এই দ্বীপ, এই নির্বাসন

এই দ্বীপ, এই নির্বাসন

মনোজ ভৌমিক

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

মা এবং বাবাকে

ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠল শৈবাল। সওয়া এগারটা। প্রায় দুপুর হতে চলল। অথচ সারা ঘরে একটা অন্ধকার জেলখানা জেলখানা ভাব। পাঁচ বছর আগে যেদিন প্রথম নিউইয়র্কে এল, নিজের ঘরে পৌঁছে প্রথম এই কথাটাই মনে হয়েছিল ওর। অথচ কলকাতায় থাকতে নিউইয়র্ক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছবি ওর মনে গাঁথা ছিল। এমনকি, তিনঘণ্টা লেট করে প্যানাম্ ফ্লাইট জিরো জিরো ওয়ান যখন কেনেডী এয়ার পোর্টে ল্যাণ্ড করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আকাশ থেকে নিউইয়র্ক শহরকে ঠিক স্বর্গের মতো দেখাচ্ছিল। কিছুদিন আগেই একটা সুইডিশ ছবিতে এইরকম একটা স্বর্গ দেখেছিল শৈবাল। অগুনতি বিরাট থাম, তার প্রত্যেকটির মাথায় একটা করে প্রদীপ। আকাশ থেকে নীচের আলো দেখে চোখে ধাঁধা লেগেছিল ওর। একটা বাচ্চা পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল— নিউয়র্ক, নিউইয়র্ক। তারপর এক হাতে সুটকেস অন্য হাতে বেশ কয়েকদিন আগে তোলা বুকের এক্সরে প্লেট নিয়ে ইমিগ্রেশন কাউন্টার পেরিয়ে কলাম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির উল্টোদিকে ব্রডওয়েয়ের ওপর ইঁট বের করা ন'তলা বাড়িটায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত আটটা। ন'তলায় উঠে হলওয়েয়ের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনটা বেজায় দমে গেল ওর। কিরকম অন্ধকার জেলখানা জেলখানা ভাব।

আবার ঘড়িটির দিকে চোখ পড়তে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শৈবাল। এখানে সবাই কেমন নিজের কাজ নিজে করে। ঘর রঙ করে, গাড়ি-বাড়ি মেরামত করে, বাগান করে, বাথরুম-পায়খানা সারায়। শুধু সাহেবরা কেন, কলকাতার বাবুরাও এদেশে এসে বেশ করিৎকর্মা হয়ে গেছে। সবাই সব কাজ নিজে করে, এ কথাটা ভাবলেই ভয় লাগে শৈবালের। এত কাজ যদি নিজেকে করতে হয়, চব্বিশ ঘণ্টায় কুলিয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ হয় ওর। বহুদিন আগে ঘরে একটা তাক লাগাবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল মনে মনে। দিন পনের পর সেই তাক শৈবালের একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল। অফিস থেকে বেরিয়ে দোকানে তাক কিনতে যেতে হবে ভাবতেই গায়ে জ্বর আসতো। একদিন মনে জোর করে অফিস-ফেরতা কুইন্সের একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়ে হাজির হল। ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলোর মধ্যে ঢুকলে পুরোপুরি হারিয়ে যায় শৈবাল। যেটা কিনতে যায় সেটা আর শেষ পর্যন্ত কেনা হয়ে ওঠে না। বহুবার এরকম হয়েছে যে কেট্‌লি বা কাপ কিনতে গিয়ে শার্ট কিংবা মানিব্যাগ নিয়ে ফিরে এসেছে ও। একতলার এত রকম শার্টের

মেলা দেখতে দেখতে কিছু না কিছু কিনতে ইচ্ছে করেই। আর অনেকক্ষণ দেখার পর কিছু একটা না কিনলে গায়ের ভেতর কামড়াতে থাকে কিরকম। হংকং-এর শার্ট, কোরিয়ার শার্ট, ইন্ডিয়ান শার্ট, জাপানের শার্ট, আমেরিকার শার্ট, টেপার্ড শার্ট, টি শার্ট, স্পোর্টস শার্ট, ড্রেস শার্ট, নাইলন, টেরিলিন, কটন, উলেন, সোয়েড ; কোন রকমে শার্টের মেলা পেরুলে ড্রেসিং গাউন, সোয়েটার, বেল্ট, মানিব্যাগ, জাঙ্গিয়া, গেঞ্জি, জুতো, সিগারেট, টুথপেস্ট, গহনা। হরেক রকমের কাঁচের শো'কেসে একই মাল হাজার রকমের। একবার গুণে দেখেছিল শৈবাল। শুধু টুথপেস্টই তেইশ রকমের। এ তো গেল একতলা। এরকম প্রায় পাঁচতলা আছে। সব কটা তলাই ঠাসা। কলকাতায় কোন অসুবিধে হত না শৈবালের। ছোট্ট দোকান, মাত্র কয়েকটা মাল। চটপট বেছে নেওয়া যেত। যাইহোক সেদিন বেশ সজাগ হয়েই দোকানে ঢুকেছিল ও। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা তিন তলায় ওয়াল ডেকরেশন সেক্‌শানে গিয়ে বাদামী রঙের চকচকে তিনটে তাক কিনে চোখ বুজে বেরিয়ে এসেছিল দোকান থেকে। বাড়িতে এসে দেখে স্ক্রু নেই, ব্র্যাকেটগুলো কেনা হয়নি, ড্রিল লাগবে দেয়াল ফুটো করতে। তাই তাকগুলো সযত্নে দেয়ালে হেলিয়ে রেখেছে। ইচ্ছেগুলো তেজী হলে, আরেকদিন বেরিয়ে বাকি জিনিসগুলো কিনে আনলেই চলবে। বাইরের ঘরে দক্ষিণের দেয়ালের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জোড়া বিরাট ভারী পর্দাটা টেনে সরাতেই চোখদুটো যেন অন্ধ হয়ে গেল। কপাল কুঁচকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে পাশের বাড়ির বুড়ো টমকে দেখতে পেল। নিউটন, উইপিং উইলো গাছটার তলায় পেচ্ছাব করছে। নিউটন টমের কুকুর।

স্কুলে পড়তে অনেকবার পাবনা গিয়েছে ও। এখনো মনে পড়ে ভোররাত্তিরে ঈশ্বরদি স্টেশন থেকে বাস নিয়ে এঁকেবেঁকে একঘণ্টার পথ। বাঁ পাশে পাবনা লাইব্রেরী, ডানদিকে টাউন হল পেরোলেই আনন্দে বাসের মধ্যেই তুর্কি লাফ শুরু করে দিত শৈবাল। টাউন হলের পাশে সেই বিরাট সাদা থামওয়ালা বাড়িটা দেখে রূপকথা মনে হোত ওর। সদর দরজা বন্ধ। পশ্চিম দিকে ইঁদারা ও লিচুগাছের পাশ দিয়ে ভেতরবাড়ির উঠোনে বাবার হাত ধরে চলে আসত ও। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার আগেই বড়কুঠুরির পাল্লা খুলে যেত। লণ্ঠন হাতে দাদির গলা শোনা যেত 'কে, গোপাল, আলি ?' বাবা চীৎকার করে জবাব দিতেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মেজকুঠুরি, ছোটকুঠুরি, ও ভেতরবাড়ির অনেক দরজার পাল্লা খুলে যেত। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। ছোটমা, মেজমা, লম্বা জ্যাঠা, ভাল কাকু, এঘর ওঘর থেকে উঠোনের ওপর জড়ো হয়েছেন। লণ্ঠন হাতে

চন্নাদা, হোঁদল আর তুফান ছুটেছে সদর দরজার কাছ থেকে মালগুলো আনতে। মেজমার বড় মেয়ে মঞ্জুদি শৈবালের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরত। যেন কোনোদিন মঞ্জুদি ওকে ফিরে যেতে দেবে না কলকাতায়। অনেক লণ্ঠনের আলোতে উঠোনের মধ্যিখানে পেয়ারা গাছটা স্পষ্ট দেখতে পেত শৈবাল। পাবনায় পুরো বাড়িতে কখনো ইলেকট্রিক দেখেনি শৈবাল। শুধু কাছারিঘরে সন্ধ্যে ছ'টা থেকে ন'টা ইলেকট্রিক আলো জ্বলত। নিউইয়র্কে এসে সকলের কথা আলাদা আলাদা ভাবে মনে হয় ওর। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের এই দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত এই মানুষটি প্রাণপণে স্মৃতিগুলোকে আঁকড়ে ধরে, আদর করে।

গায়ে গরম জলের ছ্যাঁকা লাগতে চমকে ওঠে শৈবাল। ঠাণ্ডা জলের কলটা খুলতে ভুলে গেছে ও। বাথরুমটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জলের কলটা চালিয়ে জলটা গা-সওয়া করে নেয় শৈবাল। বাথরুমের জানালা দিয়ে ব্যাকইয়ার্ডটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। লিসা, লিসার বর আর বাচ্চাটা খেলা করছে। পরশুদিনের বরফটা এখনো ঘাসের ওপর জমে আছে। বরফের বল তৈরী করে বাচ্চাটা লিসাকে ছুঁড়ে মারছে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বলে জানলাটাকে বন্ধ করে দিল শৈবাল।

জামাকাপড় পাল্টিয়ে চটপট রাস্তায় নেমে পড়ল ও। প্রায় দেড়টা। কুইন্সের রিগো পার্কে ওর অ্যাপার্টমেন্ট। ম্যানহাটান থেকে কুইন্সে এসে বেশ কয়েকদিন মেজাজটা খারাপ ছিল। প্রথমদিন ম্যান্‌হাটানের বাড়িটার হলওয়েতে পৌঁছে জেলখানা মনে হলেও আস্তে আস্তে ন'তলার ওপরে ছোট্ট ঘরটার প্রেমে পড়েছিল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হাড্‌সন নদীটা দেখা যায়। এপারে নিউইয়র্ক, ওপারে নিউ-জার্সি। সকালবেলা রোদ্দুর পড়ে হাড্‌সন ঝিকমিক করে—রাতে হাড্‌সনের ওপারে নিউ-জার্সি শহরের আলো অসংখ্য জোনাকির মতো জ্বলে। নদীর এপারের কোল ঘেঁষে ওয়েস্ট সাইড হাইওয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে উত্তর-দক্ষিণে। রাত্তিরে হাইওয়ের ওপরে গাড়িগুলো দেখা যায় না। শুধু হেডলাইটের আলোগুলো হাড্‌সনের আকাশে অসংখ্য বিন্দুর মতো ভেসে বেড়ায়। প্রথম রাত্তিরে প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে এই অসংখ্য আলোর মালা দেখেছিল শৈবাল। একটা উদ্ভট ভাবনা এসেছিল মাথায়। মনে হয়েছিল অসংখ্য মানুষ মশাল হাতে ঐ নদীটাকে পাহারা দিচ্ছে। হাড্‌সনকে খুব পবিত্র মনে হয়েছিল হঠাৎ। মনে হয়েছিল নিউইয়র্কের গঙ্গা। পরে জেনেছে হাড্‌সনের জল অত্যন্ত নোংরা। ও জলে বিষ

আছে। যত জেনেছে তত গঙ্গার কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে বসেছে। এত বিষ বুকে নিয়ে যে নদী এখনো ঝিকমিক করে সে নদী পবিত্র। ঠাকুরদেবতা সম্পর্কে ওর যে কোন প্রত্যক্ষ ভক্তি আছে তা নয়। অথচ হাড্‌সনের পবিত্রতা সম্পর্কে এই দৃঢ় বিশ্বাসে নিজেরই অবাক লাগে। পূর্ব দিকে বাড়ি ঘেঁষে রাস্তাটা ব্রডওয়ে। অন্য ফুটপাতে অনেকখানি চত্বর জুড়ে কলাম্বিয়া যুনিভার্সিটি। কলকাতায় থাকতে ব্রডওয়ে আর কলাম্বিয়া যুনিভার্সিটির নাম অনেক শুনেছে শৈবাল। ওর ধারণা ছিল ব্রডওয়ে মানেই নাটালি উড আর জিনা লোলোব্রিজিডা। কাজেই, ওর বন্ধুর কাকা যখন এই বাড়িটাতে ঘর ঠিক করে চিঠি দিয়েছিলেন, কিরকম একটা উত্তেজনা অনুভব করেছিল ও। নাটালি উড, জিনা লোলোব্রিজিডা আর শৈবাল সেন। পাশাপাশি নামগুলো অনেকবার উচ্চারণ করেছে। অথচ কলম্বিয়া যুনিভার্সিটি আর ন'তলা বাড়িটার মাঝখানে ব্রডওয়ের সঙ্গে ওর কল্পনার কত তফাৎ। আপার ব্রডওয়ের চেহারা অনেকটা কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের মতো। রাস্তার দু'ধারে ফুটপাতে পুরোনো-নতুন বই-এর দোকান, দোকানের বাইরেও স্টল করে অনেক বই সাজানো। এক একটা ব্লকে দু'তিনটে কফি কর্ণার, তাছাড়া স্টেশনারি, তরি-তরকারির বাজার। দক্ষিণে দু'তিনটে ব্লক হাঁটলেই ভিখিরীর মেলা। সাদা, কালো, তামাটে সব দেশের সব রঙের ভিখিরী। রাস্তায় গিস গিস করছে ভীড়। ছত্রিশ জাতের মানুষ। বাহাত্তর রকমের পোশাক—ভিক্টোরিয়ান থেকে মড্ পর্যন্ত। নিগ্রো লোকগুলোকে দেখে ভয় লাগতো প্রথম প্রথম। পরে জেনেছে কলাম্বিয়ার পেছনেই হার্লেম। হার্লেম সম্পর্কে জুজুবুড়ির মতো একটা ভয় ছিল কলকাতা থেকেই। পরে অবশ্য ধারণা পাল্টেছে—বহুবার গিয়েছে ওখানে। প্যাটের সঙ্গে আলাপ হয়েছে অবশ্য অনেক পরে। নিগ্রো মেয়ে প্যাট্রিশিয়া ডেভিস। টিয়া দত্ত, প্যাটের সঙ্গে একই অফিসে কাজ করে।

লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেসওয়ের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূরে আলেকজ্যাণ্ডার্স ডিপার্টমেন্ট স্টোরটা চোখে পড়ল ওর। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাপড় কাচা সাবানের বিজ্ঞাপনটা মনে এল ওর। রিং অ্যারাউণ্ড দ্য কলার! ওর সবকটা জামা নোংরা হয়ে গেছে। এত নোংরা যে কাচলেও কলারের কাছটা পরিষ্কার হয় না কিছুতেই। আজকে দুটো শার্ট ওকে কিনতেই হবে। স্টোরের পেছনে বিরাট পার্কিং লটটার গা-ঘেঁষা ফুটপাথের ওপর দিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল শৈবাল। স্নান করে বাইরে বেরিয়ে বেশ শীত শীত করছে এখন। বাঁদিকে বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। ফুটপাতের ওপর সারি সারি গাছ। একটাও পাতা

নেই, উদোম ন্যাংটো। কলকাতা থেকে নিউইয়র্কে এসে প্রথম শীতে এই ব্যাপারটা বেশ মজার লেগেছিল ওর। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি গাছের সবুজ পাতাগুলি রং বদলায়। লালচে তারপর বিবর্ণ হলুদ। অক্টোবর থেকেই টুপটাপ ঝুপঝাপ নিঃশব্দে পাতাগুলো ঝরে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সব পাতা ঝরা শেষ। সারাটা শীত এই উলঙ্গ গাছগুলি হি হি করে কাঁপে। গাছে কচি কচি ডালে বরফ মাঝে মাঝে কাঁচের লাঠির মতো দেখায়। রোদ্দুর উঠলে এই কাঁচের লাঠি গলে টুপটাপ জল পড়ে মাটিতে।

গাছগুলোর দিকে তাকালেই কাঁপুনি ধরছে। অ্যাপার্টমেন্টগুলোর দিকে এইটিন এইচ নম্বরটা মনে পড়ে গেল শৈবালের। টিয়া দত্তর অ্যাপার্টমেন্ট। অনুপ দত্ত'র বউ। শৈবালের টিয়া। ঠিক এক্ষুনি টিয়া কি করছে জানার কৌতূহল হল ওর। বরের সঙ্গে প্রেম করছে? রান্না করছে? নাকি ইলেকট্রা পড়ছে? টিয়া ইউজিন ও'নীলের খুব ভক্ত। মেজাজ খারাপ থাকলেই ইউজিন ও'নীলের নাটক নিয়ে বসে। শৈবালের মাঝে মাঝে মনে হয় টিয়া যেন বিভ্রান্ত। টিয়ার বাবা ইন্‌কাম ট্যাক্সের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কলকাতায় বেলভেডিয়ার অঞ্চলে থেকেছে ছোটবেলা থেকে। পড়াশুনা লোরেটোতে। স্কুল শেষ করে প্রেসিডেন্সী কলেজ। সেখানেই অনুপ দত্ত'র সঙ্গে আলাপ ও দু'বছরের মধ্যে বিয়ে। আরো বছর দুয়েক পর আমেরিকা। টিয়ার কাছে শুনেছে বড়লোকের ছেলে অনুপ। সখ করে পড়াশুনো করতে আসা। নিউইয়র্কে আসার আগে 'আনন্দবাজার' কাগজে 'উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা'র কলমে ছবিসহ অনুপের নাম, ওর বাবা-মা-দাদুর নাম, আদিনিবাস এবং বি এস-সি'তে সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার গল্প ছাপা হয়েছিল। অনুপের মাকে একবার দেখেছিল শৈবাল। চুল বব করে টিয়ার দিদি-দিদি লাগছিল।

কুমারেশদার বাড়িতে একটা পার্টিতে টিয়ার সঙ্গে শৈবালের আলাপ হয়েছে মাসখানেক আগে। কুমারেশদার স্ত্রী বেশ ভালই রান্নাবান্না করেন—কিন্তু নেহাত পেটের তাগিদে কারো বাড়িতে যেতে ভালো লাগে না আর। কুমারেশদাকে সরাসরি নাও করতে পারে না। অনেকদিন আলাপ। টিয়া যে দেখতে সুন্দর তা নয়। কিন্তু আলগা চটক আছে একটা। সোফার এককোণে বসে একটা 'নিউজউইক' পত্রিকায় চোখ ডুবিয়ে পার্টির কোলাহল থেকে দুদণ্ড শান্তি পেতে চাইছিল শৈবাল। টিয়া ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে প্রশ্ন করেছিল — 'বোর হচ্ছেন?' শৈবাল অল্প হেসেছে তাকিয়ে। টিয়া আবার বললো, 'দ্যাট মেক্‌স দি টু অফ্ আস।' সেই মুহূর্তে টিয়াকে খুব ভাল লেগেছে

ওর। মদের গন্ধ, খাবারের গন্ধ, পরনিন্দা, পরচর্চার একঘেয়েমির মধ্যে টিয়া যেন একরাশ নতুন বাতাস।

পার্টিতে দেখা হবার দিন সাতেক পর টিয়া একটা শনিবার ওর বাড়িতে ফোন করে। অবাক হয়নি শৈবাল। টিয়া বলেনি, কিন্তু কেন যেন শৈবালের মনে হয়েছিল টিয়া ফোন করলে বেশ হয়। অনুপ দত্ত সে সময়টা ক্যানাডায় গেছে অফিসের কাজে। টিয়া বলল, 'আসুন না, আড্ডা মারা যাবে।' শৈবাল বলেছিল, 'কি রাঁধবেন বলুন!' টিয়া প্রায় ধমকের সুরে বলল—'টিপিকাল মিড্‌ল ক্লাস অ্যাটিচুড্। আপনি কি পেটসর্বস্ব!'

সে রাত্তিরে টিয়ার কাছ থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটা অপরাধবোধ মাছির মতো ভন ভন করেছিল মনের চারপাশে। কিন্তু নেশাটা গেল না। টিয়ার স্পর্শ লেগে রইল চামড়ার নীচে। চৌকোণা মুখ, থুতনিতে কাটা দাগ, নরম বুক, বাদামী স্তনবৃন্ত নিয়ে মিসেস অনুপ দত্ত শৈবালের টিয়া হয়ে গেল। বৈধ বা অবৈধ সম্পর্ক যাই হোক, শৈবালের আটাশ বছর বয়সে টিয়াই প্রথম গোটা মেয়ে।

পোড়া গন্ধ নাকে আসতে চারপাশে তাকাল শৈবাল। হৈ চৈ করে লোকজন ছুটছে ডান দিকে। ডান দিকের আকাশটা কালো হয়ে গেছে। আগুন লেগেছে কোথাও। ধোঁয়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। সামনে একটা বাড়ি থাকাতে আর কিছু দেখতে পেল না শৈবাল। পা চালিয়ে বাড়িটা পেরিয়ে ডানদিকে তাকাল শৈবাল। কুইন্স বুলেভার্ডের ওপারে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস দাউ দাউ করে জ্বলছে। আলেকজ্যাণ্ডার্স বাঁ হাতে ফেলে ডানদিকে ছুটল শৈবাল। কুইন্স বুলেভার্ডে ট্রাফিক বন্ধ। পুলিশে ছেয়ে গেছে। রাস্তা পেরোতে গিয়ে দমকলের বিকট আওয়াজ কানে এল ওর। সাইড রাস্তায় কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ। ব্যারিয়ার দিয়ে রাস্তাটা ফাঁকা করে রেখেছে। বোধহয় দমকলের জন্যেই। লক্ লক্ করে আগুন জ্বলছে বাড়িটার একতলায়। অনেক লোকের পেছনে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে ভাল করে তাকাল শৈবাল। ইঁটের বাড়ি। পাঁচ-ছ'তলা হবে। কালো হলদে পোশাক পরা ধাড়ি ধাড়ি লোকগুলো লাফিয়ে নামল দমকলের গাড়ি থেকে। পাশের লোকজন কথা বলছে ফিস ফিস করে। সকলের মধ্যেই বেশ একটা উত্তেজনা। কোণার দোকানটাতে ঠেস দিয়ে বুলডগের মতো দেখতে একটা মাঝবয়সী আমেরিকান হাত-পা নেড়ে কি সব

বোঝাচ্ছে। ভীড় ঠেলে একটু কাছে যাবার চেষ্টা করলো শৈবাল। 'আরসন', 'আরসন' বলে একটা রব উঠল। অর্থাৎ, কেউ বদমাইসি করে আগুন লাগিয়েছে বাড়িটায়। আরো কাছে যেতে কানাঘুষোয় গল্পটা শুনতে পেল শৈবাল। একটা পুয়েটোরিকান ছেলে নাকি একতলায় থাকত। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দিন সাতেক আগে। বাড়িওয়ালা সন্দেহ করছে ওই নাকি আগুনটা লাগিয়েছে। চাকরি-বাকরি ছিল না, ভাঁড়া দিতে পারেনি তিনমাস। তাই, বাড়িওয়ালা তাড়িয়েছে। ওকে নাকি ঘণ্টা তিনেক আগে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে কেউ কেউ। বুলডগের মতো লোকটা এখনো চেঁচিয়ে চলেছে। বলছে—'এই সব জাতগুলোর জন্যই নাকি শহরটা গোল্লায় গেল।' হঠাৎ পুয়েটোরিকান ছেলেটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করল শৈবালের। সত্যিই তো চাকরি না পেলে ভাড়া দেবে কি করে! চাকরি নেই, মাথার ওপর ছাদটাও নেই—আক্রোশটা স্বাভাবিক বলেই মনে হল ওর। কেউ রাগ করে না, কোনো আক্রোশ দানা বাঁধে না বলেই তো যা খুশি তাই হচ্ছে পৃথিবীতে। 'শালা'—মনে মনে বিড় বিড় করল শৈবাল—'মাথার ওপর থেকে ছাদটা কেড়ে নিয়েছ—ও কি তোমার দু'গালে চুমু খাবে নাকি? বলবে, হে সুন্দর, তুমি আমার বাস উঠিয়েছ—তুমি আমার যীশু, এসো তোমায় প্রণাম করি!'

'হায় শয়বাল'—মেয়েলি কণ্ঠে পেছন ফিরে তাকাল শৈবাল। ভূত দেখে আঁতকে উঠল যেন। প্যাট ডেভিসকে মোটেই এখানে আশা করেনি ও। এখানে কি করছে প্যাট? নিজের অজান্তেই চোখটা গিয়ে পৌঁছল পার্কিংলটের ওপারে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং'-এ।

'কি ব্যাপার, তুমি এখানে?' বিস্ময় চাপতে পারে না শৈবাল।

'আই টোল্ড ইউ, ডিড্‌ন্ট আই? মাই কাসিন লিভ্‌স ইন দি নেবারহুড। ইউ মেট্ হার ইন মাই হাউস, রিমেম্‌বার?'প্যাটের গলাটা বড্ড জোরে শোনালো। নাকি, শৈবালের ভয় করছে এইটিন এইচ থেকে ওকে দেখা যাচ্ছে কিনা! শৈবালের এখন অস্পষ্ট মনে পড়ল প্যাটের এই মাসতুতো বোনের কথা। প্যাটের বাড়িতে আলাপ হয়েছে সপ্তাহ দুয়েক আগে। সেদিনই প্রথম প্যাটের বাড়িতে গিয়েছিল শৈবাল। চায়না টাউনে মেলা দেখতে গিয়ে আজকের মতো হঠাৎই প্যাটের সঙ্গে দেখা। তার আগে টিয়ার অফিসের সামনে দেখা হয়েছে অনেকবার। টিয়াই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। জোর করেই প্যাট সেদিন ওকে নিয়ে গিয়েছিল হোবোকেনে। হোবোকেন হাড্‌সনের ওপারে নিউ-জার্সির একটা শহর। সেইখানেই একটা টু-ফ্যামিলি হাউসে থাকে প্যাট। বাড়িটার একতলায়

ভাড়া থাকে ও।

'ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু টক টু মি ? ইউ সেইড ইউ উইল কল মি। ইউ নেভার ডিড।' প্যাটের গলায় অভিমান।

'সময় হয়ে ওঠেনি। তারপর কি রকম আছ বল ?' প্যাটের উপস্থিতিতে এখনো অস্বস্তি বোধ করছে শৈবাল।

'বাই দি ওয়ে, এ ফানি থিং হ্যাপেন্‌ড লাস্ট উইক। আই টোল্ড টিয়া দ্যাট ইউ হ্যাড্ বিন টু মাই প্লেস। শী ডিড্‌ন্ট সিম টু হ্যাড লাইক্‌ড ইট।' প্যাটকে একটু চিন্তান্বিত মনে হল।

'কেন ?' জেনেশুনেও প্রশ্নটা করে ফেলে শৈবাল।

'ইউ টেল মি !' ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসলো প্যাট। হাসলে প্যাটকে বেশ দেখায়। ওর যে একটা বারো বছরের ছেলে আছে ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই। প্যাটের বর পালিয়েছে বছর পাঁচেক আগে। বর পালিয়ে যাবার পর একা সংসার চালাচ্ছে প্যাট। ছেলেটা স্কুলে যায়। বুড়ি মাকে নিয়ে এসেছে মেম্‌ফিস্ থেকে। হঠাৎ টিয়ার ওপর রাগে গাটা জ্বলে গেল শৈবালের। অকর্মার ঢেঁকি। বাড়িতে বসে বসে 'ইলেকট্রা' পড়ছে, অনুপের আড়ালে ওর সঙ্গে প্রেম করছে আর বর এলে সতী, সাধ্বী বউ সেজে গয়না পরে পার্টিতে যাচ্ছে। প্যাটের কাছে টিয়াকে ফালতু মনে হল ওর।

'ওয়েল, কল মি সাম টাইমস্। আই হ্যাভ্ টু গো নাও। বাই !' হাত নেড়ে ভীড়ে মিশে গেল প্যাট। অনেকক্ষণ ঐ দিকে চেয়ে রইল শৈবাল। এদিকে ভীড়টা পাতলা হয়ে এসেছে। ধোঁয়া ঢুকে চোখটা জ্বালা করছে এখন। কুইন্স বুলেভার্ড পর্যন্ত এগিয়ে আসতেই ডানদিকে আলেকজ্যাণ্ডার্সটা আবার চোখে পড়ল ওর। শার্ট কেনার তাগিদটা এখন আর নেই। তার চেয়ে শহরে গিয়ে একটা সিনেমা দেখলে বেশ হয়। শহর মানে ম্যান্‌হাটান, হাজার হাজার নিয়নবাতি জ্বালানো সিটি অফ অল সিটিস্। গরীব, বড়লোক, পাগল, আঁতেল, ছাপোষা, কবি, কুস্তিগীর, সতী, সাধ্বী, বেশ্যা, বেশ্যার দালাল—সকলেরই পেয়ারে শহর এই ম্যান্‌হাটান। পূর্বে হার্লেম নদী, পশ্চিমে হাড্‌সন দিয়ে ঘেরা এই এক চিলতে দ্বীপে কি একটা যাদু আছে ! কুইন্সে এসে প্রথম প্রথম তাই খুব মনখারাপ লাগত ওর। সাজানো-গোছানো মধ্যবিত্ত অঞ্চলে বাড়ি। দোকানপাট. লোকজন সবই আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে চরিত্তির নেই। লোকগুলো সকালে অফিস যায়, সন্ধ্যেবেলায় বাজার করে, ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বেড়ায়, বুড়ো

টম নিউটনকে পেচ্ছাব করায়, তারপর রাত্তির ন'টা বাজতে না বাজতেই রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করতে থাকে। ফাঁকা রাস্তার ওপর মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংগুলো ভূতের মতো সারা গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ম্যান্‌হাটানে তখন আসর জমে। খেলা শুরু হয়। এক এক পাড়ায় এক এক রকমের খেলা। ম্যান্‌হাটান শহরে কখনো একা লাগে না শৈবালের! পাঁচ বছর কেন, ও যেন এই শহরটাকে সারা জীবন ভালবাসতে পারে।

আলেকজ্যাণ্ডার্স-এর কাছাকাছি আসতেই সাবওয়ে স্টেশনটা চোখে পড়ল ওর। সুরুৎ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাটির নীচে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেল শৈবাল। স্টেশনে বেশ ভীড়। অনেকক্ষণ ট্রেন আসেনি বোধহয়। ছুটির দিনে এই সব অঞ্চলে অনেকক্ষণ পর পর ট্রেন দেয়। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারি করতে করতে ভীড়ের মানুষগুলোকে আলাদা ভাবে দেখতে লাগল শৈবাল। একটু আগেই জ্বলন্ত বাড়িটার সামনে যে লোকটা 'আরসন', 'আরসন' বলে চেঁচাচ্ছিল, সে এখন বেঞ্চিতে বসে মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। মুখে একটা কিরকম সৌম্য, নির্লিপ্তভাব। একটু আগেই যে লোকটা চোখমুখ লাল করে চেঁচাচ্ছিল, মুখ দেখলে এখন আর সেটা বোঝার উপায় নেই।

ঐ বেঞ্চিরই কোণার দিকে অল্পবয়সী দুটো ছেলেমেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। দু'জনে এত বিভোর যে ট্রেন এসে চলে গেলেও টের পাবার কথা নয় এদের। কিন্তু শৈবাল জানে তা হবে না—ট্রেন এলে চুমু খেতে খেতেই ওরা ঠিক উঠে পড়বে ট্রেনে ; বরঞ্চ দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে ও নিজেই ট্রেনটা মিস করে যাবে হয়ত। আমেরিকান জাতের এই প্র্যাক্‌টিকাল ব্যাপার-স্যাপার বেশ তারিফ করে শৈবাল। সব কিছুরই একটা সময় আছে—কাজের সময়, খাওয়ার সময়, শোয়ার সময়। চুমু খাওয়ার অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। এর সঙ্গে কাজেরও কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ, চুমু খেতে খেতে অনায়াসে কাজ করা যায়। টিয়াকে একবার সাবওয়ে স্টেশনে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল শৈবাল। টিয়া তারপর অনেকদিন ওর সাথে কথা বলেনি। পরে টিয়াকে এ ব্যাপারে বহুবার প্রশ্ন করেছে শৈবাল। টিয়া সঠিক কোন উত্তর দেয়নি। শুধু বলেছে—'কেউ যদি দেখে ফেলত ?' কার দেখে ফেলাকে ভয় করে টিয়া ? অনুপ ? টিয়া বলে, 'শুধু অনুপ কেন, যে কোন বাঙালী !' অবাক হয়নি শৈবাল। এখানে বাঙালীরা সব চেয়ে বেশি ভয় পায় বাঙালীদের। চুমু খেতে চাও খাও—কিন্তু বাঙালীরা যেন না দেখে !

বিকট শব্দ করে উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা এসে থামে। ট্রেনটার গায়ে রঙ বেরঙের উল্কি। প্রথম প্রথম এই সব হিজিবিজি আঁকা বেশ নোংরা লগত ওর। আজকাল বরঞ্চ আঁকা না থাকলেই অস্বস্তি লাগে। দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান না থাকলে যেমন কলকাতা বলে মনে হয় না তেমনই নিউইয়র্কে ট্রেনে ও দেয়ালে এই সব রঙ বেরঙের উল্কি একটা বিশেষ চরিত্র এনে দিয়েছে এই শহরকে। এক জায়গায় লেখা আছে—'রেগান স্টিংক্স।' তার পাশেই রেগানের একটা ছবি। বিরাট পাঁউরুটি হাতে রেগানকে ঘিরে কয়েকটা নিগ্রো ভিখিরী ছেলেমেয়ে। যেই এঁকে থাকুক, ছবিটার তারিফ না করে পারল না শৈবাল। রঙের ক্যান থেকে স্প্রে করে যে এরকম একটা ছবি আঁকতে পারে সে নিশ্চয়ই জিনিয়াস। এর পাশেই অপটু হাতে আঁকা একটা অশ্লীল ছবি। পাশে লেখা—সিণ্ডি প্লাস টম, তারপর একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। হঠাৎ পুয়েটোরিকান ছেলেটার কথা মনে হয় শৈবালের। ছেলেটা এখন কোথায় কে জানে! নিজের ওপর বড্ড করুণা হল ওর। এই একত্রিশ বছরে কিছুই করেনি ও। ভাল না, মন্দ না, কিচ্ছু না। কিংবা যা কিছু করেছে কেন করেছে ও জানে না। পড়াশুনো কেন করেছে জানে না, আমেরিকা কেন এসেছে জানে না, টিয়ার সঙ্গে কেন প্রেম করে জানে না। একত্রিশ বছর ধরে ও যেন টাইম পাস করে যাচ্ছে। ওর জীবনটা যেন ও প্লাস বোরডম প্লাস টিয়া প্লাস শূন্যতা আর তারপর একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

ওপারের ট্রেনটা ছেড়ে দিল। দূর থেকে এই প্ল্যাটফর্মে আসা ট্রেনটার আলো এসে পড়ল শৈবালের চোখে। ধার থেকে সরে এসে দাঁড়াল ও। ছুটির দিন বলে অনেক কামরা বাদ দিয়ে দিয়েছে বোধহয়। কারণ স্টেশনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শেষ কামরাটা। শৈবাল আরো অনেকের সঙ্গে ছুটলো। ওর আগে চুমু খাওয়া অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে দুটোও দৌড়ে উঠে পড়ল ট্রেনে। ট্রেনটা খুব ফাঁকা নয়। তাহলেও একটা বসবার জায়গা পেয়ে গেল শৈবাল। পাশে একটা আধবুড়ো আমেরিকান লোক বসে বসে ঝিমোচ্ছে। কোলের ওপর খোলা একটা সাপ্তাহিক কাগজ। গা দিয়ে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। সারারাত্তির মদ গিলেছে হয়ত। দেয়াল-ঘেঁষা সিটটায় ছেলে-মেয়ে দুটো এখনো মিলেমিশে একাকার। ছেলেটার একটা হাত মেয়েটার বুকের ওপর আলতো করে রাখা। মেয়েটার জামাটা বড্ড ছোট। কিংবা স্তন দুটো জামা আন্দাজে বড্ড বড়। জামার বাঁধন ছাড়িয়ে উপচে পড়েছে বাইরে।

'শৈবাল, না ?' পরিষ্কার বাংলা কথায় চমকে পেছন ফিরে তাকালো শৈবাল।

প্রলয় ঘোষ। একটু দূরে রত্না বৌদি ও প্রলয়দার মেয়ে পিংকি। মনে মনে প্রমাদ গোনে শৈবাল। ও যে মেয়েটাকে দেখছিল প্রলয়দা দেখে ফেলেছে কিনা কে জানে! টিয়ার কথাগুলি মনে পড়ে গেল আবার। যা খুশি কর, যেদিকে খুশি তাকাও বাঙালীরা যেন না দেখে। এই মুহূর্তে নিজেকে অপরাধী মনে হল ওর। প্রায় 'ধর্মাবতার হুজুর' বলার মতো করুণ কণ্ঠে শৈবাল বলল—'মালুদা!' প্রলয়দার নাম কি করে যে মালুদা হয়ে গেল এ ব্যাপারে প্রথম প্রথম বেশ বিস্ময় ছিল ওর। ডক্টর পালের বাড়িতে একটা মজার কাণ্ড হয়েছিল একবার সেই থেকে মালুদাকে মনে আছে ওর। প্রচুর মদ্যপান করে টিয়ার গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছিলেন। কুমারেশদা চাপা স্বরে মালুদাকে ধমক দিয়েছিলেন। মালুদা খুব রোমান্টিক গলায় বলছিল—আমি রুক্মিণীকে ভালবাসি।'

কুমারেশদা বললেন—'ও রুক্মিণী নয়, ও টিয়া। অনুপ দত্তর স্ত্রী টিয়া দত্ত।'

মালুদা খুব বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন—ঠিক আছে, তোমার কথাও ঠিক, আমার কথাও ঠিক। ও অনুপ দত্তের বউ টিয়া আর আমার বউ রুক্মিণী।'

টিয়া ভয় পেয়ে উঠে গিয়েছিল। রত্নাবৌদি অবশ্য খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন।

'কোথায়?' মালুদার কণ্ঠস্বরে কিরকম একটা দাদা-দাদা ভাব।

'এই তো একটু শহরের দিকে যাচ্ছি। আপনি?' সহজ হবার চেষ্টা করল শৈবাল।

'কলকাতা যাচ্ছি', মালুদা মিটিমিটি হাসছেন।

অবাক হবারই কথা। ট্রেনে করে কলকাতা যাচ্ছে মালুদা!

'কবে?'

'আট সপ্তাহ বাকি আছে আর। শপিং করতে বেরিয়েছি একটু। আমার যা শালা, শালী আর মাসতুতো, পিসতুতো ভাইবোনের গুষ্টি তাতে ভালো দোকান থেকে গিফ্‌ট কিনতে গেলে তো ফেল মেরে যাবো ভাই। তাই সারা সপ্তাহ ধরে কাগজ কিনি। সেল দেখলে দাগ মারি, আর ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়ি।'

'এত কেনেন কেন?' সত্যিই অবাক হল শৈবাল।

'আরে ওদের জন্যে কি আর কিনি। কিনি নিজের প্রেস্টিজ রাখতে। দু'চারটে জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে না দিলে আমেরিকা থেকে আসছি বুঝবে কি করে।'

'দেশে না গেলেই পারেন।' শৈবাল একটু গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকাতেই দেখতে পেল পিংকি এক দৃষ্টিতে ওর বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আরে যাই কি আর সাধে। দুবছর পর পর না গেলে বৌ ভেগে যাবে বলেছে।'

রত্নাবৌদির দিকে ভাল করে তাকাল শৈবাল। রত্নাবৌদি কথাগুলো শুনতে পায়নি নিশ্চয়ই। অল্প হাসলেন শৈবালের দিকে তাকিয়ে। পিংকি এখনো বাবার দিকে তাকিয়ে।

'দেখো, দেখো, এদেশের মেয়েদেব দেখ! কি রকম লিবারেটেড দেখ!'

মালুদা বোধহয় কোণের সীটের মেয়েটার কথা বলছেন। হঠাৎ রত্নাবৌদির দেশে যেতে চাওয়ার সঙ্গে এই মেয়েটির লিবারেশনের সম্পর্কটা ধরতে পারল না শৈবাল।

'কিন্তু...' শৈবাল কিছু বলার আগেই মালুদা থামিয়ে দিলেন।

'এই জন্যেই এদেশটাকে এতো ভালো লাগে বুঝেছো। যা ইচ্ছে তাই করছে।'

শৈবাল মালুদার কথাব কোনো উত্তর না দিয়ে পাশের লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা এখনো মুখটা বিচ্ছিরি হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। কোলের কাগজটা এখনও খোলা।

'কিন্তু বড্ড টেনসন হে এদেশে—মালুদার কণ্ঠস্বরে দীর্ঘশ্বাসের আভাস পাওয়া গেল—এই যে দেখ, মেয়েটা বড় হচ্ছে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আতঙ্কে আছি। যদিও বেশ কড়া শাসনেই থাকে কিন্তু সব সময় তো আর চোখে চোখে রাখতে পাবি না। কোথায় যে কোন ছেলের সঙ্গে কি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে! বয়ফ্রেণ্ডের বাড়িতে হোমওয়ার্ক করতে যাবে বলেছিল, জোর করে নিয়ে এসেছি বলে, দেখ না মুখটা কি রকম হাঁড়ি করে বসে আছে।'

শৈবাল উত্তর দিল না। এক মুহূর্ত আগেই এই লোকটা অদূরের মেয়েটাকে গিলছিল হাঁ করে আর 'লিবারেটেড' 'লিবারেটেড' করে চেঁচাচ্ছিল। আর নিজের মেয়ের কথা উঠতেই কিরকম সনাতন বাবা বনে গেল লোকটা। যত লিবারেশন সব পরের মেয়ের বেলায়—আর নিজের মেয়ে হলেই সতী, সাধ্বী, বেউলো।

কলকাতা থেকে আমেরিকা এসে এই লোকগুলো আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে বলে মনে হল ওর। পাশের লোকটার কোলের কাগজটায় চোখ বোলাতে লাগল শৈবাল। এ পাতাটায় বেশ মজার মজার বিজ্ঞাপন। অধিকাংশই মাসাজ পার্লারের। কাগজের নামটা পড়তে পারছে না ও। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনে চোখটা আটকে গেল। দোকানের নাম 'দি ওরিয়েন্টাল ডিফারেন্স।' সুন্দরী ওরিয়েন্টাল মেয়েরা চান করিয়ে দেবে, গা টিপে দেবে। ঢুকতে লাগবে ত্রিশ ডলার। সকালবেলায় টিয়ার কথাগুলো মনে পড়ে গেল শৈবালের।

ট্রেনটা থার্টি ফোর্থ স্ট্রীট স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। লাফ দিয়ে সীট ছেড়ে উঠে পড়ল শৈবাল।

'কি হে, চললে নাকি ?' অস্পষ্টভাবে মালুদার কথা কানে এল ওর। পেছন ফিরে তাকানোর সময় নেই। ট্রেনের কামরা বন্ধ হবার আগেই টুক করে প্ল্যাটফর্মের ভীড়ে মিশে গেল। গিজ গিজ করছে লোক। আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের ট্রেন ছাড়ে এখান থেকে। একটা ক্যাণ্ডিস্টোর দেখে দাঁড়াল শৈবাল। সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে করছে। মানিব্যাগটা থেকে কুড়ি ডলারের একটা নোট বার করলো শৈবাল। মাইনের পুরো টাকা ব্যাগে। মালুদার কথাগুলো এখনো কানের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। এখানকার সস্তার উপহার কিনে দেশের মানুষগুলোকে উপহাস করছে। ভাবতেই মাথাটা গরম হয়ে গেল ওর। মাথাটা বড্ড ধরিয়েছে মালুদা। এক কাপ কফি না খেলেই নয়। সিগারেট আর চেঞ্জটা নিয়ে শৈবাল রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

সামনেই এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর চুড়োটা দেখা যাচ্ছে। সিক্সথ্ এভিন্যু ধরে গাড়িগুলো যেদিক থেকে আসছে, তার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল শৈবাল। চারিদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাত্র পাঁচটা বাজে এখন। শীতকালে বড্ড তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয় এখানে। বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে এখন। ঠাণ্ডা বেশি নেই কিন্তু এই হাওয়াটা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। ডানদিকে একটা কফিশপ দেখে চটপট ভেতরে ঢুকে পড়ল শৈবাল। কফি অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের লোকগুলোকে এখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঠিক সিনেমার মতো। বাইরে বেশ হাওয়া দিচ্ছে নিশ্চয়। মানুষজন যে যার মতো হেঁটে যাচ্ছে, যে যার তালে, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। কেউ কাউকে চেনে না। এই সেই শহর যেখানে সবাই সব কিছু পায়। কেউ কাউকে কিছু দেয় না। সবাই নিয়ে নেয়। কফিতে চুমুক দিয়ে বেশ আরাম লাগল ওর। কলকাতায় শীতের রাত্তিরে লেপের মধ্যে এই উষ্ণতা অনুভব করত শৈবাল। হঠাৎ ডানদিক থেকে প্রচণ্ড জোরে গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজে চমকে তাকালো শৈবাল। একটা লোককে সে ছিটকে পড়তে দেখল। কেউ কিছু বোঝার আগেই গাড়িটা ঐ ভীড় রাস্তায় ডানদিকে ঘুরল তীব্রগতিতে। কিছু লোক চীৎকার করে উঠল। কেউ কেউ গাড়িটার পেছনে ডানদিকে ছুটল। আর কিছু লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তায়। দোকানের ওয়েটারটাও ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। পেছনে পেছনে শৈবালও ছুটছে। রাস্তায় গিজ গিজ করছে মানুষ। ভিড় ঠেলে মাঝখানে যেতে চেষ্টা করল

শৈবাল। ওর সামনেই মুখে রুমাল চেপে একটা মেয়ে 'মাই গড' বলে মাটিতে বসে পড়ল। রাস্তার মাঝখানে লোকটা পড়ে আছে উপুড় হয়ে। কিছু করার নেই কারো। ঘিলু, রক্তে মাখামাখি মাথাটা চ্যাপ্টা হয়ে প্রায় রাস্তার সঙ্গে আটকে গেছে। হঠাৎ বরদাজ্যাঠার চীৎকারটা যেন স্পষ্ট শুনতে পেল শৈবাল—আই ডোন্ট বিলিভ ইট, ইট্‌স এ কন্‌স্পিরেসি।' বরদাজ্যাঠার ছেলে সন্তুও গাড়ি চাপা পড়েছিল। খুব ভোরবেলায়, সকলের দৃষ্টির আড়ালে, রেড রোডে। সিক্সথ্ এভিন্যুটা হঠাৎ যেন রেড রোড হয়ে গেল। শৈবাল স্পষ্ট দেখতে পেল সন্তু উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। বরদাজ্যাঠা বাবার খুড়তুতো দাদা। পার্টিশানের আগেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন শৈবালদের মতো। সন্তু ও শৈবাল বড় 'হয়েছে একই সময়ে। খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের। মাথার মধ্যে হাজার পোকা কিলবিল করছে এখন। টলতে টলতে ভীড় ঠেলে অন্য ফুটপাথের দিকে এগোতে লাগল শৈবাল। সন্তু মারা যাবার দু'বছর বাদে বড়মা পাগল হয়ে যান। কেউ কিছু বললেই মুখে আঙুল ঠেকিয়ে বলতেন—'শাট্‌ আপ।' ঠিক ভবানীপুর থানার দারোগা শেতল মুখুজ্যের মতো।

চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে একটা শ্বাস নিল শৈবাল। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে যদি মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়। ওপর দিকে মাথা তুলতেই চমকে উঠল ও। জ্বলছে, নিবছে সাইনবোর্ড। 'দি ওরিয়েন্টাল ডিফারেন্স।' সুন্দরী ওরিয়েন্টাল মেয়েরা চান করিয়ে দেয়, গা টিপে দেয়।

সরু একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির ওপর লাল সস্তার কার্পেট পাতা। রাজার ছেলের মতো সিঁড়িগুলো পেরিয়ে ওপরে স্লাইডিং দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শৈবাল। দরজার বাইরে ডোরম্যান। ছোটখাট ফর্সা লোক একটা। একটু আগে ট্রেনের গায়ে আঁকা রেগানের মতো মুখের আদল অনেকটা। চুলটা পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কলকাতায় ব্রিল ক্রীমের বিজ্ঞাপনে একরকম চুল প্রায়ই দেখেছে শৈবাল। দরজা খুলেই একটা কাউন্টার। বেঁটে মতো একটা মেয়ে কাউন্টারের পেছন থেকে ওকে অভিনন্দন জানাল। মানিব্যাগ বার করলো শৈবাল। কাউন্টারের পাশে কতকগুলো সোফা সেট ড্রয়িংরুমের মতো সাজানো। পাঁচ ছ'টা অল্পবয়সী মেয়ে বসে গল্প করছে। মুখ, নাকগুলো চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা। কাউন্টারের মেয়েটাকে দেখে বেশ বয়স হয়েছে মনে হয়। এই বোধহয় এ দোকানের মাসী। সোফা থেকে একটা মেয়ে উঠে এল শৈবালের কাছে। জুতোটা ছাড়তে বলল। এই মরেছে। জুতো ছাড়তে হবে কেন ? এটা কি মন্দির নাকি ? কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ জুতোটা ছেড়ে ফেলল শৈবাল। মেয়েটা এক

হাতে জুতো, আর এক হাতে শৈবালকে নিয়ে ভেতরের আরেকটা ঘরে চলে এল। চোখ ধাঁধানো ঘর এটা। বাঁদিকে পুরো দেয়ালের ওপরের অংশ আয়না দিয়ে মোড়া। নীচে সাদা সানমাইকার ড্রেসিং টেবিল। টেবিলের একদিকে হরেক রকমের পারফিউম সাজানো। তার পাশে সুন্দর সুন্দর তোয়ালে থাকে থাকে সাজানো। একটা বাস্কেটে নানা রকমের চিরুণী। সরু, মোটা, লম্বা, বেঁটে। উল্টোদিকে সারি সারি লকার। মেয়েটা হেসে জিজ্ঞেস করল—'তোমার নাম কি?' সঠিক নামটা বলা উচিত কিনা বুঝে উঠতে না পেরে শৈবাল বলল—'স্যাম'। ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসল মেয়েটা—'ওটা তো এখানকার নাম। ইন্ডিয়ানদের নাম ওরকম হয় না। আসল নাম কি?' মেয়েটা যেন আব্দার করছে।

'শৈবাল' মুখ দিয়ে সত্যি নামটা বেরিয়ে গেল ওর।

'শৈবাল'—স্পষ্ট উচ্চারণ করল মেয়েটা—'আমার নাম লীন। আমি কোরিয়ার মেয়ে।'

শৈবালের একটু অস্বস্তি লাগতে শুরু করেছে এবার। আর কি কথা বলা যায় বুঝে উঠতে পারছে না ও।

'জামাকাপড় খুলে এই তোয়ালেটা জড়িয়ে নাও'—লকারের ভেতর থেকে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করল লীন—'জামাকাপড় লকারে রেখে, মানিব্যাগ আর ঘড়ি এই ব্যাগে ভরে পাশের সাওনা রুমে বস, আমি এক্ষুণি আসছি। আর, ও হ্যাঁ কি ড্রিংক করবে?'

কথা বলার সুযোগ পেয়ে শৈবাল হুড়মুড় করে বলল—'স্কচ, ডাবল অন দি রক্স।'

সারা ঘরে পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে হেসে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। শৈবাল রীতিমত ঘামছে। কাঁপা হাতে জামাকাপড় খুলে তোয়ালেটা জড়িয়ে আয়নার দিকে তাকালো। বুকে কোনো পাকা চুল এখন আর দেখা যাচ্ছে না। নির্দেশমত মানিব্যাগ ও ঘড়ি প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে পাশের ঘরে গিয়ে পৌঁছল শৈবাল। সাওনা রুম। আগুনের মতো গরম। এক কোণে একটা পাত্রে কাঠকয়লা পুড়ছে। বেঞ্চের ওপর বসতে গিয়ে গাটা যেন পুড়ে গেল ওর। ঘরের চারিদিকে তাকাল শৈবাল। দুটো দেয়াল জুড়ে গ্যালারির মতো বেঞ্চ লাগান। পাইন কাঠের ফ্রেমিং করা দেয়ালে। দরজা ঠেলে লীন ঢুকল। হাতের ট্রেতে একটা সুন্দর গ্লাসে হুইস্কি। ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা হুইস্কি গিলে ফেলল শৈবাল। মুখ তুলে সোজাসুজি লীনের দিকে তাকালো। লীন দেখতে খুব সুন্দরী নয়।

গায়ের রং হলদেটে। পরনে ওয়ান পিস বেদিং সুট। স্তনদুটো প্রায় পুরোটাই দেখতে পাচ্ছে শৈবাল।

লীন আবার হাসল 'হুইস্কিটা শেষ করে নাও। শাওয়ার রুম রেডি করে এসেছি।'

আবার ঢক ঢক করে স্কচ গিলল শৈবাল।

'তাড়াহুড়ো নেই। সময় আছে। আস্তে আস্তে খাও'—লীন একদৃষ্টিতে শৈবালের দিকে তাকিয়ে আছে—'কিছু যদি মনে না কর, আমি একটা সিপ নিতে পারি।'

একটু সহজ হবার চেষ্টা করল শৈবাল—'নিশ্চয়ই।'

মেয়েটা একটা ছোট্ট চুমুক দিল গ্লাসে। নীলচে আলোয় বেশ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে এখন। শৈবাল এক চুমুকে বাকিটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা হাত ধরে ওকে শাওয়ার রুমে নিয়ে এল। ছোট ছোট হালকা নীল রঙের টালি দিয়ে গাঁথা শাওয়ার রুমের দেয়াল। একপাশে চৌকোণা একটা বিরাট বাথটাব। ডানদিকে সুন্দর শাওয়ার। একটানে কোমরের তোয়ালেটা টেনে খুলে দিল লীন। কানের দুপাশটা গরম হয়ে উঠল শৈবালের। তাড়াতাড়ি দু'হাতে নিজেকে ঢাকতে যাওয়ার আগেই শাওয়ারটা খুলে দিল লীন। অল্প গরম জল অজস্র ধারায় শৈবালের গায়ে এসে পড়ছে। আরামে চোখটা বুজে ফেলল শৈবাল। মেয়েটার নরম হাত শৈবালের সমস্ত শরীরে খেলা করে যাচ্ছে। শৈবালের মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে। সাবান মাখিয়ে ওকে ধুয়ে দিল লীন। কতদিন, মনে পড়ে না, কতদিন আগে কেউ ওকে স্নান করিয়ে দিত। তোয়ালে দিয়ে গাটা মুছিয়ে ওর হাত ধরে বাইরে এল লীন। ডানদিকে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। ল্যান্ডিং-এর ওপর একটা আধবুড়ি মহিলা এক মনে তোয়ালে গোছাচ্ছে। পাশ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ওরা। মহিলা আব কারো অস্তিত্ব টের পেলেন বলে মনে হল না। ওপরে সারি সারি ঘর। তার একটা খুলে দিয়ে লীন বলল—'তুমি আরাম কর, আমি আসছি।'

ছোট অথচ বেশ ছিমছাম ঘর। একটা ছোট্ট বিছানা পাতা মাঝখানে। বাঁদিকের কোণে একটা ছোট টেবিলে অনেক রকমের সরঞ্জাম। তার মধ্যে একটা জনসন বেবী অয়েলের শিশি চোখে পড়ল শৈবালের। তাছাড়া নানারকমের পারফিউম ও পাউডার। লীন থেকে থেকে কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারে না শৈবাল। ল্যাণ্ডিং'এ আধবুড়ি কোরিয়ান মেয়েটাকে বেশ অদ্ভুত লেগেছে ওর। নিজের মনে গুণগুণ করে গান গাইছিল। আর কাজ করছিল। দরজা খুলে

ঘরে ঢোকে লীন। হাতে ট্রেতে আবার একটা কাঁচের গ্লাস।

'হুইস্কি—ডাবল অন দি রক্‌স'—ট্রে'টা মাটিতে রেখে নীল গ্লাসটা ছোট টেবিলের ওপর রাখল!

'ঐ মেয়েটা কে?'—সিঁড়িতে দেখা ঐ মেয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করে শৈবাল।

লীনের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে লীনের দিকে তাকায় শৈবাল। লীন বলল—'কাউন্টারে যে মেয়েটাকে দেখেছ—ওর বোন ইউং। ওর মাথার ঠিক নেই। কারো সাথে কথা বলে না। শুধু বিড় বিড় বকে আর বাড়ির কাজ করে।'

'মাথার ঠিক নেই কেন?' শৈবাল কৌতূহলী হয়।

'এ দেশটাকে কোনদিনই ভালো লাগেনি ওর। কোরিয়ায় ফিরে যাবার কথা ভাবত। পারেনি '

'তুমি কোরিয়ায় ফিরে যাবার কথা ভাবো?' শৈবাল সোজাসুজি তাকাল লীনের দিকে।

'হ্যাঁ ভাবি। কিন্তু...' কথাটা এড়িয়ে গেল লীন—'তুমি তোয়ালেটা ছেড়ে চট্‌পট্‌ বিছানায় শুয়ে পড় তো শৈবাল।' লীনের পরিষ্কার উচ্চারণে অবাক হল শৈবাল।

ইউং পাগল হয়ে গেছে কেন? লোকে কেন পাগল হয়ে যায়! বড় মা কেন পাগল হয়ে গেল? বড়মা তো দেশেই ছিল। নাকি, দেশ থেকে পালাতে চেয়েছিল বড়মা। শৈবাল মনে মনে বলল—বড মা, আমি তোমায় নিউইয়র্কে নিয়ে আসব। এখানে এলে তুমি ভাল হয়ে যাবে বড়মা। তুমি সব ভুলে যাবে।

লীনের নরম আঙ্গুলগুলো খেলা করছে শৈবালের পিঠে। কাঁধে একটা জায়গায় আঙ্গুল ঠেকিয়ে লীন প্রশ্ন করল—'কালো দাগ কেন? কি হয়েছিল এখানে?'

তুবড়ির ইংরিজী কিছুতেই মনে পড়ছে না শৈবালের। ছোটবেলায় উড়োন তুবড়ির খোল এসে পড়েছিল পিঠে। বেশ খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল। কালো দাগটা রয়েই গেছে। শৈবাল শুধু বলল—'ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্‌সিডেন্ট।'

'তুমি কি বিবাহিত?' লীনের প্রশ্নে অবাক হল শৈবাল। ও বিবাহিত কিনা তাতে লীনের কি এসে যায়। নাকি, গপ্পো না করলে শুধু শুধু গা টিপতে ভালো লাগে না কারো। শৈবাল কথা না বলে মাথা নাড়ল।

'আমি একজন আমেরিকানকে বিয়ে করে এদেশে এসেছি তিনমাস আগে।'

বিড় বিড় করে উঠল লীন।

শৈবালের মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কি ঝামেলা! ওর ভাগ্যে বিবাহিত ছাড়া কি কিছুই জুটবে না। বেশ্যার কাছে এল সেও বিবাহিতা! গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে ফেলল শৈবাল। নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন করল—'তোমার বর কোথায়?'

'আমেরিকা আসার পর তিনদিন একটা হোটেলে ছিলাম। চারদিনের দিন পালিয়েছে। সেই সঙ্গে আমার গয়না-গাটিগুলোও উধাও।' মেয়েটার গলাটা ভারী শোনাচ্ছে এখন।

শৈবাল বেশ অস্বস্তি বোধ করছে এখন। মেয়েটার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না ও। নরম নরম মিথ্যা কথা বলে টাকা ঝাড়ার মতলব কিনা কে জানে! এই জাতের মেয়েদের ছলাকলার অনেক গল্প শুনেছে শৈবাল, সিনেমাতেও দেখেছে। তাও, গপ্পোটা শোনাই যাক না! 'সেকি' কৌতূহল দেখিয়ে শৈবাল বলল—'তারপর?' কথাটা বলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ও। লীন ওর বুকে, পেটে, পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। শৈবাল ওর ডান হাতটা আলতো করে লীনের বুকে রাখল।

'তারপর আর কি! গত তিনটে মাস দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। চাকরির চেষ্টা করেছি, পাইনি।'

'কিন্তু তুমি তো ইমিগ্রান্ট। চাকরি পেলে না কেন?' শৈবালের মুখে চোখে অবিশ্বাস।'

'আমি ভালো ইংরিজী বলতে পারি না। লেখাপড়া কিছু শিখিনি। টাইপ জানি না। কে আমায় চাকরি দেবে বল?'

'এখানে তো কোরিয়ানদের অনেক দোকান-টোকান আছে সেখানে চেষ্টা করলে না কেন?'

'সেখানে আরো খারাপ। ওসব জায়গায় সাধারণত ইল্লিগ্যাল এশিয়েনদের দিয়ে কাজ করায় কিংবা নিজেদের ফ্যামিলির লোক। আমাকে বলেছিল ঘণ্টায় এক ডলার করে দেবে। প্রথম দু'সপ্তাহ ট্রেনিং-এর সময় কিছু পাবে না।'

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল শৈবালের। বাঙালী রেস্টুরেন্টের একটা ওয়েটারের কাছে এ ধরনের ঘটনা শুনেছে শৈবাল। শৈবালের কৌতূহল বাড়ছে—'এখানে এলে কি করে?'

'জ্যাক নিয়ে এসেছে। নীচে যে লোকটাকে দেখলে, ও।'

রেগানের মতো দেখতে ডোরম্যানটার কথা মনে পড়ল শৈবালের—'কিরকম

লাগছে ওখানে ?'

'নরক'—সাপের মতো হিসহিস করে উঠল লীন—'কাল থেকে এখনো পর্যন্ত পঁচিশটা লোকের সঙ্গে শুয়েছি। কেউ কথা বলে না, শুধু টাকা ছড়ায় আর আমার শরীরটাকে নিয়ে যন্ত্রণা দেয়। কেউ খামচায়, কেউ চড় মারে, কেউ খাটের সঙ্গে বেঁধে অত্যাচার করে। কেউ চল্লিশ, কেউ পঞ্চাশ, কেউ আরো বেশি। অশ্লীল গালাগালি দিতে বলে। যত অশ্লীল কথা বলি, তত টাকা ছোঁড়ে।' কথা বলতে বলতে লীনের চোখে জল এসে যায়।

'আমি যে তিরিশ ডলার দিলাম, তার থেকে কত পাবে তুমি ?' শৈবাল জানতে চায়।

'একটা কানকড়িও নয়। আমাকে অত্যাচার করে খুশি হয়ে কাস্টমাররা যে টাকা দেয় তার অর্ধেক আমার।'

'আর বাকি অর্ধেক ?'

'বাকি অর্ধেক জ্যাকের।'

'কেন ?' শৈবালের মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

'ও যে আমায় চাকরি দিয়েছে, তার সেলামি। তা ছাড়া আমার ভরণপোষণ করেছে গত দু'মাস।'

'কিন্তু তার বদলে তুমিও তো দেহ দিয়েছ ওকে।'

'ওরকম দেহ এখানে হাজার হাজার পাওয়া যায়। অনেকেই বলে যে আমার কপাল ভাল আমি জ্যাককে পেয়েছি। কত মেয়ে খুন হয় এই শহরে, জানো ?' হ্যাঁ, জানে শৈবাল। একটু আগেই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। রেড রোডে সন্তুও পড়েছিল একদিন। প্রত্যেকটা বড় শহরে প্রত্যেক দিন খুন হয়। সবাই জানে। কেউ ভাবে না। আঁতে ঘা না পড়লে কেউ ভাবে না। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে শৈবালের। একশো ড্রাম বাজছে মাথার ভেতরে। হঠাৎ উঠে বসে শৈবাল—'কোরিয়ায় ফিরে যাবে ?'

লীন মাথা নীচু করে বলল—'না, কোরিয়া আরো খারাপ। এখানে তবু খেয়ে পরে বেঁচে আছি। ওখানে না খেতে পেয়ে মরে যাব। আমেরিকা এতো ধনী দেশ। ঠিক দাঁড়িয়ে যাব একদিন।'

'দাঁড়িয়ে যাবার আগেই একটা চাকা তোমায় পিষে ফেলবে লীন।' শৈবালের কপালের শিরাগুলো ফুলছে—'কোরিয়ায় না হোক, অন্য কোথাও পালিয়ে যাও।'

লীন হাসল। খুব বিষণ্ণ দেখালো মুখটা—'কিন্তু পালাব কি করে, অত অত টাকা কোথায় আমার?'

'কাল থেকে কত টাকা রোজগার করেছ?' শৈবাল যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

'শ' পাঁচেক হবে, কিন্তু তার অর্ধেক জ্যাকের।'

'টাকগুলো কি তোমার কাছে আছে?'

লীন বলল—'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'কোন কিন্তু-ফিন্তু নয়।' শৈবাল প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করল—মাইনের পুরো টাকাটা এখনো ব্যাগেই রয়েছে। ব্যাগ থেকে তিনটে একশ ডলারের নোট এগিয়ে ধরল শৈবাল—'নাও, পোর্টঅথরিটি থেকে টিকিট কিনে বাসে উঠে পড়।'

লীনের মুখটা চকচক করছে। আবার বিষণ্ণ হাসল লীন—'কিন্তু জ্যাক? ও যে মেরে ফেলবে আমাকে?'

লকলকে আগুনে জল পড়লে যে রকম ছ্যাঁক করে আওয়াজ হয় শৈবালের বুকের মধ্যে সেরকম একটা শব্দ হল।

পটলার কথা মনে পড়ল ওর। ছোটবেলায় পটলা ওকে খুব মেরেছিল একবার। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরার পর বাবার মারটা আরো বেশি মনে আছে ওর—'তোমার হাত আছে, পা আছে, বুদ্ধি আছে। রাস্তায় থান ইঁট আছে—কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরতে লজ্জা করল না, তোমার?'

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল শৈবাল—'জ্যাক তোমাকে এমনিতেও মেরে ফেলবে। যাও জামাকাপড় নিয়ে এস। একটু ভদ্রগোছের।' লীন খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চুলগুলোকে দু'হাতে টেনে ধরে আয়নার সামনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াল শৈবাল। হাত মুঠো করে কপালের ওপর আলতো করে ঘুঁষি মারলো দু'একবার। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়, এই ঘরটাকে কিরকম কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্প বলে মনে হচ্ছে ওর। হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজে চমকে তোয়ালেটা জড়িয়ে নেয় শৈবাল। অনেকগুলো তোয়ালে নিয়ে ঘরে ঢুকল ইউং। কপালে একটা নীল রঙের ফিতে বাঁধা। শৈবাল মৃদু হেসে বলল, 'হাউ আর ইউ ইউং?'

ইউং মুখ তুলে তাকাল। মুখে আঙুল ঠেকিয়ে ধমকের সুরে বলল—'শাট্‌ আপ!' তারপর তোয়ালেটা টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল।

শৈবাল গলে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। এই ঘর এই দেশ কি করে কলকাতা হয়ে

যায়। সাত সমুদ্রের ক্লান্তি. তের নদীর অন্ধকার কি করে দশহাজার মাইল পেরিয়ে মানুষকে ঘিরে থাকে ! শৈবাল বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। ইউং-এর ভেতর বড়মাকে দেখতে পাচ্ছে শৈবাল। কার মুখ বন্ধ করতে চাইছে ইউং ? আমেরিকার ? কার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল বড়মা ? কলকাতার ? দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লীন। চটপট জামাকাপড় পরে নেয় শৈবাল। লীন নীল জামা পড়েছে একটা। শৈবাল বলল—'তুমি সাওনা রুমে যাওয়ার দরজার পেছনে থেক। জ্যাক 'ক্যাঁক' করলেই—বেড়িয়ে পড়বে আমার পেছন পেছন। পেছন ফিরে তাকিও না। রাস্তায় পৌঁছে ডানদিকে ছুটবে। ন'টা ব্লক গেলেই পোর্ট অথিরিটি। আমি তোমার সঙ্গে যাব না। চার ব্লক পরে আমি অন্যদিকে বেঁকে যাব।'

সাওনা রুমের দরজার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে শৈবাল জ্যাককে দেখতে পাচ্ছে। বাঁ হাতের ইশারায় লীনকে অপেক্ষা করতে বলে একটা সিগারেট মুখে দিয়ে জ্যাকের কাছে এগিয়ে গেল ও। বাঁদিকে এখন মাত্র দুটো মেয়ে বসে আছে সোফায়। কাউন্টারের মেয়েটা নেই।

জ্যাকের কাছে দেশলাই চাইল শৈবাল—'মে আই হ্যাভ এ লাইট প্লীজ ?'

জ্যাক মৃদু হেসে বুকপকেটে হাত ঢোকাল। ইলেকশনে জেতার পর রেগান যে রকম হেসেছিল জ্যাকের হাসি দেখে সেই মুখটা মনে পড়ে যায়। হাত আছে, বুদ্ধি আছে, কিন্তু পা'টাই বেছে নিল শৈবাল। স্থির লক্ষ্যে জ্যাকের কুঁচকিতে প্রচণ্ড জোরে পা চালাল ও। 'মাই গড' বলে আওয়াজ করে কুঁচকি চেপে মাটিতে বসে পড়ল জ্যাক। রেগানের মতো মুখটা কুঁকড়ে শেতল মুখুয্যের মতো হয়ে গেল। সোফার মেয়েগুলো যেন ফ্রীজসট। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নামল শৈবাল। পেছনে লীন নামছে। সদর দরজায় কোনো পাল্লা নেই। বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে ছুটতে লাগল শৈবাল। একটু থেমে লীনকে এগিয়ে যেতে বলল।

লীন শৈবালকে ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। দূরে পোর্ট অথরিটি দেখতে পেল শৈবাল। ওর মাথাটা বনবন করে ঘুরছে। চার চারটে পেগ নৃত্য করছে সারা শরীরে। ভীড়ে মিশে যাচ্ছে লীন। চারপাশে তাকাল শৈবাল। আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির মেলা, রাস্তা ঝকঝকে দোকানপাট বুকে নিয়ে শহরটা যেন হাসছে। লীনকে দেখতে পেল না শৈবাল। ও নিশ্চয়ই টার্মিনালে ঢুকে পড়েছে এতক্ষণ। ভীড়টাকে সামনে রেখে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল শৈবাল। ছুটতে ছুটতে পশ্চিমে অনেকখানি পথ পেরিয়ে এল। ওপর দিয়ে ওয়েস্ট সাইড হাইওয়ে যাচ্ছে। তলা দিয়ে শৈবাল সোজা রেলিংটার কাছে পৌঁছে গেল। কোনমতে

রেলিংয়ে ভর দিয়ে সামনে তাকাল ও। হাড্‌সন নিউইয়র্কের গঙ্গা। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে উঠল ওর। মাথাটা সোজা রাখতে পারছে না কিছুতেই। মাথাটা ঝুলে গেল। গলগল করে বমি হচ্ছে ওর। পৃথিবীর সব কিছু গরল যেন ওর মুখ থেকে হাড্‌সনে গিয়ে পড়ছে। হাড্‌সনের ওপারে তাকাল শৈবাল। শহরটা জ্বলছে। হাজার হাজার আলোক-বিন্দু যেন ওরই দিকে তাকিয়ে। পুয়েটিকান ছেলেটা এখন কোথায়? লীন কি বাসে উঠে পড়েছে? কোথাকার বাস? কটা বাজে এখন? কলকাতায় ভোর হতে কত বাকি? একটু পরেই তো বরদাজ্যাঠা কাঁপা হাতে রেশনের থলিটা নিয়ে বেরোবে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে উঠে বড়মা বিরাট বড় সিঁদুরের টিপ পরবে কপালে। কলকাতা জেগে যাবে। শৈবাল বিড় বিড় করে উঠল—'কলকাতা জেগে যাবে। কলকাতা জেগে যাবে।'...

শুধু গরু নয়, মাঝে মাঝে মানুষও জাবর কাটে। ফ্লাশিং মেডো পার্কে লেক থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে একটা সামার রিক্লাইনারে আধো-শোয়া প্রলয় ঘোষ এখন জাবর কাটছেন। মুখের পাইপটা নিভে গেছে একটু আগে। খোলা বিয়ারের ক্যান্‌টা কোলের ওপর। পরনে লম্বা গোছের সাদা হাফ্ প্যান্ট আর লাল টুকটুকে একটা পাতলা গেঞ্জী। মাথায় হলুদ রঙের টুপিটা প্রায় চোখ পর্যন্ত নামানো। চোখ খুলে চুপ করে বসে আছেন। চোখ খুলে রাখলেই যে কিছু দেখতে হবে এমন কোন মানে নেই। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে প্রলয় ঘোষ তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

পুরোপুরি ঘুমোচ্ছেন অবশ্য একথা ঠিক বলা যায় না। নিজের জীবনের অনেক কিছু ঘটনা, অনেক কিছু স্মৃতি মনের মধ্যে এলোমেলো অলস ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে বিড় বিড় করে বকছেন। গলা দিয়ে ঘড ঘড় করে একটা আওয়াজ হচ্ছে কখনো। তার মানে এই নয় যে, উনি পাগল কিংবা ওঁর শরীর খারাপ। আসলে এই সব তড়িঘড়ি দেশে যে সব চিন্তা-ভাবনাগুলো কুলুপ আঁটা থাকে সেগুলোই ওঁর অন্যমনস্কতার সুযোগে এখন পঙ্গপালের মতো সারা মনটাকে ছেয়ে ফেলেছে। কিছু স্মৃতি, কিছু ঘটনা, সিনেমার স্লো-মোশনের মতো ওঁর মনের পর্দায় ধরা পড়ছে। মাঝে মধ্যে উনি বিড়বিড় করে কথা বলছেন এই দৃশ্যের চরিত্রগুলোর সঙ্গে, কখনো নিজেকেই উত্তর দিচ্ছেন—কখনো মজা লাগছে, কখনো বা যন্ত্রণা হচ্ছে। গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজটা আনন্দ অথবা যন্ত্রণারই প্রকাশ। এই অবস্থায় মানুষকে বেশ অসহায় লাগে। যেমন এই মুহূর্তে উনি বিড় বিড় করে বললেন, 'ভালো আছি। দারুণ আছি। পৃথিবীর কাউকে শালা কেয়ার করি না। কিচ্ছু কেয়ার করি না।'

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে। প্রলয় ঘোষ যথেষ্ট কেয়ার করেন। অনেককে কেয়ার করেন। এমন কি এদেশে আসার পর থেকে নিজের স্ত্রীকেও সমীহ করতে শুরু করেছেন। স্ত্রীর রূপ অথবা গুণের জন্য নয়। রূপবতী বলে রত্না ঘোষকে কেউ ভুল করেনি কখনো। অন্তত প্রলয় ঘোষ তো নয়ই। তাছাড়া, পিংকি হবার পর থেকেই পেট বুক একাকার। কি রকম একটা ডিস্‌ফিগার। অনেক দিক থেকেই আধুনিক হয়েছেন আমেরিকায় এসে। কিন্তু এখনো রাত্তিরবেলা সাপটে পুঁইশাক, ডাঁটা-চচ্চড়ি দিয়ে পেট পুরে খেয়ে সায়ার দড়ি আলগা করে না শুলে ঘুম আসে না ওঁর। ডিস্‌ফিগার তো কি! উনি তো আর কাউকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন না এই বয়সে। কাজেই খাবার-দাবারগুলো সবটাই কোমরের সামনে আর পেছনে লেগে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, প্রলয় ঘোষ স্ত্রীকে সমীহ করেন অন্য কারণে। ওঁর স্ত্রী কোকা-কোলা কোম্পানীতে চাকরি করেন। মোটা না হলেও, ডলারের মাইনেটা টাকায় বললে মাসে নেট প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঘরে নিয়ে আসেন রত্না। এ ছাড়া কোকা-কোলা কোম্পানীর দৌলতে খুবই সস্তায় কোকা-কোলা পান। কাজেই প্রলয় ঘোষের বাড়িতে ডজন দুয়েক কোকা-কোলার ডাব্বা ডাব্বা বোতল সব সময়েই মজুদ থাকে। প্রলয় ঘোষ স্ত্রীর প্রায় দুগুণ রোজগার করেন। দু'জনে মিলে প্রতি মাসে ভারতীয় মুদ্রায় হাজার পনের টাকা। মাত্র ছ' বছর আগেও খড়্গাপুরে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোরকিপার হিসাবে উনি মাইনে পেতেন কেটেকুটে সাড়ে সাত'শ। সেই সাড়ে সাত'শ থেকে পনের হাজারের পেছনের অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা নিয়েই জাবর কাটছেন উনি।

কাউকে কেয়ার না-করাটা এই মুহূর্তে অপরাধ নয়। কারণ, এখন ফ্লাশিং মেডো পার্কের ফুরফুরে হাওয়ায় শনিবারের দুপুরে উনি নিজেই নিজের সিনেমার নায়ক। আর, তাছাড়া রত্না ঘোষও এখন অন্যমনস্ক। উনি পাশেই ঘাসের ওপর থেবরিয়ে বসে উপুড় হয়ে তিন মাস আগের একটা 'আনন্দলোক' পড়ছেন—কাজেই প্রলয় ঘোষ কাউকে কেয়ার করেন কি করেন না সে বিষয়ে ওঁর কোন মাথাব্যথা নেই। পাশের অ্যাপার্টমেন্টের অল্পবয়সী বউটার কাছ থেকে বইটা ধার নিয়েছেন গতকাল। খড়্গাপুরে থাকতে পাশের অনিমাদি নিত। এখানে পাশের বাড়ির বউটা সি-মেলে আনায়। সমস্ত জীবনে এই একটাই ওঁর নেশা। পান, সিগারেট, মদ স্পর্শ করেন না। পার্টিতে গিয়ে কখনো নিজের বর অথবা অন্যের বরের সঙ্গে নাচেন না। কিন্তু 'আনন্দলোক' ওঁর চাই। তাই এই মুহূর্তে বইটাকে প্রায় গিলে খাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে উনিও বিড় বিড় করে বকছেন—একটু

আগেই বলে উঠলেন—'ন্যাকামি !' ঠেঙ্গিয়ে বিষ ঝেড়ে দেওয়া উচিত। জলজ্যান্ত বউ রেখে অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে ঢলানি।' কথাগুলো উনি কিন্তু প্রলয় ঘোষকে বলেননি, বলেছেন বম্বে সিনেমার নায়ক অমিতাভ বচ্চনকে। জয়া ভাদুড়িকে বাড়িতে রেখে অভিনেত্রী রেখার সঙ্গে প্রেমের গল্পটা পড়ছিলেন এই সময়, তাই। একই সময়, প্রলয় ঘোষও বিড় বিড় করে কথা বলছিলেন। কিন্তু রত্না ঘোষ নিজের স্বগতোক্তিটা স্পষ্ট শুনতে পেলেন আর কথাগুলো যেন বর্শার ফলার মতো সোজা গিয়ে বুকের মধ্যে বিঁধে গেল। হঠাৎ মাটির কথা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। ধবিত্রীর মৃত্তিকা মাটি নয়। কালো বলে আদর করে প্রলয় ঘোষ মেয়ের নাম রেখেছিলেন মাটি। মাটির কপালে কমলা রঙের লিপস্টিকের টিপটা যেন মেঘের মতো সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 'কত লিপস্টিক রে বুড়ি, কত লিপস্টিক আমেরিকায়'—কথাগুলো বলতে বলতে রত্না ঘোষের গলাটা ধরে এল। চোখের কোল জলে টইটুম্বুর। গাল বেয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল আনন্দলোকের পাতায়। কিছু কিছু স্মৃতি মানুষকে শুধু দুঃখ দেয় না, যন্ত্রণা দেয়, অত্যাচার করে। আশেপাশের সব কিছু ভুলে, আমেরিকার সব কিছু সুখ অগ্রাহ্য করে নিজের অজান্তে সেই যন্ত্রণাতেই বোধহয় ডুকরে কেঁদে উঠলেন রত্না ঘোষ। ছোটবেলায় বুড়িদের মতো থপথপ করে হাঁটত বলে রত্না মাটিকে ডাকতেন 'বুড়ি'। ছোট্ট থপথপে কালো মেয়ে কথাটা আবৃত্তি করে বলত 'বুই'। সেই থেকে ঠাকুমা ডাকতেন 'বুই'। ছোট বোন পিংকি ডাকত 'দিদিভাই'। আরেকজন ডাকতো মিঠু। তার কথা পরে হবে।

ফ্লাশিং মেডো পার্কে অমন ডুকরে বোধহয় কেউ কোনদিন কাঁদেনি। এপাশ ওপাশ থেকে অনেকেই ফিরে দাঁড়াল। প্রলয় ঘোষও চমকে উঠে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। খানিকটা অপরাধীর মতো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন যে এই মুহূর্তে উনি যে কথাগুলো ভাবছিলেন রত্না ঘোষ সেগুলো আঁচ পেয়েছেন কিনা। কারণ, ঠিক এই মুহূর্তে উনি মেরিলিন মনরোর সঙ্গে প্রেম করছিলেন। মেরিলিনকে বড্ড পছন্দ করেন প্রলয় ঘোষ। ঠিক এই মুহূর্তে আধো ঘুম, আধো জাগরণে উনি স্বপ্ন দেখছিলেন মেরিলিন বলছে, 'আমায় নাও, আমি আর পারছি না। আমাকে তোমার বুকে আশ্রয় দাও'। 'আই অ্যাম সরি....' উদ্ধত প্রলয় ঘোষের সংলাপ। স্বপ্নের প্রলয় ঘোষ কিন্তু রক্ হাডসনের মতো দেখতে।

'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।'—মেরিলিন প্রায় ভিক্ষে করছে।

'আই ডোন্ট লাভ য়ু।' প্রলয় ঘোষ বীরের মতো মুচকি হাসছেন।

'এ কথা বোলো না। আমার তোমাকে চাই। পৃথিবীর অন্য কোন মেয়ে তোমাকে স্পর্শ করার আগে, আমি তোমাকে পেতে চাই। তুমি শুধু আমার।' কথা বলতে বলতে জামাটা এক টানে ছিড়ে ফেলল মেরিলিন। টুকটুকে লাল বৃন্ত সমেত উদ্ধত তুষারধবল স্তনদুটো ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর মেরিলিন প্রায় একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রলয় ঘোষের বুকের ওপর এবং মুরগীর মতো কঁক্ কঁক্ করে আওয়াজ করতে লাগল। স্তনে মাখামাখি প্রলয় ঘোষের গলা থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ শুরু হয়েছে— রত্না ঘোষের ডুকরে কেঁদে ওঠাটা ঠিক এই সময়। মেরিলিনের সঙ্গে প্রেমটা প্রায় কলেজ থেকেই চলছে। শুধু কি মেরিলিন। যে সব বিদেশী ফিল্মস্টারকে পছন্দ হয়—তাঁদের সঙ্গেই স্বপ্নে প্রেম হয় ওঁর। মেরিলিন সবচেয়ে পুরোনো। আসল জীবনে কবেই মেরিলিন মরে হেজে গেছে। কিন্তু প্রলয় ঘোষের প্রেম পুরোনো হয়নি একটুও। এ ছাড়াও ওঁর স্বপ্নের একটা বিশেষত্ব এই যে উনি ইংরিজীতে কথা বলেন এবং বিলিতি ফিল্মস্টাররা বাংলায়। খড়্গাপুরেও এই সব স্বপ্ন প্রায়ই দেখতেন। ওখানে নায়িকারা জামাকাপড় খুলত অনেক দেরীতে। আমেরিকায় স্বপ্নের সব চেয়ে বড় গুণ যে নায়িকারা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জামা-টামা ছেড়ে ফেলেন। তাই স্বপ্ন-দেখাটা এদেশে আসার পর থেকে একটু বেড়ে গেছে ওঁর।

জেগে উঠে এখন কয়েক সেকেণ্ড পর অস্বস্তিটা কেটে গিয়ে বিরক্ত বোধ করলেন প্রলয় ঘোষ। এই ভর দুপুরে ডুকরে কেঁদে ওঠার কোন মানে হয়! বেশ রাগত স্বরেই স্ত্রীকে বলে উঠলেন—'সে সব তো কবে চুকেবুকে গেছে।' রাগ দেখাবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু মনটা খচ্‌খচ্ করে উঠল। বিশেষ করে মেরিলিন মনরোর সঙ্গে প্রেম করে উঠেই পাশাপাশি বড় মেয়ের মুখটা বড্ড জ্বালাতে লাগলো ওঁকে। জ্বালা কমানোর জন্যে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা বিয়ার গলায় ঢেলে ফেললেন। স্বপ্ন দেখাকালীন অনেকক্ষণ বিয়ারটা খোলা ছিল তায় জুলাই মাসের গরমে বিয়ারটা প্রায় পাঁচনের মতো হয়ে গেছে। গরম বিয়ারে মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল, তাছাড়া মনটাও খিচড়ে গিয়ে নিজের ওপর রেগে বিয়ারের ক্যান্‌টা ছুঁড়ে দিলেন লেকের দিকে। কাগজের নৌকার মত কাঁপতে কাঁপতে ক্যান্‌টা ভেসে যেতে লাগল।

রত্না ঘোষ অনেকটা সামলে নিয়েছেন। অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'চুকে গেছে বললেই চুকে যায়? বুকে হাত দিয়ে বলতে পার—চুকে গেছে!'

'তাহলে ফ্লাশিং মেডোতে পা ছড়িয়ে কাঁদ।' প্রলয় ঘোষ চাপা গলায় বললেন—'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিকে বাঁদর খেলার ভিড় হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ তা ঠিক, মাটি তোমার কাছে বাঁদর খেলাই··· । তোমার ভয়েই তো মেয়েটা··· ' রত্না কথা শেষ না করে চুপ করে রইলেন ।

প্রলয় ঘোষ চীৎকার করে উঠলেন—'শাট্ আপ । বোকার মতো কথা বোল না ।'

রত্নার কণ্ঠস্বর এবার স্থির—'অত বোকা, বোকা বোল না । এ সংসারের টাকা আমিও জোগাই মনে রেখ । এখানকার লোক-দেখানো লবাবীর টাকা শুধু তুমি একা আনো না ।'

ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে প্রলয় ঘোষ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না । জোঁকের মুখে নুন—প্রলয় ঘোষ একেবারে চুপ করে গেলেন । বেশ আফশোষ হতে লাগল । বেমক্কা 'বোকা' কথাটা বেশ বোকার মতই বেরিয়ে গেছে ওঁর । কাজেই খোঁচাটা হজম করা ছাড়া উপায় নেই । তাছাড়া রত্নাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ রেগে গেছে । রাগ করে আবার চাকরীটা ছেড়ে দিলেই হয়েছে । সামনের বছর ইউরোপ ট্যুরটা তাহলে মাঠে মারা যাবে । সামনে লেকের দিকে তাকিয়ে বিয়ারের ক্যান্‌টা খুঁজলেন প্রলয় ঘোষ । জল ঢুকে ওটা অনেকক্ষণ আগেই তলিয়ে গেছে ।

তাছাড়া, মাটি যে ওরকম করবে কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল । মাঝখান থেকে উনি নিমিত্তের ভাগী হয়ে রইলেন । গত দু'বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে । খড়্গপুর থেকে আমেরিকায় এলেন এই তো সেদিন । এখনো স্পষ্ট মনে আছে ঝড়-বাদলে প্লেনটা কেনেডী এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে না পেরে সোজা বস্টনে চলে গেল । উনচল্লিশ বছর বয়সে জীবনে সেই প্রথম প্লেনে চেপেছেন প্রলয় ঘোষ । তার এক বছর আগেই একটা অত বড় ঘটনা ।

যৌবনও প্রায় যাই যাই । চাকরি-বাকরি ছেড়ে ঐ বয়সে এতদূর একটা অজানা দেশে পাড়ি জমাতে বেশ দুরদুর করেছিল বুকটা । সাড়ে সাত'শ টাকা মাইনে হলেও চাকরিটা মোটামুটি পাকা । তাছাড়া ছাত্রদের থীসিস টাইপ করে বেশ কিছু উপরিও ছিল । রোজ রাত্তিরেই প্রায় ওভার-টাইম হোত । এমন কি রবিবারও বাদ ছিল না । মেয়ে দুটোর সঙ্গে দেখা হত খুবই কম । রাত্তিরে বাড়ি ফিরে পায়খানা-স্নান সেরে খেতে বসতে বসতে প্রায় রাত দশটা । মেয়ে দুটো তখন ঘুমোত । আবার সকাল আটটার সময় মেয়ে দুটো ইস্কুলে যাবার পর উনি ঘুম থেকে উঠতেন । তারপর বাজার করে, কোনমতে নাকে মুখে গুঁজে অফিস ছুটতেন । দিনের পর দিন,মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই একই ঘটনা । দেবুদা এর মধ্যে একদিন প্রলয় ঘোষকে বললেন—'তুমি তো এম· কম· পাস ।

শুনছি নাকি আমেরিকা যাবার ভিসা দিচ্ছে আজকাল। চেষ্টা করবে নাকি ?'
প্রলয় ঘোষ অবাক হয়ে দেব পালকে প্রশ্ন করেছিলেন—'আপনি যাবেন না ?'
দেব পাল মৃদু হেসে বলেছিলেন—'পাগল নাকি !' পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে
দেশের জল-মাটি ছেড়ে বিদেশে বিভূঁয়ে খামোখা প্রাণটা দেব ?'

দেবুদার কথা মনে হলে এখনো অবাক লাগে ওঁর। একসঙ্গে কাজ করেছেন প্রায় চৌদ্দ বছর—পাশাপাশি বাড়িতেও থেকেছেন বছর দশেক। কোনদিন মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি। আসলে, যারা স্বদেশী-টদেশী করে তারা যেন কিরকম। ওর গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্বদেশীর কোন সম্পর্ক উনি কাউকে বোঝাতে পারবেন না কিন্তু কোন কিছু বুঝতে না পারলে যে রকম হঠাৎ হঠাৎ অগাধ বিশ্বাস জন্মায়—এ ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। যাই হোক, দেবুদার পরামর্শেই ফর্ম আনিয়ে, ভর্তি করে, ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীর পায়ে ছুঁইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভগবান মুখ তুলে চাইবেন এমন ভরসা ওঁর ছিল না। সেও প্রায় দশ বছর হতে চলল। আমেরিকা আসার প্রায় বছর দুয়েক আগের ঘটনা।

'মে আই হ্যাভ্ সাম লাইট প্লীজ', একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গল ওঁর।

'সিওর। সিওর।' বলে খুব তৎপর হয়ে দু'পকেট হাতড়াতে লাগলেন প্রলয় ঘোষ। দাঁত দিয়ে নিজের মুখের পাইপটা কামড়ে জোরে টান মারলেন বার কয়েক।

'আই গট ইট' বলে মেয়েটি পাশেই মাটির ওপর থেকে দেশলাইটা কুড়িয়ে নিল। ফস করে সিগারেট ধরিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে পেছন ফিরল। নিভে যাওয়া পাইপ টানতে টানতে প্রলয় ঘোষ মেয়েটার পেছন দেখতে লাগলেন। শুধু আড় চোখে একবার দেখে নিলেন ওঁর স্ত্রীকে। রত্না ঘোষ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছেন আনন্দলোকে মাথা রেখে। চোখটা বন্ধ, মুখটা হাঁ করা। প্রলয় ঘোষ আবার মেয়েটির দিকে তাকালেন। মেয়েটি ভিড়ে মিশে গেছে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদের ভিড়ে।

দেশলাই দিয়ে নেভা পাইপটা ধরিয়ে মেডো পার্কের চারপাশে চোখ বোলালেন প্রলয় ঘোষ। রঙের মেলা বসে গেছে আজ। একে শনিবার তায় জুলাই মাস। প্রায় আটানব্বই ডিগ্রী ফারেনহিট। বাতাস প্রায় নেই বললেই চলে। ওঁর লাল গেঞ্জীটা এর মধ্যেই ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। গরম কালে এই সব পার্কে বা সমুদ্র সৈকতে এলে চারপাশের রঙে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ রঙের পোশাক পরা হরেক জাতের মানুষ। সব জাত অবশ্য একসঙ্গে নেই। লালমুখো অর্থাৎ ককেশিয়ানরা আলাদা। হলদেটে অর্থাৎ

ইতালিয়ানরা আলাদা। তামাটে অর্থাৎ স্প্যানিশরা আলাদা। শ্যামবর্ণ ইয়ে প্রলয় ঘোষরা আলাদা। আর কালুয়া মানে নিগ্রোরা আলাদা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি ইতালিয়ান ছেলে যে চাইনিজ মেয়ের সঙ্গে নেই কিংবা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী যে কালুয়া ছেলের হাত ধরে ঘুরছে না তা নয়। তবে এ দৃশ্য খুবই কম। তবে এতে খুব অবাক হন না প্রলয় ঘোষ। খড়্গপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের দেখেছেন উনি। একটা বাঙালী যেমন আরেকটা বাঙালী দেখলে সেঁটে যায়, সেরকমই মাদ্রাজী, গুজরাটি কিংবা পাঞ্জাবীরা একত্র হলেই ক্যাঁচ্‌র-ম্যাঁচ্‌র করে। একই দেশের মধ্যেই যদি এই আলাদা-আলাদা ভাব, বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা আশ্চর্য নয় মোটেই। সব জাতই চলে যায়, মনে মনে বললেন প্রলয় ঘোষ—একমাত্র কালুয়া ছাড়া। কালুয়া মেয়েগুলোকে দেখলেও রীতিমত ভয় লাগে ওঁর। মোটা মোটা ঝুলে পড়া ঠোঁট, থ্যাবড়ানো নাক, কোঁকড়ানো চুল, আবলুস কাঠের মতো গায়ের রঙ—সব মিলিয়ে ওঁর কেমন ঘেন্না করে। কিরকম যেন নীচু জাত, ঝি-চাকরদের মতো চেহারা। একটা কালুয়ার সামনে ওঁর নিজেকে কিরকম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ মনে হয়। মনে হয় ছোঁয়া লাগলে জাত যাবে। আর, গোরা সর্ব দোষহরা। দাঁতে হলদে ছোপ কিংবা গায়ে গন্ধ থাকলেও সাহেব হল সাহেব। আর কালুয়ারা হল চাকর-বাকর। তাই শ্যামবর্ণ হলেও সাদা লম্বা হাফপ্যান্টে, কিংবা লাল টুকটুকে গেঞ্জীতে অথবা হলদে টুপিতে প্রলয় ঘোষের সর্বদাই একটা সাহেব সাহেব ভাব। এমন কি মুখের পাইপটা পর্যন্ত উনি সাহেবদের মতো দাঁত দিয়ে কামড়ান।

ইতস্তত ছড়ানো কিছু আইসক্রীম, কিছু হট ডগের গাড়ি। এদিক ওদিক দু' চারটে বেলুনওয়ালা। খালি গায়ে বাচ্চাগুলো খেলে বেড়াচ্ছে চারপাশে। পনের থেকে পঁয়তাল্লিশ অধিকাংশ মেয়ের গা'ই অর্ধেক খালি। বুকে একটা এক চিলতে কাঁচুলি, আর কোমরে একটা ত্রিভুজ ঢাকনি। এদেরই গা খুলে রাখা সার্থক। রঙ যেন ফেটে পড়ছে। আর রোদ্দুর পড়ে ঘামগুলো যেন মাখনের মতো গলে গলে পড়ছে। দেশে থাকতেই ফর্সা মেয়ের ওপর বড্ড ঝোঁক ছিল ওঁর। আর, রত্না বেশ কালো, এবং পেটমোটা। এদের পেটের দিকে তাকালে চোখ আর ফেরে না। কোনো পাহাড়-পর্বত অর্থাৎ ভুঁড়ি নেই। নিখুঁত, নিভাঁজ, সমতলভূমি। আর খরগোশের গায়ের মতো নরম। সাবওয়ে ট্রেনে ভিড়ের অছিলায় দু'চারটে মেয়ের পেটে হাত বুলিয়ে দেখেছেন প্রলয় ঘোষ। একবার তো ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। মেয়েটা হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিলো—'হোয়াট আর য়ু আপ টু ?' ফ্যাকাশে প্রলয় ঘোষ ফ্যাস ফ্যাস করে

বলেছিলেন—'আই ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড এ রড।' মেয়েটা হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—'মাই টামি ইজ নট ইয়োর রড'। চারপাশে মানুষেরা তাকিয়েছিল ওঁর দিকে, কেউ কেউ মুচকি হাসছিল। ঘামতে ঘামতে পরের স্টেশনে নেমে গিয়েছিল প্রলয় ঘোষ। মা লক্ষ্মীর নাম করে প্রতিজ্ঞা করেছেন আর কোন টামিতে হাত দেবেন না কোনদিন॰। এই মা লক্ষ্মীর কৃপাতেই সাড়ে সাত'শ থেকে পনের হাজার। মা লক্ষ্মী কৃপা করলে আরো বাড়বে। বাড়িটা চল্লিশ হাজারে কিনেছেন গত বছর। হু হু করে দাম বেড়ে যাচ্ছে। এক বছরেই ভ্যালুয়েশন হয়েছে আটচল্লিশ হাজার। এ ছাড়া ব্যাঙ্কেও প্রায় হাজার কুড়ি। অফিসের ক্রেডিট ইউনিয়নে হাজার পাঁচেক। রত্নার ব্যাঙ্কেও সাত হাজারের কাছাকাছি। টাকার হিসেব করলে প্রায় তিন লাখ টাকা। ভাবা যায়! মাত্র সাত বছরে তিন লাখ টাকা। সব কিছু ভুলে আলাদিনের দৈত্যের মতো হো হো করে হেসে উঠলেন প্রলয় ঘোষ। রত্না ঘোষ গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছেন। মুখটা এখনো হাঁ-করা। শুধু গাছতলায় বাঁধা একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করে উঠল।

হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বেশ চমকেই উঠলেন প্রলয় ঘোষ। প্রায় সাতটা বাজতে চলল। রোদ্দুর দেখে সময় বোঝবার জো নেই। সন্ধ্যে হতে হতে প্রায় ন'টা বেজে যাবে। সেই দুটোর সময় এসেছেন। পাঁচ ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে চলে গেছে টেরও পাননি। এক্ষুনি উঠতে হবে। স্ত্রীর পিঠে হাত দিয়ে ঠেললেন।

'ইট্'স গেটিং লেট। লেট্'স গো। হ্যাঁগো, ওঠ না।' প্রায় আট বছর এদেশে থাকার ফলে স্ত্রীর সঙ্গেও বাংলা-ইংরিজী মিশিয়ে কথা বলেন প্রলয় ঘোষ। এ ছাড়া আমেরিকার সাহেবদের সঙ্গে মিশে মিশে চলতি কথাগুলোও বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। 'শিট্', 'ফাক্', সান অফ্ এ বিচ্' শব্দগুলো জলের মতো ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, দেশলাই খুঁজে না পেলে বলেন—'শিট্'। বিয়ার হাতে কোন কালুয়াকে দেখলে বলেন—'ফাকিং, সান অফ্ এ বিচ্'। অবশ্য আস্তে বলেন—প্রায় মনে মনে। কারণ, ঐ ছ'ফুট লম্বা দৈত্যগুলোকে দেখলে ওঁর পেটটা কিরকম গুড়-গুড় করে।

স্ত্রীর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বড্ড দমে গেলেন উনি। হাঁ-করা মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। কি বিচ্ছিরি ফিগার। কতই বা বয়স। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। এক্ষুনি মনে হচ্ছে বাহাত্তর। একটু ক্ষুণ্ণ হলেও মনে মনে ভাবলেন—বাহাত্তরই ভাল। মাসে মাসে ছ'শ ডলার ঘরে আসছে! ফিগার দিয়ে

কি ধুয়ে খাবেন ! ডলার-কে-ডলার আসছে—রাত্তির বেলা পুঁই শাক, মাছের ঝাল, ডাঁটা চচ্চড়ি রান্না হচ্ছে। তাছাড়া, পূবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে ফিগারের ছড়াছড়ি। বাড়িতে ফিগার না থাকলেও চলবে। শুধু ছোট মেয়ে পিংকিটার জন্যে ইদানীং বেশ অস্বস্তি বোধ করেন প্রলয় ঘোষ। মেয়েটা পনের বছরেই বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। পিংকি এখন ঠিক মাটির বয়সী। আর, মাটির মতোই চুলবুলে। তবে, মাটি যে ভুল করেছে পিংকিকে সে ভুল উনি করতে দেবেন না। কড়া শাসনে থাকে পিংকি। ক্যাম্পে যাবার হুকুম নেই। কোন বয়ফ্রেণ্ডকে ফোন করা বারণ। এমনকি ফর্সা রং ছাড়া কোন মেয়ের সঙ্গেও মেশা পর্যন্ত নিষেধ। পিংকি অথচ মাটির মতোই কালো। পিংকির চোখ দুটো মাটির মতোই সুন্দর। শুধু পিংকি অনেক লম্বা, চওড়া। সেটা বোধহয় আমেরিকার জল হাওয়ার গুণ। আর পিংকি খুব তুখোড় ইংরিজী বলে—অথচ বাংলাও ভোলেনি ! ইস্কুলের মাস্টার মশাই-এর কথামতো মেয়ের সঙ্গে প্রলয় ঘোষ ইংরিজীতে এবং রত্না বাংলায় কথা বলেন। হয়ত এই কারণেই পিংকি ভাল বাংলাও বলে।

আবার পিঠে হাত দিয়ে রত্নাকে ঠেলা মারলেন প্রলয় ঘোষ। ধড়মড় করে উঠে বসলেন রত্না।

'ইট্'স লেট। পার্টিতে যেতে হবে না ?'

রত্না হাত ঘড়িতে সময় দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন—'ইস, কত দেরী হয়ে গেল। আগে ডাকবে তো !'

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে শাড়ি জামা ঠিকঠাক করে নিলেন। ইতিমধ্যে প্রলয় ঘোষ রিক্লাইনারটাকে ভাঁজ করে গাড়ির ট্রাঙ্কে পুরে নিয়েছেন। দু'জনে মিলে যখন গাড়িতে উঠে বসলেন তখন প্রায় সাতটা কুড়ি।

আজকের পার্টির একটা ইতিহাস আছে। পাঁচ বছর আগে কাছাকাছি কয়েকঘর বাঙালী পরিবার নিয়ে এই ক্লাবের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কি নাম রাখা হবে এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর কে একজন বলে উঠল যে ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য যখন উইক্ এণ্ডে খাওয়া-দাওয়া করা তখন এর নাম রাখা হোক—'ভোজন ও ঢেঁকুর'। সাময়িক সবাই হেসে উঠলেও নামটা বেশ মজার বলে ওটাই চালু হয়ে গেছে। সেই 'ভোজন ও ঢেঁকুর' ক্লাবের আজকে পঞ্চম জন্মবার্ষিকী পার্টি। এই সব পার্টিতে সব পরিবারই কিছু না কিছু রান্না-বান্না করে আনেন। নিজেদের মধ্যে গাল-গল্প হয়। ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে। একটা লোকাল জিমের একটা বড় ঘর লীজ নেওয়া হয়েছে প্রত্যেক শনিবার ঘণ্টা পাঁচেকের মতো। গত বছর দুয়েক হল এঁরা খাওয়া-দাওয়া, গাল-গল্প ছাড়াও

কিছু কিছু খেলাধুলোর প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন নিয়মিত। ব্যাডমিন্টন, ক্যারাম, তাস ইত্যাদির নিয়মিত কম্পিটিশন হয়। একটা জুনিয়র বিভাগ। পিংকির মতো ছেলেমেয়েদের জন্যে। একটা সিনিয়র বিভাগ—বড় ও বুড়োদের জন্যে। এ ছাড়া গত দু' বছর হল 'ভোজন ও ঢেঁকুর' ক্লাব সরস্বতী পুজোরও আয়োজন শুরু করেছে। এখানকারই চ্যাটার্জি বামুন কলকাতা থেকে পৈতে আনিয়ে দিব্যি মন্তর-টন্তর পড়ে পুজো করেন। বউরা গরদ পরে উপোস করে ভোগ রাঁধেন, ফলমূল কাটেন, পুজোর জোগাড়-যন্তর করেন। ঘটা করে মাইকে অঞ্জলি হয়। ফল-মূল-নৈবেদ্য-খিচুড়ি ও ধূপের গন্ধে আকাশ বাতাস ম' ম' করে। শুধু ফুলের গন্ধটা পাওয়া যায় না। সেটা এঁদের দোষ নয়। আমেরিকার ফুলে গন্ধ খুব কম। রাতে পুজো ও খাওয়া-দাওয়ার শেষে যথারীতি বিচিত্রানুষ্ঠান তো আছেই। স্থানীয় শিল্পীরা নাচ-গান-বাজনা করেন। লোক-টোক জোগাড় করে থিয়েটারেরও ব্যবস্থা হয় মাঝে মধ্যে। কেউ পার্ট ভুলে গেলে প্রলয় ঘোষকে দেখলে মনে হবে উনিই বোধহয় পার্ট ভুলে গেছেন। অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করেন। বাচ্চাদের ইংরিজীতে ধমক দেন। থিয়েটারে অশ্লীল কথা থাকলে লাল কালি দিয়ে কেটে দেন : রাজনৈতিক বই হলে বাদ। ওঁর মতে পুজোটা ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপার। পলিটিক্স ও অবসিনিটির এখানে কোন স্থান নেই। প্রলয় ঘোষের দায়িত্বও কম নয়। উনি হচ্ছেন 'ভোজন ও ঢেঁকুরে'র সাধারণ সম্পাদক। পুজোর সময় ওঁর হাঁটার ধরন দেখলে যে কোন লোক মহারাজ নন্দকুমার বলে ভুল করতে পারে। সকলের সঙ্গেই মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে কথা বলেন। শুধু চার ধরনের মানুষকে উনি সহ্য করতে পারেন না। কালুয়া, স্বদেশী, কম্যুনিষ্ট কিংবা আন-লাইসেন্সড অবিবাহিত বাঙালী ছেলে যারা মেয়েদের গা-ঘেঁষে গুজগুজ করে কথা বলে। শেষের ধরনটা দেখলে ওঁর হাত নিসপিস করতো। মাথায় খুন চাপে। এরকমই একটা ছেলে ছিল খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, ইন্দ্রনীল সান্যাল। যে ওঁর আড়ালে মাটিকে মিঠু বলে ডাকত। আর, সেই একই কারণে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ওপর ওঁর জাতক্রোধ।

এ্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়েতে গাড়িগুলো ছবির মতো স্থির। একে তো দেরী হয়ে গেছে, তার ওপর রাস্তায় জ্যাম থাকলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক পাইপটা কামড়ে থাকার ফলে দাঁতটাও ব্যথা ব্যথা করছে। আজকাল বয়সটা অনুভব করেন প্রলয় ঘোষ। অবশ্য খড়্গপুরের ক্রনিক আমাশাটা আমেরিকায় নির্মূল ভাবে সেরে গেছে। কিন্তু খাবারে ভেজাল না থাকার ফলে গায়ে গতরে লেগে যায় তাড়াতাড়ি। আর, গাড়ি কেনার পর থেকে হাঁটার

অভ্যেসটা গেছে। কাজেই শরীরটাও ভারী হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। কি রকম যেন গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় আজকাল। মাথা ধরে। বুকটা পাথরচাপা মনে হয় মাঝে মধ্যে। তাছাড়া, টেন্‌শন তো আছেই। এই তো সেদিন কমোডটা খারাপ হয়ে বাথরুমটা ভেসে গেল। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর নাজেহাল হয়ে মিস্ত্রীকে ডাকতেই হল। সাদা মোটাসোটা সাহেব মিস্ত্রী গাড়ি করে এসে সারিয়ে দিয়ে গেল। করকরে আশি ডলার চলে গেল আধঘণ্টার মধ্যে। টাকার হিসেবে ওঁর খড়্গপুরের প্রায় এক মাসের মাইনে। অবশ্য, ওভার-টাইমটা সমানে চলেছে এই যা রক্ষে। তাছাড়া, স্ত্রীর চাকরিটার জন্যেও উনি খানিকটা সাশ্রয় বোধ করেন। ফল-মূল-তরি-তরকারির খরচা খানিকটা কমেছে বাড়ি কেনার পর থেকে। ব্যাক ইয়ার্ডেই অনেক কিছুর চাষ। টমেটো, ঝাল ও আঝালা কাঁচা লঙ্কা, ঝিঙে, কুমড়ো, বেগুন, লাউ, পেঁয়াজ, রসুন। গত বছর প্রায় চারশ টমেটো হয়েছিল। বেশ ডাব্বাই ডাব্বাই। সেগুলো ফুরোতে না ফুরোতেই এবারের গাছ লেগে গেছে। ছোট মেয়ের ফুলের সখ বলে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। নইলে ঐ জায়গায় বেশ কয়েক কিলো আলু আর ফুলকপি হয়ে যেত। প্রত্যেকটা জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে গেছে এই কয়েক বছরে। যে ফুলকপি বছর সাতেক আগে কুড়ি সেন্টে পাওয়া যেত এখন এক একটা এক ডলার ঊনপঞ্চাশ। তাও ছোট ছোট গাঁদা ফুলের মতো সাইজ। ফুলকপির দাম তের টাকা ভাবলেই মন খারাপ। খড়্গপুরে শীতকালে কুড়ি পয়সায় ফুলকপি পাওয়া যেত। অনেক সময় রাস্তায় ছাড়া দামড়া গরুগুলোকেও ফুলকপি খেতে দেখেছেন প্রলয় ঘোষ। নেহাত দেশ থেকে তরি-তরকারি আনতে দেয় না, তাই। না হ'লে নির্ঘাৎ উনি ফুলকপি সিঁ' মেলে আনাতেন। তবুও, যে যাই বলুক আমেরিকা এখনো লক্ষ্মীর দেশ। মেয়ের জন্যে ভিডিও, স্ত্রীর জন্যে অডিও, বাড়ি-ভর্তি এয়ার কণ্ডিশনার, কার্পেট, পর্দা—খড়্গপুরে থাকলে এ সব লবাবী হত কোনকালে। আমাশায় ভুগতে ভুগতেই প্রাণটা বেরিয়ে যেত একদিন। তাছাড়া, মাটির ব্যাপারটা সারাটা জীবন মাছির মতো লেগে থাকত গায়ে। সমস্ত লোক আঙুল দেখাত, মুখ টিপে হাসত, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করত। মাটির জন্য এখনো মাঝে মধ্যে কষ্ট যে হয় না, তা নয়। কিন্তু এই সোনার রাজ্যে এসেছেন বলেই মাটিকে ভুলতে পেরেছেন। রত্না এখনো ভুলতে পারেননি। হাজার হোক, মা তো!

প্রচণ্ড জোরে হর্ণ বাজতে চমকে পেছন ফিরে তাকালেন। ঝড়ের গতিতে একটা সাদা রঙের টয়োটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। কখন যে রাস্তার মধ্যে

থেমে পড়েছেন মনে নেই ওঁর। পাশ থেকে রত্না বলে উঠলেন : 'তোমার কি ঘুম পাচ্ছে নাকি ? মুখ খিঁচিয়ে কিরকম গালাগাল দিতে দিতে গেল দেখেছ ?' হ্যাঁ, দেখছেন প্রলয় ঘোষ। একজোড়া ফর্সা যুবক-যুবতী যাবার সময় গালাগাল দিতে দিতে গেল। কাঁচ বন্ধ ছিল বলে, কি বলল বোঝা গেল না। স্ত্রীকে বোঝালেন—'তা তো দেবেই। দোষটা তো আমারই। সাহেবরা অকারণ গালাগাল দেয় না। এই যদি কালুয়া হত তো দেখতে। এক্ষুনি ইট ছুঁড়ে মারত।' রত্না এ কথাটা এড়িয়ে গেলেন। প্রলয় ঘোষের কাছে সাহেবদের সাতখুন মাপ। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন—'নাইনটি ফোর্থ স্ট্রীট দিয়ে বেরিয়ে চল। একবারে বাড়ি হয়ে যাব। সকাল থেকেই ছুট্‌কির জ্বর। শরীর ভালো না থাকলে ওকে আর নিয়ে যাব না।' ছোট মেয়েকে উনি ছুট্‌কি বলেন।

প্রলয় ঘোষ অস্বস্তি বোধ করলেন : 'একা একা বাড়িতে রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে ? অ্যাডাল্ট মুভি দেখবে বসে বসে। তার চেয়ে অ্যাস্‌পিরিন দিয়ে, নিয়ে চল। ওখানে গিয়ে কোথাও একটু শুয়ে বিশ্রাম করবে।'

রত্না প্রতিবাদের সুরে বললেন—'আর কতদিন মেয়েকে এরকম আগলাবে। ভাল-মন্দ নিজেকে একটু বুঝতে দাও না।'

প্রলয় ঘোষ তেলেবেগুনে জ্বলে গেলেন—'একটা মেয়েতে শিক্ষা হয়নি ! ওর ভালো-মন্দ বোঝার বয়স হয়েছে ? তাছাড়া ও ঠিক মাটির মতোই চুলবুলে।'

রত্না চুপ করে যাবার আগে ফিসফিস করে বললেন—'মাটির কথা এখন থাক।'

হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে নাইন্টি ফোর্থ স্ট্রীটে ঢুকে পড়লেন প্রলয় ঘোষ। আমেরিকায় গাড়িতে চড়ে যে কি আরাম সেটা উনি মর্মে মর্মে বোঝেন। কলকাতায় এক দু'বার ট্যাক্সিতে চেপেছেন। সে যেন খেলনা গাড়ি। দোল খেতে খেতে আর গর্তে পড়তে পড়তে হাড়গোড় ভেঙে যাবার জোগাড়। আর, এ যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে যাওয়া, ঝাঁকুনি নেই, রাস্তায় গর্ত নেই। মনে হবে ডান্‌লোপিলোতে শুয়ে শুয়ে উড়ছ। আর রাস্তাগুলো একেবারে আমূল বাটার। গাড়ি বার করলেই গড়গড় করে চলতে শুরু করে। এঞ্জিন না থাকলেও গাড়ি চলা কিছু আশ্চর্য নয় এসব রাস্তায়। তাও তো ওঁর ইম্পালার বয়স প্রায় চার বছর হয়ে গেল। মহানায়ক উত্তমকুমার নাকি ইম্পালা গাড়ি চড়ে রেড রোডে হাওয়া খেতেন, সেই থেকে 'ইম্পালা' নামটা রত্নার মনে ছিল। তাই গাড়ির প্রশ্ন উঠতেই বিনা দ্বিধায় রত্না বলেছিলেন, ইম্পালা। সাদা হাঁসের মতো দেখতে। ভেতরে লাল রঙের মখমলের গদী। এ ছাড়া রেডিও, এয়ার

কন্ডিশনারও আছে। রেডিওতে ইংরিজী গান শুনে প্রলয় ঘোষের প্রাণটা জুড়িয়ে যায়, মনে হয় যেন স্বর্গে বসে আছেন। ইদানীং অবশ্য স্বর্গের নাম শুনলে একটু আধটু বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। বাঁচা-মরার প্রশ্নটা এসে যায় কিনা! তাছাড়া, স্বর্গেরও তো আমেরিকা-ইন্ডিয়া আছে। আমেরিকান নাগরিক হলেও জন্মসূত্রে যদি স্বর্গের খড়্গপুরে গিয়ে হাজির হন! স্বর্গের খড়্গপুর কথাটা খুব ভালো লাগল ওঁর। মনে মনে নিজের কল্পনাশক্তিকে তারিফ করলেন উনি।

নাইন্টি ফোর্থ স্ট্রীটটা খুব ঘিঞ্জি। হাইওয়ে থেকে ঢুকলে প্রথমটা আরো দম আটকানো লাগে। ঢুকেই একটা পাবলিক ক্লিনিক। এই পাবলিক ক্লিনিকের আশেপাশে কয়েকঘর কালুয়া ও স্প্যানিশ পরিবারের বাস। এইজন্য, সম্ভব হলে প্রলয় ঘোষ এই দিকটা দিয়ে ঢোকেন না। পাবলিক ক্লিনিকে শুধু একবার ঢুকেছিলেন—তাও বাধ্য হয়ে। ক্লিনিক ভর্তি শুধু কালুয়া-গুষ্টি। ওরা যেমন নোংরা, তেমনি গায়ে গন্ধ। পালিয়ে আসার পথ পাননি সেদিন। তাছাড়া এই সব কালুয়া আব স্প্যানিশরা রাস্তার ওপর বাড়ির সামনের রকে ছোটলোকের মত বসে থাকে। বোতল মুখে দিয়ে বিয়ার খায় ছেলে-মেয়ে সবাই। কেউ কেউ প্রচণ্ড জোরে ট্রানজিস্টর চালায়। তালে তালে পাছা দুলিয়ে নাচে আর হ্যা হ্যা করে হাসে। অবশ্য কয়েকটা ব্লক পেরোলেই এই রাস্তাটাই অন্যরকম। খুপরির মতো হলেও সুন্দর সামান্য ইঁটের বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা। মানুষজন অনেক সভ্য। বেশির ভাগেই সাদা। এদের পোশাক-আশাক, কথা বলার ধরন, হাঁটা দেখলেই শ্রদ্ধা হয় ওঁর। মাঝে মধ্যে বাইরে বসে বিয়ার যে খায় না, তা নয়। তবে সে ভঙ্গী অনেক সংযত। এখানেই কয়েকটা ব্লক পশ্চিমে গেলে প্রলয় ঘোষের বাড়ি। একটু গায়ে গায়ে ঠাসা হলেও এ পাড়ায় বেশ নিরাপদ বোধ করেন উনি। অধিকাংশই বুড়ো-বুড়ি। চ্যাংড়া ছেলে-ছোক্‌রাদের ভিড় কম। আমেরিকায় মেয়ে মানুষ করা যে কি যন্ত্রণা সেটা প্রলয় ঘোষ এতদিনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

ডানদিকে ঘোরার আগেই রত্না বললেন—'চলোনা গো চালটা কিনে নিয়ে যাই। ঘরে বাসমতি ছাড়া কিছু নেই। সকাল সন্ধ্যে বাসমতি খেলে পঞ্চাশ পাউণ্ড চাল দুদিনে শেষ হয়ে যাবে।'

ডানদিকে না ঘুরে সোজা এগিয়ে গেলেন প্রলয়। মাইলখানেকের মধ্যেই একটা কোরিয়ান দোকানে পঁচিশ অথবা পঞ্চাশ পাউন্ডের বস্তা পাওয়া যায়। এখানকার ভারতীয় দোকানগুলোতে পারত পক্ষে ঢোকেন না উনি। সব কিছুতেই ভেজাল বলে মনে হয় ওঁর। এই তো কিছুদিন আগেই চানাচুরের

প্যাকেটে একটা বড় মতো আরশোলা আবিষ্কার করেছিলেন রত্না। লঙ্কার গুঁড়োতে নিশ্চয়ই এরা সুরকি মেশায়। কারণ, পাঁচ চামচ, ছ'চামচ দিলেও জিভে জ্বালা করে না। আর এই সব দোকানওলাগুলোও কিরকম টেঁটিয়া হয়ে উঠেছে আজকাল। দরদস্তুর করা যায় না। এক পয়সাও কমাতে চায় না। পাঁচ ছ'বছর আগেও এইসব দোকানে নির্ভয়ে দর করা যেত। সেদিক থেকে চায়না টাউনে এখনো ট্রাডিশন বজায় আছে। ফুটপাথে ঢেলে অনেক রকমের মাছ, আনাজপাতি বিক্রী হয়। দামও বেশ সস্তা। পছন্দ না হয় দরদস্তুর কর। না পোষালে পাশেই গাদা গাদা দোকান। মাঝে মধ্যে ওখানে গিয়ে মাসের বাজারটা সারেন প্রলয় ঘোষ। অনেক কষ্টে উপার্জিত ডলার ঐ সাজানো গোছানো সুপারমার্কেটে দিয়ে আসতে রাজী নন উনি। শুধু চীনাদের গা থেকে ও রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোনো একটা সয়া সসের গন্ধে একটু গা'টা গুলিয়ে ওঠে। শহরের এই একমাত্র নোংরা জায়গা যেখানে সাহেবদের বেশ ভীড় হয়। কারণ চীনেরা নোংরা হলেও খাবারে ভেজাল দেয় না। তাছাড়া, এরা তাইওয়ানের চীন। কেউ কম্যুনিস্ট নয়।

কোরিয়ান দোকানের সামনেই ডক্টর ভট্টাচার্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বছর কুড়ি হল আছেন এদেশে। রত্নাকে দেখে মিসেস ডাক্তার অর্থাৎ শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য হৈ হৈ করে এগিয়ে এলেন—'আরে, আরে রত্না যে, কেমন আছ ?' রত্না ঘোষ শ্রীপর্ণার থেকে বয়সে ছোটই হবেন। কিন্তু, ডাক্তারের বউ বলেই সবাইকে তুমি বলার অধিকারটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। একটু দূরে ডাক্তারের মারসেডিজ গাড়িটা পার্ক করা। এমনিতেই ডাক্তার, বদ্যি, সুঁইতে চিরকালই একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে ওঁর। আর, তাছাড়া কালো মোটা ডাক্তার দেখলেই ওঁর কিরকম যম যম মনে হয়। সাধে কি আর হিজলির ডঃ ঘোষকে কলেজের ছোঁড়ারা 'মিঃ জল্লাদ' বলে ডাকত। নিজের চোখে দেখা—এই তো বছর দশেক আগে চিত্তরঞ্জন সেনের সামান্য বুকে ব্যথা না কি হল। বড় ছেলে ভয় পেয়ে মিঃ জল্লাদকে কল দিল। জল্লাদ সেই যে বাড়িতে ঢুকল, আর স্টেথো কাঁধে সকাল-বিকাল আসতে শুরু করল যে ভিজিটের টাকা গুনতে হবে ভয়ে চিত্তরঞ্জন হার্টফেল করে মারা গেল। ডাক্তারদের মধ্যে এক বিরাট সর আছে। একবার ছুঁয়েছে কি গেছ ! দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেলে সে তোমার দাঁতটা তুলে হাতে ঘা করে ছেড়ে দেবে। হাত যদি কোনরকমে সারে তার পরদিন দেখবে কানে শুনতে পাচ্ছ না। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে তো। আর, ডাক্তাররা সেটা খুব ভালো ভাবেই জানে। এক অঙ্গের

বিষ সারা অঙ্গে ছড়িয়ে দিতে ওরা ওস্তাদ। তাই, গতবার দেশে গিয়ে রবি চক্রবর্তীকে বলে কয়ে একটা মেটিরিয়া মেডিকা আনিয়ে নিয়েছেন। আর, ফিলাডেলফিয়ায় বোরিক অ্যাণ্ড ট্যাফল-এর দোকান থেকে পছন্দ মতো ওষুধ আনিয়ে নেন উনি ও রত্না দু'জনেই। নিজের ধাত নিজে জানবেন না তো বাইরের লোক জানবে! সর্দি কাশি হলে ফেরামফস্। গুরু পাক খেয়ে বদহজম হলে পালসেটিলা, জ্বর ও গায়ে ব্যথায় রাস্টক্স্, মাথাধরা ও অল্প অল্প জ্বরে বেলেডোনা, মাথা বেশি ধরলে শেষমেষ অ্যাস্পিরিন। ছোট বেলায় পিংকি ক্রীমিতে খুব দাঁত কড়মড় করত। বিছানায় হিসি করে ফেলত। রবি চক্রবর্তী সব শুনেটুনে বললেন—'মেয়েটার একটু জেদবাদের ধাত আছে। ওকে সিনা-টু হান্ড্রেড খাওয়াও কিছুদিন।' মাস তিনেকের মধ্যে ক্রীমি, হিসি সব কোথায় পালিয়ে গেল। আর, তাছাড়া দর্শনের একটা ব্যাপার আছে তো : সৌম্য মোহনানন্দের মতো চেহারা। সব সময়ে গরদের পাঞ্জাবী, সোনার আংটি পরেন। আগে জমিদার ছিলেন, কি মিষ্টি ব্যবহার! ওতেই তো অর্ধেক রোগ জল হয়ে যায়। তাছাড়া খরচাও কম।

আমেরিকায় দুটো জিনিস ইন্ডিয়ার মতোই। ট্যাক্সি আর অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। মাথা ফেটে গেল কি, পা ভেঙে গেল, সে আলাদা কথা। সেলাই করতে হবে কি নাট-বল্টু লাগাতে হবে সেটার মানে বোঝা যায়। কিন্তু কারণ নেই, অকারণ নেই রক্ত, পেচ্ছাব পরীক্ষা, গাদা গাদা বড়ি, যন্ত্রপাতি বসিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এটা কি মঙ্গলগ্রহ পেয়েছে! ডায়গ্নিসিসের একটা দাম নেই! যেরকম ভাবে দিনকাল এগোচ্ছে তাতে আর কিছুদিন পরে কম্পিউটাররা ডাক্তার হয়ে যাবে! কম্পিউটারের ঘরে গেলেই হাজার রকমের শেকল পরিয়ে একটা সুস্থ মানুষকে বলবে, তোমার একশো রকম রোগ একটু একটু করে আছে, তার ত্রিশ-হাজার রকমের চিকিৎসা হয় আর কয়েক লক্ষ রকমের ওষুধ খেতে হবে। আর, সেই অজুহাতে এই বড় বড় ওষুধ কোম্পানীর কম্পিউটারাইজড কারখানায় কোটি কোটি ওষুধ তৈরী হবে। মুড়ি, মুড়কি, আম, কাঁঠালের বদলে মানুষ তখন ওষুধ খাবে।

কালো মোটাসোটা হলেও ডঃ ভট্টাচার্য লোক ভাল বলতে হবে। ডায়গ্নিসিসের কথায় হেসে ফেলে প্রলয় ঘোষকে বলেছিলেন—'ডায়গ্নিসিসের যুগ চলে গেছে ঘোষ মশাই। অ্যালোপ্যাথির যুগও আর নেই। এটা হল আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগ। আজকাল টেষ্ট টিউবে 'বেবি' তৈরী হচ্ছে। আপনি, এত সাহেব আর এইটুকু বুঝতে পারছেন না?' টেষ্ট টিউব বেবির নাম

শুনে আরো রেগে গেছেন প্রলয় ঘোষ—'এসব সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে। এই সব বেবি, কাকে মা বলে ডাকবে ? টেষ্ট টিউবকে ? মা'র গর্ভযন্ত্রণার কোন একটা দাম নেই ? বাবা মা'র ভালবাসার একটা অন্যরকম 'ইয়ে' আছে বুঝলেন। এর পরে কোনদিন শুনব কুকুরের শুক্র মানুষের পেটে ঢুকিয়ে ডিটেকটিভ কুকুর বানানো হচ্ছে।' ডঃ ভট্টাচায্যি আবার হাসলেন, একটুও না রেগে বললেন—'মানুষের পেটে কি নেড়ি কুত্তা জন্মায় না বলতে চান ?' প্রলয় ঘোষ এবার ক্ষেপে গেছেন—'সে সব আমাদের মতো অসভ্যের দেশে। সাহেবদের দেখুন। কত ভদ্র, কত সভ্য, কত উন্নত ?' ডঃ ভট্টাচায্যি এবার যেন একটু বিরক্ত হলেন—'জালিয়ানওয়ালাবাগে পেছন ফেরা মানুষকে গুলি চালিয়েছিল কারা বলতে পারেন ? ভিয়েতনামের অসংখ্য মানুষকে, গ্রামকে গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে কারা ? কম্বোডিয়া ? এরা মানুষ না কুকুর ?' এবারে চমকে উঠলেন প্রলয় ঘোষ। ডাক্তার কি কম্যুনিস্ট ? না হ'লে জালিয়ানওয়ালাবাগ, ভিয়েতনাম এসব কি আবোল তাবোল বকছে ? স্থির মস্তিষ্কে অব্যর্থ প্রশ্নটা ছুঁড়লেন উনি—'এতই যদি এদেশটা খারাপ তো এদেশে এলেন কি করতে ? আমাদের দেশের গ্রামগুলোতে গিয়ে ওলাওঠার চিকিৎসা করলেই পারতেন।'

ডঃ ভট্টাচায্যি এবার একটু গম্ভীর হলেন—'এদেশটা খারাপ তো আমি বলিনি। ভাল খারাপ সব দেশেই আছে। টাকা পয়সা আছে তাই এদেশে অনেক বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম হচ্ছে। তাই বলে এদের রীতি-নীতি যে মহান সে কথা আমি স্বীকার করি না। আট টাকা ভিজিট সহ্য করতে না পেরে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছি ঠিক। অনেক টাকা রোজগার করছি এটাও ঠিক, কিন্তু তাই বলে মরে গেছি ভাববেন না। অনেক টাকা রোজগার করেছি, ফেলে ছড়িয়ে খরচা করে দামী বাড়ি-গাড়ি সবই আছে কিন্তু এখনো বুঝতে পারি রঙটা সাদা নয় আমার। কেউ না বললেও বুঝতে পারি আমরা সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন। টাকা আছে বলে ওরা বলতে পারে না।'

সেদিনকার এই সব আলোচনার পর থেকে প্রলয় ঘোষ ডঃ ভট্টাচায্যির সামনে অস্বস্তি বোধ করেন। যাই হোক, ডাক্তারও গাড়ি থেকে নামেননি, উনিও না। কাজেই মহিলায়-মহিলায় সামাজিকতা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়ে গেল। কোরিয়ান দোকানের ছেলেটি চালের বস্তাটা এনে গাড়িতে তুলে দিয়েছে। আজকে মেজাজটাই কেমন যেন বিগড়ে গেছে। ফ্লাশিং মেডোতে রত্নার ডুকরে কান্না, রাস্তায় জ্যাম, গরম, ডাক্তার সব মিলিয়ে পার্টিতে যাবার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কথা দিয়ে কথা না রাখাটা অপছন্দ করেন প্রলয় ঘোষ। কাজেই

বাড়ির ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থেকে নামতে নামতে রত্নাকে বললেন, 'আমি শুধু মুখ হাত পা ধুয়ে, তবে বেরোব।'

সকালবেলায় পিংকির জ্বর দেখে বেরিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। মেয়েটা ঘুমোচ্ছে ভেবে সন্তর্পণে দরজাটা খুললেন চাবি লাগিয়ে। বাইরের ঘরটা অন্ধকার। শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। আলতো করে ভেজানো। গিয়ে আস্তে করে ঠেলা দিয়ে খুললেন। ভেতরে ঢুকে চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না উনি। পিংকির জামাকাপড় প্রায় সবটাই খোলা। বুকের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে একটা কালুয়া ছেলে উন্মত্ত ভাবে পিংকিকে চুমু খাচ্ছে। ঘরে মানুষের আওয়াজ পেয়ে দু'জনেই চমকে উঠে বসল বিছানার ওপর। বিছানার চাদর দিয়ে কোনমতে ঢেকে নিল পিংকি। ছেলেটি লাফ দিয়ে খাটের নীচে নেমে পাশে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সংবিৎ ফিরে পেলেন প্রলয় ঘোষ। শরীরের সমস্ত রক্তটা বোধহয় এখন মাথায়। পাশেই ড্রেসারের ওপর মিনে করা ফুলদানিটা চোখে পড়ল ওঁর। এখনো ফুলদানীতে পিংকির প্রিয় সাদা গোলাপ সাজানো। ডানহাতে শক্ত করে ফুলদানীটা ধরে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারলেন ছেলেটার দিকে। ক্ষিপ্র গতিতে হাত বাড়িয়ে ফুলদানীটা লুফে নিল ছেলেটি। শুধু ফুল আর জল ছিটকে গিয়ে পড়ল। পিংকি শুধু চীৎকার করে বলল—'ইট ইজ নট্ হিজ ফল্ট, বাবা।' প্রলয় ঘোষের আর কোন জ্ঞান নেই, আজ শুধু সাপের মত হিসহিসে আওয়াজ বেরোল গলা দিয়ে—'আই অ্যাম গোইং টু কিল ইউ, টুডে।' ছুটে গিয়ে মেয়েটার গলা টিপে ধরলেন—পিংকি চীৎকার করে উঠল। রত্না ঘোষ পেছন থেকে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটা প্রলয় ঘোষকে পেছনের কলার ধরে টেনে তুলল। হিড়হিড় করে টানতে টানতে ওঁকে নিয়ে এল দেয়ালের কাছে। দেয়ালের সঙ্গে ওঁকে চেপে ধরে খুব স্থির কণ্ঠে বলল—'ইউ আর পিংকি'স ড্যাড। আদারওয়াইজ আই উড হ্যাভ টার্নড ইয়োর স্কিন হোয়াইট, আইজ ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়োর ব্লাড ব্লু।' ছ' ফুট লম্বা এই দৈত্যটার সামনে এত রাগের মধ্যেও ভয় পেলেন প্রলয় ঘোষ। পিংকি এতক্ষণে জামা পরে নিয়েছে। ওর গলায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। খুব নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল—'লীভ হিম অ্যালোন, জন।' জন নামে ছেলেটি প্রলয় ঘোষকে ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে শুধু বলল—'কল মি ইফ্ ইউ নিড মি, পিংকি।' পিংকি ঘাড় নাড়ল। ছুটে বাইরে চলে গেল জন।

প্রলয় ঘোষ এরকম তাজ্জব সিনেমা দেখেননি নিজের জীবনে। রত্না ঘোষ

খুব দৃঢ় স্বরে মেয়েকে বললেন—'তুমি খুব অন্যায় করেছ পিংকি। তুমি আমাদের বিশ্বাস নষ্ট করে দিলে।' প্রলয় ঘোষ চীৎকার করে উঠলেন—'বিশ্বাস মানে ওর একদিন কি আমার একদিন।' ড্রেসারের ওপর থেকে বড় কাঁচিটা হাতে তুলে নিয়ে পিংকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই রত্না দু'হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠলেন—'কি হচ্ছে কি।' প্রলয় ঘোষ ছটফট করতে লাগলেন—'আই অ্যাম গোইং টু কিল হার অ্যান্ড দ্যাট ফাকিং সন অফ এ বিচ।'

হাত থেকে ততক্ষণে কাঁচিটা কেড়ে নিয়েছেন রত্না। ঘরটা অসম্ভব রকমের নিস্তব্ধ। লজ্জায়, অপমানে প্রলয় ঘোষের মুখে লাল আভা দেখা দিচ্ছে। শুধু বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন—'আই উইল কিল দ্যাট ফাকিং সন অফ এ বিচ।' হঠাৎ খুব সহজ কণ্ঠে পিংকি বলল—'হি ইজ নট সন অফ্ বিচ্ বাবা।' 'শাট্ আপ'—প্রলয় ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলেন—'তোকেও খুন করে ফেলব।' পিংকির গলা আশ্চর্য রকমের স্থির—'আই নো নাও। ইউ কিল্ড দিদিভাই।' এতবড় কথা প্রলয় ঘোষের মুখের ওপর আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি। রত্না ধমকের সুরে বললেন—'কি আজেবাজে কথা বলছ, ছুট্কি।' পিংকির ঠোঁটের কোনায় হাসি—'গত সাতটা বছর বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি দিদিভাই-এর সঙ্গে কথা বলেছি, দিদিভাইকে আদর করেছি। লেট্ হিম ডিনাই। জান সেই রাত্তিরে দিদিভাই কি অসম্ভব রকমের একা ফিল করেছিল। সেদিন বাবা শুধু একটা কথাই ভেবেছিল। দ্যাট ওয়াজ হিজ ব্লাডি প্রেস্টিজ।'

প্রলয় ঘোষ বোধহয় এত ইংরিজী এক সঙ্গে কোনদিন বলেননি—আবারো চীৎকার করে উঠলেন—'ডু ইউ নো হোয়াট ইয়োর দিদিভাই ডিড।'

'ইয়েস আই ডু। শি ওয়াজ প্রেগ্ন্যান্ট।'—পিংকির গলায় উত্তেজনার লেশমাত্র নেই।

'ডু ইউ থিংক ইট ইজ ক্রেডিটেবল টু বিকাম প্রেগন্যান্ট অ্যাট ফিফ্‌টিন।'—প্রলয় ঘোষ রাগে কাঁপছেন থর থর করে।

'মা ওয়াজ অলসো ফিফ্‌টিন, হোয়েন শি ক্যারেড দিদিভাই।' পিংকি যেন কিছুই কেয়ার করে না আজ।

'বাট শি ওয়াজ ম্যারেড।'

'ইউ মিন শি হ্যাড এ ফাকিং লাইসেন্স।' পিংকি হেসে ফেলল।

উঠে গিয়ে সজোরে প্রলয় ঘোষ মেয়েকে চড় মারলেন। পিংকির মাথাটা গিয়ে ঠুকল খাটের বোর্ডে। পিংকি 'উঃ' বলে চীৎকার করে উঠল। রত্না ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন—। রত্না চীৎকার করে বললেন, 'তোমরা দু'জনে

থামবে!'

পিংকি আস্তে আস্তে বলল—'তোমাদের কাছ থেকে অনেক ভালবাসা পেতে পারত দিদিভাই। শি রিয়েলি নিডেড ইউ দ্যাট ডে। শি মেড এ মিস্টেক। বাবার কাছে ঐরকম মার খেয়ে সারারাত্তিব দিদিভাই আমার পাশে শুয়ে থরথর করে কেঁপেছিল আর বলছিল—ছুট্‌কি, আমায় একটু আদর করে দে। ঘেন্না করিস না, একটু আদর করে দে। ডু ইউ নো ড্যাড আই ওয়াজ দি ওনলি পারসন হু কেয়ারড ? আমি দিদিভাই-এর চুলে বিলি কেটে দিয়েছি। কপালে হামি খেয়ে দিয়েছি। বারবার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছি। হোয়ার ওয়্যার ইউ ড্যাড, হোয়েন শি নিডেড ইউ ? ইউ ওয়্যার মোর কনসার্নড অ্যাবাউট ইয়োর ব্লাডি প্রেস্টিজ।'

রত্না ঘোষ ঠিক দুপুর বেলার মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন। প্রলয় ঘোষ পাথরের মতো স্থিব। পিংকি যেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছে—'ইট ডাজন্ট ম্যাটার এনি মোর। ইট হ্যাজ বিন ওভার এ লং টাইম এগো। দিদিভাই যেদিন টাওয়ার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরল, সেদিন থেকে তুমিও আমার কাছে মরে গেলে। কি অসম্ভব একা একটা মেয়েকে কি সহজেই তুমি আরো একা করে দিলে। তুমি নিজেই নিজের কাছে বন্দী। খড়্গপুরের জেলখানা থেকে দশহাজার মাইল দূরে এখন তুমি আমেরিকার জেলখানায়। আর, তোমার আশেপাশের মানুষকে তুমি সেই জেলখানায় আটকে রাখতে চাও।'

পিংকিও চুপ করে গেল একসময়। অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙ্গে ফোন বাজল—প্রলয় ঘোষ ফোনটা ধরলেন।

ডঃ ভট্টাচায্যি ফোন করেছেন—'কি মশাই, আসছেন না পার্টিতে ?'

প্রলয় ঘোষ কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। ডঃ ভট্টাচায্যি আবার বললেন—'বাড়িতে কারো কিছু হল-টোল নাকি ?'

প্রলয় ঘোষ থতমত খেয়ে বললেন—'না, না, সব কিছু ঠিক আছে। এভরিথিং আণ্ডার কন্ট্রোল। আমরা এক্ষুনি রওনা হব।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে প্রলয় ঘোষ রত্নাকে বললেন—'রেডি হোয়ে নাও।'

রত্না প্রতিবাদের সুরে বললেন—আজ ভাল লাগছে না।'

প্রলয় ঘোষ বিরক্ত হলেন—'ভাল লাগা না লাগার ব্যাপারটা অবান্তর। কথার একটা দাম আছে আমার। যাও, তৈরী হয়ে নাও।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—'গো অ্যাণ্ড ডু ইয়োর হোমওয়র্ক। উই উইল বি ব্যাক্ ইন অ্যান আওয়ার।'

প্রলয় ঘোষের গলায় এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে রত্না মুখ বুজে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে পিংকিকে শুধু বললেন—'সারাদিনে কিছু খেয়েছিস ?' পিংকি মার দিকে তাকাল। কোন উত্তর দিল না।'

কিছুক্ষণ পর পিংকি গাড়িটা স্টার্ট দেবার আওয়াজ পেল। জানালার পর্দাটা সরিয়ে ও বাইরের দিকে তাকাল। সাদা ইম্পালাটাকে অন্ধকারে ভূতের মতো লাগছে। শুধু পেছনের লাল আলো দুটো হায়েনার মতো পিংকির দিকে তাকিয়ে। আর ঠিক তক্ষুনি পিংকির মনে হল ও বড় একা। অসম্ভব একা।

এই পিংকি অথবা ছুট্‌কি, যার চোখে এখন এতটুকু জল নেই, ছোট বেলায় মাটি ওকে কত খেপাত কাঁদা নিয়ে। কথায় কথায় পিংকি 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলত আর মাটি দুলে দুলে আবৃত্তি করত—'ছিঁচ কাঁদুনির নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা।' নাকে ঘা শুনে পিংকি খুব রেগে যেত। মাঝে মধ্যে খুব অসহ্য হয়ে গেলে চীৎকার করে বলে উঠত—'ন্যেকু'। পিংকির ধারণা ছিল ন্যেকু মানে সাংঘাতিক কিছু খারাপ। ইন্দ্রদার কাছে পিংকি আরেকটা খারাপ কথা শিখেছিল। ইন্দ্রদা বলেছিল—কথাটার মানে নাকি বোকা। ইন্দ্রদা মানে ইন্দ্রনীল সান্যাল। আই·আই· টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। ঠাকুমা রোজ ওকে চাঁদের মধ্যে চরকাবুড়ির গল্প বলতেন। চাঁদের মধ্যে কোন বুড়ি আছে বলে বিশ্বাস হয়নি পিংকির। তাই সেদিন গল্প শুরু করতেই পিংকি বলেছিল—'তুমি বড্ড গাণ্ডু ঠাম্মা। চাঁদে কখনো বুড়ি থাকে ?' ঠাকুমাকে ঠাম্মা বলত পিংকি। ঠাকুমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—'এ কথার মানে কিরে বুই ?' পিংকি বুক ফুলিয়ে বলেছিল—'ইন্দ্রদা আমাকে বলেছে গাণ্ডু মানে বোকা।' ঠাম্মাকে নতুন কিছু শেখাতে পেরে খুব গর্ব হয়েছিল পিংকির। গর্বটা অবশ্য বেশিদিন টেঁকেনি। কিছুদিন পরেই ছেলের ওপর কি একটা কারণে খুব রেগে গিয়ে ঠাকুমা প্রলয়কে চীৎকার করে বলেছিলেন—'তুই বড্ড গাণ্ডু।' প্রলয় ঘোষ হাসবেন না কাঁদবেন বুঝে পাননি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোল। ঠাকুমাকে খারাপ কথা শেখানোর জন্য ও নিজে শেখার জন্য বাবার কাছে বেধড়ক মার খেয়েছিল পিংকি। সত্যি কথা বলতে কি, কথাটার মানে এখনো জানে না পিংকি। অনেকবার ভেবেছে জিজ্ঞেস করবে কাউকে। লজ্জায় পারেনি। এখন এই অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যে এই ঘটনাটা মনে পড়ে হাসি পেল পিংকির।

শুধু একা বলে নয়, মনটা একদম শূন্য।

মনের ভেতর এই শূন্যতাকে ভয় পায় পিংকি। এই বাড়ি, এই ঘর, বাবা-মা,

আমেরিকা শহর, অসংখ্য মানুষের মধ্যেও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ লাগে, ভালো লাগা, খারাপ লাগার মধ্যে কোন তফাৎ নেই এই মুহূর্তে। ও যে আছে এ ব্যাপারটাই নিজের কাছে খুব নির্বোধ বলে মনে হয়। একটু আগের ঘটনাও আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কিন্তু খুব সম্ভবত এই শূন্যতা থেকেই একটা অসহ্য অস্থিরতা ওকে গ্রাস করছে। স্থান বলে কিছু নেই। শুধু অখণ্ড সময়ের একটা বিরাট বুদবুদে চেপে পিংকি ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন মুখ নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। কোন চরিত্র নেই, অন্ধকার নেই, আলো নেই, শব্দ নেই। একটু সময়ে অনেক কাজ করার মধ্যে শারীরিক যন্ত্রণা আছে, কিন্তু কোন কাজ নেই অথচ অখণ্ড সময় এ ব্যাপারটা বীভৎস। পিংকির মনে হল এই কারণেই বোধহয় লটারীর টাকা পাবার পরও মানুষ কেরাণীর কাজ করে। এই তো আরেকদিন নিউইয়র্কের ব্রুকলীন অঞ্চলে একটা লোক সকালবেলায় স্টেনগান চালিয়ে আট দশটা মানুষকে খুন করে ফেলল। আর, আজ থেকে আট বছর আগে ঘুম থেকে ওঠার আগেই সোজা গিয়ে দিদিভাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের টাওয়ারে উঠেছিল। পিংকি মনে মনে ভাবল—ঠিক এই মুহূর্তে ও হয়ত নির্বোধ কিছু করে ফেলতে পারে।

ফোনটা বেজে উঠতে পিংকি চমকে উঠল। স্বস্তিও পেল খানিকটা। অন্তত একটা কাজ পাওয়া গেল। ওপার থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল পিংকি।

'পিংকি। আর ইউ ওকে?' জনকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

একটু চুপ করে থেকে পিংকি বলল—'ইয়া। আই অ্যাম ওকে।' (মিথ্যে কথা। এই মুহূর্তে পিংকির জনকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল)

'হোয়্যার ইজ ইওর ড্যাড?'

'হি ওয়েন্ট টু এ পার্টি।'

'আই অ্যাম সরি ইফ্ আই কজ্‌ড ইউ প্রব্লেম।'

'ডোন্ট সে দ্যাট, জন। ইট ওয়াজ নট ইয়োর ফল্ট।'

'ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কাম ওভার?'

'নো।'

'ডু ইউ ওয়ান্ট টু কাম হিয়ার অ্যান্ড সি মি। আই অ্যাম ওনলি থ্রী ব্লক্‌স্ অ্যাওয়ে।'

'নো।' পিংকির কণ্ঠস্বর অসম্ভব রকমের স্থির।

'ডোন্ট ইউ লাভ মি?'

'ইয়েস, আই ডু। বাট, আই ওয়ান্ট টু স্টে অ্যালোন রাইট নাও।' জনের

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই আস্তে আস্তে ফোনটা নামিয়ে রাখল পিংকি। কথাটা ঠিক। জন কার্টারকে পিংকি খুব ভালবাসে। কিন্তু এই মুহূর্তে পিংকি কাউকে সহ্য করতে পারবে না। জনকেও না। জন কার্টারের গায়ের রং অথবা মাথার চুলে পিংকির কিছু এসে যায় না। বাবার মতো পিংকি সাদা কালোতে বিশ্বাস করে না। তাছাড়া, জনের ওপর ওর একটা কৃতজ্ঞতাও আছে। মাত্র বছরখানেক আগেই সন্ধ্যেবেলায় একটা বিচ্ছিরি ঘটনায় জনের সঙ্গে ওর পরিচয়। ওয়াই· এম· সি·-এ তে সাঁতার কেটে পিংকি বাড়ি ফিরছিল। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ওভারহেড রেল লাইনটার তলা দিয়ে আসতে আসতে কয়েকটা চ্যাংড়া ছেলের পাল্লায় পড়েছিল ও। এ অঞ্চলে সন্ধ্যের পর এমনিতেই লোকজনেব যাতায়াত কম। দোকানপাট খোলা থাকলে কিছু লোকজন তবু থাকে। দোকানপাট বন্ধ হয় সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ। তখন রাস্তাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। প্রথম প্রথম এই ছেলেগুলো পেছন থেকে ওকে টিটকিরি দিতে শুরু করে।

'আর ইউ হিন্ডু? হিন্ডু গার্লস স্মেল কারি।'

পিংকি প্রথমে কিছু বলেনি। ছেলেগুলোর গায়ের রং সাদা। কিন্তু দেখলেই কিরকম ঘেন্না হয়। আবার মন্তব্য এসে পড়ে।

'উই ওয়ান্ট টু স্মেল কারি, বেবি।'

হঠাৎ পিংকি রেগে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। ওদেব তিনজনকে লক্ষ করে বলে—'ইউ স্মেল লাইক পিগ্‌স। ইউ ক্যান লিক্ মাই বুট্‌স!'

ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে তাকায়। একজন ঢ্যাঙা মতো ছেলে এগিয়ে এসে হঠাৎ পিংকিকে জড়িয়ে ধরে। পেছন থেকে আরেকটা ছেলে বলে—'নট ইয়োর বুট্‌স, বেবি। উই উড লাইক টু লিক সামথিং এল্‌স।'

পিংকি নিজেকে ছাড়বার প্রাণপণ চেষ্টা করে শেষে মরীয়া হয়ে চীৎকার করে ওঠে—'হেল্প।'

ঢ্যাঙা মতন ছেলেটা ওর জামার ভেতর হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বলে—'উই আর গোইং টু হেল্প ইউ বেবি!'

সেদিন পিংকির কিছু করার ছিল না যদি না জন কার্টার সেই সময় ওখানে এসে পড়ত। জনকে দেখে এই ছেলেগুলো পালিয়ে যায়। জন ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। তার পরের দিন, জন ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল স্কুলে। জন একই স্কুলে ওর থেকে দু ক্লাস উঁচুতে পড়ে। বাড়িতে ফিরে এ ঘটনাটা বাবা-মাকে বলেনি পিংকি। বললে হয়ত বাবা সাঁতার কাটতে যাওয়াই বন্ধ করে

দিত। কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়াও জনকে ও খুব ভালবাসে। ওকে চুমুও খেয়েছে দু'চারবার। প্রথম প্রথম বাবার কথা ভেবে চুম খাওয়ার ব্যাপারে ওর একটা অপরাধবোধ ছিল। পরে দেখছে চুমুর সঙ্গে অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার ছেলেমেয়েরা সবাই খায়। কাজেই চুমুর সঙ্গে ভারতীয় পবিত্রতার কেন বিরোধ ও বুঝতে পারে না। আজকে বিকেলের ব্যাপারটা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। জন একটু আদর করতে চেয়েছিল। পিংকি আপত্তি করেনি। তারপর, মজা লাগাতে লাগাতে মজাটা একটু বেশিদূব গড়িয়েছিল। কিন্তু, বাবা যত না রেগেছে এই ব্যাপারটায়, তার থেকে অনেক বেশি রেগেছে জন নিগ্রো বলে। আরো অনেক কিছুর মতো বাবার এই ভাবনা-চিন্তা পিংকি স্পষ্ট বুঝতে পারে না। উইক এণ্ডে বাবাদের এই পার্টিগুলোও পিংকির অসহ্য লাগে। সবাই কিরকম গোল হয়ে বসে কলকল করে বাংলায় কথা বলে, হ্যা হ্যা করে হাসে, ভাত-মাংস-তরকারি খায়, মদ গেলে আর ওদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় অন্য একটা ঘরে। সে ঘরে এখানে মানুষ হওয়া ছেলে-মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলে, গল্প করে। পাশাপাশি যেন দুটো চিড়িয়াখানা। একটাতে ধেড়ে ধেড়ে দেশী ইঁদুর, অন্যদিকে দেশ থেকে আমেবিকায় ইম্‌পোর্টেড ও লালিত পালিত নেংটি ইঁদুর। এখানে মানুষ-হওয়া আবো অনেক ছেলেমেয়েদের থেকে পিংকির নিজেকে একটু আলাদা মনে হয়। দেশ বলতেই ওর অনেক কিছু মনে হয়—ঠাম্মা, দেব জ্যেঠু, দিদিভাই, হিজলি কিংবা সালুয়ার সেই ভাঙ্গা এয়ারপোর্ট। ওর বয়সী অনেক ছেলেমেয়েকে ও হিজলির গল্প করেছে। এরা বুঝতে পারে না। এদের কাছে ইন্ডিয়াটা ফানি কান্ট্রি। পিংকি বাংলা বলতে পারে সুন্দর। পড়তেও পারে কিন্তু লেখে না লজ্জায়। কারণ অনভ্যাসে নিজের লেখায় নিজেরই লজ্জা হয। আর, এত বানান ভুল। বাংলা কবিতাও পড়তে খুব ভালবাসে ও। এতদিন ওদের বাড়িতে শুধু একটাই বাংলা বই ছিল—সঞ্চয়িতা। পড়ে পড়ে সঞ্চয়িতা মুখস্থ হয়ে গেছে। অনেক কিছুর মানেও বুঝতে পারে না। কিন্তু পড়তে কি রকম গা শিরশির করে। কিছুদিন আগে শৈবাল কাকুর কাছ থেকে তিনটে কবিতার বই ধার নিয়েছে। দারুণ। একমাত্র শৈবাল কাকুকে ওর ভালো লাগে। শৈবালকাকু বাবার থেকে ছোট কিন্তু ওব থেকে অনেক বড়। শৈবালকাকু বোধহয় অনুপকাকুর বউ টিয়া কাকিমাকে ভালবাসে। ও জানে না। কিন্তু ওর মনে হয়। টিয়া কাকিমাকে পিংকি একটুও পছন্দ করে না। কেন —ও ঠিক বোঝাতে পারবে না।

দেবজ্যেঠুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে এক্ষুনি শান্তি পেতো পিংকি। বাবার

থেকে দেবজ্যেঠুকে পিংকি অনেক বেশি ভালবাসে। পিংকির জন্ম হয়েছিল খড়গাপুরের হিজলডাঙ্গায়। ওরফে হিজলি। ত্রিশের দশকে বৃটিশদের তৈরী হিজলি জেলের নাম অনেকেরই জানা। সে জেল আর নেই। পিংকির জন্মের অনেক আগে থেকেই সেখানে এখন বিরাট চত্বর জুড়ে আই· আই· টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। দেবজ্যেঠুর কাছে হিজলি জেল ও স্বদেশী আন্দোলনের গল্প অনেক শুনেছে পিংকি। চাঁদের চরকাবুড়ির চেয়ে সে গল্প অনেক ভাল। পিংকি হলফ করে বলতে পারে। মেদিনীপুরের গড়ঙ্গা গ্রামে দেবজ্যেঠুর বড় সাপ মারার গল্প কিংবা বৃটিশ ট্রাকে আগুন লাগাবার গল্প শুনলে এখানে অনেকেরই তাক লেগে যাবে।

দেবজ্যেঠু মানে দেবাশিস পাল। পরিচিত মহলে নামটা ছোট হয়ে দেবু পাল হয়েছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ চ্যাংড়া ছেলেপিলেরা মিঃ মোটু বলে ডাকে। অবশ্য দূর থেকে। পালমশাই-এর ওজনটা হিসেব করলে মোটু নামটা খুব একটা ব্যর্থ নয়। একমাথা কোঁকড়ানো কাঁচাপাকা চুল, ছ'ফুট উচ্চতা, সাড়ে তিন'শ পাউণ্ড ওজন—সব মিলিয়ে উপেক্ষা করা যায় না। পাল মশাই-এর গায়ের রঙ ওঁর বাবার মতো—সুলেখা ব্ল্যাক। ভবতোষ পালের ছিল ব্যবসা-অন্ত প্রাণ। অবশ্য ক্রমাগত ফেল মেরেছেন ব্যবসায়। ভবতোষের স্ত্রী হেমলতা বেশ সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। গয়নগাঁটি বেশ ভালই পেয়েছিলেন বিয়েতে। গয়নাগাঁটি বন্ধক রেখে নতুন নতুন একটা ব্যবসা শুরু করতেন আর কিছুদিনের মধ্যেই ফেল মারতেন। আসলে ব্যবসার চাবিকাঠি খুঁজতে খুঁজতে যৌবনটা কেটে গেল। বিক্রীর টাকা থেকে খরচ বাদ দিলে যে লাভ এই সহজ সত্যটাই উপলব্ধি হয়নি অনেকদিন। বিক্রীর পুরো টাকাটাই লাভ ভেবে খরচ করতেন—তাই আসলটা যে কোথা দিয়ে পালাত এ রহস্যের সমাধানটা জানা ছিল না ওঁর। বড় ছেলে স্নেহাশিসকে ক্লাস নাইনে স্কুল ছাড়িয়ে দিতে হল। হেমলতার গয়নাগাঁটি প্রায় সবটা গেছে তখন। কাঁথি শহরে পৈতৃক ভিটেটা ছাড়া সম্পত্তি বা আয় বলতে কিছু নেই। আত্মীয়স্বজনের কাছে একটু একটু ধার দেনা শুরু হয়েছে। এই সময় হেমলতার অনেক অনুনয়-অনুরোধে ভবতোষ সীমা পাইস হোটেলে পঁচিশ টাকা মাইনেতে কাজে ঢোকেন। ম্যানেজারের কাজ। দু'বেলা খাওয়ার খরচ নেই, এমন কি মাঝে মধ্যে স্নেহকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। স্নেহও দু'বেলা বাবার সঙ্গে হোটেলেই খেয়ে নেয়। দেবাশিস এখন কাঁথি স্কুলে ক্লাস থ্রীতে পড়ে। এই সময় একটা ঘটনায় ভবতোষের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এই ঘটনার নায়ক অবশ্য স্নেহাশিস।

পাইস হোটেলে ভবতোষের চাকবির পেছনে হেমলতার অনেকখানি হাত ছিল। হোটেলের মালিক শিবকুমার মল্লিক হেমলতার দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই। বাবাকে দিয়ে শিব জ্যাঠাকে বলিয়ে চাকরিটা হেমলতাই করিয়ে দিয়েছিলেন। শিবকুমারের বাড়িতে বেশ অদ্ভুতভাবে স্নেহাশিস ডেভিড ব্রেকব্রোর নজরে পড়ে গেল। ছোট মেয়ের বিয়েতে দু'জনে লালমুখো সাহেবকে নেমন্তন্ন করেছিলেন শিবকুমার। গান্ধীজির মতো শিবকুমার সাহেবদের অনেক কিছুই শ্রদ্ধা করতেন। ডেভিড ব্রেকব্রো রূপোর চিরুণী দিয়েছিলেন বিয়েতে। সাহেবদের পরিবেশন করার ভার পড়েছিল স্নেহাশিসের ওপর। শিবকুমার সাধ্যমত আদব কায়দায় সাহেবদের খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন কিন্তু সাহেব জেদ ধরল হাত দিয়ে খাবে। স্নেহাশিসের পনের বছরের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ডালে-ছ্যাঁচড়ায় মাখামাখি লালচে গোঁফের ফাঁক দিয়ে সাহেব স্নেহাশিসকে জিজ্ঞেস করলেন—'কি কর ?' একে সাহেব, তায় গোঁফ। কাজেই কিছু বুঝতে না পেরে স্নেহাশিস ভয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। ভালদাদু অর্থাৎ শিবকুমার বাঁচিয়ে দিলেন প্রথম যাত্রা। প্রথম প্রশ্নের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই দ্বিতীয় প্রশ্ন এসে পড়ল—'ব্যবসা করবে ?' পিঠে ভবতোষের আঙ্গুলের খোঁচা টের পেল স্নেহাশিস। ভবতোষ বিড় বিড় করে ছেলের কানে বলে দিলেন—'বল, ইয়েস স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' যন্ত্রচালিতের মতো কথাগুলো আবৃত্তি করে গেল স্নেহাশিস। স্নেহাশিসকে কলকাতার অফিসে এসে দেখা করতে বলে সাহেব শিবকুমারকে বোঝাতে লাগলেন কি করে দেশের ইয়ংম্যানদের ঠিক পথে চালিত করতে হয়, গান্ধীজির ওপর ওঁদের কতখানি ভরসা ইত্যাদি।

ব্রেকব্রোর কল্যাণে সিগারেটের এজেন্সিটা পেয়ে গেল স্নেহাশিস। শেষবারের মতো হেমলতার গয়না বন্ধক দিলেন ভবতোষ। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গুপ্তমন্ত্রে মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যেই স্নেহাশিস পাকা ব্যবসাদার হয়ে গেল। সুখ অনেকের ভাগ্যেই সহ্য হয় না। অবস্থা যখন বেশ সচ্ছল, তখন ভবতোষ ছেলের বিয়ে দিলেন বাইশ বছর বয়সে। তার মাস দুয়েক পরেই পর পর অনেক কিছু ঘটে গেল কাঁথি শহরে, মেদিনীপুরে। কলকাতায়, ভারতবর্ষেও একই সময় এরকম অনেক ঘটেছে। প্রথমত ভবতোষ হার্টফেল করে মারা গেলেন, ডেভিড ব্রেকব্রো দিবালোকে কাঁথি শহরে কন্‌ভয় শুদ্ধ আগুনে পুড়ে গেলেন। সে বছর, তার পরের বছর এবং তার পরের বছর মেদিনীপুরের তিনজন লালমুখো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি, ডগলাস ও বার্চ পর পর খুন হলেন। কে যে ডেভিড

ব্রেকব্রোকে মেরেছিল জানা যায়নি। কিন্তু, রাজদ্রোহিতার অপরাধে সুরজিৎ পাঠক বন্দী হলেন হিজলি জেলে। আর, চোদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ঢোকার আগেই দেবাশিস পাল বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। সেটা উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল। হিজলি জেল তৈরী হয়েছে একত্রিশ সালে। সেই জেলের চত্বরেই আই· আই· টি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে পঞ্চাশে। স্বাধীনতার অনেক পরে প্রায় চুয়ান্ন সাল নাগাদ দেবাশিস এখানে চাকরি নেন।

এখন যেটা মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং সেটাই ছিল জেল। সুরজিৎ পাঠকের নাকি ফাঁসি হয়েছিল উনিশশো আটত্রিশ সালে। দেবজ্যেঠুর কাছে গল্পগুলো শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিত পিংকির। শুধু ও নয়, দিদিভাই ও দেবজ্যেঠুর মেয়ে লালিদিও শুনত। প্রতিদিন নিয়ম করে পিস্তল ছুঁড়তেন, কিরকম করে রাস্তার মধ্যে বড় বড় গাছ ফেলে কন্‌ভয় আটকানো হত, তারপর কি করে গাড়ির ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে সব শুদ্ধু পুড়িয়ে মারা হত এ সব গল্প পিংকির মুখস্থ। আর, সম্ভবত এই কারণেই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজেব সাহেব প্রফেসরগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারত না ও। এই রাগটা পিংকির এখন আর নেই। দেবজ্যেঠুকে পিংকি অনেক কথা বলত, অনেক প্রাণের মনের কথা। আমেরিকায় আসার দিন দেবজ্যেঠুকে জড়িয়ে ধরে পিংকির সেকি হাউ হাউ করে কান্না। দেবজ্যেঠুও কাঁদছিলেন। ধেড়ে আট বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে বলেছিলেন—'মাঝে মধ্যে খোঁজখবর নিস্। গোরাদের দেশে গিয়ে এই কেলেজ্যেঠুকে যেন ভুলে যাস না।' কাউকে ভোলেনি পিংকি। দেবজ্যেঠুকে নয়, দিদিভাইকেও নয়। হিজলি তো নয়ই। তিনবছর আগেও হিজলি গিয়েছিল পিংকি। দেবজ্যেঠুরা সবাই কলকাতায় ছিলেন। দেখা হয়নি। আসার আগের দিন মেন বিল্ডিং-এর টাওয়ারে উঠেছিল ও। কেন উঠেছিল কে জানে।

ঠিক এক্ষুনি দেবজ্যেঠুর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করল ওর। ফোনবুকের শেষ পাতায় দেবজ্যেঠুর ফোন নাম্বারটা নিজের হাতে লিখে রেখেছিল ও। জিরো ডায়াল করে ইন্টারন্যাশনাল-কে চাইল। অপারেটর ফোন নাম্বারটা নিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল। প্রত্যেকবারই রেকর্ডেড কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল : 'উই আর সরি, ডিউ টু সার্কিট কন্‌জেসশন ইন দি কান্ট্রি দ্যাট ইউ ডায়াল্‌ড, ইয়োর কল ডিড নট কমপ্লিট। প্লিজ ট্রাই ইয়োর কল লেটার।' কন্‌জেসশন ব্যাপারটা পিংকি অনুভব করছে নিজের মধ্যেই। অন্তত দেবজ্যেঠুর সঙ্গে কথা বললে মনের ভাবটা কমত খানিকটা। এই যে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে সেটা বলতে পারত। আর এটাও বলতে পারত ও আর কোনদিন ফিরবে

না। কোথায় যাচ্ছে ও জানে না। সম্বল বলতে দিগি ব্যাঙ্কে জমানো আটানব্বই ডলার। দেবজ্যেঠুকে শুধু বলতে চেয়েছিল—জ্যেঠু, আই ওয়ান্ট টু বি মাইসেল্ফ।

আবার ফোন এল। জিন্‌স পরতে পরতে ফোনটা তুলল পিংকি। মা ফোন করছে। পিংকি উত্তর দিতেই রত্না খুব চিন্তিত স্বরে বললেন—'কে ফোন করছিল ? একটু আগে কোঁ-কোঁ করে আওয়াজ হচ্ছিল।'

পিংকি বলল—'কেউ না। পব পর অনেকগুলো রং নাম্বার হলো।'

রত্না যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—'আমরা একটু পরেই ফিরব। খিদে পেলে খেয়ে নিও। ফ্রীজে খাবার আছে।'

পিংকির কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবুও কোনরকমে বলল—'আচ্ছা।'

রত্না প্রশ্ন করলেন—'কি কবছ এখন ?'

পিংকি মনে মনে হাসল। বলল—'হোমওয়ার্ক'।

রত্না যেন আশ্বস্ত হলেন। বললেন—'ঠিক আছে, আমরা একটু পরেই যাচ্ছি।' রত্না ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

ভ্যানিটি ব্যাগে আটানব্বই ডলার পুরে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল পিংকি। একটু হাল্কা লাগছে এখন। অনেকদিন পর জেলখানা থেকে বেরোলে যেমন কেউ পেছন ফিরে তাকায় না, পিংকিও সেইরকম একবারও বাড়িটার দিকে ফিরে তাকালো না। এই জেলখানায় সে আর কোনদিন ফিরবে না। গন্তব্যস্থল জানা নেই ওর। কাজেই ও এলোমেলো অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে লাগল। বেশ জোরে জোবে হাওয়া দিচ্ছে এখন। গরম ভাবটাও নেই আর। বৃষ্টি হবে বোধহয়। দূরে একটা দোকানের কাছে বেশ কিছু ওরই বয়সী ছেলেমেয়ে জটলা করছে। একটু এগোতেই ওদেরকে চিনতে পারল পিংকি। ওদেরই স্কুলের একটা মেয়েকে ওখানে দেখতে পেল ও।

'হায় পিংকি। হোয়াট্‌স রং ? ইউ আর আউট অ্যাট দিস্‌ আওয়ার ?' জ্যানিস বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'চারটে ছেলেমেয়ে হো হো করে হেসে উঠল। পিংকিও হাসল। সত্যিই অবাক হবার কথা ওদের। একা একা বাড়ির বাইরে এত রাত্তিরে বেরোনোর হুকুম নেই ওর।

'আই কেম আউট ফর এ চেঞ্জ, টু ফিল দি ডিফারেন্স।' কথাটা বলতে বলতে পিংকি জ্যানিসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মারিউয়ানার গন্ধ পাচ্ছে ও। জ্যানিস একটা হাতে মোড়া সিগারেট এগিয়ে দিল ওকে—'ফিল দি ডিফারেন্স, ট্রাই ইউ।'

সিগারেট দু'চারটে খেয়েছে পিংকি কিন্তু মারিউয়ানা খায়নি কখনো। বাবার ভয়ে। আজ তো আর বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, আর বাবা কি ভাবল তাতেও ওর কিছু এসে যায় না। খানিকটা কৌতূহলের বশেই একটা সিগারেট নিয়ে নিল পিংকি। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটা লম্বা টান মারল সিগারেটে। কিরকম একটা অদ্ভুত আঁশটে আঁশটে গন্ধ এই ধোঁয়ায়। একটু কাশি হল। ওর কাশি দেখে জ্যানিস হেসে ফেলল—'ইনহেল ইট। ইউ উইল ফিল গ্রেট, আফটার এ ফিউ মিনিটস্।' জ্যানিসকে গুরুদেব সমঝে চোখ বুঁজে ধোঁয়াগুলো গিলে ফেলতে লাগল পিংকি। এখনো স্পষ্ট মনে আছে ও প্রথম সিগারেট খেয়েছিল সাত বছর বয়সে। একবার দেবজ্যেঠুর সাইকেলের পেছনে চেপে ও হিজলি থেকে সালুয়ার ভাঙ্গা এয়ারপোর্টে বেড়াতে গিয়েছিল। রাস্তার পাশেই এয়ারপোর্ট। একটা ভাঙ্গাচোরা রানওয়ে। প্লেনের দু'একটা ভাঙ্গাচোরা টুকরো। অন্ধকারে ঐ এয়ারপোর্টটায় গা ছমছম করছিল পিংকির। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই এয়ারপোর্টটা তৈরি হয়েছিল। সে সময় ব্যবহারও হয়েছিল কিছুদিন। তারপর অকেজো হয়েই পড়ে আছে এত বছর। একটু এগোলেই সুবর্ণরেখা নদী। দেবজ্যেঠু নাম দিয়েছিল পাগলী। বর্ষাকালে ফুলে-ফেঁপে এ নদী ভয়ংকর আর গরমকালে প্রায় পুরোটাই চর। সে সময় পায়ে হেঁটেই ওপারের সুবর্ণরেখা গ্রামে যাওয়া যায়। সেদিন দেবজ্যেঠুর সিগারেট খাওয়া দেখে পিংকির খুব লোভ হয়েছিল। একবার টেনে দেখতে চেয়েছিল। দেবজ্যেঠু হেসে বলেছিলেন: 'মেয়েরা কি সিগারেট খায়?'

'কেন খাবে না?' পিংকির মুখে চোখে অগাধ বিস্ময়।

কথাটার উত্তর না দিয়ে দেবজ্যেঠু সিগারেটটা হাতে দিয়ে বলেছিলেন: 'খেয়েই দেখ।'

একটা টান মেরে পিংকির মনে হয়েছিল ও মরেই যাবে। এত কাশি। কাশি থামলে জ্যেঠুকে বলেছিল—'তুমি কেন খাও?' কি বিচ্ছিরি।'

রাতে দিদিভাই ওর মুখে গন্ধ পেয়েছিল। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল—'কি খেয়েছিস রে?' পিংকি ভয়ে সাদা। কোন মতে বলল—'বাবাকে বলে দিবি না তো?'

দিদিভাই মুচকি হেসে পিংকির মুখটা নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলেছিল: 'পাগল!'

দিদিভাই-এর বুকে বোরোলিন আর পাউডার মিশে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোত। সব মিলিয়ে পিংকি দিদিভাইকে খুব ভালবাসত। ঠিক দেবজ্যেঠুর

মতো।

মাথাটা বেশ ঝিমঝিম করছে। ওপাশে একটু দূরে জ্যানিস একটা ছেলেকে চুমু খাচ্ছে। ছেলেটা মাঝে মাঝে জ্যানিসের বুকে হাত দিতে যাচ্ছে আর জ্যানিস হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলছে—'কাট ইট আউট।' অনেকক্ষণ ব্যাপারটা দেখতে দেখতে হাসি পেয়ে গেল ওর। ঠিক ভাঙ্গা গ্রামোফোন রেকর্ডে আটকে যাওয়া পিনের মতো। জ্যানিস বোধহয় এই ছেলেটাকে ভালবাসে। হয়ত, ও যেরকম জনকে ভালবাসে সেরকমই। জন গায়ে হাত দিলে ও রাগ করে না মোটেই। তাই বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জ্যানিসের মতো পারবে না ও। লজ্জার থেকেও ভয়টা পিংকির অনেক বেশি। এ ব্যাপারগুলো এ বয়সের ছেলেমেয়েদের একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এদেশে একটু খোলাখুলি। দেশে একটু লুকিয়ে চুরিয়ে। দিদিভাই নিশ্চয়ই ইন্দ্রদাকে ভালবাসত। সব সময় ইন্দ্রদার কথা বলত। অবশ্য, শুধু পিংকির কাছে। আর কারো কাছে ইন্দ্রদার কথা বলতে শোনেনি দিদিভাইকে। বাবা-মাকে সব কিছু লুকোত দিদিভাই। পিংকিও লুকোয়। ওর মনে হয় বাবার ভেতরে দু'রকমের মানুষ আছে। একরকম মানুষ এদেশের সব কিছু অন্ধের মতো নকল করে, সাদা সাহেব দেখলে গদ্‌গদ হয়ে কথা বলে, কালো দেখলে নাক কুঁচকোয় আর অন্যরকম, মানুষটা নিজের মেয়েকে 'সেক্রেড কাউ' করে রাখতে চায়, ছেলেদের সঙ্গে কথা বললে রেগে যায়। বাবার অধিকাংশ বন্ধুকেই দেখতে পারে না পিংকি। অনিমেষকাকু তো রীতিমত ডার্টি। কিছুদিন আগেই একটা পার্টিতে পিংকিকে একা পেয়ে আদরের অছিলায় সারা শরীরে হাত বুলোতে শুরু করেছিল। আর সেই মানুষটাই একটু পরে বাইরের ঘরে শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছিল—'এদেশের মেয়েদের সব চেয়ে যেটা আমি ঘৃণা করি সেটা হল আনফেইথফুলনেস।' কথাটা বলতে মুখ একটুও কাঁপেনি। বড়রাও মিথ্যে কথা বলে।

পিংকি হাঁটতে শুরু করল। পেছন থেকে জ্যানিস বলল—'হোয়্যার আর ইউ গোইং।'

পিংকি চলতে চলতে উত্তর দিল—'আই ডোন্ট নো। বাট আই অট টু গো।' হাঁটতে হাঁটতে পিংকি রুজভেল্ট স্টেশনের কাছে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণে ওর খেয়াল হল ও কোথায় যাবে জানে না। যেখানেই যাক আগে ম্যানহাটানে ওকে যেতেই হবে। তারপর পেন-স্টেশনে গিয়ে একটা ট্রেনে উঠে পড়বে ও। জনের জন্যে মন কেমন করছে একটু। ফোনে ওর সঙ্গে বড্ড খারাপ ব্যবহার করেছে। আর হয়ত কোনদিন দেখাই হবে না। রুজভেল্ট আর ব্রডওয়ের কোনায়

পাবলিক টেলিফোনে পয়সা ঢুকিয়ে জনের নম্বরটা ডায়াল করল পিংকি। একটি মেয়েলী আওয়াজ পেল পিংকি। জনের বোন বোধহয়। জন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন।

জন এসে ফোন ধরতে পিংকি বললো—'হাউ ইজ এভিরিথিং ?'

জনের গলায় এখনো উদ্বেগ : 'হোয়ার আর ইউ ?'

পিংকি হাসল : 'সাম হোয়্যার ইন দি ডার্ক।'

জন বেশ গম্ভীর হয়ে গেল : 'ডু ইউ লাভ মি ?'

পিংকি কি ভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারছে না। শুধু বলল—'ইয়েস, আই ডু। বাট...'

জন বাধা দিল—'নো বাটস, পিংকি, লেট মি কাম ওভার। আই নো ইউ আর নট হোম।'

পিংকি হাসল একটু—'আই নেভার হ্যাড এ হোম, ইট ডাজ নট ম্যাটার এনিমোর।'

জন বেশ চমকে গেছে—'হ্যোয়ার টু ?'

পিংকির কোন উত্তেজনা নেই : 'আই উইশ আই নিউ। আই উইল গো টু দি সিটি, রাইড দি স্টেট বেল্ডিং, মে বি। য়্যান্ড দেন আই উইল টেক এ ট্রেন।'

জন কিছু বলার আগেই পিংকি বাধা দিয়ে আবার বলল : 'আই লাভ ইউ জন।'

জন কোনও উত্তর দিল না। পিংকি আবার জনকে ডাকল। ওপাশে কেউ নেই। টেলিফোনে রেকর্ডেড কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'প্লিজ ডিপজিট ফাইভ সেন্টস ফর নেক্সট থ্রী মিনিটস।' পকেটে একটাও খুচরো পয়সা নেই আর। পিংকি ফোনটা নামিয়ে রেখে পা চালিয়ে স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

স্টেশনে লোকজন নেই বললেই চলে। সামনের বেঞ্চিতে একটা পুরো পরিবার। ইস্ট ইউরোপীয়ান বলে মনে হল পিংকির। দূরে বেঞ্চিতে একটা বুড়ি শুয়ে আছে। গায়ে একটা অসম্ভব ময়লা কোট। শনের দড়ির মতো চুল। বেঞ্চির নীচে একটা শপিংব্যাগে কিছু জিনিস। ব্যাগটা বোধহয় রাস্তা থেকে কুড়োনো। কাদা লেগে আছে অনেকটা। পিংকির মনে হল ওরই মতো বুড়িটার বোধহয় কোন বাড়ি নেই, কোথাও যাবার নেই, কিছু হারাবার ভয়ও নেই। স্টেশনে যাবে কিন্তু কোন ট্রেনে উঠবে না। খিদে পেলে খাবার খুঁজতে বেরোবে—আবার কোন স্টেশনে গিয়ে শুয়ে পড়বে। পিংকি মনে মনে ভাবল অনেকদিন পরে ও নিশ্চয়ই এই বুড়িটার মতো হয়ে যাবে। মাটির নীচে সাবওয়ে

স্টেশনের নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ট্রেন এসে পড়ল।

স্টেশনের মতো কামরাগুলোও ফাঁকা। হু হু করে ট্রেন পৌঁছে গেল ম্যানহাটানে। ট্রেন থেকে নেমে চোখ ধাঁধিয়ে গেল পিংকির;স্টেশনে গিজ গিজ কবছে মানুষ। হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে একটা নির্জন, নির্বান্ধব পুরী হঠাৎ মেলায় পরিণত হয়ে গেল। পিংকি অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল। রাত্তির ন'টার সময় ও চিরকাল শুয়ে পড়েছে। খুব বেশি হলে বাবাদের পার্টিতে গিয়ে আলাদা ঘরে বন্দী হয়ে থেকেছে। শহরের অন্যপ্রান্তের এত আলো এত মানুষ এত রাত্তিরে পিংকি কোনদিন দেখোন। ভীড়ে ধাক্কা খেতে খেতে পিংকি স্টেশনের বাইরে এল।

রাস্তাতেও ভীড। দোকানপাট সব বন্ধ। এলোমেলো প্রচুর মানুষ ঘুবে বেড়াচ্ছে। সাবি সারি নিয়নবাতির আলোয় শহরটা যেন হাসছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে লাল, হলুদ আলো দিয়ে সাজানো এম্পায়ার•স্টেট বিল্ডিং-এর চুড়োটা দেখতে পেল পিংকি। হাওয়ায় একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব এখন। মেঘে আকাশটাব মুখ লাল। পিংকির মনে হল এক্ষুনি বোধহয় বৃষ্টি হবে কিন্তু কোন মানুষের মুখে কোন উদ্বেগ নেই। বৃষ্টি হোক, ঝড় আসুক, মানুষগুলোর যেন কিছু এসে যায় না।

এই শহবটা ছেড়ে যাবার আগে স্টেট বিল্ডিং-এব মাথায় উঠবে পিংকি। বিল্ডিং-এর সামনের দরজা বন্ধ। পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে টিকিট কেটে এলিভেটব চেপে পিংকি হুস করে উঠে গেল ছাদে। ছোট্র ঘরটা থেকে বেরিয়ে রেলিং দিয়ে ঘেরা গোলবারান্দায় এসে দাঁড়াল ও। এ যেন রূপকথার রাজ্য। ওপবে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার, নীচে শুধু আলো আর আলো। আলোগুলো পেরোলোই নদীব কালো জল। কালো জল পেরিয়ে আবার আলো। নীচের দিকে তাকিয়ে আলোগুলোকে গুনতে থাকল পিংকি। না, আলো গুনছে না পিংকি। ও কিছু যেন খুঁজছে।

বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটা পিংকির মাথায় পড়ল। সেই অদ্ভুত অনুভূতি। কি সুন্দর এই শহর, কি সুন্দর এই পৃথিবী। নীচে সাপের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে থাকা রাস্তাগুলোতে, গাড়িগুলোকে দেশলাই—এর বাক্সের মতো দেখাচ্ছে, মানুষগুলোকে আর দেখা যায় না। এত উঁচুতে অস্তিত্ব সম্পর্কে বোধগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসে।

নীচের অসংখ্য আলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে পিংকি চীৎকার করে ডাকল—'দিদিভাই'। আলো আর অন্ধকারের মাঝখানের আকাশে শব্দটা হারিয়ে

গেল। দূরে নদীর বুকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। পিংকি আবার চীৎকার করে উঠল 'দিদিভাই'। আজ, এতক্ষণ পরে পিংকির চোখে জল এল। ও স্পষ্ট শুনতে পেল দিদিভাই বলছে—'ছিঁচকাদুনি নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা।' বৃষ্টি আর চোখের জলে পিংকির মুখটা ভেসে যাচ্ছে। পিংকি শেষবারের মতো মাটিকে ডাকল। চারপাশের অন্ধকার, আলো, জল, আকাশ থেকে মাটি কোন উত্তর দিল না।

পিংকির কাঁধে হাত রাখল কেউ। আই· আই· টির টাওয়ার থেকে নীচের শহরটা সবুজে সবুজ। দূরে পাগলী সুবর্ণরেখা। অন্যদিকে কাঁসাই। সালুয়ার ভাঙ্গা এয়ারপোর্টটা গাছগাছালিতে ঢাকা। ইন্দ্রনীল সান্যাল পালাচ্ছে কলকাতায়। লজ্জায় অপমানে প্রলয় ঘোষ কি করবে ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। পনের বছরের পোয়াতী মেয়েটা তখন টাওয়ারের ওপর থেকে নীচের পৃথিবীকে দেখছিল। এত ঐশ্বর্য তোর বুকে তবু তুই কৃপণ কেন ? এত নদী, এত পাহাড়, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বাতাস তবু এত বঞ্চনা কেন ? নীল নদের পাখী যেমন রাজপুত্তুরকে জিজ্ঞেস করেছিল তেমনি পিংকিও প্রশ্ন করল—'হোয়াই ? পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন ?'

পেছন থেকে জন বলল—'লেট্স গো, ইট্স রেনিং।'

পিংকি বলল—'যাক, ধুয়ে যাক। লেট ইট রেন।'

তোলপাড় বৃষ্টিতে সারা শহর, শহরের আলো, শহরের অন্ধকাব, নদীর বিষাক্ত জল, সব ধুয়ে যাচ্ছে। বোধহয় কাউকে ছোঁবে বলেই মাটি রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টির দিকে হাত বাড়াল।

নগদ সাত'শ ডলারে কেনা ভক্সওয়াগন গাডিটা পুরোপুরি থেমে যাবার আগে শুধু একবার গরগর করে আওয়াজ করল। এ আওয়াজে কোন জোর নেই—নেমন্তন্ন খেয়ে বেরোবার আগে যেন গৃহস্বামীকে শান্তভাবে বলা—'গেলাম'। কোন লাভ নেই জেনেও দু'চারবার ইগ্নিশন কি'টাকে নিয়ে কসরৎ করতে ছাড়ল না অনুপ। বাইরে—ভেতরে প্রায় অন্ধকারের মধ্যে ড্যাস্বোর্ডে অল্টারনেটারের লাল আলোটা জ্বলে রইল নিঃশব্দে।

থেমে যাওয়ার আগেই গাড়িটাকে কোনক্রমে ডানদিকে ছোট্ট ঢিপির মত জায়গাটাতে তুলে ফেলেছিল অনুপ। না হলে যে কি বিরাট দুর্ঘটনা হতে পারত এ কথা ভেবে টিয়ার বুকটা এখনো কাঁপছে। আচমকা থুতনিটা ড্যাসবোর্ড ঠুকে চটচট করছে জিভটা। বোধহয় রক্তে। খুব বেশি না কাটলেও রক্তের স্বাদ টিয়া একদম সহ্য করতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই এই রকম। ডানদিকের

দরজাটা খুলে টিয়া থু থু করে রক্ত ফেলল ঘাসে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে রুমাল বার করে ঠোঁটের রক্ত ও লিপস্টিক পরিপাটি করে মুছে ফেলল ও। বুকটা এখনও কাঁপছে।

'খুব লেগেছে?' অনুপ সামনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'না।'

'সত্যি কথা বল।'

'মরে যাবার মত নয়।'

'সব তাতেই হেঁয়ালী আমার ভাল লাগে না।' খুব রেগে গিয়ে স্টিয়ারিংটাতেই সজোরে ঘুষি মারে অনুপ।

টিয়া উত্তব দিল না। মুখে কিছু না বললেও টিয়া মনে মনে ভাবল, যন্ত্রণার মুহূর্তগুলো পুরোপুরি আমার। ভাগ করা যায় না। এ তুমি বুঝবে না।

দরজা খুলে ভক্সওয়াগনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল অনুপ। বিপদ-সংকেতের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে টিয়া ওপরে আয়নার দিকে তাকাল। ঠোঁটের নীচে এখনো একটু বক্ত লেগে আছে। পাশেই অনুপেব মুখ। বাইরেব প্রায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-থাকা অনুপের মুখটা বিপদ সংকেতের আলোয় জ্বলছে নিভছে। এই আছে, এই নেই।

বেল্ট পার্কওয়ের ওপর তীব্র গতিতে গাড়িগুলো দৌড়চ্ছে পূবে-পশ্চিমে। একটু দূরেই ঝকঝকে ন্যারোজ ব্রিজ ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর। জিভটায় এখনও একটা আড়ষ্ট ব্যথা। টিয়া মনে মনে ভাবল—এব থেকে অনেক বেশি ব্যথা অন্য জায়গায়, যে যন্ত্রণার কথা কাউকে বোঝানো যায় না, ধরাছোঁয়া যায় না, হাত বোলানো যায় না—এই যন্ত্রণাগুলোকে বড় ভয় করে। ক্যান্সারের মত ধীবে অথচ নিশ্চিতভাবেই এরা বোধহয় রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। কেন এমন হয়। চাব বছর আগে যে মানুষটাকে মনে হত অনেকদিনের চেনা, আজকাল তার দিকে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকায় টিয়া। অনুপ এতটুকু বদলায়নি। অথচ, গত চার বছরে টিয়া নিষ্ঠুরভাবে বদলেছে। নতুন টিয়া এখন নতুন ভাষায় কথা বলে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে অনুপও তাকায়। কপালে হাত রাখে। বোধহয় ছুঁয়ে দেখতে চায় পুরোনো মানুষটাকে। অনুপকে দেখে টিয়ার হাসি পায়, কান্নাও। অনুপের দুঃখগুলোকে টিয়া যে কোন সময় হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে। অনুপ কাঁদে, হাসে কিন্তু বদলায় না। আর, বদলায় না বলেই দূরত্বটা বাড়তেই থাকে। এখন শুধু একটা ছাদের নীচে, একসঙ্গে থাকে দুটো অচেনা মানুষ। স্বামী-স্ত্রী।

'গাড়িটা একটু স্টার্ট করার চেষ্টা কর।' পাশেই জানলার বাইরে অনুপ।

'চাবি ?'

'লাগানোই আছে।' স্পষ্টতঃই অনুপের গলায় বিরক্তি।

ইগ্‌নিশন কি'টা ঘুরিয়ে অ্যাক্সিলেরেটারে পা দিল টিয়া। শিয়ালের মত খ্যাঁক-খ্যাঁক করে একটা আওয়াজ হল। স্টার্ট হবে না জেনেও খ্যাঁকখেঁকে আওয়াজটা করতে লাগল ও। খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই।

'থামাও। কারবুটার ওভার ফ্লো করে যাবে।' অনুপ চীৎকার করে উঠল।

তারপর, ছুটে জানলার কাছে এসে গজ গজ করে উঠল—'এটা গাড়ি, খেলা করার জিনিস নয়।'

টিয়া আবার চুপ। শুধু মনে মনে বলল—'এটাও আমার জীবন, তোমার খেলা করার জিনিস নয়।'

খেলা করার কথায় পরশু রাত্তিরের ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে টিয়ার বেশ দেরী হয়েছে সেদিন। প্রায় সাড়ে সাতটা। অনুপ শুয়েছিল বিছানায়। জুতোটা ছেড়ে টিয়া বাথরুমের দিকে যাবে—অনুপ বলে উঠল হঠাৎ, 'এত দেরী যে!'

'কাজ ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপ বলল—'কাজটা ছেড়ে দিলেই তো হয়।'

'হ্যাঁ, তা হয়। কিন্তু, টাকাটা আমারও দরকার।'

'আমি দেব।'

টিয়া উত্তর না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। বেরোতে না বেরোতেই অনুপ বলল, 'তুমি অনেক বদলে গেছ।'

'তাই ?' টিয়া অবাক হবার ভান করল।

'তুমি আগে কত হাসিখুসি ছিলে। কত প্রাণ ছিল তোমার! তুমি বড্ড বদলে যাচ্ছ।'

'তুমিও বদলাও। কেউ তো বারণ করেনি।'

'ইমপসিব্‌ল'—অনুপ যেন আর্তনাদ করে উঠল। চোখ ছলছল দেখেই টিয়া বুঝতে পেরেছিল অনুপ এবার রেগে যাবে ও কেঁদে ফেলবে। টিয়ার শাশুড়ী বলেছিলেন—'ছোটবেলা থেকেই অনুপটা এই রকম। রাগলেই কেঁদে ফেলে। রেগে গেলে নাকি ছোটবেলায় অনুপ পা ছড়িয়ে কাঁদত। টিয়া অনুপের কাছে গিয়ে বসল। অনুপের মাথাটা নিজের কোলে নিল। অনুপ ডান হাতে আস্তে আস্তে টিয়ার জামাটা খুলল। ভেতরের জামার হুকটা টিয়া নিজেই খুলেছে।

তারপর নগ্ন উষ্ণতাটুকু পুরোপুরি শুষে নিতে নিতে অনুপ বলেছে,'তুমি ভাল না বাসলে আমি পাগল হয়ে যাব।' এক বুকে মাথা, আর অন্য বুকে হাত রেখে অনুপ ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুর মত। ঘুমন্ত অনুপের দিকে তাকিয়ে টিয়া বলেছে—'তুমি নয়। পাগল হব আমি।' যে শিশু বাড়ে না, তাকে নিয়ে মার যেমন চিন্তা, অনুপ সম্পর্কে টিয়ার দুশ্চিন্তা অনেকটা সেইরকম। ও যেন দামাল ছেলে। খেলা করবে, হাসবে, কাঁদবে। আর, পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেই বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বে। দূর থেকে অনুপের গলা ভেসে এল আবার : 'স্ক্রু-ড্রাইভারটা দেবে ?'

চেস্ট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে হাত বাড়িয়ে অনুপকে দিল টিয়া। দরজাটা খুলে অনুপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'কিছু বুঝছ ?'

অনুপ বলল, 'না, বুড়ো হয়েছে ত, সব কিছু আস্তে আস্তে যাচ্ছে।'

'কি করবে ?'

'জানি না। আরেকটু খুটখাট করি। তারপর ভাবব।'

'জায়গাটা ভাল নয়।'

'কিছু করার নেই। গাড়ি পছন্দমত জায়গায় খারাপ হয় না। তুমি ভেতরে গিয়ে বস।' অনুপের গলায় ঝাঁঝ এখনো যায়নি।

'কোথাও থেকে ফোন করা যায় না ?'

'এখানে কোন ফোন নেই।' মুখ না তুলেই উত্তর দিল অনুপ। এখানে কোন আলো নেই। গাড়ির হেডলাইটে যতটুকু আলো হয়েছে ঐটুকুই।

টিয়া অনুপের দিকে তাকিয়ে। বেশ দেখাচ্ছে ওকে। লম্বা চুলের একগোছা কপালের ওপর পড়েছে। ইঁট রঙের জামা পড়েছে একটা। প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম যেদিন আলাপ হয়েছিল ঠিক সেই রকম। কিরকম একটা কাঁদো কাঁদো মিষ্টি ভাব। কফি হাউসে আলাপ করিয়ে দিল প্রণব—'আমার বন্ধু, অনুপ দত্ত। তোকে খুব ভালবাসে।'

সেদিনও কপালের ওপর একগোছা চুল। মুখে সিগারেট। অনুপ একটু হেসে বলল, 'নমস্কার।'

টিয়া একটু হেসেছিল, 'নমস্কার।' আমি কিন্তু পাজী মেয়ে।'

মুখ-চোখে একরাশ অন্ধকার নিয়ে অনুপ বলেছে—'তাই নাকি। বিশ্বাস হয় না কিন্তু।'

ঠাট্টা করে ব্যাপারটাকে সহজ করে দিল প্রণব : 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু…। যাকগে ওসব তত্ত্বকথা ছাড়। সিনেমা যাবি তো চল। আমি সিনেমা দেখব,তোরা

একটু গুজগুজ করে প্রেম করতে পারিস।'

অনুপের মুখ চোখ রীতিমতো লাল। অনুপের দিকে এক পলক তাকিয়ে প্রণব আবার বলল, 'লজ্জায় রাঙা-বৌ বনে গেলি যে। এদিকে তো ছুপে রুস্তম।'

প্রণবটা খুব অসভ্য। টিয়া বলল : 'মুখটাকে একটু ভালো কর্।'

প্রণব বলল : 'তুই ভার নিলে এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমার ঢাক-ঢাক গুরগুর নেই। আমার পলিসি হচ্ছে—দেখলে সুন্দরী মেয়ে, হাঁ করে দেখ চেয়ে।'

হাসতে হাসতে টিয়া জবাব দিল : 'বেশি হাঁ করিস না, মেয়ের বদলে মাছি ঢুকে যাবে।'

সেদিন অনুপ ওদের সঙ্গে সিনেমা যায়নি। কিন্তু তিনদিন পরেই বাড়িতে ফোন করে বলেছে—'কি করে নম্বর পেয়েছি জিজ্ঞাসা করবেন না। আজকে আসবেন কফি হাউসে?'

থটরিডিং কিংবা টেলিপ্যাথি কিনা জানা নেই কিন্তু টিয়া জানত অনুপ ওকে ফোন করবেই। টিয়া বলেছিল—'বৃহস্পতিবার হলে ভাল হয়। যে ক্লাশগুলো আছে ওগুলো কাটা যায়।'

ভালোবাসা, প্রেম, বিশ্বাস এই শব্দগুলো এত জীর্ণ যে ব্যবহার করতে মায়া হয় ওর। অথচ, কিছুদিন আগেও এই কথাগুলো শুনলে বুক কাঁপত। মুখ চোখ লাল হয়ে যেত। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ত। পাঁচ বছর আগে অনুপকে টিয়া কারণে-অকারণে বহুবার জিজ্ঞাসা করত—'সত্যি করে বল তো, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস?'

অনুপ আকাশের দিকে তাকাতো—অর্থাৎ আকাশের মত। আকাশের মত কাউকে কি ভালবাসা যায়? তখন ভাবেনি। আজ, পাঁচ বছর পর এইসব হিজিবিজি অনেক রকম মনে হয়।

অনুপ বলত : 'বিশ্বাস না হয় প্রমাণ দিতে পারি!'

টিয়া অবাক হয়ে অনুপের মুখে কি যেন খুঁজত। প্রমাণ দেবার ঝোঁকে অনুপ টিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। একবার দু'বার—অনেকবার। প্রমাণের কথা টিয়া ভুলে যেত তখন।

এখন টিয়ার মনে হয় ভালবাসা নামে একটা অর্থহীন শব্দকে ও এতকাল ভালবেসেছে। কত তাড়াতাড়ি সব কিছু বদলে যায়। অন্তত নিজের সম্পর্কে এ কথাটা ওর ভাবনায় বার বার ধরা পড়ে। এদেশে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল আছে।

বাইরের বোঝাও বেশি, ভেতরের বোঝাও। কাউকে বলতে পারলে হয়ত বা হাল্কা হওয়া যেত। হয়ত বা শৈবালকে বলা যায়। মাত্র এক মাসের আলাপে শৈবালকে ওর যত আপন মনে হয় আর কাউকে অতটা নয়। শৈবাল কি ভাবে কে জানে! শৈবাল খুব সুন্দর কথা বলেছিল : 'সবাই বদলায়। কে কোনদিকে কতটা বদলাবে সেটাই বড় কথা। আমেরিকায় এসেছি বলেই বদলাতে হবে তার কোন মানে নেই। দেশে থাকলেও মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়। মুখোশটা শুধু একই রকম থাকে—হয়ত বা সামাজিক চাপে।'

টিয়া অবাক হয় : 'কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ?'

শৈবাল হাসে : 'বোঝা শক্ত। মুখোশটা অভ্যেস হয়ে গেলে মুখটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। তবে সব কিছুরই দাম দিতে হয় আমাদের। বদলানোর অথবা না-বদলানোর।'

টিয়া বলে : 'আপনি তো অনেক কথা বলতে পারেন। লোক দেখলে গুটিয়ে যান কেন? বোবার মত এক কোণে বসে মদ গেলেন।'

'বোবারা অনেক কিছু দেখতে পায়। যারা বেশি কথা বলে তারা পায় না। তবে আপনার ক্ষেত্রে আলাদা। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারি।'

'আসুন না একদিন।'

'আড়ালে না প্রকাশ্যে?'

'আড়ালেই আসুন। পার্টিতে আপনাকে বলবো কি সুবাদে?'

'কি খাওয়াবেন বলুন?'

'আপনি কি পেটসর্বস্ব?' খিল খিল করে হেসে উঠল টিয়া।

'শরীরটাকে অস্বীকার করি কি করে? শরীরটা নিয়েই তো আমি। কবে যাব?'

একটু চুপ করে থেকে টিয়া বলল : 'সোমবার আসুন। কাজ থেকে ছুটি নিতে পারবেন?'

'মাঝে মধ্যে অসুস্থ হলে কোন ক্ষতি নেই। স্বাস্থ্য ভাল থাকে।'

তারপর, টিয়ার জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ঘটে গেছে বললে ভুল হবে—বলা উচিত তছনচ হয়ে গেছে।

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অনুপ : 'ইম্‌পসিব্‌ল। দরজা বন্ধ করেছ কেন?'

টিয়া তাড়াতাড়ি বাঁদিকের দরজাটা খুলে দিল। একদম মনে নেই কখন গাড়ির দরজাটা ও ভেতর থেকে লক করে দিয়েছে।

অনুপ গাড়িটা স্টার্ট দিল আবার। আর্তনাদ করে স্টার্ট হয়ে গেল ভক্সওয়াগন। অনুপ যেন খুশি হল খুব। আপন মনে বলে উঠল : 'সাবাস বেটা। ব্যাঙ বাবাজী বাঘের বাচ্চা। যুগ যুগ জিও।' টিয়ার খুব হাসি পেল। ভক্সওয়াগন বিট্‌ল সত্যিই ব্যাঙের মত।

দেখতে দেখতে ন্যারোজ ব্রিজে পৌঁছে গেল ওরা। ব্রিজ পেরোলেই স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড। বর্ডার টাউন। অর্থাৎ এদিকে এটাই নিউইয়র্কের শেষ অঞ্চল। এর পরই শুরু হয়েছে নিউ-জার্সি। সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য। কাজের খাতিরে যারা যাতায়াত করে তাদের কথা আলাদা—কিন্তু এমনিতে এই দুই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি প্রায় নেই বললেই চলে। ম্যানহাটনেব নাম শুনলে নিউ-জার্সীর লোকেরা ভিরমি খায়—আবার ম্যানহাটানের লোকদের নিউ-জার্সী যেতে বললে মুখখানা শুকিয়ে কাঠ—যেন এইমাত্র আন্দামানে বনবাসের আজ্ঞা দেওয়া হল। অনুপের অবশ্য কিছু এসে যায় না। লোক ছাড়া অনুপ থাকতে পারে না। ইদানীং জুটেছে নীলাদ্রি ব্যানার্জী। টিয়াকেও আসতে হয় সঙ্গে। নাহলেই অনুপের চোখে জল এসে যাবে হয়ত।

নীলাদ্রি ব্যানার্জী লোক খারাপ নয় মোটেই। বরঞ্চ আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের চেয়ে নীলাদ্রিদাকে টিয়ার অনেক আলাদা মনে হয়। অনেক কিছু নিয়ে ভাবেন। কোনরকমে বেঁচে থাকার দলে উনি মোটেই নন। ওঁদের মধ্যে একটা উষ্ণতা আছে যেটা টিয়া এখানে অনেকের মধ্যেই পায়নি। মাঝে মাঝেই ফোন করে তলব করেন : 'কি করছ হে ! চলে এস। বনানী মাগুর মাছ রান্না করেছে আজ।' মাগুর মানে মাগুরের জাত—ক্যাট ফিস। অনুপের কাছে নীলাদ্রিদা যেন পায়েড পাইপার। বাঁশী শুনলেই পড়ি কি মরি করে অনুপ ব্যাঙ বাবাজী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। টিয়াকেও সঙ্গে যেতে হয়। ভাল লাগুক ছাই না লাগুক। টিয়ার একটা আলাদা সত্তা আছে বলে মনে করে না বোধহয় অনুপ। অবশ্য, আজকের কথা আলাদা। আজ টিয়ার ভালই লাগছে। মনটাও ভাল ছিল। অন্তত গাড়িটা খারাপ হবার আগে পর্যন্ত।

বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ পেল টিয়া। গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ের ওপর দিয়ে ব্যাঙবাবাজী লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে। এটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল বেল্ট। কলকারখানায় ভর্তি ; কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিই বেশি। কেমিক্যাল কারখানাগুলো থেকেই এখানকার বাতাসে সব সময়ই একটা উৎকট গন্ধ।

'জানলাটা বন্ধ করে দেবে ?'—অনুপের কণ্ঠস্বরে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব। টিয়া কাঁচটা তুলে দিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'শৈবালকে তোমার কিরকম লাগে ?'—অনুপের প্রশ্নে চমকে উঠল টিয়া।

'কে শৈবাল ?' টিয়া অবাক হতে চেষ্টা কবল।

'শৈবাল বাগচি।'

'ও হ্যাঁ। কেন বল ত ?' টিযার বুকটা কাঁপতে শুরু কবেছে আবার।

'কোন কারণ নেই। এমনি প্রশ্ন করলাম।' অন্ধকারের মধ্যে অনুপ স্থির দৃষ্টিতে টিয়ার দিকে তাকাল।

'কি জানি। ভেবে দেখিনি।' টিয়া সহজ হবার চেষ্টা করল আপ্রাণ।

'নীলাদ্রিদার বাড়ি পৌঁছতে এখনো অনেক দেবী। ভেবে দেখ-না একটু।'—অনুপ মুচকি মুচকি হাসছে।

'কিরকম জানি না। বাইরে থেকে কিন্তু মনে হয খুব আনসোশ্যাল।' টিয়া ঢোঁক গিলল।

'না, খুব আনসোশ্যাল কিন্তু নয়'—অনুপ এবার খানিকটা সহজ হল—'ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাকে বলতে। পরশুদিন আমার সঙ্গে দেখা হোল ম্যানহাটানে। আমাকে দেখেই অন্যদিকে তাকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল—আমিই ডাকলাম।'

'তারপর'—বিরাট একটা বোমা যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে টিয়ার বুক থেকে।

'তারপর আর কি। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা দিলাম একটা কফি শপে। বেশ মজার মজার কথা বলেন কিন্তু। ভাবছি বাড়িতে বলব একদিন।'

'না, বাড়িতে নয়।' নিজের অজান্তেই কথাগুলো বেবিয়ে গেল মুখ দিয়ে—'চিনি না, জানি না।'

'বাড়িতে নয় কেন ?' অনুপ অবাক হল।

'সরি ! তোমার ভাল লাগলে বল।' ইচ্ছে করে কৃত্রিম হবার চেষ্টা করল টিয়া। যাকে টিয়া অনেক বেশি চেনে বলে বিশ্বাস করে, অনুপের সামনে তাকে নতুন করে চিনতে কষ্ট হবে ওর—। এ কথাটা অনুপকে বোঝানো যায় না। টিয়ার মনে হল এক্ষুনি অনুপের মুখটা চাপা দিয়ে বলে—'এ প্রশ্ন আর নয়। এর চেয়ে বেশি তোমার আর জানা উচিত নয়।' এসব না বলে টিয়া শুধু বলল—'কুমারেশদাদের যেদিন বলছ সেদিনই বল।'

অনুপ এ কথার কোন উত্তর দিল না।

মাঝে মধ্যে কয়েকটা ব্যাপার টিয়াকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। কলকাতায় ওদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দু' বছরের সঙ্গে তার পরের অর্থাৎ এখানকার

তিন বছরের কোন সম্পর্ক নেই। কলকাতায় থাকতে ওর অনুপকে ভালই লাগত। বিয়েও হয়েছিল মেলামেশা করে। বিয়ের আগে অনেকবার ভেবে দেখেছে টিয়া। এখানে আসার পর কি যে হল! দূরত্বটা বেড়েই চলল ক্রমশ। অবশ্য, এ সম্পর্কে শৈবালের কথাটাই হয়ত ঠিক। শৈবাল বলেছিল : 'একটা পাহাড়ের আড়ালে অনুপ লুকিয়েছিল অনেকদিন। পাহাড়ের আড়াল আর নেই। জীবন, সংসার, পড়াশুনো, চাকরি আর তোমার মতো এরকম বেখাপ্পা মেয়ের পাল্লায় পরে দিশেহারা হয়ে গেছে অনুপ।'

'আমি বেখাপ্পা কেন?'

'কারণ, তুমি আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মত অল্পে সন্তুষ্ট নও।'

'কলকাতায় খুশি ছিলাম কেন?'

'কলকাতায় তুমি ছিলে জেলখানায়। তাই জানালা দিয়ে আকাশটা দেখেই তোমার মনটা ভরে যেত। জানালার বাইরে যাবার কথা ভাবইনি কোনদিন। আর, এখানে আকাশটা তোমার মুঠোর মধ্যে। তাই বাইরে থেকে জেলখানায় ঢুকতে তুমি আর চাইছ না।'

'অনুপের জন্যে কষ্ট হয় খুব।'

"ওটা অভ্যেস। অনেকটা সিগারেটের মত। তুমি ছাডতে চাও। কিন্তু ছাড়তে কষ্ট হয়।'

এ কথাগুলো হয়েছে অনেক পরে। বাকি সব কিছু স্পষ্ট মনে আছে এখনো। কথামতো শৈবাল এসেছিল। অনুপ তখন ক্যানাডায়। দরজার ভেতর থেকে টিয়া প্রশ্ন করল : 'হু ইজ ইট?'

শৈবাল বলল : 'দস্যু।'

টিয়া দরজাটা খুলে হেসেছে। বলেছে—'আসুন।'

শৈবাল ঢুকতে ঢুকতে বলল—'দস্যু জেনেও বুক কাঁপল না একটু।'

টিয়া এবারে গম্ভীর : 'সজ্জন অনেক দেখেছি। দস্যুই ভাল লাগে আজকাল।'

টিয়াদের অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরে ঘুবে দেখছিল শৈবাল।

'কি দেখছেন?'

'ঘর আর ঘরণী দুজনকেই।'

'ঘরটা তো মামুলি। ঘরণী লক্ষ্মীছাড়া।'

'কে বলল লক্ষ্মী মেয়ে আমার ভাল লাগে।'

'ক' চামচ চিনি দেব চায়ে?' কথা ঘোরাতে চেষ্টা করল টিয়া।

কথা না বলে টিয়ার পেছনে এসে দাঁড়াল শৈবাল। টিয়ার বুক কাঁপছিল। ঘাড়ের ওপর শৈবালের উষ্ণ নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে ও।

শৈবাল খুব আস্তে বলল : 'আমার খুব ছুঁতে ইচ্ছে করছে। আজ, এক্ষুনি।'

অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলেও টিয়া আর পালাতে পারবে না। শৈবাল যেন ওর মনের কথাটাই বলল : 'এখনো সময় আছে। পালাতে চাইলে পালাও।'

টিয়া ঘুরে দাঁড়াল : 'নিজের কাছ থেকে পালানো যায় না। ছুঁয়ে দেখুন।'

ছুঁয়ে দেখেছে। নগ্ন টিয়াকে শৈবাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছে। পাশেই শুয়ে থাকা টিয়াকে দেয়ালের আয়নায় চুরি করে দেখেছে। টিয়ার পিঠ ভর্তি পদ্মকাঁটা। শৈবালের হাত ভর্তি টিয়ার বুক। টিয়ার কপালের টিপ অনেকটাই এখন শৈবালের গালে। দুজনেই সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে শুয়েছিল। দু'জনেই হাঁপিয়ে গেছে। নিস্তব্ধ ঘরে দুজনের নিঃশ্বাসের আওয়াজে। টিয়াই প্রথম কথা বলছে—'তুমি মিথ্যুক নও।'

শৈবাল প্রশ্ন করেছে—'কেন ?'

'তুমি একবারও বলনি তুমি আমাকে ভীষণ ভালবাস—পাগলের মতো ভালবাস কিংবা আমাকে ছাড়া তুমি মরে যাবে।'

শৈবাল একটুও হাসেনি। শৈবাল বোধহয় জানে টিয়া কি বলবে। ঠিক এরকম সময় টিয়া বলেছে—'অনুপের থেকে আমি এতদূরে চলে এলাম কেন ?' শৈবাল তখন পাহাড়ের গল্প বলেছে।

'পঁচিশ সেন্ট আছে ? টোল দিতে হবে।' অনুপের কথায় জেগে উঠল টিয়া। টোলবুথ এসে গেছে। ঝাঁকড়া মাথা একটা কালো মেয়ে রয়েছে টোলবুথে। টিয়া ব্যাগ থেকে খুচরো বের করল।

টোলবুথ পেরিয়ে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। পশ্চিমে আরো মাইল সাতেক যেতে হবে। নিউ-জার্সীতে আসতে এই কারণেই বড্ড বিরক্তি লাগে টিয়ার। চলেছে তো চলেছে। প্রায় সত্তর মাইল রাস্তা। আজকে অবশ্য গাড়িটা খারাপ হয়েই বিপদটা হল। ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজে। অর্থাৎ প্রায় আড়াই ঘণ্টা হয়ে গেল। চোখ বুজে সীটে মাথাটা হেলিয়ে দিল ও।

অনুপ ইংরিজী গান গাইছে গুনগুন করে—'রেনড্রপস কিপ ফলিং অন মাই হেড।' টিয়ার হাসি পেল। একটানা গাড়ি চালাতে অনুপের খুব খারাপ লাগছে বোধহয়। টিয়া আগেও দেখেছে একঘেয়ে লাগলে বা রেগে গেলে অনুপ গুনগুন

করে গান গায়। অনেকটা পদ্য আবৃত্তির মত। টিয়ার শাশুড়ী খুব সুন্দর গান করেন। বাড়িতে ওস্তাদ আসত। কিন্তু ওঁকে বাইরে কোনদিন গান গাইতে দেননি শ্বশুর। বলতেন—'বাড়ির গান গাইবে কি ?' টিয়া যখন এখানে একটা ইনসিউরান্স কোম্পানীতে কাজ নিল, ওর শ্বশুর খুশি হননি মোটেই। অনুপকে লিখেছিলেন : 'বৌমা চাকরি করুক এটা আমার পছন্দ নয়। তোমার ঠাকুর্দা বলতেন বাইরে কাজ করলে বউ পর হয়ে যায়। অবশ্য প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। তাহলেও বেশিদিন না করাই ভাল। তাছাড়া তোমার মা নাতির জন্য বড় উৎসুক।'

টিয়া মনে মনে ভাবল—চাকরি করতে কারই বা ভাল লাগে। অনুপ এমন কিছু রোজগার করে না। আর, যতই রোজগার করুক সামান্য হাতখরচের টাকাটাও প্রত্যেক সময় বরের কাছে চাইতে লজ্জা করে। বিয়ের আগে বাবার কাছে চাইতে পারত। এখন সেখানেও সংকোচ হয়। তাছাড়া, দেশে চাকরি করার হাজার রকমের ঝামেলা। এখানে, বিশেষ করে ছেলেমেয়ে না থাকলে, চাকরিটা অতটা হাঙ্গামা কিছু নয়। সময়ও কেটে যায়, আবার টুকটাক জিনিসের জন্য কারও কাছে হাতও পাততে হয় না। মাত্র দেড় বছর কাজ করেই টিয়া ওর ব্যাঙ্কে প্রায় ন'হাজার ডলার জমিয়ে ফেলেছে। সম্পূর্ণ ওর নিজের রোজগার করা টাকা। কারো দয়ার দান নয়। আর, এদেশে কে কি চাকরি করছে না করছে কারো কিছু এসে যায় না। সব কিছুরই বেশ একটা গালভরা নাম—সব কিছুর শেষেই একটা ম্যানেজমেন্ট লাগিয়ে দিলেই হল। দারোয়ানী হল সিকিওরিটি ম্যানেজমেন্ট, রেষ্টুরেন্টের বেয়ারাগিরিকে বলা যায় হোটেল-মোটেল ম্যানেজমেন্ট, বাগানের মালীর নাম লন ডক্টর। আমাদের দেশের কত কোয়ালিফায়েড ছেলে এখানে এসে কাজ না পেয়ে সিকিওরিটি ম্যানেজার হয়ে যায়। রোজগারপাতি মন্দ না। খেয়ে পরে ভাল আছে নিশ্চয়ই। এখানে কেউ কারো পরোয়া করে না। দেশে বাবা-মা জানতে পারলে কষ্ট পাবেন হয়ত। আত্মীয়-স্বজন কেউ কেউ হয়ত খুশিই হবেন মনে মনে। সহানুভূতি দেখিয়ে বলবেন—'আমাদের বাবা আমেরিকার ওপর কোন লোভটোভ নেই। এই তো দ্যাখ-না আমাদের ভূপতি এখানেই এখন কত বড় অফিসার হয়ে গেছে। দেশের ছেলে দেশেই মানায়।' যে আত্মীয়ার কথায় এত কথা মনে হল তাঁর ছেলে ভূপতিকে টিয়া দেখেছে কলকাতায়। ভূপতির সঙ্গে ভূপতির মার রোজ মারামারি। সেও নাকি টাকাপয়সা নিয়েই। সপ্তাহ দুয়েক আগেই মার চিঠিতে জেনেছে ভূপতি নাকি বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। ভূপতি সব টাকা বউ-এর

পেছনে ওড়াতো। তাই নিয়ে মা আর ছেলের ঝগড়া। সেদিক থেকে টিয়া এখানে বেশ আছে। যদিও ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে ভূপতির মা'র তুলনাই হয় না, তবুও কি দরকার, অন্য কিছু নিয়ে ত লেগে যেতে পারত। আর, আজ আমেরিকা এসেছে বলেই হয়ত টিয়া নিজেকে নতুন করে দেখতে পাচ্ছে। বাবা-মা-অনুপ-অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে বাদ দিয়ে ওর একটা 'আমিত্ব' আছে। সেই 'আমিত্ব'কে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করছে ও। ভালো-লাগা, মন্দ-লাগাগুলো পাল্টে যাচ্ছে। অথচ এই নতুন 'আমি'র মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় লাগছে মাঝে মাঝে। ইচ্ছে করলেও ফিরে যাবার উপায় নেই। ভয়টা হয়ত সেজন্যই।

'পরশুদিন সকালে ক্যানাডা যাব আবার। জামা প্যান্ট একটু ইস্ত্রী করা দরকার'—অনুপ ভাববাচ্যে কথা বলছে এখন। বেজায় রেগেছে বোধহয়।

'ইস্ত্রী করা এমন কিছু শক্ত নয়—নিজে একটু শিখে নিলেই ত পার।' টিয়া যেন ইচ্ছে করেই ঘি ঢালল আগুনে।

'দেবে না বললেই ত হয়, অত হেঁয়ালী করার কি দরকার', অনুপ গাড়ির স্পিডটা বাড়িয়ে দিল একটু।

'আমি তো বাংলায় কথা বলছি, তোমার হেঁয়ালী লাগছে কেন?' টিয়া অবাক হল।

'আজকাল তোমার অনেক কিছুই আমি বুঝি না। অনেক কথা, অনেক কাজ।'

'আগে বুঝতে?'

'জানি না। ভাবতাম, বুঝি। অবশ্য আমার যে খুব এসে যায় তা নয়।'

'এসে যখন যায় না, তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি?'

'তা ঠিক।' গরগর করে উঠল অনুপ—'সব কিছুরই একটা লাভ-ক্ষতি আছে। ভেবে দেখিনি এতদিন।'

'ভেবে দেখ।'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই ভেবে দেখতে হবে। আমার জীবন, তোমার জীবন।'

'প্লীজ। নিজেরটা ভাব। আমি আমারটা ভাবব।'

এর উত্তরে অনুপ বিড়বিড় করে কি বলল টিয়া শুনতে পেল না। হঠাৎ ব্রেক কষার আওয়াজে চমক ভাঙ্গল ওর। ব্যাঙবাবাজী নীলাদ্রিদার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে।

নিউ-জার্সীর এই অঞ্চলটাকে বলা হয় ওসান। মাইল পাঁচেকের মধ্যেই

সমুদ্র। আলাদিনের সাতমহলা প্রাসাদের মত হঠাৎ যেন মাটি খুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে এই অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো। রাস্তার উল্টোদিকে একটা গ্যাস স্টেশন। এ ছাড়া উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে মাইল পাঁচেকের মধ্যে আর কোন বাড়িঘর নেই। সবই প্রায় ফার্মল্যান্ড। রাত্তিরবেলা এখানে আসতে বেশ গা ছমছম করে। অনুপ না থাকলে একা একা টিয়া কোনদিন আসতে পারত না। টিয়া অবশ্য এখন বেশ ভালই গাড়ি চালায়। ম্যানহাটানের ভিড়ে না পারলেও হাইওয়েতে ওর কোন অসুবিধেই হয় না আজকাল। এত ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে বা পিকনিকে আসতে মন্দ লাগে না কিন্তু টিয়া মনে মনে ভাবল মরে গেলেও ও কখনো এখানে থাকতে পারবে না। এই সব তেপান্তরের মাঠে সাধ করে কেন যে মানুষজন থাকে ও বুঝতে পারে না।

নীলাদ্রিদা বাইবেই দাঁড়িয়েছিলেন। পাইচারি করছিলেন বারান্দায়। এতক্ষণ বাদে নীলাদ্রিদাকে দেখে অনুপের মুখে হাসি ফুটল। পকেট থেকে একটা ছোট চিরুনি বার করে চুলটা আঁচড়ে নিল একবার। চিৎকার করে নীলাদ্রিদা বললেন : 'আরেকটু হলে পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম নির্ঘাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'অ্যাক্সিডেন্টই বলতে পারেন। ব্যাঙবাবাজী রাস্তার মধ্যে বেঁকে বসেছিলেন।' কথাটা বলতে বলতেই টিয়ার মনে হল অনুপ যেন এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। না তাকালেও অনুপের দৃষ্টি অনুভব করতে পারল ও। বনানীদি বারান্দায় এলেন। অনুপকে ধমকে বললেন—'রাস্তায় দাঁড়িয়েই গল্প হবে নাকি! ভেতরে এস।'

এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে এখন। রাস্তার উল্টোদিকে সারি সারি গাছের মেলা। বাতাসে পাতাগুলো এ ওর গায়ে ঢলে ঝুমঝুম আওয়াজ। রাত্তির দশটার সময়েই এ অঞ্চল যেন নির্বান্ধব পুরী। লম্বা লম্বা পা ফেলে অনুপ বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। কেউ কোথাও নেই, একা একা টিয়া দাঁড়িয়ে রইল লনের ওপর। সারি সারি অনেকগুলো গাড়ি পার্ক করা আছে। হাওয়ার দাপটে ব্যাঙবাবাজী আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছে। চুলগুলো উড়ে এসে চোখ দুটো ঢেকে দিল টিয়ার। একটা অদ্ভুত সোঁদা সোঁদা গন্ধ। কলকাতায় লেকের পাশে জল আর মাটিতে মিশে যেরকম অদ্ভুত বুনো একটা গন্ধ বেরোত অনেকটা সেইরকম। এখানে শুধু একজনের মনে সেই বুনো গন্ধটা পায় টিয়া। বুনো, বেআব্রু, বেপরোয়া একটা মনকেই ছুঁতে চায় ও। মাঝে মধ্যে ভয় লাগে। বুক কাঁপে। শৈবাল কোন নিয়ম মানে না। কোন কনভেনশন না, কিচ্ছু না। ভয় দেখালে বলে : 'এই আমি। টেক

ইট অর লিভ্ ইট।'

নিতেও হাত কাঁপে। ফেলে আসতেও কষ্ট হয়। টিয়া বলে : 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না কেন ? কেন, মনে হয় এই অনুভূতিগুলো ধার করা।'

'বিশ্বাস, অবিশ্বাস, প্রেম, ভালোবাসা এই শব্দগুলো আমাদের তৈরী। আমাদের চারপাশে বেড়া দিতে আমাদের ভাল লাগে।'

'কোথাও না কোথাও তো গণ্ডী দিতেই হবে।' টিয়া বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে।

'যেখানে থেমে যাবো, বিশ্রাম নেবো সেটাই তখনকার বেড়া। ভোরবেলা উঠে যদি দেখি বেড়ার ওপারের ঘাসগুলো সবুজ—মন যদি চায় বেড়া টপকাও। আবার যেখানে থামবে সেটা হোক তোমার নতুন গণ্ডী।'

'শেষ গণ্ডী কতদূর ?'

'আগে হামি খাও, তবে বলব।'

'ক'টা?'

'তিন লক্ষ তিরিশ হাজার চারশ পঞ্চাশ।'

'সংখ্যা দিয়ে ভালবাসাকে বাঁধতে চাও কেন ?'

'হামি ভালবাসা নয়। জন্তুরাও হামি খায়। জৈবিক তাগিদে।'

'ভালবাসা তবে কি ?'

'জানি না। বোধহয় এক সঙ্গে বেড়াগুলো টপকে যাওয়া। ভালবাসা বোধ হয় মুক্তি।'

মুক্তি, মুক্তি—কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করল টিয়া। বনানীদি পেছন থেকে ডাকলেন : 'টিয়া, তুমি কি গাছগুলোর সঙ্গে কথা বলছ ?' কথা না বলে টিয়া বনানীদির পেছন পেছন বাড়ির ভেতরে এল। গাছগুলো এখন স্থির। পাতাগুলো দুলছে না। টিয়ার ভাবনাগুলো বোধহয় পাতাগুলো জানতে পেরেছে। টিয়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবল—কালকেই অনুপের সঙ্গে ও সোজাসুজি কথা বলবে। একদিন না একদিন অনুপের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে ওকে। বালির তৈরী এ বাড়িতে নিজের মনকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে ভয়ে ভয়ে আর ও থাকতে পারবে না কিছুতেই।

মনে মনে অনুপের মুখটা কল্পনা করতে পারছে টিয়া। অনুপ প্রথমে বিশ্বাস করবে না। তারপর রেগে চীৎকার করে উঠবে : 'তুমি কি আর কাউকে ভালবাস ?'

টিয়া শৈবালের নাম বলবে না। সত্যিই তো শৈবালকে ভালবাসে কিনা ও এখনো জানে না। টিয়া বলবে : 'সেটা ইম্‌পরট্যান্ট নয়। তোমাকে ভালবাসি না

সেটা জানি।'

অনুপ রাগে কুঁকড়ে যাবে হয়ত। বলবে: 'হু ইজ দ্যাট বাস্টার্ড ?'

টিয়া নিজের অহঙ্কারটা অনুপের মুঠোয় দেবে না। শুধু বলবে—'নাই বা জানলে।'

অনুপ দেয়ালে টাঙ্গানো ওদের ছবিটা নিয়ে আরেকটা দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে। তারপর নিজের চুলগুলো মুঠি পাকিয়ে চীৎকার করবে—'হু ইজ ইট ? হ্যাড ইউ কিস্ড হিম ?'

টিয়া হেসে উঠবে এই সময়: 'মে বি আই কিস্ড হিম। মে বি আই কনসিভ্ড হিজ বেবী। এগুলো তোমার জানার নয়। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, ইট ইজ অল ফিনিশ্ড বিট্যুইন আস।'

অনুপের চোখে জল আসবে। আঁকড়ে ধরতে চাইবে টিয়াকে। বুকে মুখ ঘষতে চাইবে। কিন্তু, টিয়া আগের মানুষ নেই। নতুন টিয়া খোলস ছেড়ে বেরিয়ে সব কিছু পেছনে ফেলে বেড়াটা টপকে যাবে।

'কি ব্যাপার বল ত ? এত আনমনা কেন ?' নীলাদ্রিদার কথায় চমকে উঠল টিয়া। সত্যিই তো ও যেন তলিয়ে গিয়েছিল কোথাও। তাড়াতাড়ি লজ্জা পেয়ে বলল: 'না, না ও কিছু নয়। আড়াই ঘণ্টা গাড়িতে বসে ভাব-সমাধি হয়ে গিয়েছিল প্রায়। জ্ঞান ফিরতে সময় লাগছে।'

'একটু ওয়াইন দেব ?' নীলাদ্রিদা প্রশ্ন করলেন।

'ওয়াইন ?' কি যেন ভাবল টিয়া—'না, একটু স্কচ দিন।'

সবাই যেন একটু চমকে টিয়ার দিকে তাকাল। নীলাদ্রিদা একটু হাসলেন—'একটু শক্ত হয়ে যাবে না ?'

'ও খুব শক্ত মেয়ে এমনিতেই। স্কচ খেতে পারবে।' অনুপ না তাকিয়েই বলল।

'মেয়েদের স্কচ খাওয়া শোভন নয় জানি। তাও একটু খাই। খুব ইচ্ছে করছে।' টিয়া আব্দার করল।

নীলাদ্রিদা জিজ্ঞেস করলেন—'জল বা সোডা দেব একটু ?'

'না, শুধু বরফের ওপর দিন। বরফ দেবেন বেশি করে।' টিয়া বুঝতে পারল অনুপ এক দৃষ্টিতে এখনো ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। অনুপের দিকে সোজাসুজি ফিরে তাকিয়ে বলল: 'একটা সিগারেট দেবে ?'

বনানীদি রান্না ভুলে টিয়ার দিকে তাকালেন। অনুপ প্যাকেট থেকে একটা চেস্টারফিল্ড এগিয়ে দিল টিয়াকে। টিয়াকে কিন্তু সিগারেট মুখে সুন্দর

দেখায়—অনুপ মনে মনে ভাবল। লাইটারের আগুনে টিয়ার মুখে একটা নতুন আলো পড়ল।

টিয়া ও নিজের ড্রিংক ঢেলে নীলাদ্রিদার সোফায় এসে বসলেন। নীলাদ্রিদার বাড়িটা ছোট্টর ওপর বেশ পরিপাটি করে গোছানো। স্টিরিও সিস্টেমের পুরো তাকটা, কাঠ কিনে নীলাদ্রিদা নিজেই বানিয়েছেন। বাড়ি ভর্তি সুন্দর সুন্দর হাউস প্ল্যান্ট। গাছগুলো রাখাব ক্যারেজগুলো বনানীদির নিজের হাতে সেলাই করা। দেযালে অনেক ঝকমকে ছবি। সব ছবি অবশ্য টিয়ার পছন্দ নয়। যেমন কালো প্লাস্টিক ব্যাকগ্রাউণ্ডে মোল্ড করা শিশুর স্তন্যপান করার ছবিটা ছবি হিসেবে বাজে। অবশ্য অত খুঁটিয়ে দেখার কোন মানেই হয় না। দেয়ালে সাজানো এক জিনিস আব ছবি ভালো লাগা আর এক জিনিস। বই-এর ব্যাপারেও তাই। গেটে থেকে শুরু করে পেরি মেসন পর্যন্ত আছে নীলাদ্রিদার। টিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল। নীলাদ্রিদা বলেছিলেন : 'দেখ ভাই বই-টই পড়ার সময় কোথায ? তাকেব অনেকখানি ফাঁকা ছিল। পেরি মেসনের বইগুলো সাইজে মাপসই। কিনে নিলাম। গেটের পাশে গেল, কি দস্যু মোহনের পাশে গেল অত খেয়াল করে দেখিনি।'

হয়ত এই জন্যেই নীলাদ্রিদাকে ভাল লাগে। মানুষটার ভেতরে-বাইরে আলাদা কিছু নেই। বনানীদিও মাথা ঘামান না কিছু নিয়ে। বনানীদিকে খুব সুখি বলে মনে হয টিয়াব। হযত বনানীদির চাহিদা খুব কম। কিংবা বনানীদি যা চান নীলাদ্রিদা হয়ত তাই। মোট কথা ওদের দুজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত হারমনি আছে। এতটা হারমনি মিথ্যে করে সাজিয়ে রাখা যায় না।

'আজকে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা মজার জায়গায় নিয়ে যাব তোমাদের।' নীলাদ্রিদা অনুপের দিকে তাকালেন।

'এটাই তো বেশ মজার জায়গা।' অনুপ ধোঁয়া ছাড়ল আরাম করে।

'এই সময়, সামারের ঠিক আগে আগে, এখানকার বীচে একটা উৎসব হয়। হাজার হাজার মানুষ এখানে এসে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েক'শ মানুষ সমুদ্রের ধারে দাঁড়িযে এক সঙ্গে গান করে। এটা দেখবার জিনিস, শোনবারও বটে।'

'কি গান ?' অনুপ জানতে চাইল।

'কান্ট্রি সং গোছের। গানটা বড় কথা নয়। কোন বাজনা নেই, আয়োজন নেই, কয়েকশো লোকের এক সঙ্গে খালি গলার গান করাটাই শোনবার।'

'কখন যাব ?' টিযা প্রশ্ন করল।

'এখনও অনেক দেরী। শুরু হতে হতে রাত একটা। অবশ্য তোমাদের মুড

আছে ত ?'

টিয়া, অনুপ দু'জনেই রাজী। কেন যে ঘরের ভেতরের বাতাসটা এত ঘোলাটে হয়ে গেছে ! হয়ত বা বাইরে গেলে এই দম-আটকানো ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। টিয়া আর অনুপের চোখাচোখি হলো। দু'জনেই বোধহয় একই সঙ্গে এই কথাটা ভাবল।

হয়ত বা বনানীদিকে সাহায্য করবে বলেই টিয়া রান্না ঘরে এল। বনানীদি সুন্দর খোঁপা করে চুল বেঁধেছেন। টিয়ার চুল এত ছোট যে খোঁপা হয় না। অথচ দেশে থাকতে টিয়ার চুল কোমর ছাড়িয়ে যেত। মা রোজ চুল বেঁধে দিত বিকেলে। বন্ধুরা হিংসে করত। বলত, অনুপ নিশ্চয় তোর চুল দেখে প্রেমে পড়েছে। এখন কথাগুলো মনে পড়লে হাসি পায়। চুল দেখে কেউ কারো প্রেমে পড়ে নাকি। তখন কিন্তু এসব কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো। এখানে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই চুলের বোঝা নামিয়ে ফেলেছে টিয়া। বেঁধে দেবার জন্যে মা নেই। তাছাড়া এত বড় চুল নিয়ে খুব অসুবিধে। কোথায় রাখবে ভেবে পেত না ও।

'কি গো আজকে যে স্কচ খাচ্ছ বড় ? অনুপ কিছু বলেছে !' বনানীদি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন।

'অনুপ কিছু বলে না। আমার কথা বাদ দিন। আজ আপনার কথা শুনব।' প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল টিয়া।

'আমার আবার কি কথা ?' বনানীদি যেন একটু অবাক হলেন।

'আপনি নীলাদ্রিদাকে কতখানি ভালবাসেন ?' টিয়া যেন মাপ জানতে চাইছে।

বনানীদি অবাক হয়ে তাকালেন আবার : 'কি জানি, ভেবে দেখিনি।'

'রাগ হয় না মাঝে মাঝে ?'

'হয়। রাগ হয়, কান্না পায়, মন কেমন করে। সব মিলিয়ে সব কিছু কিরকম অভ্যেস হয়ে গেছে। ভালবাসি কিনা আলাদা করে ভেবে দেখিনি।' বনানীদি মুচকি হাসলেন একটু—'আমার কথা একেবারে সেকেলে। বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের আগে নীলাদ্রিকে আমি দেখিইনি।'

'আর, নীলাদ্রিদা ?'

'নীলাদ্রিও নয়। জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই রাগে মাথা প্রায় ন্যাড়া করে বিয়ে করতে এসেছিল। শুভদৃষ্টির সময় বর দেখে আমি যা কেঁদেছিলাম পরে !'

'নেড়া মাথায় নীলাদ্রিদাকে কেমন দেখাচ্ছিল ?'

'ঠিক গুণ্ডা, গুণ্ডা। তারপর আর কি। পরে দেখলাম লোকটা যা ভেবেছিলাম তা মোটেই নয়। আস্তে আস্তে সব কিছু কিরকম অভ্যেস হয়ে গেল।'

'একটা লোককে যাকে আগে দেখেননি—তাকে ভালবাসলেন কি করে ?'

'অতশত বলতে পারব না। তাছাড়া, তখনকার দিনে এত ভাবার সময়ও ছিল না আমাদের। আমার বাবা বলে গিয়েছিলেন—পায়ে হেঁটে শ্বশুর বাড়িতে ঢুকছ—যদি বেরোতে হয় খাটে শুয়ে—নচেৎ নয়। আজ থেকে নীলাদ্রিই তোমার সব।'

'মেনে নিলেন কথাগুলো ?' টিয়া যেন রূপকথার গল্প শুনছে।

'বাবাকে যে বড্ড ভয় পেতাম, বিশ্বাসও করতাম, খুব। শুধু জানতাম মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দেবেন না বাবা। তাছাড়া, বাইরে দেখা হলে নীলাদ্রিকে হয়ত আমি কখনো ভালবাসতে পারতাম না। আমাব কাছে, সেই বয়সে, দেখতে সুন্দর ছেলের দাম অনেক বেশি ছিল—যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। নীলাদ্রির কাঠখোট্টা এই চেহারার ভেতরে যে সুন্দব মানুষটা আছে তাকে খুঁজে পেতাম না কোনদিন।' বনানীদি যেন কথাগুলো বলতে পেরে খুশী হলেন।

'কিন্তু আপনার বাবা তো ভুলও করতে পারতেন ?' টিয়ার এখনও বিশ্বাস হয়নি।

'হ্যাঁ পারতেন। তবুও তিনিই ছিলেন সংসারের কর্তা। হয়ত অনেক ভুল করেছেন। কিন্তু সেই ভুলের ওপরই সংসারটা চলে যাচ্ছে এতদিন। হয়ত ভালবাসার জোর ছিল, তাই ভুল করারও অধিকার ছিল।'

'আপনার ছেলেমেয়েকেও কি আপনি এই ভাবেই বিয়ে দেবেন ?'

'না। ওরা মানুষ হয়েছে আমেরিকায়। ওদের পছন্দ-অপছন্দ আছে। তাছাড়া নীলাদ্রি মোটেই আমার বাবার মত নয়। মেয়েটা তো বাবার ন্যাওটা। বুড়ো-ধাড়ি মেয়েকে কোলে নিয়ে এখনো নীলাদ্রি যা আদিখ্যেতা করে! সব বয়ফ্রেণ্ডের কথা বাবাকেই বলা চাই। মাঝে মধ্যে আবার বয়ফ্রেণ্ড আর বাবাকে নিয়ে একসঙ্গে ডেট করছে। বাবা ওর সব চেয়ে বড় বন্ধু। যাক্‌গে, কথা আর শেষ হবে না। চল, সবাই বসে পড় টেবিলে। আমি সার্ভ করে দিচ্ছি।'

খেয়েদেয়ে উঠে সবাই মিলে বেড়িয়ে পড়ল বীচের দিকে। ব্যাঙবাবাজীর ওপর বড্ড ধকল গেছে বলে অনুপ ওটাকে রেখে নীলাদ্রিদার গাড়িতেই উঠে পড়ল। সামনে নীলাদ্রিদা আর অনুপ। পেছনে বনানীদি আর টিয়া। শত চেষ্টা

করেও বনানীদিকে নীলাদ্রিদার পাশে বসানো গেল না। শুধু বললেন—'না বাবা, আমি আর টিয়া পেছনে গল্প করতে করতে যাব।'

টিয়ার আর তর সইছে না। কাল হতে আর কতদূর ? এত বড় ভুলের ওপর সম্পর্কটা ফেলে রাখতে আর একটুও ইচ্ছে করছে না ওর। বনানীদির কথাগুলো এখনো ভাল করে বুঝতে পারেনি ও। হয়ত সময় লাগবে। তাছাড়া, নীলাদ্রিদা আর অনুপ এক নয়। আর বনানীদির মত বিশ্বাসের জোর টিয়ার নেই। শৈবালকে ভালবাসে কিনা ও জানে না। কিন্তু শৈবালের কথাগুলো শুনলে বুক কাঁপে। বেড়া টপকালে কি তা টিয়া এখনো দেখেনি—তবে এই বেড়ার ভেতরে এক অসহ্য যন্ত্রণা।

দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। নীলাদ্রিদা গাড়িটা পার্ক করলেন রাস্তার বাঁদিকে একটা পার্কিং লটে। পার্কিং লটে অন্তত হাজার খানেক গাড়ি। অনবরত গাড়ি এসে যাচ্ছে এখনো। হাঁটতে হাঁটতে একটা মেঠো রাস্তা ধরে ওরা এগোতে থাকল। নীলাদ্রিদা বললেন : 'যদি কেউ হারিয়ে যাও এই ভাঙ্গা বাড়িটা মনে রেখ—এর পেছনেই পার্কিং লট।' বাঁদিকে টিয়া দেখল একটা কাঠের ছোট্ট ভাঙ্গা বাড়ি।

টিয়া জিজ্ঞেস করল—'বাড়িটা ভেঙ্গে গেল কি করে ?'

নীলাদ্রিদা বললেন—'ওটা কোন পাকা বাড়ি নয়। গত সামারে মেলার সময় একটা টেম্পোরারি স্ট্রাক্‌চার তৈরী করেছিল ওরা। শীতে, ঝড়ে ওটা ভেঙ্গে গেছে।'

একটু দূরে এগোতেই সমুদ্রটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। যেন ভোজবাজীর মত একটা নতুন দিগন্ত দেখতে পেল টিয়া। আর শুনতে পেল সুর।

কয়েক'শ মানুষ সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইছে। সাদা ধবধবে তাদের পোশাক। ঠিক সমুদ্রের ঢেউ-এর মত। গানের কথা আর সুর, এলোমেলো হাওয়ায় মিশে সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। তার সঙ্গে মিশে আছে সমুদ্রের গর্জন। ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে পাড়ে। ওপারে আকাশ ঝুঁকে পড়েছে সাগরের ওপর। ঠিক যেরকম ভাবে শৈবাল ওকে চুমু খায়।

কতক্ষণ, ঠিক কতক্ষণ মনে নেই। পাশ থেকে বোধহয় অনুপ কথা বলল—'একটা কথা বলব।' পাশ ফিরে তাকিয়ে নীলাদ্রিদাদের দেখতে পেল না টিয়া। ও আর অনুপ সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

টিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলল : 'বল'। মনে মনে ভাবল—অনুপ এখন কোন কথা না বললেই ভাল হত। অনুপ এমন কোন কথা কি বলতে পারে যা টিয়া শোনেনি ?

নীচে হাঁটু গেড়ে বসে বালির ওপর বিলি কাটছে অনুপ। ফিসফিস করে বলল : 'আমাকে বলতেই হবে।'

টিয়া কোন উত্তর দিল না।

অনুপ আবার বলল : 'আমারই দোষ। অনেক দেরী হয়েছে জানি। তাও··'

টিয়া মনে মনে হাসল। অনুপ বোধহয় কাঁদবে আবার। অস্বস্তি বোধ করল। আর তো একটা রাত্তির। যেমন করে হোক সহ্য করে নেবে টিয়া। পাঁচটা বছর পেরিয়ে একটা রাত্তির মুখ বুজে অপেক্ষা করবে ও। স্থির চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল টিয়া।

অনুপ বলল · 'আমি আরেকটা মেয়েকে ভালবাসি টিয়া।'

সমুদ্রের ঢেউটা কি অনুপের কথার সঙ্গেই তীরে এসে আছাড় খেয়েছিল কিনা টিয়ার মনে নেই। মন্ত্রচালিতের মতো টিয়া জিজ্ঞেস করল : 'কি বললে ?'

অনুপ বালির ওপর বিলি কাটছে এখনও : 'আমি আরেকটা মেয়েকে ভালবাসি।'

টিয়া বুঝতে পারেনি। প্রশ্ন করল—'কে ?'

অনুপ মুখ না তুলেই বলল : 'ওর নাম ক্যাথি। আমাদের অফিসে কাজ করে।'

টিয়ার বিশ্বাস হচ্ছে না : 'কতদিন ওকে ভালবাস ?'

অনুপ এবার তাকাল—'প্রায় বছর খানেকের আলাপ।'

টিয়া আরেকবার জানতে চায়—'এতদিন বলনি কেন ?' টিয়া জানে না একথাটা জানতে চেয়ে ওর কি লাভ।

অনুপ বলল : 'তুমি কখনো কিছু জানতে চাও না। ভাবতাম তোমার ইন্টারেষ্ট নেই।'

পৃথিবীর সব কৌতূহল লাভ-লোকসানের বাঁধন মানে না। তাই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে টিয়া আবার প্রশ্ন করল : 'আর আমি ?'

অনুপ সোজাসুজি টিয়ার দিকে তাকাল না। খুব আস্তে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল : 'আমি আর ক্যাথি হয়ত বিয়ে করব।'

মুক্তি, মুক্তি···যে মুক্তির জন্যে এতটা সময় টিয়া অপেক্ষা করেছে সেই মুহূর্তটা এসে গেল, কত সহজেই। কি অনায়াসে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়। হয়ত

বা সেই মুক্তিব আনন্দে টিযাব ঠোঁট দুটো থব থব কবে কেঁপে উঠল।

দূব থেকে নীলাদ্রিদা ডাকলেন 'ঠাণ্ডা লাগছে, আমবা গাডিতে গিযে বসছি। পার্কিং লটেব বাস্তাটা মনে আছে তো ? ভাঙ্গা বাডিটাব পেছনে—'কথাগুলো এলোমেলো ভেসে গেল।

অনুপ চীৎকাব কবে জবাব দিল 'আমবা আসছি।'

টিযা আব অনুপ চেনা বাস্তাটা ধবে এগোল ভাঙ্গা বাডিটাব দিকে। পেছনে পডে বইলো উথাল-পাথাল সমুদ্র, কযেকশো লোকেব উদাত্ত কণ্ঠেব গান, আব ।

বুকেব ভেতব একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা। টিযা আব টিযাব বশে নেই। যে বেডাটা টপকানোব স্বপ্ন দেখেছিল এতদিন, আজ ঠিক এক্ষুনি, সেই ভাঙ্গা বেডাটাব জন্যে টিযাব চোখে জল এল। অসহ্য ক্লান্তিতে পা দুটো ডুবে যেতে থাকল বালিতে।

তবুও অনুপেব পাশাপাশি হেঁটে ধীবে ধীবে পার্কিং লটেব দিকে এগিযে গেল টিযা।

সোম থেকে শুক্রবাব প্রায প্রতিদিন এই সমযটায যত বাজ্যেব ঘুম শৈবালেব চোখে জডো হয। সক্কালবেলায চায়েব কাপে প্রথম চুমুকেব পব। অফিসে ওব ঘবেব দবজাটা আজকাল এসেই বন্ধ কবে এ কাবণে। চা খেতে খেতে বাত্তিবেব বাকি ঘুমটাব বেশ চলে প্রায মিনিট দশেক। এই মিনিট দশেক ওব বড আদবেব—বিশেষ কবে শীতকালে। অর্ধেক বাজত্ব, বাজকন্যা কিছুতেই কিছু এসে যায না এ সময়।

ওব ডেস্কেব সামনেব দেযালে দু'ফুট বাই তিন ফুট ফ্রেমে বাঁধানো একটা অযেল পেন্টিং। উনিশশো উনত্রিশ সালে আঁকা নিউইযর্ক শহবেব একটি ভীডবহুল বাস্তাব ছবি। বোধহয তখনকাব ব্রডওযে। একফালি বাস্তায় ভবদুপুরে অনেক মানুষেব ভীড। আকাশে ও বাডিব মাথায ঝলমলে বোদ। ইঁট, কাঠ, সাইনবোর্ডে ধাক্কা খেতে খেতে মাত্র এইটুকুন বোদ বাস্তায় এসে পডেছে। ট্রামগাডি, মোটবগাডি ও মানুষের মিছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও ব্রডওযেব মত বাস্তায ট্রামগাডি চলত। মানুষেব চলাফেরাব ভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তখনকাব মানুষেব মুখে চোখে একটা অন্যবকম ব্যাপার ছিল। কথাটা বোধহয় 'নিশ্চিন্দি'। চৌষট্টি সালে পাবনা থেকে একেবাবে কলকাতা চলে আসার পব দাদি অর্থাৎ ঠাকুমা এই একটা শব্দ বার বাব ব্যবহার কবতেন। আপন মনে বলতেন—'দূব, দূর, এই শহরে কি মাইন্‌ষে বাঁচে। ছিটেফোটাও নিশ্চিন্দি নাই।'

বিকেল হলেই জানালায় চোখ লাগিয়ে বসে থাকতেন। শৈবাল, তপু, গোপাল, উনি সবাই বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত এক অশান্তি। নীচে ভাড়াটেদের বা পাশের বাড়ির যে কোন কলিং বেল বাজলেই চীৎকার করে উঠতেন—'ও বৌমা, রাধার মারে কও দরজাটা য্যান খুইল্যা দেয়। বাবু আসছে বোধহয়।' বৌমা অর্থাৎ মা বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে বলতেন—'বিকেল তেনটেয় বাবু হবে কেন মা ? ওর আসতে অনেক দেরী। আপনি একটু ঘুমান এখন।' দাদির বিশ্বাস হতো না—'তবে যে বেল শুনলাম।' রাধার মা জবাব দিত : 'ওটা পাশের বাড়ির ঠাকুমা। আপনি গড়িয়ে নিন।' শুয়ে ঘুম আসত না। পাবনা, হাটুরিয়া, জগন্নাথপুরের ছবিগুলো ভেসে উঠত সামনে। সত্তর বছরের জগৎ, এক অদ্ভুত নিশ্চিন্দির আশ্রয়। কলকাতায় এসে যে নিশ্চিন্দি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিলেন দাদি ; দেয়ালে টাঙ্গানো ছবির এ মানুষগুলোর চোখে-মুখে, হাঁটাচলায় যেন সেই নিশ্চিন্দি দেখতে পায় শৈবাল।

পার্টিশনের পর অনেকগুলো বছর এই নিশ্চিন্দি আঁকড়েই পাবনার বাড়িতে রয়ে গেলেন জিতেন্দ্রজিৎ ও প্রফুল্লনলিনী। চার ভায়ের মধ্যে দাদু ছিলেন সেজ। ওপরের দুই ভাই মারা যান শৈবালের জন্মের প্রায় বছর দশেক আগে। শৈবালদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে জিতেন্দ্রজিৎই পাকাপোক্তভাবে শেষ জমিদার ও প্রথম হতভাগ্য। ছোট ভাই সুরজিৎ পুত্র-কন্যা-পরিবার সহ পাবনা ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন সবচেয়ে আগে। সামান্য আয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারা-সত্বে সুরজিতের কোন মোহ ছিল না। হয়ত ভবিষ্যতটা উনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। কলকাতায় এসে আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলেন সুরজিৎ। জমিদারী লোপ পেয়েছিল অনেকদিন আগেই। সম্পত্তি বলতে বাড়ির গায়ে লাগা সিনেমা হল বাণী টকিজ, ছয়-সাত বিঘে জমির ওপর ইছামতি পাড় ঘেঁষে আম, কাঁঠাল, জামরুল, লিচুর বাগান আর পাবনা রোডের ওপর ভাড়া দেওয়া কিছু দোকান। ভাড়ার টাকা থেকে শুরু করে আম, কাঁঠাল সব কিছু তিনভাগে ভাগ হত। বড় দাদুর দুই ছেলে বড়দা জ্যাঠা আর লম্বা জ্যাঠার এক ভাগ। মেজদাদুর দুই ছেলে ভাল কাকু আর মেজমাদের এক ভাগ। শৈবালের দাদুর এক ভাগ। মেজ জ্যাঠা বাড়িতে থাকতেন না। তার ভাগটা মেজমা পেতেন। তিনটে হাঁড়ি চড়ত বাড়িতে। ভাগের একটা ছোট্ট ঘটনা এখনো অস্পষ্ট মনে আছে শৈবালের। লম্বা জ্যাঠাকে ও খুব ভয় পেত। শুধু লম্বা বলে নয়, বড্ড গম্ভীরও ছিলেন লম্বা জ্যাঠা। মা বলতো মোহিত জ্যেঠু মারা যাবার পর থেকেই নাকি এইরকম ; মোহিত জেঠুকে নাকি ইংরেজরা বিষ খাইয়ে

মেরেছিল জেলে। দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন তিনি। ছোট কুঠুরির জানালা থেকে যে মধুমাখা আমগাছটা দেখা যায়, সেই গাছের ডালে মাঝেমধ্যে পিস্তল লুকিয়ে রাখতেন মোহিত জ্যেঠু। জ্ঞান হয়ে শৈবাল দেখেছে লম্বা জ্যাঠা শুধু গুম হয়ে থাকেন, ভাগের তদারক করেন। আম, কাঁঠাল পাড়ার সময় লম্বা জ্যাঠার কাঁধে চেপে শৈবালও যায়। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও আম, কাঁঠাল ভাগ হচ্ছিল ভেতর বাড়ির উঠোনে। শৈবাল চলে যাচ্ছিল সন্তুর সঙ্গে। লম্বা জ্যাঠা ডাকলেন। শৈবালের হাতে সবচেয়ে বড় মধুমাখা আমটা তুলে বললেন—'এটা তোর। আমি দিলাম।' গর্বে বুকটা ভরে গেল শৈবালের। যে লম্বা জ্যাঠাকে সবাই এত ভয় পায়—তার হাত থেকে এত বড় একটা আম। শৈবাল মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু শেষে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ভাগের শেষে শৈবালের হাতের আমটা লম্বা জ্যাঠা দাদুর ভাগে গুণে ফেললেন। হঠাৎ মার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানে এল শৈবালের। বিরাট ঘোমটার আড়াল থেকে মা বললেন : 'বাবু, আমটা ফিরিয়ে দাও।'

লম্বা জ্যাঠা অবাক। বাকি সবাইও বেশ খানিকটা থতমত। মেজমা বললেন : 'কেন অনিমা, সেজদা ওটা বাবুকে দিলেন ভালবেসে। ওটা বাবুই রাখুক না।'

মার গলায় একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা ছিল : 'না, মেজদি। ভালবাসা যদি দাঁড়িপাল্লা মেপে ভাগ হতে পারে—বাবু এ আম একা খাবে না। তুমি আমটা কেটে দাও। ও সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাবে।'

এখনো মনে পড়ে রাত্তির বেলায় মা খুব কেঁদেছিল। বাবাকে বলেছিল : 'তোমার দুটো পায়ে পড়ি। চল আমরা কলকাতা চলে যাই। এখানে থাকলে বাবু অন্যরকম হয়ে যাবে।' মার কথায় বোধহয় কোথাও অনেকখানি সত্যি লুকোনো ছিল। কয়েকমাস পরে ওরা কলকাতায় চলে এল। দাদু পছন্দ করেননি মোটেই। আপত্তিও করেননি। বাবাকে বলেছিলেন : 'যাব্যা যাও। ইউ হ্যাভ্ বিকাম অ্যান অ্যাডাল্ট।'

শৈবালরা কলকাতা আসার পর পরই বড়দা জ্যাঠারাও চলে এসেছিলেন কলকাতায়। ভালকাকু, লম্বা জ্যাঠা, মেজমা, দাদুরা এসেছিলেন অনেক পরে। অনেক পরে লম্বা জ্যাঠাকে আবার জ্বলে উঠতে দেখেছিল শৈবাল। সেই গুম-মেরে-থাকা মানুষটা আরেকবাব, বোধহয় শেষবারের মত, বেঁচে উঠেছিল উনিশশো সত্তরে। মরা চোখে আরেকবার স্ফুলিঙ্গ ছুটতে দেখেছিল শৈবাল। সন্তু তখনও বেঁচে। কিন্তু কেউ জানে না কোথায়। বড় জ্যাঠা শাপান্ত

করেছিলেন ছেলের। খুব ক্ষেপে গিয়ে বড়মাকে বলেছিলেন : 'এবার ছেলে এলে বলে দিও। বাবার হোটেলে থেকে রাজনীতি না করলেও চলবে। এসব সখের রাজনীতি অনেক দেখেছি।' মাথা তুলে লম্বা জ্যাঠা খুব স্থির কণ্ঠে বলেছিল—'ক্যান ন'দা ? এরা যদি চাল্যা সাজবার চায়, দ্যাওনা ক্যান। আমরা ত ফিনিশড্। কালাতিপাত করা ছাড়া আমাদের আর কোন অকোপেশন নাই।' বড়দা জ্যাঠা একটু অবাক হয়েছিলেন হয়ত। বলেছিলেন : 'অত সোজা নয়। এরা বোঝে না। পরিবর্তন সহজে আসে না। প্রস্তুতি চাই।' লম্বা জ্যাঠা হাসছিলেন : 'প্রস্তুতিরও একটা বিগিনিং আছে! এটা হয়ত তাই।'

এসব অবশ্য অনেক পরের ঘটনা। প্রথম প্রথম কলকাতা এসে শৈবালের দম বন্ধ হয়ে যেত। গায়ে গায়ে লাগা বাড়ি। জানালা দিয়ে আকাশের ছিটেফোঁটাও নজরে আসে না। ডোভার লেনের একটা ছোট বাড়ির একখানা ঘরে ওরা এসে উঠেছিল। বাড়ির পশ্চিমদিকটা তখন একটা বিরাট মাঠ। কিছুদিনের মধ্যেই পাশের বাড়ির মিনতিদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কি চকচকে চেহারা ছিল মিনতিদির। ইংরেজীতে কথা বলতে পারত। তর্জনী নাচিয়ে মাঝে মধ্যে বাংলা কবিতাও আবৃত্তি করতে পারত। এখন কবিতাটা একদম ভাল লাগে না। কিন্তু তখন মিনতিদির মুখে একটা কবিতা শৈবাল প্রায়ই শুনত : 'তেলের শিশি ভাঙ্গলো বলে খোকার পরে রাগ করো, আর, তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো, তার বেলা ?' মিনতিদির হাত ধরে প্রায় প্রত্যেক বিকেলে শৈবাল সামনের মাঠটায় বেড়াতে যেত।

প্রথম বছর পাবনা যাওয়া হল না। বাবার হাতে পয়সা ছিল না। দাদু পাঠাতে পারতেন, পাঠাননি। হয়ত খানিকটা রাগেই। বাবাও জেদ করে গেলেন না। পাবনা যাওয়া হবে না শুনে প্রথমটায় শৈবাল খুব কেঁদেছিল। সেদিনই বিকেলে মিনতিদির সঙ্গে বেরিয়ে দেখে সামনের মাঠটায় বিরাট ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। মিনতিদি বলল : 'পাবনায় কি যাবি ? পাবনা ত গ্রাম। কলকাতায় কত পূজা হয় জানিস ?' অতবড় ম্যারাপ দেখে অবাক হয়ে গেল শৈবাল—'এত বড় কেন ? কটা পুজো হবে এখানে ?' মিনতিদি হেসে বলেছিল—'একটাই। কিন্তু পাশে থিয়েটারের জন্য স্টেজ তৈরি হচ্ছে।'

পুজোর পর পাবনার জন্য আর দুঃখ ছিল না ওর। অষ্টমীর দিন বাবার সঙ্গে বেরিয়ে উনচল্লিশটা ঠাকুর দেখেছিল শৈবাল। ট্রামে উঠে অনেক, অনেক দূর গিয়েছিল। নবমীর দিন ওর জীবনের প্রথম থিয়েটার। মিনতিদির গা ঘেঁষে বসে 'সিরাজদ্দৌল্লা' থিয়েটার দেখা। সিরাজদ্দৌল্লার দুঃখে শৈবালের হাপুস নয়নে

কাঁদা দেখে মিনতিদি জড়িয়ে ধরে বলেছিল : 'এত কাঁদছিস কেন ? এটা তো থিয়েটার ?' খুব লজ্জা পেয়েছিল শৈবাল। অবাকও হয়েছিল খানিকটা। কারণ ও নিজের চোখে দেখেছিল মাও কাঁদছে।' বিজয়ার দিন ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আলোর মেলা, নাচ, আর বাজী ফাটা দেখতে দেখতে শৈবালের মনে হয়েছিল পাবনা গেলে এই বিরাট ব্যাপারটাতে ও ফাঁকি পড়ে যেত। বাড়ি ফিরে মা-বাবাকে প্রণাম করেছিল শৈবাল। বাবার সঙ্গে কোলাকুলি। মিনতিদিকে প্রণাম করে কোলাকুলি করার আগেই মিনতিদি পালিয়ে গেল। পরে মার কাছে শুনেছে মেয়েদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে নেই। তার দুদিন পরে মার সোনার জল করা ফাউন্টেন পেনে আঁকাবাঁকা অক্ষরে পাবনায় চন্নাদাকে দু'লাইন চিঠি লিখেছিল শৈবাল : 'এখানে ৩৯টি ঠাকুর ও সিরাজদ্দৌলা থিয়েটার দেখিয়াছি। ইতি শৈবাল।' তখন সবে মার কাছে একটু-আধটু লিখতে শেখেছে ও। এটাই ওর প্রথম চিঠি।...

'ওয়েক আপ, শৈবাল।' দরজাব ফাঁকে বেথ মিটি মিটি হাসছে। বেথ হুড। শৈবালের সেক্রেটারি।

'হোয়াট হেপেন্ড টু দ্য নাইন ও'ক্লক ট্রেন ?' শৈবাল কোনরকমে মুখ তুলল।

'ইট ইজ লেট, আই গেস।' বেথ আবার হাসল।

প্রত্যেকদিন সকাল ন'টার সময় ওর অফিসের পাশ দিয়ে লং আইল্যাণ্ড রেল রোডের এক্সপ্রেস ট্রেন এই বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। বলতে গেলে ঐ ঝাঁকুনিতেই ওর সকালবেলার ঝিমুনিটা কাটে। ঘরে এখন একরাশ গন্ধের সমারোহ। কি যে মাখে সারা গায়ে এই মেয়ে। চোখ তুলে শৈবাল দেখল বেথ এখনো মিটিমিটি হাসছে। লাল-সাদা ডোরা কাটা প্যান্টের সঙ্গে একটা ফিকে হলুদ রঙের টপ। রজনীগন্ধার মত ঋজু দাঁড়ানোর ভঙ্গী। মাত্র কুড়ি-একুশ বছর বয়স। চীজ খাওয়া চকচকে চেহারা। এ বয়সেই জীবনটাকে অনেকখানি দেখে ফেলেছে বেথ। একটা বিয়ে, একটা ডিভোর্স এর মধ্যেই। তিন বছরের একটা মেয়েও আছে। বিয়েব কথা তুললে এখন ও হাসে। বলে : 'আই মেড এ মিস্‌টেক, আই ম্যারেড মাই ফার্স্ট লাভ।' প্রথম প্রেমকে বিয়ে করতে নেই, সে বিয়ে নাকি টেঁকে না।

'জন প্রাইস উড লাইক টু সি ইউ হোয়েন ইউ হ্যাভ এ চান্স।'

'ওকে ম্যাম।' শৈবাল মুচকি হাসল।

'অ্যান্ড রিমেমবার, আই উইল বি অফ নেক্সট্ থ্রী ডে'জ।'

'হোয়ার আর য়্যু গোইং? স্টেইং হোম?'

'আই উইল বি ভিজিটিং মাই মাদার ইন ফ্লোরিডা। উই হ্যাভ্ প্ল্যান্স টু গো টু ডিস্নিল্যান্ড টুগেদার।'

'বি এ নাইস গার্ল। বিহেভ ইয়োরসেল্ফ। ইফ্ ইয়ু ড্রিংক টু ম্যাচ অ্যান্ড মিস মি, কিস দ্য মিকি মাউস ফর মি, উইল য়্যু?' শৈবাল বেথের চোখে চোখ রাখল।

'ইজ ইট এ হিন্ট?' বেথ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে।

বিকট শব্দ করে ফোন বাজল এই সময়। এই নতুন ফোনটা বড্ড জোরে বাজে। দু কানে হাত রাখল শৈবাল। অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না এই মুহূর্তে। তাই বেথকে বলল: 'হু এভার ইট ইজ. আই অ্যাম নট অ্যাট মাই ডেস্ক। লেট মি গো অ্যান্ড সি প্রাইস।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শৈবালের কানে এল বেথ টেলিফোনে বলছে—'গুড মর্নিং। মিঃ ব্যাগচীস ওয়্যার··' বাগচীর কি দশা হয়েছে এদেশে। ব্যাগচী কথাটা মনে মনে দু'বার উচ্চারণ করতে গিয়ে শৈবাল হেসে ফেলল।

পুরোপুরি রেসিডেনশিয়াল এলাকাতে এই বিরাট কোম্পানি কি রকম যেন বেমানান। কোম্পানী আসলে সুইস। নর্থ আমেরিকায় এইটাই সবচেয়ে বড় ডিভিশন। দশ দশটা ব্লক জুড়ে লং আইল্যান্ড রেলরোডের গা ঘেঁষে বিরাট ফ্যাক্টরি, রিসার্চ ল্যাব ও অফিস। গ্যাস ও প্লাজমা ওয়েল্ডিং প্রসেসের টর্চ ও রোবট বানানো হয় এখানে। এই ডিভিশনের নাম টেরো সিসটেম্স ডেভেলপমেন্ট ইন্ক। এতবড় কোম্পানী, অথচ পুরোপুরি প্রাইভেট। বর্তমান মালিকের পুরো নাম প্রফেসর ডক্টর অনারারি চেয়ারম্যান রেনি ওয়াসারম্যান। সংক্ষেপে পি· ডি· এইচ· সি· আর· ডব্লু। ডাকনাম প্রফেসর। আড়ালে এখানকার কর্মচারীরা বলে গডফাদার। ভাল বোনাস-টোনাস পেলে বলে ড্যাডি।

এই কোম্পানীর গোড়াপত্তন হয়েছিল আঠারো'শ সাতান্ন সালে—সুইৎজারল্যান্ডের লসান শহরে। পাহাড়ে ঘেরা বড় অথচ ছিমছাম শহর। সালটা মনে আছে শৈবালের, কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা স্মরণীয় বছর। কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। একদিকে অবিভক্ত বাংলায় ব্যারাকপুর সৈন্যব্যারাকে তখন বিদ্রোহের শুরু, মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী, তারপর সে

আগুন ছড়িয়ে পরে বহরমপুর সিপাহী ব্যারাকে, এদিকে পাবনায় নীলকর সাহেবের অত্যাচার তখন চরমে, অন্যদিকে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে পিয়ের ওয়াসারম্যান তখন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভিত্তিতে লসান শহরে খুলে বসলেন ছোট্ট একটা রিপেয়ার শপ। তিন বছরের মধ্যেই দূরদর্শী পিয়ের মুনাফার টাকায় শুরু হল ওয়েল্ডিং রড তৈরির কারখানা। সেটা হল আঠার'শ ষাট। পাকাপোক্তভাবে সে বছরই এই কোম্পানীর গোড়াপত্তন।

আগেকার দিনের অনেক পুরুষের মতই পিয়ের জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাছাড়া, ওয়েল্ডিং রডের দৌলতে তখন উদ্বৃত্ত সুইস ফ্র্যাঙ্কে হয়ত শত পুত্রের ভরণপোষণ করতে পারতেন। শত না হলেও পিয়েরের ছেলেপুলের সংখ্যা হাফ ডজন। কনিষ্ঠতম হল রেণি। পুরুষসিংহ পিয়েরের ছেষট্টি বছর বয়সের সন্তান। প্রথমা স্ত্রী তখন মারা গেছেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী ক্রিস্টিনার প্রথম ছেলে। ক্রিস্টিনার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ

অনেক আদরের হলেও রেণি সম্পর্কে পিয়ের খুব সচেতন ছিলেন। শেষ বয়সে পিয়েরের একটা চোখ ছিল আমেরিকায়। একুশ বছর বয়সে খানিকটা জোর করেই রেণিকে পাঠালেন আমেরিকায়। তখনও সাতাশি বছরের বৃদ্ধ পিয়ের পুরোপুরি কর্মক্ষম ছিলেন। লসানের ফ্যাক্টরিতে রোজই যেতেন সকালে। আর, রেণি এসে উঠল ডাউনটাউন ম্যানহ্যাটানে—এখন যেটাকে গ্রীনউইচ ভিলেজ বলা হয়। ছ'মাসের মধ্যেই রেণি অন্য কোম্পানি থেকে ওয়েল্ডিং রড কিনে ফিরি করতে শুরু করল নিউইয়র্কের আনাচে কানাচে—ছোটখাট রিপেয়ার শপে। রাত্তিরে ওয়েটারের কাজ করত ফোরটিন্থ স্ট্রীটের লু-চাউস রেস্টুরেন্টে। বিখ্যাত জার্মান রেস্টুরেন্ট। বছর দুয়েকের অক্লান্ত পরিশ্রমে জমানো কিছু ডলার নিয়ে রেণি ব্রুকলিনে একটা ছোট্ট কারখানা কিনে নেবার কথা জানালেন পিয়েরকে। পিয়ের যা উত্তর দিয়েছিলেন তার সারমর্ম এই: 'আই হ্যাভ নো অবজেকসন, বাট চেক উইথ ম্যাডাম ফেয়ারি।'

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভাগ্যবান, ঐশ্বর্যবান পিয়ের দুটো জিনিসে বিশ্বাস করতেন—ভাগ্য ও পরিশ্রম। পরিশ্রমের ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করেননি কখনো। কিন্তু ভাগ্য জানার জন্য ওঁকে জ্যোতিষের কাছে ছুটতে হত। মনে করতেন সব কিছুই ভাগ্যের খেলা। তাই রেণিকেও ভাগ্য গণনা করিয়ে নিতে বলেছিলেন। বাড়ির কাছেপিঠেই জিপ্সি মহিলার দোকান ছিল। রেণি গিয়ে হাত পাতল তার কাছে। ভবিষ্যৎ জীবনে সেই মহিলাই ছিল রেণির ম্যাডাম ফেয়ারি। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এখনও রেণি ম্যাডাম ফেয়ারির মতামত নিতে ভোলেন

না। এমন কি টেরো সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট নামটাও অন্যান্য তিনটে নামের থেকেই সেই জিপ্‌সি মহিলাই বেছে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নর্থ আমেরিকান ডিভিসনের জুনিয়র, মিডল অথবা টপ ম্যানেজমেন্টে চাকরি পাওয়ার আগে প্রত্যেকের হাতের লেখা ম্যাডাম ফেয়ারিকে দিয়ে বিশ্লেষণ করিয়ে নেওয়া হয়। কারো ভাগ্যে কোন দুর্ঘটনার কোনরকম লক্ষণ প্রকাশ পেলে এই কোম্পানীতে তার প্রবেশ নিষেধ। পিয়েরের তৈরি লসান শহরে সেই ছোট্ট কোম্পানী এখন ওয়েল্ডিং ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর মধ্যে এক নম্বর। পৃথিবীব সমস্ত দেশেই এখন কারখানা। এমন কি বম্বেতেও। মারা যাবার আগে পিয়ের রেণিকে বলেছিলেন—'আমি জানতাম তুমি পারবে—ম্যাডাম ফেয়ারি আমায় বলেছিল।' নর্থ আমেরিকাব এই বিরাট ডিভিশনটা অবশ্য পিয়ের দেখে যেতে পারেননি। পিয়ের মারা যাবার বছর পাঁচেক পর এই বিল্ডিং কিনেছে রেণি। এই ডিভিশনই হল লক্ষ্মী। ওয়েল্ডিং ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর ক্যাডিলাক। এর উদ্বৃত্ত ডলার দিয়েই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে অন্যান্য তিরিশটি দেশের কারখানা। ছোট্ট হলেও লসান এখনো হেড অফিস। রেণি ওখানেই বসে। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতার এই মানুষটি তাঁর নিজস্ব টেরো জেটে চেপে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। সতর্ক দৃষ্টি সব সময়ই থাকে নিউইয়র্কের দিকে। তাছাড়া, ওয়েল্ডিং ইণ্ডাস্ট্রির একটা বিরাট গুণ যে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুবই কম। বরঞ্চ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময়েই লোকে নতুন মেশিন না কিনে রিপেয়ারের কথা ভাবে। অর্থাৎ ওয়েল্ডিং ব্যবসার সোনায় সোহাগা। আলুর গুদাম পুড়লে গোপাল ভাঁড়ের মত। শুধু সজাগ থাকতে হবে কোন সেক্টরে ধ্বস নেমেছে—তারপর শকুনের পালের মত সেল্‌সম্যানরা ছড়িয়ে পড়বে। সব কিছু মিলিয়ে রেণি ও রেণির ব্যবসা দুইই রিসেশন প্রুফ। টেরো সিস্‌টেমসের প্রথম দিককার লোকজনের মধ্যে জন প্রাইস একজন। উনিশ'শ তেত্রিশ সাল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমেরিকাতেও বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আরো অনেক কিশোরের মত জনও হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শহরের কানাচে কানাচে। ষোল বছর বয়সটা তার একমাত্র মূলধন। সবে হাইস্কুলের গণ্ডী পেরিয়েই নেমে পড়ে বাজারে। ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা ক্লান্ত হয়েই এসে দাঁড়িয়েছিল রেণির দোকানের সামনে। চাকরি চেয়েছিল। নাম জিজ্ঞেস করতে বলেছিল : 'জন প্রাইস।' নামটা শুনে মুচকি হেসেছিল প্রফেসর। বলেছিলেন : 'উই হ্যাভ এ সেলসম্যান অলমোস্ট বাই দি সেম নেম—জন রাইস।' জন মরীয়া হয়ে বলেছিল : 'প্রাইস কামস্ বিফোর রাইস, অ্যাট লিস্ট উইথ ইট। ট্রাই মি।'

একটা কাগজে নিজের হাতে নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে রেণিকে দিয়ে এসেছিল জন। সেদিনই সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার পথে জনের হাতের লেখা ম্যাডাম ফেয়ারির কাছে দিয়ে এসেছিলেন প্রফেসর। তার সপ্তাহ খানেক বাদেই জন শুরু করল কাজ। কোন টাইটেল নেই। ওজন করে কেমিক্যাল ঢেলে ঢেলে ওয়েল্ডিং রডের ফ্লাস্ক তৈরি করতে হবে। সপ্তাহে পাঁচ ডলার মাইনে। গ্রেট ডিপ্রেসনের বাজারে পাঁচ ডলার ছিল অনেক টাকা। তখনকার জিনিসপত্রের দাম শুনলে এখন রূপকথা বলে মনে হয়। বাবা-মার কাছে গল্প শুনেছে শৈবাল। দু আনায় পাঁচটা ইলিশ মাছ পাবনার খোলা বাজারে বিক্রী হত।

প্রথম দিককার লোক বলেই হোক, অথবা রেণির পেয়ারের মানুষ বলেই হোক এই ডিভিশনে মরা না পর্যন্ত জন অমর। অর্থাৎ চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। এখনও তদারকে এই ডিভিশনে এলে সন্ধ্যেবেলা রেণির অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জনও লোকাল বারে যাওয়ার আমন্ত্রণ পায। হাতে পায়ে কাজ শিখেছে জন, লেখাপড়া শেখেনি। প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল এই ডিভিশনে। মাঝখানে ন'বছর বাদ। একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। এই সময়টা মেরিনে যোগ দিয়েছিল ও। পঞ্চাশ সালে আবার জন প্রাইস ফিরে এল রেণির ব্যবসায়। নতুন উদ্যমে শুরু করল কাজ। টাইটেল হল লাইন ফোরম্যান। লোকজন না এলে নিজের হাতে এক্সস্ট্রুডার চালাত। একই বছর মহাত্মা গান্ধী নিহত হলেন, শৈবালরা ডোভার লেন থেকে উঠে এল লেক মার্কেটের কাছে জনক রোডে। তার পরের বছর শৈবাল ভর্তি হল বয়েজ আইডিয়াল স্কুলে, ভবানীপুরে। জন প্রাইস গান্ধীজীর নাম শোনেনি। অন্যান্য অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত আমেরিকানদের মতই। তবে লোক খারাপ নয়।

এ কোম্পানীতে জয়েন করার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই জনের সঙ্গে শৈবালের একটা ছোটখাটো দ্বন্দ্ব হয়। দ্বিতীয় দিন গর্ডন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। জন বলেছিল : 'শয়বাল—দ্যাট্স টু টাফ। আই উড কল য়্যু স্যাম।'

নাম পাল্টাতে শৈবালের আপত্তি : 'আই উড লাইক টু বি কল্ড শৈবাল—দ্যাট্স মাই নেম।'

জন একটু হেসে উত্তর দিয়েছিল : 'উই ডোন্ট ক্যারি ইন্ডিয়ান নেমস্ চিফ্...একসেপ্ট এলিফ্যান্টস্।'

শৈবাল কোন উত্তর দেয়নি। কিন্তু রাগ পুষেছিল মনে মনে। ভেবে রেখেছিল সুযোগ পেলে উত্তর দেবে কোনদিন।

অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগটাও এসে গেল দিন তিনেকের মধ্যেই। বাজেট

মিটিং-এ প্রোডাকশনের বাজেট পেশ করে প্রোডাকশন কন্ট্রোলার জন প্রাইস শৈবালকে প্রশ্ন করেছিলেন : 'হোয়াট ডু য়্যু সে স্যাম ?'

শৈবাল যেন প্রশ্নটা লুফে নিয়ে বলল : 'আই ডোণ্ট সি এনি বেসিক ফ্ল, ডিক। বাট...

জন প্রাইসের মুখ চোখ কঠিন হল। বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জন : 'আই অ্যাম নট ডিক।'

শৈবাল মুচকি হাসল এইবার : 'দ্যাট্‌স রাইট। য়্যু আর জন ওনলি ইফ্ আই অ্যাম শৈবাল।'

অপমানে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল জন। বিড়বিড় করে বলেছিল : 'আই ডোণ্ট বিলিভ ইট।'

অথচ, শৈবালের চাকরিটা টিঁকে গেল। হয়ত বা দিনকাল বদলে গেছে। কিংবা হয়ত জন আসলে মানুষটা খারাপ নয়। পরের দিন সকালে নিজেই এসে শৈবালের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল জন। বলেছিল : 'য়্যু আর হট্ স্টাফ্, চিফ্।'

শৈবাল হেসেছে—'আই স্টিল হ্যাভ সাম লেটেন্ট হিট, মে বি।'

সেই থেকে জনের সঙ্গে শৈবালের কোন বিরোধ নেই। জন একেবারে পরিষ্কার বাঙালী উচ্চারণে শৈবাল বলে ডাকে। ঠিক মনে হবে কোন বাঙালী ডাকছে।

অ্যাটমাইজিং চেম্বারে ঢুকে জনকে কোথাও দেখতে পেল না শৈবাল। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে এল মেল্টিং ডকে। এখানে একটা ভ্যাপ্‌সা গরম। এক'শ ফারেনহিটের বেশি। পাঁচ হাজার পাউণ্ডের দু'দুটো ফারনেস রয়েছে এই ডকে। ফোরম্যান কার্ট হেমারকে প্রশ্ন করতে ও বলল জন বোধহয় টেরো ল্যাবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে শৈবাল কারখানার অপর প্রান্তে টেরো ল্যাবের দিকে এগোল।

টেরো ল্যাবে রোবট টেস্টিং হচ্ছে। কাঁচের জানালা দিয়ে শৈবাল ল্যাবের ভেতর জন প্রাইসকে দেখতে পেল। খুব উত্তেজিতভাবে ল্যাবের ফোরম্যান টম রোলিনসকে কিছু একটা বোঝাচ্ছে। জনকে দেখলে মনেই হয় না সাতষট্টি বছর বয়স। খুব বেশি হলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দেখায়। সুইং ডোর ঠেলে ল্যাবের ভেতরে ঢুকে পড়ল শৈবাল। জন দূর থেকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল : 'আই ওয়াজ লুকিং অল ওভার ফর য়্যু, ওল্ড ম্যান।'

শৈবাল : 'আই অ্যাম অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, ড্যাডি।'

জনের পাশাপাশি হেঁটে শৈবাল জনের অফিসে পৌঁছে গেল। নতুন গ্যাপ মিনি রোবট মাস প্রোডাকশনে যাবে আগামী সপ্তাহে। এ ব্যাপারটায় জন খুব

দুশ্চিন্তায় আছে। ডিজাইনটা এখনো জনের খুব পছন্দ নয়। টেস্টিং-এ এখনো ভুলভাল হচ্ছে। জন সতর্ক করল শৈবালকে : 'উই ক্যান্ট অ্যাফোর্ড এনি লাকসারি দিজ ডেজ। উই মে নেভার গেট এ চান্স টু মেক ইট আপ।'

কথাটা সত্যি। দিনকাল বেশ খারাপ। কোন কিছুই সহজ নয় আজকাল। টেরো সিসটেমস্-এর মনোপলিও আর নেই। রাতারাতি গত দশ বছরে অন্তত গোটা তিরিশেক কম্পিটিটর গজিয়ে উঠেছে সারা দেশে। অবশ্য, কোয়ালিটির ভিত্তিতে টেরো এখনও ক্যাডিলাক। কিন্তু মুশকিল এই যে লোকে ক্যাডিলাক না কিনে সস্তার দিকে ঝুঁকছে আজকাল। এই গ্যাপ মিনি রোবট খানিকটা সস্তার বাজারে বিকোবার মাল।

কাজেব কথাবার্তা শেষ হলে জন মানিব্যাগ থেকে ছবি বার করল কিছু। শৈবালের হাতে দেবার আগে বলল : 'মাই গ্র্যাণ্ড ডটার ইজ অ্যান অ্যাক্‌ট্রেস। লুক অ্যাট হার। দ্য স্নো-হোয়াইট। শি ইজ ওনলি সিক্স।'

স্নো-হোয়াইটই বটে। ফুটফুটে সুন্দর দেখতে মেয়েটা। স্নো-হোয়াট সেজে, ফুলো ফুলো গালে লাল রং মেখে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। জীবনের প্রথম থিয়েটার করার কথা মনে আছে শৈবালের। অনেক শিশুর জীবনেই প্রথম থিয়েটার করার অভিজ্ঞতা একটা বিরাট ব্যাপার।

যে বছর জনক রোডে উঠে এল সেবার পুজোতেই শৈবালের জীবনের প্রথম থিয়েটার করা। আগস্ট মাসেই ঠিক হয়ে গেল যে পাড়াতেই বটকৃষ্ণ পালের বাড়ির ছাদে ম্যারাপ বেঁধে একাদশীর দিন 'ধাত্রীপান্না' হবার কথা হল। পাড়ার অনেক বড় বড় ছেলেমেয়ে শৈবালের মাকে এসে ধরল : 'মাসিমা, শৈবালকে লাগবে আমাদের।'

মা হেসে বলল : 'ও কি পারবে ? ও তো খুব ছেলেমানুষ। যদি ভয় পেয়ে যায়।'

ঢ্যাঙা, কাল মতো একটা ছেলে, চোখে-চশমা যাকে শৈবাল পরে 'তপনদা' বলত সেই বাঁচিয়ে দিল প্রথম যাত্রা : 'ওকে ত আমরা কনক ভেবেছি। ছেলেমানুষও চাই আবার ভয় পাওয়া চাই।'

সেই সময় শৈবালের মনে হত বড়রা খুব হিংসুটে। যত নিয়ম সব ছেলেমানুষদের জন্য। বড়দের যেন কোনও নিষেধ নেই। তাছাড়া 'ছেলেমানুষ' বললে শৈবালের খুব মনে লাগত। হয়ত এর থেকে গালে একটা চড় খাওয়াও ভাল। ভাগ্যিস, তপনদা একটা লাগসই উত্তর দিয়েছিল, না হলে ব্যাপারটা তো মা প্রায় মিটিয়েই দিয়েছিল।

মা তাও প্রশ্ন করল : 'কখন রিহর্সালি তোমাদের ? সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুলের পড়া-টড়া সেরে ও কখনই-বা রিহার্সালি দেবে ?'

এবারে রক্ষা করল ইলাদি : 'মোটে ত একদিন রিহার্সালি সপ্তাহে। রবিবার দুপুরে। মাত্র দু' ঘণ্টা করে। আমি এসে নিয়ে যাব আবার পৌঁছে দিয়ে যাব।'

অকাট্য যুক্তি। মাকে রাজী হতেই হল অগত্যা। আলাপ হওয়ার আগেই ইলাদি আর তপনদাকে ভালবেসে ফেলল শৈবাল। সেটা ছিল বোধহয় সোমবাব।

মঙ্গলবার থেকে ববিবার পর্যন্ত শৈবালের যে কিরকম কেটেছিল আজ তা বলে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। সে এক অদ্ভুত উত্তেজনা। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে লাগল রোজ। সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে যে রকম সব সুন্দর পোশাক দেখেছিল—ভাবতেই অবাক লাগছিল যে ও নিজেও ঐবকম সব পোশাক পরবে। ওর অভিনয় দেখে হাজার হাজার লোক যখন হাততালি দেবে তখন মা কত অবাক হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে গর্বে বুকটা ফুলে উঠল ওর—বটকৃষ্ণ পালেব বাড়ির ছাদে যে পঞ্চাশ-ষাট জনের বেশি মানুষ ধরে না সেটা মনেই এল না শৈবালের। অন্যমনস্ক হয়ে স্কুলে বকুনি খেল দু' চারবার। জানা বানান ভুল করল। বানানের মাস্টারমশাই শ্যামাদার কাছে কান মলাও খেল তার জন্য। শ্যামাদাকে অবশ্য এমনিতেই পছন্দ করত না শৈবাল। শৈবাল নিজের চোখে দেখেছে শ্যামাদা বিড়ি খায়। মাঝে মধ্যে স্কুল রাস্তার মোড়ে গাছতলায় ইঁটের ওপব বসে নাপিতের কাছে দাড়ি কামায়। শৈবালের ধারণা ছিল ভাল লোকেরা সিগারেট খায়। ভাললোকেরা রাস্তায় বসে মোটেই দাড়ি কামায় না, নাপিত ওদের বাড়িতে আসে।

অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা অনেক উত্তেজনা বুকে লুকিয়ে ইলাদির হাত ধরে রিহার্সালে গিয়ে মনটা একটু দমে গেল প্রথমে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। ইলাদির বোন শীলাদি। পাশের বাড়ীর নবকৃষ্ণ, মোড়ের মাথার দীপুদা, ওদেব বাড়ির ওপরতলার গোবিন্দ। গোবিন্দর অবশ্য কোন পার্ট নেই। ও শুধু দেখতে এসেছে। দু'একদিন পরে শুনেছিল মুখে বসন্তের দাগ ছিল বলে গোবিন্দকে নেওয়া হয়নি। মুখে বসন্তের দাগের সঙ্গে পার্ট করার কি সম্পর্ক বুঝতে পারেনি শৈবাল।

তপনদা আর দীপুদা সিগারেট খাচ্ছিল। কালো চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা সিগাবেট। খুব সুন্দর গন্ধ এসে লাগছিল নাকে। ইলাদি পেয়েছে ধাত্রীপান্নার পার্ট। ইলাদিকে মানিয়েছেও খুব সুন্দর। তপনদা হবে সর্দার। শৈবাল করবে কনকের

পার্ট, আর নবকৃষ্ণ হচ্ছে উদয়। তপনদাই সবাইকে দেখিয়ে দিতে লাগল পার্ট। কনকের পার্ট অবশ্য খুবই ছোট। প্রথম সিনেই মরে যাওয়া। ধাত্রীপান্না, অর্থাৎ ইলাদি—কনক অর্থাৎ শৈবালকে উদয়ের জামাকাপড় পরিয়ে উদয়ের খাটে শুইয়ে দেবার আগে কনককে জড়িয়ে ধরে আদর করা আছে এই দৃশ্যে। এখানে ইলাদি কেঁদে কেঁদে এত সুন্দর করে বলল যে স্বাভাবিক ভাবেই শৈবালের চোখে জল এসে গেল—কান্নায় বুকটা এত ভরে গেল যে 'মা' বলে ডাকতেও ভুলে গেল কনক। ও শুধু কাঁপতে কাঁপতে ইলাদির বুকে মাথা গুঁজে কেঁদে ফেলল ফুঁপিয়ে। সবাই হাততালি দিয়ে উঠতে লজ্জা পেয়ে গেল শৈবাল। তপনদা হাসতে হাসতে বললেন : 'খুব স্বাভাবিক হয়েছে শৈবাল। কিন্তু যতই কান্না পাক মা বলে চীৎকার করে ডেকে তবে ধাত্রীপান্নার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে' এই দুটো শব্দে যেন পৃথিবীর সব কিছু আশ্বাস ছিল। তপনদাদের সিগারেটের মন মাতান গন্ধ, অত সুন্দর সুন্দর কথা, বাবা-মা মাস্টারমশাইদের বাদ দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন দুটো ঘন্ট সময়, তাছাড়া ইলাদির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'মা' বলে কেঁদে ওঠার একটা আলাদা মাদকতা তো আছেই। ইলাদিকে খুব সুন্দর দেখতেও ছিল। আর, কি বিরাট আর নরম বুক। অন্ততঃপক্ষে, দুটো, তিনটে কনক ওখানে দিব্যি মাথা গুঁজে কাঁদতে পারত। একটা রবিবার শেষ হলে প্রতীক্ষা শুরু হত পরের রবিবারের। রোজ রিহার্সাল হলেও কোন আপত্তি ছিল না ওর। আর রিহার্সাল শুরু হবার পর থেকেই হাতের লেখা বানান সব কিছুই নির্ভুলভাবে করে ফেলত শৈবাল। পাছে, মা পড়াশুনোর অজুহাত দেখিয়ে থিয়েটার বন্ধ করে দেয়।

আচমকা ঝড় এল। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো দাদুর চিঠি এল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। কাছারির নায়েব ইসমাইল কাকার সঙ্গে ছানার মুড়কি, রাঘবসই, বেশ কিছু টাকা ও দাদুর সেই সংক্ষিপ্ত চিঠিটা এল। চিঠিটা পড়েনি শৈবাল কিন্তু রাতে খাওয়ার সময় বাবা মাকে বলল : 'চল, তাহলে ছুটিতে পাবনাতেই ঘুরে আসি।' শৈবালের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। মা বললেন : 'হ্যাঁ, ভালই হবে। কলকাতায় যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। ওদের ছুটি শুরু মহালয়ার দিন। চল-না পরের দিনই যাই। তাহলে প্রায় একমাস থাকা হবে।' বাবা বললেন—'দেখি অফিসে কথা বলে—যদি ছুটি পাওয়া যায়।' শৈবাল শুধু অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে থাকল অদ্ভুত যন্ত্রণায়। খালি মনে হতে লাগল বাবা নিশ্চয়ই ছুটি পাবে না—মার নিশ্চয়ই মনে পড়বে যে শৈবালের একটা

থিয়েটার আছে একাদশীর দিন। বিছানায় শুয়ে ভগবানকে ডাকল প্রাণপণ—বাবার ছুটিটা যেমন করেই হোক ভগবান যেন কাঁচিয়ে দেয়।

সেই রবিবার ইলাদি নিতে এল না। খেয়ে দেয়ে অনেকক্ষণ ঝোলাবারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল শৈবাল। মা নিশ্চয়ই ইলাদিকে বলে দিয়েছিল। গোবিন্দ এল একটু পরে। বীরদর্পে শৈবালকে বলল : 'তুই চলে যাচ্ছিস। আমি কনক হব।' বুকের ভেতরে বোধহয় রক্তক্ষরণ, কিন্তু গোবিন্দকে একটু বুঝতে না দিয়ে বলল : 'ভালই ত। আমি তো পাবনা যাচ্ছি। ওখানে বিরাট বড় মেলা হয়, জানিস।' বুক ফেটে কান্না পাচ্ছিল শৈবালের। মিথ্যে কথা। পাবনায় মোটেই কোন মেলা হয় না। ইলেকট্রিক লাইট নেই, বাত্তিরে ঝিঝি পোকা ডাকে, ইছামতি নদীতে জোঁকের ভয়, ওরা কেউ থিয়েটার জানে না, একটা মেয়েও ইলাদির মত সুন্দর নয়, তপনদার মত মনমাতান সিগারেট কেউ খায় না ওখানে। এই অদ্ভুত সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে পাবনায় যেতে হবে ভাবতেই চোখে জল এসে গেল ওর। তারপরেই রাগটা গিয়ে পড়ল ইলাদির ওপর। তার মানে, ইলাদি একটু ভালবাসে না ওকে। বেশ তো, করুক না গোবিন্দ। ইলাদির কথা শুনে ও যেরকম কাঁদত. পারবে গোবিন্দ ঐ রকম কাঁদতে ? আর, গোবিন্দর মুখে যে গিজ গিজ করছে বসন্তের দাগ ওগুলো ঢাকবে কি কবে ? পুলটিস দিয়ে অতগুলো দাগ ঢাকা যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে শৈবাল চোখ বুজে ভগবানকে বলল থিয়েটারের দিন গোবিন্দর যেন পেট খারাপ হয়।

বটকৃষ্ণ পালের বাড়ির ছাদে থিয়েটার চলছিল যখন, শৈবাল তখন পাবনায়। দোতলার টানা বারান্দায় ওকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছিল হোঁদল, চন্নাদা, সুবেন, উত্তমা, পুরবীদি। একটু দুরেই ফুলকুমারী। হিন্দুস্থানী মেয়ে—দেখাশুনো করে বাচ্চাদের। অবাক হয়ে এরা সবাই শুনছিল শৈবালের ধাত্রীপান্নার গল্প। হঠাৎ শৈবাল বলল : 'আমি বলে বলে দেব পার্ট করবে সবাই ?' সবাই ঘাড় নেড়ে জানাল রাজী। পূরবীদি ধাত্রীপান্না হতে চেয়েছিল। কিন্তু পূরবীদি যে বড্ড ছোট, এই জন্যে পূরবীদিকে উদয়ের পার্ট দিল শৈবাল, নিজে নিল কনক। ফুলকুমারীকে দিল ধাত্রীপান্নার পার্ট। চন্নাদা আপত্তি জানাল · 'ধাত্রীপান্না তো বাঙালী।' শৈবাল বলল : 'তার কোন মানে নেই।' আসল কথাটা শৈবাল চন্নাদাকে বলতে পারল না। বড় বড় বুক না থাকলে কেউ কি মা হতে পারে। ঠিক ইলাদির মত বিরাট বুক ফুলকুমারীর। গোবিন্দর মত ওর মুখেও ছুঁচ ফোটানোর মত বসন্তের দাগ। তা হোক অন্ধকারে অত বোঝা যাবে না। মুখে মুখে থিয়েটার তৈরি হল। কনকের মরা পর্যন্তই জানত শৈবাল। কনক যেখানে

মা বলে ডেকে ধাত্রীপান্নার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ জায়গাটায় শৈবাল পাগলের মতো কেঁদেছিল। পূরবীদি, চন্নাদারা হাঁ করে তাকিয়েছিল। ফুলকুমারী মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। শৈবাল কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। ধাত্রীপান্নার বুকে মাথা ঠুকে কনক বার বার মনে মনে বলেছিল—তোমায় আমি একদম ভালবাসি না ইলাদি।'

সেবারই বাবার সঙ্গে দাদুর খুব কথা কাটাকাটি হল। শৈবাল আর হোঁদল ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি সই করাচ্ছিল। ছাদের উত্তর দিকের কার্নিশটা ভেঙ্গে পড়েছে। এতগুলো ছেলেমেয়ের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু কোন শরিকই পয়সা কড়ি খরচ করতে রাজী নয়। আয় বলতে তো দাদু আর ভাল কাকু ছাড়া কেউ কাজ করে না বিশেষ। দাদু পাবনা কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন—মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বেশ কমে গেছে। তাছাড়া মক্কেলরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনাজপাতি, মাছ ইত্যাদি দিয়ে সারতে চায় পয়সার বদলে। হাওয়াও পাল্টাচ্ছে দিন দিন। ইসমাইল কাকাকে নিজের কানে বলতে শুনেছে শৈবাল : 'দিন কালের রকম ভাল নয় সেজ কাকা। মাইন্‌সেরে ভয় লাগে আজকাল।' দাদু অবশ্য ইসমাইল কাকার কথা অতটা আমল দেয়নি কোনদিন। ভাল কাকু জেলা স্কুলে পড়ায়—নামমাত্র মাইনে। দাদু ছাড়া বাকি শরিকদের আসল আয়টা আসে দোকান আর বাণী টকিজের ভাড়ার টাকা থেকে। তাও, আয়টা প্রায় প্রত্যেক মাসেই কমছে। রূপালী টেলর্স-এর বিজয় মণ্ডল এসে কাকুতি-মিনতি করে গেছে ইসমাইল কাকার কাছে : 'দুই মাসের ভাড়া মাপ করে দ্যান। ব্যবসা নাই।' দু'মাসের জায়গায় তিনমাস হতে চলল এখনও ভাড়া দেবার নাম নেই। বাণী টকিজের বিক্রীও কমে গেছে অনেক। মানুষ জনের সব পয়সা বোধহয় পেটের ধান্দাতেই চলে যাচ্ছে। তবুও, নামে-বেনামে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হাটুরিয়ার কুড়ি-তিরিশ বিঘে জমির ধান চালটা, আর উদ্বৃত্ত আম, জাম, কাঁঠাল বিক্রীর কিছু কিছু টাকা এখনো আসছে এই যা রক্ষে। এই সব দেখেশুনে বাবার খুব ভয় লাগত। তাই দাদুকে বলেছিলেন : 'এখানকাব পাঠ উঠায়্যা কলকাতা চল্যা আসেন। সরকারের ভাল ইন্‌সেনটিভ স্কিম আছে। এখানকার বাণী টকিজ আর বাড়িটা এক্সচেঞ্জ করলেই...' বাবার কথা শেষ হবার আগেই দাদু বাধা দিলেন : 'ক্যালকেশিয়ান বনেছ ভাল। ভিটে বাড়িটাও উচ্ছেদ করার তাল আছে দেখছি। তাছাড়া আছে কি কলকাতায় ? ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশের রঙটাও দেখা যায় না।' বাবা আর কিছু বলেননি—বোধহয় রেগে। শৈবালের একবার ইচ্ছে হল একবার বলে—'কথাটা ঠিক নয় দাদু। কলকাতা কিন্তু খুব মজার।' তা আর

বলা হল না। গট গট করে নেমে জিতেন্দ্রজিৎ কুয়োতলা পেরিয়ে বাগানের দিকে চলে গেলেন। দাদুর বাগানের খুব সখ ছিল। এইয়া বড় বড় গোলাপ হত বাগানে। কলকাতার বাড়িতে পেয়ারা গাছ, শতদলি জবা, মাধবীলতা আর ছাদের ওপর শ'খানেক টবে রজনীগন্ধা, গোলাপ, গাঁদা সব দাদুই লাগিয়েছিলেন—পাকাপাকিভাবে কলকাতা চলে আসার পর। সে সব অবশ্য অনেক পরের কথা। মাত্র মাসখানেক আগে মাসীমণি চিঠিতে লিখেছে মাধবীলতা গাছটা নাকি কেটে ফেলা হয়েছে। বড্ড শুঁয়োপোকা হচ্ছিল।

নিজের ঘরে ফিরে ডেস্কের ওপর বেথের লেখা একটা নোট পেল শৈবাল—'টিয়া কল্‌ড। কল হার হোম বিফোর টেন থার্টি। আরজেন্ট। গুড লাক।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল এগারটা। কি ব্যাপার! হঠাৎ এতদিন পরে মনে পড়েছে বোধহয়। টিয়ার কথা মনে হতেই কানের দুপাশ গরম হয়ে গেল ওর। বেশ কিছুদিন আগে সেই বিখ্যাত টেলিফোন কল্‌টার কথা এখনো ভোলেনি। পুরুষ মাত্রেই যে জন্তু এবং শৈবাল যে কিছু আলাদা নয় এ সম্পর্কেও টিয়ার বিলাসের দৃঢ়তা শৈবালকে অবাক করেছিল। বিশ্বাসটা কি পাল্টেছে কয়েক দিনে—নাকি আরো কিছু অভিযোগ জমা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। গত একমাসে টিয়া ওর স্মৃতিকে নাড়া দিয়েছে বহুবার—কতবার মনে হয়েছে ফোন করে একবার—কিন্তু অনেক কষ্টে সংযত রেখেছে নিজেকে। টিয়ার ভুলটা নিজেকেই ভাঙ্গতে হবে—ও ভেঙ্গে দেবে না কিছুতেই। ফোন করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে একটা সিগারেট ধরাল শৈবাল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। গাছগুলো এখনো ন্যাড়া। তবে পাতার ছোট ছোট কুঁড়ি গজাতে শুরু করেছে এখন। গায়ে শেওলার মত ছোপ। এই রাস্তার ওপর কয়েক গজ দূরেই লং আইল্যান্ড রেলরোড-এর ওপর একটা ছোটখাট ব্রীজ। ব্রীজ না বলে সাঁকো বলাই ভাল হবে। ও পাড়ার লোকদের এপারে আসার জন্য। পাশাপাশি দু'জনের বেশি হাঁটা যায় না। সিঁড়িতে বসে কয়েকটা ছেলেমেয়ে গল্প করছে। এদেরকে দেখে শৈবালের খুব খুশি খুশি লাগল। মনে হল আর কয়েকদিন পরই সামার এসে যাবে নিশ্চয়ই। একটা মেয়ে আর একটা ছেলে নাচছে। আরেকজনের কোলে ট্রানজিস্টর। কাঁচটা বন্ধ বলে শৈবাল কোন গান শুনতে পেল না। গাছ ভর্তি ছোট ছোট পাতার কুঁড়ি, ঝকঝকে রোদ আর নিঃশব্দ নাচ খুব ভাল লাগল ওর।

চেয়ারে ফিরে বসতে না বসতেই ফোনটা বেজে উঠল। টিয়া বোধহয়।

কোনরকম আবেগ যাতে প্রকাশ না পায়, তাই নিজেকে তৈরি করে নিল শৈবাল। গলাটা যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা রেখে বলল : 'বাগচি।'

'তুই কি মরে গেছিস ?' তাপসের গলা শুনতে পেল শৈবাল।

'তাই মনে হল তোর ?'

'গলাটা যে বড্ড মরা মরা শোনাল ?'

'কি অদ্ভুত দেখ, দু মিনিট আগেই মনটা এত খুশি ছিল অথচ গলাটা এখন মরা মরা।' শৈবাল আসল কথাটা তাপসকে বলল না—'তারপর, কি খবর তোর ?'

'দারুণ। অসাধারণ। লা জবাব।'

'এত উচ্ছ্বাস কিসের ? নতুন করে প্রেমে পড়লি নাকি ?'

'না, প্রেমে নয় গাড্ডায়।' এতক্ষণে তাপসের গলাটা একটু গম্ভীর শোনাল।

'গাড্ডা কি রকম ?' শৈবাল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

'আপদ চুকেছে। বাঁচা গেছে।' এবার তাপসকে রীতিমত রহস্যজনক লাগছে।

'একটু ঝেড়ে কাশ না বাবা ; নাকি ধাঁধায় পেয়েছে তোকে।' শৈবাল অধৈর্য হল সামান্য।

'চাকরিটা গেছে। পাঁচ মিনিট আগে।' তাপস এমন ভাবে কথাটা বলল যেন একটু আগেই বিরাট একটা প্রমোশন হয়েছে ওর। অন্তত শৈবালের তাই মনে হল।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। শৈবাল কি বলবে বুঝে পেল না কিছুতেই। নীরবতা ভেঙ্গে তাপসই আবার কথা বলল : 'কি রে মৌনীবাবা বনে গেলি যে। প্রথম পাঁচ মিনিট আমারও দুঃখ, শোক ইত্যাদি হচ্ছিল। এখন বেশ হাল্কা লাগছে। ভাবলাম তোকে একটা ফোন করি—ঘটনাটা স্পেশ্যাল, তাছাড়া ফ্রাইডে বলে কথা—একটা সেলিব্রেশন তো অন্তত করা যেতে পারে।'

শৈবাল সহজ হল খানিকটা : 'কি ব্যাপার লে-অফ নাকি ?'

'না, ঐটাই যা একটু বদার করছে আমাকে। চাকরি গেছে বলে নয়। শুয়োরের বাচ্চা ল্যাং মারল আমাকে।' এবার যেন তাপসের গলায় রাগ।

'খটাখটি হয়েছিল নাকি ?'

'না খটাখটি হয়নি। মাসখানেক আগে শালা আমায় একটা প্রমোশন দিয়েছিল। তখন বুঝিনি। শকুনির মতো পাকা প্লেয়ার একেবারে। পুরোটা ফোনে বলা যাবে না। বিকেলে কি করছিস ?'

'বিশেষ কিছু নয়', শৈবাল মনে করার চেষ্টা করল।

'তাহলে চলে আয় সিক্স হানড্রেড ওয়েষ্টে বিকেল বেলা। সাত কাণ্ড রামায়ণ, আর মাল, দুইই উপভোগ করতে পারবি। প্লীজ, না বলিস না। তাছাড়া, এত বড় একটা অকেশন—স্মৃতির ফ্রেমে বেঁধে রাখতে হবে ত ? কখন আসছিস বল ?'

'সিক্স হানড্রেড ওয়েষ্টে আবার কে থাকে ? তুই আবার ওখানে জুটলি কি করে ? টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রীটের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিস নাকি ?'

'না, আমার ঘর আমারই আছে। রথীন, সঞ্জয় ওরা অনেক করে যেতে বলেছে। কাল কথা দিয়েছি। জানতাম না তো আজকে চাকরিটা যাবে। চলে আয় না। তোর গোমড়া মুখে ত শালা অনেকদিন হাসি দেখিনি।' তাপস একেবারে নাছোড়বান্দা।

'আচ্ছা ঠিক আছে, আসছি।' শৈবাল হেসে ফেলল।

'মালের একটা বোতল নিয়ে আসিস, আজকে শালা পয়সা খরচ করতে আমার বুকটা ফেটে যাবে। তোব চাকরি গেলে আমি তোকে খাওয়াব।' তাপস ছেড়ে দেবার আগে আবার বলল : 'তাড়াতাড়ি আসিস, অন্য কোথাও ফেঁসে যাস না। ছাড়ি এখন।' শৈবালকে প্রায় উত্তরের কোন সুযোগ আর না দিয়েই ফোনটা কেটে দিল তাপস।

তাপসটা এতটুকু বদলায়নি। কফি হাউসি মেজাজটা দিব্যি জিইয়ে রেখেছে এখনো। স্কুলে থাকতেই মুখে খই ফুটত সব সময়। বদ বুদ্ধি মাথায় ঘুরত সব সময়। ক্লাস সেভেনে কালিবাবুর সঙ্গে ওর বিখ্যাত ডায়ালগটা এখনো মনে আছে শৈবালের। কালিবাবু ক্লাসবোর্ডে লেটার লিখতে দিয়েই টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে টিউশানির খাতা দেখতেন। সেদিনের ইংরিজী ক্লাসের লেটার ছিল—'রাইট এ লেটার টু ইয়োর ফ্রেণ্ড অ্যাবাউট দি ম্যারেজ সেরিমনি য়্যু জাস্ট অ্যাটেণ্ডেড।' কালিবাবু মন দিয়ে খাতা কারেক্ট করছিলেন আর পেছনের বেঞ্চিগুলোতে 'মোহন ও স্বপন' বইটা চালাচালি হচ্ছিল। কর্মকাণ্ডের নায়ক ছিল তাপস। 'আলিঙ্গন', 'চুম্বন', অথবা 'সুইমিং কষ্টউম' ইত্যাদি সব কটা সম্পূর্ণ শব্দে দাগটাগগুলো ওই দিয়ে দিত—যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই যে কেউ প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো পড়ে ফেলতে পারে। সেদিন বোধহয় সোরগোলের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল—কিংবা হয়ত কালিবাবু আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হন হন করে হেঁটে গিয়ে বামাল সমেত তাপসকে গ্রেপ্তার করলেন। সারা ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা। উল্টে-পাল্টে পুরো বইটা দেখলেন—দাগ দেওয়া থাকায় বুঝে গেলেন কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

প্রশ্ন করলেন : 'বইটি কার ?'

কোনও উত্তর নেই কোথাও। তাপস উদাস নয়নে জানালার দিকে তাকিয়ে।

একটু বাঁকা হেসে কালিবাবু বললেন : 'বেশ, বইটি তবে বাজেয়াপ্ত হল। যদি কারও মনে পড়ে টিচার্স রুম থেকে নিয়ে এস কাল।' মাথা খারাপ! ক্লাস সেভেনের ছেলেরা কি এতই বোকা যে বই ছাড়াতে যাবে।

তারপর, তাপসের দিকে তাকিয়ে বললেন—'লেটার কতখানি লিখেছ পড়ে শোনাও। খাতা নিয়ে এস।'

গটগট করে হেঁটে খাতা নিয়ে ফিরে এল তাপস। মাথা নীচু করে তাকিয়ে রইল খাতার দিকে একমনে—যেন বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করতে চায় ও।

কালিবাবু আবার হুংকার ছাড়লেন—'রিড ইট।'

গাড়ি স্টার্ট দেবার মতো শুরু করল তাপস : 'মাই ডিয়ার শৈবাল…' তারপর চুপ করে গেল। চোখে মুখে অন্ধকার দেখল শৈবাল। আজ কপালে দুঃখ আছে নির্ঘাত।

'তারপর ?' আবার কালিবাবু গর্জন করে উঠলেন। কেঁপে উঠল সারা ক্লাস। অথচ, তাপসের মুখে একটা মৃদু হাসি খেলে গেল মনে হল।

খুব ধীর কণ্ঠে তাপস উত্তর দিল : 'এর পর ভাবছিলাম স্যার। লেখা হয়নি। গুরুজনরা বলে গেছেন ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।'

কালিবাবুর মত দুঁদে ইস্কুল মাস্টারও থতমত খেয়ে গেলেন খানিকটা—তাও গলা চড়িয়ে বললেন—'কি ভাবছিলে শুনি ?' তাপস এতটুকু নার্ভাস হয়নি—'আমি বিয়ে দেখেছি স্যার। বিয়ের অনেক কিছুর ইংরিজী আমি জানি না। যেমন ধরুন গায়ে হলুদের ইংরিজী জানি না। বর এসে যে সন্ধ্যেবেলায় ছাঁদনাতলায় দাঁড়ায় সেটাকে ইংরিজীতে কি বলে ? তারপরই স্ত্রী-আচার—ঐ যে কানে দিলাম মাকু, ভ্যাঁ করত বাপু—মাকুই বা কি, ভ্যাঁ করতেই বা কেন বলল ? শুভদৃষ্টি কি হোলি সাইট—কিন্তু এটা হোলি কেন ? পুরুত যে চীৎকার করে মন্তর বলল আর বর বউ অঞ্জলি দেবার মত সেটা পড়ে গেল তার বাংলাই জানি না, ইংরিজী তো দূরের কথা। এমন কি খেতে বসে প্রথম পাতে পড়ল ছ্যাঁচড়া—শেষে পড়ল কড়া পাকের সন্দেশ। এই দুটো ইংরিজীতে বলা শক্ত। কড়া পাককে ভাবলাম একবার বলব হার্ড বয়েলড্—কিন্তু হার্ড বয়েলড্ বললেই ডিমের কথা মনে আসে। এমনিতে আমার পিসতুতো দিদির বিয়েটা আমার দারুণ লেগেছে স্যার। তবে, বাংলা বিয়ে ইংরিজীতে বলা খুব শক্ত। আর, ইংরিজী বিয়ে আমি দেখিনি—তাই।'

একটু এদিক ওদিক হতে পারে এত বছরের ব্যবধানে কিন্তু সারমর্ম ছিল এই। সমস্ত ক্লাস. এমন কি কালিবাবু পর্যন্ত কিছুক্ষণ কথা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাই বলে হার মানেননি। কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন টিচার্স রুমে। শপাং শপাং ছ'বার বেত পড়েছিল পিঠে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হাসতে হাসতে ফিরে এসেছিল ও। শৈবাল জিজ্ঞেস করল : 'লেগেছে ?' মাথা নেড়েছিল তাপস : 'ছুটির পর হজমী খাওয়াস, তাহলে সেরে যাবে।' পরের দিন তাপসই লাঞ্চের সময় ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল : টিচার্স রুমের পাস দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি কালিবাবু 'মোহন ও স্বপন' পড়ছে।' ঐ ঘটনার পরই তাপস স্কুলে হিরো হয়ে গেল। অবশ্য, তার অনেক আগে থেকেই তাপস ওর খুব বন্ধু ছিল। এমনকি লাঞ্চটা পর্যন্ত ওরা ভাগ করে খেত।

তাপসরা বেশ বড়লোক। অন্তত প্রথম দিন ওদের বাড়িতে গিয়ে শৈবাল অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রতাপাদিত্য প্লেসে বিরাট একটা তিনতলা বাড়ি। নীচের তলায় একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট। পুরোনো আমলের অভিজাত চেহারার এই বাড়িটার সঙ্গে নীচে রেস্টুরেন্টটা বড্ড বেশি বেমানান লেগেছিল প্রথম দিনই। বাড়ির সামনেই দুপাশে মার্বেল পাথরের টালি দিয়ে ঢাকা দু'পাশে দুটো বোঞ্চ। ওখানে অবশ্য রেস্টুরেন্টের লোকরাই বসে থাকে বেশির ভাগ। দোতলায় থাকে তাপসরা। ডানদিকের গলি দিয়ে যেতে হয়। গলিটা অবশ্য খুব ঘুপসি। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই শৈবাল অবাক। দেয়ালে টাঙ্গানো অদ্ভুত সুন্দর সব ছবি। একটা দেয়ালে দুটো বিরাট বড় তলোয়ার কাটাকাটি করে ঝোলানো, কোথাও বা একটা বিরাট বাঘের মাথা ও ছাল টাঙ্গানো আছে পরিপাটি করে—এত জীবন্ত যে—হঠাৎ দেখলে মনে হবে বাঘটা বুঝি ওর দিকেই তাকিয়ে। দোতলায় উঠেই বসবার ঘর—দারুণ সুন্দর সোফাসেট—সেন্টার টেবিলের নীচে একটা হরিণের ছাল পাতা। সাইড টেবিলে জাপানী ফুলদানী—কাঁচের শো কেসে রাখা বিভিন্ন দেশের সুন্দর সুন্দর পুতুল। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথমে আলাপ হয়েছিল সেই তাপসের বাপি। বেশ লম্বা চওড়া লোক। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা। বেশ চওড়া গোঁফ। খুব বাজখাঁই গলা। প্রথমেই হেসে বললেন—'ঐ যে বাঘটা দেখছ ওটা আমি নিজে মেরেছি জান ? তুমি বড় হয়ে বাঘ মারতে চাও ?' শৈবাল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাপসের বাপির দিকে। তাপস বলল : 'চল, আমরা শোবার ঘরে যাই।' ঘরে ঢুকেই প্রথম কথা বলেছিল তাপস : 'বাপি, আমার বাবা নয়। আমার জন্মের আগেই বাবা মারা গেছে। বাপি মার সঙ্গে থাকে।' কথাগুলো

খুবই সাদামাটাভাবে বলা, কিন্তু শৈবালের মনে হয়েছিল বাপির ব্যাপারে তাপসের প্রচ্ছন্ন একটা কষ্ট আছে। পরে অনেক সময়ই একটা উদাসীনতা মাঝেমধ্যে প্রকাশ পেয়ে যেত ওর ব্যবহারে কিন্তু খোলাখুলি কিছু বলেনি কোনদিন তাপস। আর, ওপরের হাল্কা মেজাজটা দেখে ওর ভেতরটা বোঝা প্রায় অসম্ভব। ভেতরের দুঃখকষ্টকে ও একটা হাসি-খুশির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখে সব সময়। ওকে খুব ভাল না চিনলে যে কেউ মাঝে-মধ্যে পাগল বলে ভুল করতে পারে। কেউ কেউ হয়ত বা খুব কম লোক বুঝতে পারে। অনেকে ওকে ভয় পায়—ওর 'টার জন্য। কেউ কেউ ঘৃণাও করে। কিন্তু কেউ ওকে উপেক্ষা করতে পারে না। কে ভেবেছিল, তাপসও আমেরিকায় আসবে। তিন বছর আগে একদিন ভোর পাঁচটায় ফোন। ঘুম-চোখে ফোন ধরেছিল শৈবাল। গলাটা চিনতে অসুবিধে হয়নি—আমি তাপস নন্দীর ভূত। রোজ শেয়ালদা স্টেশন থেকে চন্দননগরের কলেজে পড়াতে যেত ডঃ তাপস নন্দী। 'পেচ্ছাবের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যাওয়া, আসা, বেঁচে থাকা। চোখের ওপর পেয়ারের কলকাতা মহেঞ্জদড়ো হয়ে যাচ্ছে। তাই পালিয়ে এলাম।' শৈবাল একটু হাসল। অজুহাত না দিলেও চলত। কিন্তু ওটা স্বগোতোক্তি ভেবে কথাটা এড়িয়ে গেল ও। শুধু প্রশ্ন করল : 'একা না দোকা ?' খুব জোরে হেসে উঠল : 'একা। বন্দনার কথা জিজ্ঞেস করিস না, প্লীজ।' শৈবাল চুপ করে যাওয়ার আগে বলল : 'ওয়েলকাম ইন দ্য ল্যাণ্ড অব ইয়াংকিজ। কোথায় উঠেছিস ?'

সেদিনই দেখা হল সকালে। বকর বকর হল সারাটা দিন। ওর গল্প, তাপসের গল্প, বন্দনার। বন্দনার গল্প এখন থাক।

'ডিড য়্যু গেট দ্য মেসেজ'—বেথ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

বেথকে এক পলক দেখে নিয়ে শৈবাল বলল : 'ইয়েস, থ্যাঙ্কু য়্যু।

'ডিড য়্যু কল হার ইয়েট ?' বেথকে একটু কৌতূহলী মনে হোল।

'আই উইল।' ঘড়ি দেখে শৈবাল বলল : 'ইট্‌স লেট এনিওয়ে। ডিড শি সে এনিথিং।'

'নাথিং স্পেসিফিক। বাট, শি সাউণ্ডেড এ লিট্‌ল ডেসপারেট।' বেথকে একটু চিন্তান্বিত মনে হল।

'শি ইজ অলওয়েজ ডেসপারেট। আই উইল ট্রাই লেটার। এনি আদার অ্যাকশন ?' খানিকটা কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল শৈবাল।

'হেলেন ওহেয়ার কল্‌ড। এড সুইনডেল'স সেক্রেটারী। শি ওয়াজ লুকিং

ফর ইয়োর রেকমেণ্ডেড এক্সপোর্ট প্রাইস ফর গ্যাপ মিনি টর্চ।'

একটু আগেই এটা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছে জন প্রাইসের সঙ্গে। একটু ভেবে শৈবাল বলল : 'আই উইল কল এড মানডে। আই নিড সাম টাইম টু ডিসাইড।'

বেথ বেরিয়ে যাবার আগে শৈবাল ওকে ডাকল আবার : 'হোয়াই ডোন্ট য়্যু টেক অফ ?'

বেথ যেন বিশ্বাস করেনি। তাই প্রশ্ন করল : 'বেগ ইয়োর পার্ডন ?'

শৈবাল মুচকি হেসে বলল : 'গেট লস্ট। আই উইল সি য়্যু নেক্সট থারস্ ডে।'

'থ্যাঙ্ক য়্যু। সানন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বেথ বেরিয়ে গেল বাইরে। কি মনে পড়তে পেছন ফিরল আবার—'আই উইল ড্রিংক ওয়ান ফর য়্যু।' তারপরই অদৃশ্য হল ও। বেথের আনন্দ দেখে শৈবালের সেই স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। রাতে বৃষ্টি হলেই লেক মার্কেটের দিকটায় হাঁটু জল জমে যেত তখন। ওপরের ঝোলা বারান্দা থেকে শৈবাল থেমে যাওয়া কলকাতা দেখত। ইস্কুল যাওয়া নেই। নীচের তলার ভাড়াটের তিন বছরের মেয়ে কুহু তখন নৌকো ভাসাতো রাস্তায়। ইলেকট্রিক তারে বসে এক-আধটা কাক চোখ বুজে ভিজত। রাস্তার ওপারে বারান্দায় কখনো-সখনো ইলাদি সাল গায়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ত। অবশ্য পাবনা থেকে ফিরে আসার পর পাক্কা ছ'মাস ইলাদির সঙ্গে কথা বলেনি শৈবাল।

তাপসের ফোনটা পাওয়ার পর থেকেই মনটা একটু খিচড়ে আছে। ল্যাং মারার পুরো ব্যাপারটা না শুনে নিশ্চিন্দি পাচ্ছে না কিছুতেই। যদিও অস্থায়ীত্ব ব্যাপারটার সঙ্গে এখানকার সমস্ত স্থায়ী বাসিন্দাদের আপোষ করে চলতেই হয়। এখানকার গরুর দুধও বেশি, এবং লাথিও। কালো আর ব্রাউন চামড়ার ক্ষেত্রে লাথিটা একটু এলোপাথাড়ি ও বেশি। কালুয়া, আর পুয়ের্টিকানদের কথা তো বাদই গেল। ওরা মোটামুটি এলেবেলে কাজ করার জন্যেই আছে বলা যায়। এমন কি ওদের অফিসে কালো আর পুয়ের্টিকানদের দৌড় ঝাড়ুদার, মজুর মেসিনিস্ট থেকে শুরু করে কেরানী পর্যন্ত। ব্রাউন চামড়া অর্থাৎ এশিয়ানদের বিশেষ করে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এত প্রকট নয়। তাছাড়া, তুলনা করাটাও হয়ত অসমীচীন। ইমিগ্রান্ট ভারতীয়রা অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত—শৈবালের মতো অধিকাংশই। হয় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা অ্যাকাউন্টান্ট। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার করলে যে কোন

শ্বেতাঙ্গ নাগরিকের তুলনায় একজন ভারতীয় স্বাভাবিক কারণেই নিম্নপদস্থ। তাছাড়া, প্রথম দু'তিন বছর প্রায় প্রত্যেককেই ইয়াংকি অভিজ্ঞতার মাশুল দিতে হয়। সেই সময়গুলোর কথা ভাবলে এখনো শৈবালের জ্বর আসে। তাছাড়া, নিজস্ব সত্তা বজায় রাখতে প্রতিটি মুহূর্তেই সজাগ থাকতে হয়। না হলেই ইয়াংকি সরলীকরণের জাঁতাকলে সব কিছু বদলে যায়। তাই অনেক শ্যামল এখানে স্যাম আর দেবব্রতরা ডেভ বনে যায়। নামেই মেল্টিং পট, কিন্তু সমস্ত সংস্কৃতি এখানে আলাদা আলাদা ফুটছে। ইয়াংকি ট্র্যাডিশন বলতে ত হট-ডগ, মোটরগাড়ি আর হাতে খেলা ফুটবল। বাকি প্রায় সবই ডলারে কেনা। সেই ডলারেও টান ধরেছে আজকাল, অর্থনীতির বুনিয়াদ টলমল করছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও মাঝে মাঝে কলা দেখিয়ে যাচ্ছে। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। বহু শ্রমিক মজুব ছাঁটাই হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই সব মানুষের অধিকাংশই মাইনরিটি।

টিয়ার ফোন নাম্বারটা মনে পডল না। খাতা খুলে নম্বরটা দেখে নিল শৈবাল। একটু আগে যতখানি রাগ হচ্ছিল—এখন তাব ছিটেফোঁটাও নেই। হয়ত কোন সমস্যাও হতে পাবে। দেরী হয়ে গেল অবশ্য অনেক। ফোনটা বেজে গেল অনেকবার। কেউ বাড়িতে নেই বোধহয়। না থাকতেই পারে। কারণ টিয়া সাডে দশটার মধ্যে ফোন করতে বলেছিল। শৈবাল একবার ভাবল অফিসে ফোন করে। কিন্তু অফিসে নিশ্চয়ই নেই, বাড়িতে ফোন করতে বলেছে যখন। এত তাডাহুড়োর কি আছে—শৈবাল মনে মনে বলল। এক মাস অফিসে তো কোন সম্পর্কই রাখেনি—হঠাৎ কি এমন জরুরী ব্যাপার হতে পাবে। হয়ত সেই পুরোনো কাসুন্দিই ঘাঁটিবে আবার।

বিকেলে বেরোতে বেরোতে প্রায় সাডে পাঁচটা হল। এমনিতে অফিস ছুটি সাড়ে চারটায়। কিন্তু সপ্তাহের শেষে বেশ কিছু কাজ জমেই যায়। তাছাড়া, শৈবাল চিরকালই লেট স্টার্টাব। মন দিয়ে কাজকর্ম শুরু করতে করতেই ওর প্রায় দশটা বাজে। বিকেলে একটু বেশিক্ষণ থাকতে ওর একটুও খারাপ লাগে না। তাছাড়া অফিস ফাঁকা হয়ে গেলে কাজকর্মও তাড়াতাড়ি হয়। এমনিতে সর্বক্ষণই কোথাও না কোথাও টেলিফোন বাজছে, কেউ না কেউ কথা বলছে অথবা টাইপ করছে—দু-পাঁচ মিনিট অন্তরই কিছু না কিছু ইন্টারাপশন তো লেগেই আছে। তাই বেশির ভাগ লোকজন চলে গেলেও প্রায় প্রত্যেকদিনই ও খানিকক্ষণ থাকে। ঠাণ্ডা মাথায় এই সময় চিন্তাভাবনাগুলো করতে পারে।

রাস্তায় পা দিয়ে শৈবালের মনে হল একবার বাডি হয়ে যাবে। অফিসের

জামাকাপড়গুলো ছেড়ে স্নান করে একেবারে বেরোবে। নতুন অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছে গত রবিবার। জিনিসপত্র সবই এখনো কার্টন ভর্তি যেরকম এসেছে সে রকমই আছে। শুধু শোবার ঘরে বিছানাটা কোনরকমে পেতে নিয়েছে ও। ধীরে সুস্থে বাকিগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেই হবে। তাড়াহুড়োর কি আছে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তো কেউ আসছে না। আর এলেই বা কি, অতই যদি কারো চোখে লাগে—একটু হাত লাগিয়ে গুছিয়ে নেবে না হয়। যদি পছন্দ না হয়, দরজা তো খোলাই আছে। একটাই দরজা। যেটা দিয়ে ভেতরে আসে ওটাই বেরোবার। শৈবাল মনে মনে নিজের কুঁড়েমির কথা ভেবে হাসল। কেউই তো কিছু বলেনি, কেউ আসেওনি ওর নতুন ঘরে—অথচ ও যেন কেন রেগে মরছে সেটা ওর থেকে আর কে ভালভাবে জানে। আসলে, বাড়িঘর গোছানোর কাজটাজগুলো করতে হবে ভাবলেই শৈবালের মেজাজটা তিরিক্ষে হতে থাকে—আর, তখনই শুরু হয় ছায়ার সাথে যুদ্ধ। বিশ্বসুদ্ধ সকলের ওপর রাগ হয় তখন।

ওদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর লবিতে একটা নিগ্রো গার্ড। নতুন একটা ক্লোজ সার্কিট টিভি-ও বসানো হয়েছে এখানে। সর্বত্রই চুরিচামারি বেড়ে গেছে এখন। ক্লোজ সার্কিটে প্রায় প্রত্যেকটা ফ্লোরই দেখা যায়। তা সত্ত্বেও ওর উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টেই একজন বলছিল দু'সপ্তাহ আগেই নাকি পাঁচতলায় বেশ বড় রকম চুরি হয়ে গেছে একটা। শৈবাল থাকে ষোল তলায়। এ বাড়িটা আগেরটার মত অত অন্ধকার নয়। পুব দিকের জানালা দিয়ে প্রচুর আলো আসে। রাত্তিরে ওর জানালা দিয়ে একদিকে পুরো লা-গোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট, অন্যদিকে পুরো ম্যানহাটান দেখা যায়। এমন কি দু'দুটো মেজর হাইওয়ের ওপর দিয়ে সারারাত গাড়ির মেলা দেখতে ভালই লাগে। শুধু প্লেনগুলো যাওয়ার সময় বাড়িটা একটু কাঁপে—বিশ্রী একটা গোঁ গোঁ করে আওয়াজও হয়। তাও এ বাড়িটা আগেরটার থেকে অনেক পরিষ্কার। ভাড়াটাও অনেক বেশি। আগেরটায় দু'শ পঁচাত্তর। এখানে চারশ পঁচিশ। মাত্র বছর পাঁচেক আগে এগুলোর ভাড়া ছিল আড়াই'শ ডলারের কাছাকাছি।

লেটারবক্সে একগাদা কাগজ। দু'একটা বিল। বাকি সব বিজ্ঞাপন। প্রথম প্রথম এই বিজ্ঞাপনের কাগজগুলো মন দিয়ে পড়ত ও। যেমন, সুপার মার্কেটের প্রাইস লিস্টই আসে প্রায় হাফ ডজন। কোনটাতে ডিম সস্তা, কোথাও ফুলকপি, কোথাও বা চিকেন। একেকটা সস্তা যদি একেক দোকান থেকে কিনতে হয়—তাহলে কুড়ি ডলারের বাজার করতেই ওর লেগে যাবে ঘণ্টা পাঁচেক।

কাজেই ওগুলো অনায়াসে ফেলে দেয় শৈবাল। তবে সংসারী হয়ে হাফ ডজন গ্যাঙ্গো বেবি-টেবি থাকলে তখন হয়ত লাগবে—তখন না হয় শনি-রবি দু'দিনই বাজার করা যাবে। আপাতত ও ব্যাপারটায় নিশ্চিন্দি। এছাড়াও প্রায় প্রত্যেক দিনই কেউ না কেউ লিখে পাঠাচ্ছে—'য়্যু মে হ্যাভ অলরেডি ওয়ান এ মিলিয়ন ডলার্স।' প্রথম প্রথম এগুলো পেয়ে খুব উত্তেজনা অনুভব করত শৈবাল। 'ইয়েস' 'নো' দুটো করে খোপ কাটা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো পত্রিকার প্রমোশন। 'ইয়েস' মানে আমি পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক। সেখানেও তিনটে খোপ—টাকা এখন পাঠাচ্ছ। ধারে কিনবে নাকি—আমরা পরে বিল করব। আর, 'নো' মানে পত্রিকা নিতে আমি অনিচ্ছুক। শুরুতে শৈবালের মনে হোত 'নো' লিখলে সুইপাস্টকস বোধহয় দেবে না। তাই 'ইয়েস' কলমে দাগ দিয়ে ভাল ছেলের মতো কড়কড়ে চেক পাঠাত সঙ্গে। মিলিয়ন ডলার পেলে একটা পত্রিকা নিতে আর কিই বা এসে যায়। এই করে করে বেশ কিছু পত্রিকা জমে গেছে বাড়িতে। মিলিয়ন ডলার কেন, একটা সান্ত্বনা পুরস্কারও জোটেনি কপালে। ইদানীং চালাক হয়ে গেছে অনেক। এখন 'নো' লিখে পাঠায়। তবু পাঠাতে ছাড়ে না। বলা তো যায় না, শিকে ছিঁড়লে তখন! এলিভেটর চেপে উপরে উঠতে উঠতে শৈবালের হঠাৎ মনে হল মা'র চিঠি ও অনেকদিন পায়নি। ওরা সব কেমন আছে কে জানে।

স্নান সেবে বেরোতে বেরোতে প্রায় সাতটা বেজে গেল। তাপসটা ক্ষেপে যাবে নির্ঘাত। তবু স্নান করে বেরোলে এত তাজা লাগে ভাবা যায় না। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েই রাস্তার ওপারেই ওযাইন শপে ঢুকে পড়ল শৈবাল। স্নান করে বেরিয়ে অবশ্য একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। অনেকেই থাকবে হয়ত ওখানে। তাই ভেবেচিন্তে জনি ওয়াকার-রেড লেবেল-এর হাফ গ্যালনের একটা বোতল নিয়ে নিল শৈবাল।

এই বাড়ি থেকে সাবওয়ে খুবই কাছে। আগের বাড়িটা থেকে সাবওয়ে প্রায় দশ বারটা ব্লক। শীতকালে খুব কষ্ট হত ওখানে। শরীরের সব কিছুই অবশ্য কোট প্যান্ট দিয়ে মোড়া। কিন্তু নাক, চোখ আর কানগুলো বেশি শীতে প্রায় অবশ হয়ে যায়। নাক, কানের টুপিও পাওয়া যায় অবশ্য। কিন্তু সং সেজে রাস্তায় বেরোতে শৈবালের খুব আপত্তি। তার থেকে একটু ঠাণ্ডা লাগা ভাল। নতুন অ্যাপার্টমেন্টে এই উপদ্রব হয়ত কমবে খানিকটা। তাছাড়া শীতও প্রায় যাই যাই। অবশ্য মার্চেও বরফ পড়ে—কিন্তু শীত সেরকম নয়। পাঁচ বছর আগের বিশে মার্চ অর্থাৎ শৈবাল যেদিন এসেছিল নিউইয়র্কে, সেদিনই

রাত্তিরবেলা প্রচুর বরফ পড়েছিল। সেই প্রথম শৈবালের বরফ দেখা। তার আগে শুধু সিনেমায় দেখেছে। পেঁজা তুলোর মত বরফ ভাসছিল হাওয়ায়—আর, সিক্স হানড্রেড ওয়েস্টরে একটা ছোট খাটে শুয়ে শৈবাল আকাশ পাতাল ভাবছিল। নতুন দেশ, নতুন কানুন, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। জেট ল্যাগের জন্য ওর ঘুম আসছিল না চোখে। পকেটে মাত্র দুশো ডলার। এটা ফুরিয়ে যাবার আগে নোঙর যদি ধরতে না পারে, তখন ! অবশ্য এখানে ওর থেকে বড় ছোট অনেক বাঙালীই ছিল। শুধু টাক-মাথা রমেন তালুকদার-এর কথায় অনেকখানি ভরসা পেয়েছিল শৈবাল। চোখ দুটো বুজে প্রায় ভাগ্য-পরীক্ষার মত প্রশ্ন করেছিল—'রকে আড্ডা মেরেছেন কখনো ?' শৈবাল মাথা নেড়েছে। বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে রমেনদা বলেছিলেন—'কলকাতায় রকে-বসা ছোঁড়াদের কখনো আমেরিকা ফিরিয়ে দিতে পারে ! শুধু তিনটি কথা মনে রাখতে হবে প্রথমে। যা জিজ্ঞেস করবে বলবেন—জানি। জানুন আর নাই জানুন। স্যালারি কত চাও জিজ্ঞেস করলেই বলবেন—ওপেন অর্থাৎ যা দেবে। আর, ভুলে যাবেন আপনি ভদ্রলোকের ছেলে—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যে কোন অকাজের জন্যই প্রস্তুত থাকবেন। রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি কাগজ কিনবেন। বোধ্য, দুর্বোধ্য সব রকমের কাজের জন্য কাস্টম মেড বায়ো-ডেটা বানাবেন যার ইয়াংকি পরিচয় হল রেস্যুমে। একটা করে কপি রাখবেন সব সময়। এটা হল তীর্থস্থান। এখানে সব রকমের চিড়িয়া আছে। এঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টান্ট, ফিজিসিস্ট, কিংবা শুধু বি কম। কোন ইন্টারভিউ পেলেই সেই লাইনের লোক ধরবেন একজন। সাবজেক্টটা একটু থ্রি আওয়ার সাবজেক্টের মতো বুঝে নেবেন। বাকিটা আপনার খেলা। কখ্খনো ভাব দেখাবেন না আপনি গরীব। যদি কেউ বলে ইন্ডিয়া তো পুয়োর—খুব রেগেমেগে বলবেন, জানো তুমি কার সাথে কথা বলছ—আই অ্যাম দি ডিরেক্ট ফাস্ট কাজিন অব মহারাজা অফ্ হাতিমপুর। ভাবটা এই রকম যে চাকরিটা আপনি চাইছেন কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনি ওর থেকেও এক কাঠি ওপরে। গরীব গরীব ভাব দেখালে এখানে চাকরি হয় না। গরীব এদেশেও আছে, কিন্তু গরীবদের কোথাও কেউ পোঁছে না। একটা চাকরি, যা হোক, পেয়ে গেলে ব্যস। লাইনের হলে ভাল। না হলেও কিছু পরোয়া নেই। ধীরে সুস্থে খুঁজুন। কেউ তো পালাচ্ছে না—আপনিও না। আমেরিকাও না। আর, এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছেন তো কি। ওটা সাইড ডিগ্রী হিসেবে রইল। হয়ত দেখবেন ব্যাঙ্কেই আপনার ভবিষ্যৎ। ওরাই যা পড়ানোর পড়িয়ে নেবে। আমাদের দেশে কত মেয়েই তো এরকমভাবে জীবন কাটায়।

ফিলজফিতে এম এ পাস করে কত মেয়েই তো রান্না আর আঁতুড়ঘর করে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। ভাবলেই খারাপ। কয়েকদিন পরেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুদিন বাদে দেখবেন নেশা ধরে গেছে। ডলার বোধহয় শঙ্খবিষ। আস্তে আস্তে মানুষকে অবশ করে ফেলে।'

এই লেকচারটা টনিক হিসেবে কাজ করেছে শৈবালের। অন্তত প্রথম মনের জোরটা পেয়েছিল রমেনদার কাছেই। কথাগুলো ফলেও ছিল আশ্চর্যরকম। দুশো ডলার ফুরোনোর আগেই প্রথম চাকরিটা পেয়েছিল সপ্তাহ তিনেকের মাথায়। কাজটা আহা মরি নয়—তবে নোঙর করার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর ধীরে সুস্থে এটা ওটা করে ধাপে ধাপে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ও। কিন্তু ডলারে নেশা হয়নি এখনো। হতে দেবে না। অবশ হওয়ার আগেই দেশে ফিরে যাবে ও। অনেকের ক্ষেত্রে ভাগ্যের চাকা অন্যরকমভাবে ঘোরে। যেমন সঞ্জয়—এখনো রেস্টুরেন্টে কাজ করে। আর, তাপসের মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে অনেক রগড়ে ভাল চাকরি পেয়েছিল মাত্র মাস ছয়েক আগে। আর ওর চাকরিটা গেল।

আজ সব কিছুতেই যেন দেরী। সাবওয়ে ট্রেনটা টানেলে আটকে রইল অনেকক্ষণ। একশ দশ স্ট্রীট মাটির নীচ থেকে রাস্তার ওপরে যখন পা দিল শৈবাল, ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা বাজে। পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল ও। হয়ত বা হাডসনেব খুব কাছে বলেই এখানে শীতটা একটু বেশি। রাস্তায় বেশ ভীড়। বিশেষ করে আনাজপাতির দোকানগুলোতে গিজগিজ করছে মানুষ। সপ্তাহ শেষের বাজার সারছে অনেকেই। দু' চারজনের মুখে হাসিও দেখতে পেল শৈবাল। হয়ত বা এ সপ্তাহের মতো দুঃখকষ্ট শেষ। আবাব সোমবার দেখা যাবে।

সঞ্জয়ের ঘরটা তো একসময় ওর নিজেরই ঘর ছিল। হাড্রেড থারটিন্‌থ স্ট্রীটের মোড়ের এই বাড়িটা আদ্যিকালের পুরোনো। কোন একসময় এটা কলাম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির ডর্মিটরি ছিল। এখন সস্তায় থাকার জায়গা। ইস্ট ইউরোপিয়ান কিছু লোক, কিছু নিঃসম্বল বুড়ো-বুড়ি ছাড়া বাকি আর সকলেই ভারতীয়। ঘবের দাম এখানেও বেড়েছে—শৈবাল যে ঘরটার জন্য সপ্তাহে বাইশ ডলার ভাড়া দিত এখন সেই ঘরেই সঞ্জয় দিচ্ছে পঁয়তাল্লিশ। তাও, হাডসনের ভিউওয়ালা এরকম একটা ঘরও শহরের অন্য কোথাও জুটবে না এই ভাড়ায়। কোন অ্যাডভান্স লাগে না। এক ঘরে তিন-চারজন থাকলে বাড়িওয়ালা কিছু বলে না। তবে সারানো-টারানোর বালাই নেই। শীতকালে কোন কোন ঘরে

অসম্ভব হিট—আবার কোন কোন ঘরে হিটারটা একেবারেই খারাপ। যাই হোক পয়সা বাঁচানো ও বিলাসিতা একই সঙ্গে পাওয়া মুশকিল। ঠাণ্ডা লাগলে সোয়েটার পরে—মোজা গলিয়ে নাও। খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। না হয় একটা সস্তার হিটারও কিনে নেওয়া যায়।

বাড়ির মত এলিভেটরটাও পুরোনো। দরজাটা আপনি খোলে না খুলে নিতে হয়। বোতাম টিপলেই কিরকম রকেটের মতো গোঁ গোঁ করে আওয়াজ হয়। মাঝে মাঝে বেশ দোলে আর কাঁপে। ইদানীংকালে শৈবালের একটু আধটু ভয় হয়। যদি খুলে পড়ে যায় নীচে। এ ভয়টা আগে ছিল না। কুইন্সে ভালো এলিভেটরে চেপে চেপে হয়েছে। কলকাতায় থাকতে যে দু'চারটে যা লিফ্‌টে উঠেছে তার থেকে এ তো হাজার গুণে ভাল। এই ভয় লাগা ব্যাপারটাতে নিজের সম্পর্কে খটকা লাগে। নিজের অজান্তেই ও কি বদলে যাচ্ছে দিন দিন ?

এলিভেটর থেকে করিডরে বেরোতেই একটা গন্ধ লাগল নাকে। ভারতীয় রান্নাব গন্ধ। বেশ জবর কিছু উনুনে চেপেছে বোধহয়। দরজা খুলে দিল রথীন। হৈ হৈ কবে উঠল সকলে। সঞ্জয় বলল · 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।' এ অভিযোগের অর্থ শৈবাল জানে। আজকাল এদিকে আসা হয় না বড একটা। ম্যানহাটানে এলেও এ বাড়িতে আসে খুব কম।

তাও, অভিযোগটাতে মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলল : 'আর যারা অযোধ্যায় রইল, তাদের একবার লঙ্কায় আসতে কি কোন বাধা ছিল ?' সঞ্জয় হাসল, উত্তর দিল না। তাপস এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শৈবালের দিকে। এতক্ষণে বলল : 'এই তোব সকাল সকাল।' শৈবাল হাসল। বলল : 'একটু স্নান করে এলাম।'

সমস্ত ঘরটাতে প্রচুর ধোঁয়া। রান্নার ও সিগারেটের। মদ ও মশলা মিশে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছে ও। অনেকদিন পরে পরিচিত এই গন্ধটায় একটু অস্বস্তি লাগলেও মনে মনে খুশিই হল ও। এই তীর্থস্থান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল পাঁচ বছর আগে। এই যে আত্মীয়-বান্ধবের মতো গায়ে-গায়ে লেগে থাকা মুহূর্তগুলো, দেশ থেকে দশহাজার মাইল দূরের আরেকটা অনাড়ম্বর দেশ, চাল-চুলোহীন ন্যাংটো জীবন যাত্রা—এই সেই শুরু। শুরুতে সবাই জিরো। কে কতদূর যাবে জানা নেই। কিন্তু প্রত্যেকের সাধ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই জন্ম নিল এখানে। তারপরেই তো শঙ্খবিষ ! ঐ যে মধ্যপথের মানুষগুলো, যারা বাড়ি গেলেই সাফল্যের কথা বলে, সোফাসেটের কিংবা গয়নার দাম শোনায়, ছেলে মেয়ে দেশে গিয়ে থুতুকে স্নো বলে ভুল করলে গর্ববোধ করে—আসলে শুরুটা তারা ভুলে যায়। না এদিক, না ওদিক এই ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থাটাকে ঘৃণা করে

শৈবাল। আসুক, না আসুক সিক্স হানড্রেড ওয়েস্টকে ও ভুলতে পারবে না কিছুতেই।

মদ, মশলা ছাড়াও আর একটা বিটকেল গন্ধ বেরোচ্ছে—এতক্ষণে শৈবালের সেটা খেয়াল হল। ওর ভুরু কুঁচকোনো আর নাক টানা দেখে তাপস ধরে ফেলল ঠিক। হাত বাড়িয়ে হাতে পাকানো সিগারেট দিল একটা—'নে টান। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?'

শৈবাল তাকিয়ে দেখলে গ্রাস অর্থাৎ মারিউয়ানা। একটু হেসে বলল : 'এ শালা বুজরুকি। কিস্যু নেশা হয় না এতে। তাছাড়া গাঁজা খেলে মাথা ধরে আবার আজকাল।'

তাপস বেশ জোরেই হেসে উঠল : 'তোর সিসটেমটা শালা ভদ্রলোক হয়ে যাচ্ছে। এবার কোনদিন বিয়ে করে বলবি—গুরু, সিগারেট আর মদটাও ছেড়ে দিলাম। বউ একদম পছন্দ করে না। শুধু চুমু খেয়ে বেঁচে আছি আজকাল।'

সঞ্জয় ফোড়ং কাটতে ছাড়ল না—'চুমুও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে শিগগিরি। চুমুর সঙ্গে নাকি হাজার হাজার বীজাণু শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাই বলে চুমু খাওয়া তো বন্ধ হতে পারে না। কাজেই চুমু খেয়েই লোকে ওষুধ খেয়ে নেবে। একটু খাওয়াদাওয়া অনিয়ম হলেই যেমন বুড়ো-বুড়িরা অ্যাল্‌কা সেলজার খায় এখানে।'

শৈবাল একটু গম্ভীর হয়ে বলল : 'মন্দ কি। কামিনী-কাঞ্চন দুটোই পাপ। সব ছেলেমেয়েরা ভাই-বোন হয়ে যাবে ভবিষ্যতে।'

তাপস বাধা দিল : 'উঁহু, ওতে অসুবিধে আছে। বাচ্চা? ভাই-বোনে কি বাচ্চা হয়?'

শৈবাল উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। তাপসের গলাটা একটু জড়িয়ে যাচ্ছে যেন। সঞ্জয়ের দিকে তাকাতে সঞ্জয় তাপসের দিকে ইঙ্গিত করে চোখ টিপল। অর্থাৎ নেশা ধরেছে। অনেকক্ষণ থেকেই চলছে বোধহয়।

ঘরের সবাইকে শৈবাল চেনে না। দু' চারজন নতুন। নতুন মানুষগুলোকে দেখলেই বোঝা যায়। দেশের একটা ছাপ মারা থাকে। এরা সবাই একটু মনমরা। সেই অনিশ্চিত মুহূর্তগুলো এখনো ইচ্ছে করলেই ও মনে করতে পারে। নতুনদের সঙ্গে এক এক করে আলাপ হল। একজন তো গতকালই এসেছে। নাম বিকাশ পালিত। আলাপ হতেই বিকাশ বলল : 'চলে তো এলাম। কিছু টিপ্‌স ছাড়ুন। আপাতত ছোটখাট যা হোক কিছু।'

শৈবাল মনে মনে ভাবল রমেনদার লেকচারটা দেবে কিনা। কিন্তু ও কিছু

বলার আগেই তাপস বলে উঠল আপন মনে : 'শালা সাদা বাঁদর কিরকম ল্যাং মারল জানিস ? এখনও মাথাব মধ্যে আগুন জ্বলছে। ভুলতে পারছি না কিছুতেই।'

শৈবাল ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাপসের কথায় মনে পড়ে গেল আবার : 'ব্যাপারটা কি একটু গুছিয়ে বলবি ?'

তাপস গুম মেরে আছে কিরকম। চোখটা বোঁজা। পিটপিট করে তাকিয়ে বলল : 'একটা বেশ বড় করে অনেক বরফ দিয়ে রেড লেবেল বানা।' সঞ্জয় বাধা দিল। বলল : 'তুমি তো ভড্‌কা খাচ্ছিলে তাপসদা ? মিক্স করাটা কি ভাল হবে ?' তাপস ধমকে উঠল : 'জ্ঞান দিস না। আমার বডিটা মেল্টিং পট, বুঝলি ? গাঁজা, ভাঙ্গ, হাঁড়িয়া, মা কালি এক নম্বর, দু নম্বর, মহুয়া, হাইল্যাণ্ড চিফ, ব্ল্যাক-নাইট, স্কচ, সব কিছু মিশে পেটে একটা তৈরী হয়ে গেছে। যা বলছি, কর।' শৈবাল দুটো গ্লাসে রেড লেবেল ঢালল। একটা নিজে নিয়ে আরেকটা গ্লাস দিল তাপসকে।

বেশ বড একটা চুমুক দিয়ে তাপস বলল : 'মাস দুয়েক আগে আমার একটা প্রমোশন হল বুঝলি ? নতুন কাজ, নতুন ডিপার্টমেন্ট। হাজার তিনেক ডলাব মাইনেও বাড়ল। তোকে ফোন করেছিলাম মনে আছে!'

শৈবাল মাথা নাডল অর্থাৎ মনে আছে। একটু দম নিয়ে তাপস আবাব বলল : 'গত দু সপ্তাহ ধরেই খচ খচ করছিল মনটা। কাজকর্ম নেই বিশেষ। সারাদিন শালা বসেই আছি। এদিকে আমার পুরোনো পজিশনে লোক এসে গেল। কানাঘুঁষোয় শুনলাম ও শালা নাকি বসের লোক। লোক ত নয়, ছেলে। অন্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করত—বহুত জুনিয়ার। আমি অতটা পাত্তা দিইনি। আমার শালা কি ? আমার তো কিছু এসে যাচ্ছে না। আজ সকালবেলা ডেকে আমার ছুটি করে দিল একজন। কারণ জানতে চাইলে বলল নতুন প্রজেক্টটা আপাতত বন্ধ। তাই আপাতত আমাকে আর প্রয়োজন নেই। পুরোনো পজিশনটাও ফিরে পেতে পারি না,কারণ লোক এসে গেছে। কি বিউটিফুল গেম প্ল্যান বল ত ?'

সঞ্জয় রীতিমত উত্তেজিত। বলল : 'তুমি কিছু বললে না তাপসদা ? মাথা নীচু করে চলে এলে ?'

তাপস মুখ তুলে তাকাল : 'হ্যাঁ, বললাম। চীৎকার চেঁচামেচি করলাম। আমি যে করব, তাও বোধহয় জানত। মাইনেও রেডি করাই ছিল। হাতে খামটা ধরিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ডেস্ক পরিষ্কার করে দিতে বলে চলে গেল। পুরো

ব্যাপারটাই আমার কাছে এত বিস্বাদ লাগছিল কি বলব ? কি রকম যেন নিজেকে এলেবেলে মনে হচ্ছিল ।'

সবাই চুপচাপ । রথীন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল । এবার যেন নড়েচড়ে বসল । অন্যদিকে তাকিয়ে বলল : 'আপনার ল-সুট করা উচিত । ছেড়ে দেবেন কেন ?'

কেউ কোন উত্তব দিল না । সঞ্জয় শুধু আপন মনে বলতে লাগল . 'আমেরিকানদের শুধু দোষ দিই কি কবে । ভারতীয়রাই বা কম যায কি । এখানকাব ভাবতীয় রেস্টুরেন্টগুলোব ভেতরের চেহারাটা দেখেছ কখনো ? ক্যাশ টাকায মাইনে দেয় । অধিকাংশই মিনিমাম ওয়েজেব থেকে কম । চাকবির কোন লেখাপড়া নেই । যে কোন সময তাড়িয়ে দিতে পাবে । কোন ইনসিওবান্স স্কিম পর্যন্ত নেই । টিপ্‌স-এব টাকাটাই যা রোজগার । তাও সারাদিনে যে সব গ্লাস ডিশ ভাঙ্গে টিপ্‌সের টাকা থেকে কেটে নেয শালারা । আব. ভাল মাইনে করা মালিকেব পেয়ারের ম্যানেজাববাও দিনেব শেষে সেই টিপ্‌সে ভাগ বসায । আমরা উকিল ধরেছি । ইউনিযন করব । যা থাকে কপালে । তুমি যদি চাও এই উকিলটাকে তোমাব কথা বলে দেখতে পাবি তাপসদা ।'

ঘবের আবহাওয়া বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে । সঞ্জয একমনে রান্না করতে লেগেছে আবার । রথীন গুণগুণ করে গান গাইছে । বিকাশ পালিতেব মুখখানা শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গেছে । আমেবিকায় এসে ভুল কবল না ঠিক কবল ভাবছে হয়ত । অস্বস্তিকব পরিবেশটাকে সহজ কবাব চেষ্টা কবল তাপস . 'আবার সোমবার ভাবব । প্রবলেম আছে, প্রবলেম থাকবেই । নে, মাল ঢাল তো বড দেখে ।'

আবার জমে উঠল আসর । হৈ হৈ করে গ্লাসগুলোতে জনি ওয়াকার ঢালল রথীন । বিকাশ পালিত বোবা হ[illegible] সিলিং-এব দিকে তাকিয়ে । তাপস ঠেলা মারল বিকাশকে : 'কি মশাই, মহেশ যোগী বনে গেলেন নাকি ?'

বিকাশের গলা শুকনো । জড়িয়ে জড়িয়ে বলল : 'ভয লাগছে একটু ।'

তাপস হৈ হৈ করে উঠল : 'জমিয়ে মাল খান সব ঠিক হযে যাবে । নাচতে জানেন ?'

বিকাশ মাথা নাডল, অর্থাৎ না । তাপস হাল ছাডবার পাত্র নয়—'সে কি মশাই । কলকাতায় দুর্গাপুজোর ভাসানের সময মস্তানদের নাচ দেখেননি । আসুন শিখিয়ে দিচ্ছি । উঠুন তো উঠুন । আরে উঠুন না ।' জোর করে হ্যাঁচকা টান মেরে বিকাশকে দাঁড় করিয়ে দিল তাপস । খুব গম্ভীরভাবে বোঝাতে শুরু করল : 'এ নাচ হল সব থেকে সোজা । কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত একদম

ফিক্সড। নট চড়নচড়ন। শুধু তালে তালে পাছা থেকে হাঁটু পর্যন্ত দুলবে—এপাশ ওপাশ সামনে পেছনে—আবার হাঁটু থেকে পায়ের পাতা কাঁপবে না একটুও। খুব সোজা, নিন প্র্যাকটিস করুন। আমি গান ধরছি।'

সত্যিই গান ধরল তাপস। হাততালি দিয়ে নেচে নেচে গান ধরল ও। 'বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপুরে। আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা—যে সাপের নাক নেই, চোখ নেই কান নেই··· ' সব কথা মনে নেই ওর। তাও থামল না। একই কথা ঘুরে ফিরে গেয়ে যেতে লাগল তাপস। আস্তে আস্তে এই গান কোরাসে পরিণত হোল। হাতে খুন্তি নিয়ে সঞ্জয়—আর গ্লাস নিয়ে রথীনও নাচছে। বিকাশ পালিতেরও পাছা থেকে হাঁটু পর্যন্ত দুলছে তালে তালে।

সিগারেটের ধোঁয়া, উনুনের আগুন, হিটার সব মিলিয়ে অসম্ভব তেতে গেছে ঘরটা। উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল শৈবাল। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আর কুচি কুচি বরফ ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। বাইরের দিকে তাকান যায় না। যতদূর চোখ যায় শুধু সাদা। শৈবাল মুঠো করে বরফ নিল হাতে। এ বরফ ধরা যায় না। হাতে পড়ে গলে যায়। সামনের দিকে তাকিয়ে হাডসন নদীটাকে দেখতে পেল না শৈবাল। হাতটাকে নিয়ে মুখে ঘষল দু'চারবার। ঘরের ভেতর তাণ্ডব নৃত্য হচ্ছে এখনো। ঠিক এইরকম সময় ধাক্কা পড়ল দরজায়। কেউই শুনতে পায়নি বোধহয়। নাচ গান চলছে এখনো।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল শৈবাল। এক লোলচর্ম বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে। সঞ্জয় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল—'মে আই হেল্প মিসেস স্যাণ্ডার্স?' ভদ্রমহিলা মুখটা বাঁকালেন একটু—হাসলেন না যন্ত্রণা হল বোঝা গেল না। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল একটু। খুব আস্তে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—'ইয়েস, য়্যু মে! মাই লাইফ ইজ হ্যাঙ্গিং অন এ থ্রেড। য়্যু হ্যাভ এ হোল লাইফ অ্যাহেড অফ য়্যু। আই মে অনলি হ্যাভ এ ফিউ ডেজ টু গো, মে বি মান্‌থস। উড য়্যু কিপ দি পার্টি এ লিট্‌ল লো সো দ্যাট আই ক্যান্ স্লিপ? ইজ ইট টু মাচ টু আস্ক?'

শৈবাল তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'উই আর সরি।' বৃদ্ধা এবার সত্যিই হাসলেন—'ডোন্ট বি সরি! আই উড হ্যাভ ডান দি সেম থিং এ ফ্রাইডে নাইট অ্যাট ইয়োর এজ। বাট এ্যাট দিস এজ এভরি ডে ইজ এ লং ওয়েট—কাউন্টিং দ্য ফাইন্যাল মোমেন্টস। আই হোপ, য়্যু ডোন্ট মাইণ্ড।' বৃদ্ধা পেছন ফিরলেন। ধীরে ধীরে পাশের দরজার দিকে গেলেন। সঞ্জয় দরজাটা খুলে ধরল। বৃদ্ধা

আবার হাসলেন। গ্লাভস পরা হাতে সঞ্জয়ের হাতটা চেপে ধরলেন—'গড ব্লেস য়্যু।'

সঞ্জয় ঘরে ফিরল। নাচ, গান বন্ধ হয়ে গেছে। তাপস শুধু প্রশ্ন করল—'কেউ নেই ?'

সঞ্জয় ঘাড় নেড়ে বলল : 'ছেলে আছে। শিকাগোয় থাকে। মাঝে মধ্যে উদয় হয় মাদার্স ডে-তে। সারাটা বছর হা-পিত্যেস করে বসে থাকে বুড়ি—দিন গোনে।'

শৈবাল গজ গজ করে বলল—'সত্যিই, ইট্'স এ লং ওয়েট।' কাজ করার ক্ষমতা ফুরিয়েছে—আমেরিকাতে ওর আর কোন প্রয়োজন নেই। রাস্তার ধারে আবর্জনা স্তূপে জমা আর একটা শূন্য ক্যান। কবে এসে গার্বেজ গাড়ি তুলে নিয়ে যাবে তারই প্রতীক্ষা।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে তিনটে। ওখান থেকে রওনা হতে হতেই দুটো বেজে গেল। সঞ্জয়কে কাজে যেতে হবে সকালে। রেস্টুরেন্টে ছুটি নেই কোন। তাপস থেকে গেল। যাবার আগে বলল : 'কাল দুপুরে হানা দিতে পারি, তোর ওখানে।'

'এখনই চল না কেন ?'

'অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে। পা দুটো চলতে চাইছে না এখন। তা ছাড়া এত বরফে তুইই বা কোথায় যাচ্ছিস ?'

'আমি চলি। তুই কাল আসিস।' আসল কথা হল যতই অগোছাল হোক, নিজের বিছানা ছাড়া ঘুম আসে না শৈবালের। ভাবনা-চিন্তাগুলোকে জড়ো করে জড়িয়ে ধরে শোবার একটা আলাদা মেজাজ।

শুয়ে পড়তে পড়তে প্রায় ভোর চারটে। ঘুম এল আরো পরে।

ঠিক কতক্ষণ মনে নেই। ঘুম ভাঙ্গল ফোনের আওয়াজে। হাতড়ে হাতড়ে ফোনটা ধরল শৈবাল।

'এখনো কি ঘুমিয়ে ?' টিয়ার গলা।

'কটা বাজে ?' শৈবালের কথা এখনো জড়িয়ে।

'একটা।'

'রাত না দিন ?'

'দিন। কাল কোথায় ছিলে সারারাত ?' টিয়াকে উদ্বিগ্ন শোনাল।

'তোমাকে ফোন করেছিলাম—তুমি ছিলে না।'

'আমি ওখানে থাকি না।'

'বাড়ি পাল্টেছ নাকি ?' শৈবাল চোখ মেলে তাকাল। ঘরে এখনো অন্ধকার।
'অনুপ নয়, আমি।'
'মানে ?' শৈবাল উঠে বসেছে বিছানায়।
'কোন মানে নেই। উই আর গেটিং এ ডিভোর্স।' টিয়ার গলা খুব শান্ত।
'আমার নতুন ফোন কোথায় পেলে ?' শৈবাল অবাক হল।
'পুরোনো নাম্বারে টেলিফোন করে।' একটু থেমে টিয়া বলল : 'আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে। বাইরে অবশ্য অনেক বরফ জমে আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগবে।'
অনেক রাগ জমে ছিল কিন্তু রাগতে পারল না শৈবাল। অনেক কথা বলবে ভেবেছিল—বলা হল না। শুধু বলল : 'ঠিকানাটা দাও।'
টিয়া ফোন ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ। এতক্ষণে মনে পড়ল তাপসের আসার কথা দুপুর বেলা। আবার হাতড়ে হাতড়ে ফোনটা খুঁজল শৈবাল। ফোন করল সঞ্জয়ের বাড়িতে।
'কখন আসছিস ?'
'আসছি না। তোকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম এক্ষুনি ?'
'কেন, কি হল ? বরফ ?'
'না, একটু আগেই একটা ঘটনা ঘটেছে। সঞ্জয়রা রেস্টুরেন্ট খোলার আগেই ওয়াক-আউট করেছে সবাই মিলে। পিকেটিং শুরু করেছে দোকানের সামনে। আমি আর রথীন এখন পোস্টার বানাচ্ছি। সবে কাগজপত্তর, রঙের পেন্সিল কিনে এনে জমিয়ে বসেছি। আজ আর যাওয়া হবে না। পারলে তুই একবার চলে আসিস সন্ধ্যেবেলা।'
ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাতে নিজেকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না শৈবাল, ঘরটা এত অন্ধকার। খাট থেকে নেমে পর্দাটা সরাল ও। গাছের ডালে থোকা থোকা বরফ, রাস্তাটাও সাদা হয়ে আছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাইরে। সূর্যের আলো বরফের ওপর পড়ে একটা রূপোলী রং। বাইরের আলো অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। নিজেকে দেখতে পেল আয়নায়।
উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে বাথরুমে ঢুকে পড়ল শৈবাল। মনটা খুশি খুশি লাগছে হঠাৎ। কেন কে জানে।...
এই রাস্তাটায় যে কি করে গাড়িটা ঢুকে পড়ল কে জানে। চারপাশে জমাট অন্ধকার। সামনে বেশ খানিকটা দূরে আরেকটা গাড়ির টেললাইট দুটো দেখা

যাচ্ছে আবছা। বাঁদিকে অনেক নীচে গায়ে গায়ে লাগা অজস্র আলোকবিন্দু অসংখ্য জোনাকির মত জ্বলছে। অর্থাৎ, গভীর খাদের নীচে বোধহয় কোন ছোটখাট শহর। ডানদিকে গাছপালা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না আর। আন্দাজে মনে হয় ডানদিকে বিরাট পাহাড়। এতক্ষণে প্রলয় ঘোষ বুঝতে পারলেন যে গাড়ি নিয়ে উনি কোন অচেনা পাহাড়ী রাস্তায় ঢুকে পড়েছেন। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এই সরু রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। পাশে তাকিয়ে প্রলয় ঘোষ খানিকটা অবাক হলেন। বিছানা চাদর বালিশ পেতে হাত পা ছড়িয়ে রত্না ঘোষ দিব্যি ঘুমাচ্ছেন। শোবার ঘরের বালিশ-চাদর গাড়ির মধ্যে রত্না যে কখন নিয়ে এসেছেন কিছুতেই মনে পড়ল না ওঁর। পেছনেব সীটে কাউকে দেখতে পেলেন না প্রলয় ঘোষ। পিংকি কোথায় ? পেছনে তাকাতে গিয়ে গাড়িটা বেঁকে গেল একটু। চাকার তলায় কোন ছোটখাটো পাথরের নুড়ি পড়ে ছিটকে এসে লাগল দরজার কাঁচে। চমকে সামনের দিকে ফিরলেন প্রলয় ঘোষ। কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে কিভাবে এখানে ঢুকলেন অনেক চেষ্টা করেও মনে পড়ছে না কিছুতেই। নিউইয়র্ক শহরের মাঝখানে পাহাড় কোথা থেকে এল ? এখনো মনে পড়ছে সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে টুকিটাকি বাজার করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে রত্না, পিংকি দু'জনেই ছিল। রত্না পাশে, পিংকি পেছনের সীটে। বাজার সেরে বাড়ি ফিরেছিলেন সেটাও মনে আছে। তারপর, কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন, এই অপরিচিত, অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তায় কি করে পৌঁছে গেছেন কিছুই মনে পড়ছে না আর। বাড়ি ফেরার পর থেকে কোন স্মৃতি নেই। মনের মধ্যে সব কিছু ব্ল্যাকআউট। সামনে-পেছনে—দুপাশে যতদূর চোখ যায় নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। শুধু বাঁপাশে খাদের নীচে কোন অচেনা শহর আর সামনে অনেক দূরে দুটো লাল আলোকবিন্দু। হয়ত বা কোন গাড়ির টেল-লাইট। তাও, লাল আলো দুটোও মাঝে মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ শক্তিতে অ্যাক্সিলেটর চেপে আবার আলোকবিন্দু দুটিকে চোখের সামনে এনে ফেলেছেন প্রলয় ঘোষ। এই অচেনা অন্ধকার রাস্তায় সামনের গাড়ির টেল লাইটটাই যা ভরসা। সাবধানে রাস্তা চলতে চলতে গাড়িটার ভেতরে ঘুরে ফিরে তাকালেন উনি।

এবার আরো অবাক হবার পালা। নিজের গাড়িটাকে চিনতে পারলেন না প্রলয় ঘোষ। ভেতরটা রঙ ওঠা, জীর্ণ। সীটগুলো ছেঁড়া, অ্যাশট্রে থেকে সিগারেটের টুকরো ও ছাই উপচে পড়ছে। এ গাড়ি কোনদিন দেখেছেন বলে মনে হোল না ওঁর। ড্যাশবোর্ড-এর ওপর পুরু ময়লা। হিজিবিজি অনেক কাগজ

এদিক ওদিক ছড়ানো। গাড়ির মধ্যে সব থেকে প্রিয় ওঁর রেডিও। রেডিওটা চালাতে গিয়ে দেখলেন নবটা ভাঙ্গা। রাগে, দুঃখে হতাশায় ডান হাত দিয়ে স্টিয়ারিংটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। হাতের চাপে হর্ণটা বেজে উঠল অদ্ভুত সুরে ' অনেকটা সানাই-এর মত। চমকে উঠলেন প্রলয় ঘোষ।

পাশে এখনো রত্না ঘোষ দিব্যি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন দেখে উনি বেশ রেগে গেলেন। এরকম একটা বিপদ অথচ রত্নার কোন চিন্তাই নেই। চারপাশে তাকিয়ে আবার মনে করতে চেষ্টা করলেন সব কিছু। নাঃ কোন লাভ নেই। বাড়ি ফেরা পর্যন্তই মনে আছে শুধু। চীৎকাব কবে রত্নাকে ডাকলেন—'এতো ঘুমোচ্ছ কেন ?' কণ্ঠনালীতে কি যেন আটকে গেছে মনে হয়। কথার বদলে ঘড ঘড করে আওয়াজ বেবোল শুধু। এতক্ষণে রীতিমত ভয় পেলেন প্রলয় ঘোষ। এই অন্ধকাব, বাঁ পাশের গভীর খাদ, আঁকাবাঁকা, অচেনা সরু পাহাডী রাস্তা, গাড়ির মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে রত্নার নিশ্চিন্ত ঘুম—সব মিলিয়ে উনি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলেন। এরকম রাস্তা দার্জিলিং-এ দেখেছেন বলে মনে হোল ওঁর। এ তো মাথা খারাপের লক্ষণ। নিউইয়র্কের সুপার মার্কেটে বাজাব সেবে বাড়ি ফিরে উনি দার্জিলিং-এ এরকম একটা গাড়ির মধ্যে এসে পড়লেন কি করে ! এদিকে হাত-পাগুলোও বেশ ভারী হয়ে আসছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। রত্নাকে যে চীৎকার করে ঘুম থেকে তুলবেন তারও কোন উপায় নেই। ভয়ে গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না। হঠাৎ এই অদ্ভুত পরিবেশে মৃত্যুর কথা মনে হোল ওঁর। উনি কি মরে যাচ্ছেন ? জীবনের শেষে সবাই কি এরকম অচেনা, সরু একটা পাহাড়ী রাস্তায় ঢুকে পড়ে। খাদের নীচে শহরটা তো এখনো দেখা যাচ্ছে। অথচ ওখানে ফিরে যাবার রাস্তা প্রলয় ঘোষের জানা নেই। অনেক দূরে সামনের গাড়ির টেল-লাইট দুটো আবার ডানদিকে অদৃশ্য হোল। অর্থাৎ, রাস্তাটা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে আবার। প্রাণপণ শক্তিতে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিলেন প্রলয় ঘোষ। পা দুটো যেন সাতমন ওজন। নড়াতেই কষ্ট হচ্ছে এখন। গাড়ির স্পিডও কমে আসছে ক্রমশ।

চোখের পাতা দুটো জড়িয়ে আসছে ঘুমে। অনেক চেষ্টা করে তাকিয়ে রইলেন প্রলয় ঘোষ। সামনের গাড়িটাকে হারিয়ে ফেললে চলবে না কিছুতেই। ও গাড়িটা ঠিক, না ভুল যাচ্ছে জানা নেই—কিন্তু ওটাই একমাত্র আলো এই অন্ধকারে। গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল ওঁর। খানিকটা দূরে বাঁদিকে খাদের ধারে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ মাটি কোপাচ্ছে কোদাল দিয়ে। গাড়ির হেডলাইটে ওদের অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একেই তো এই

সরু রাস্তা। সেটাও কেটে ফেলতে চায় নাকি এরা! খালি গা, ময়লা রং, নেংটি পরা। অনেকটা দেশের দিনমজুরদের মতো। এই লোকগুলো আমেরিকায় এল কি করে! এদের ভিসা-পাসপোর্ট দিল কে? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা ওদের অনেক কাছে এগিয়ে এল। লোকগুলো বেশ বিপজ্জনক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। গাড়িটা বড্ড বাঁদিক ঘেঁষে যাচ্ছে। লোকগুলো চাপা পড়ে যেতে পারে। অথচ ওদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে জোরে চাপলেন প্রলয় ঘোষ। আবার, এলোমেলো ফুঁ দেওয়া সানাই-এর মতো বিকট আওয়াজ বেরোলো একটা। লোকগুলো শুনতে পেল না তবু! ওরা একমনে রাস্তাটা কেটেই চলেছে।

দেখতে দেখতে গাড়িটা লোকগুলোর কাছে এসে পড়ল। স্টিয়ারিং-এ হুমড়ি খেয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটালেন প্রলয় ঘোষ। নড়বড় করতে করতে গাড়িটা ডানদিকে বেঁকল। অস্পষ্ট দেখতে পেলেন লোকগুলোকে। মনে হোল লোকগুলোকে যেন আগে কোথাও দেখেছেন। কিছু ভাবার আগেই খুব জোরে একটা আওয়াজ হোল আর সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেল বোধহয় গাড়িটা। প্রলয় ঘোষের মাথাটা গিয়ে ঠুকল গাড়ির ছাদে। পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকালেন প্রলয় ঘোষ। রত্না ঘোষ এখনো ঘুমিয়ে। অবশ হাত দুটো কোন রকমে স্টিয়ারিং-এ রেখে গাড়িটা সোজা করতে চেষ্টা করলেন প্রলয় ঘোষ। সামান্য টাল খেয়ে গাড়িটা সোজা হয়ে গেল। ঘটাং ঘটাং করে একটা আওয়াজ হতে লাগল গাড়ি থেকে—কোন যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে গেছে, নির্ঘাৎ কিছু একটা ঝুলে পড়েছে তলায়। রাস্তার সঙ্গে ঘষটাতে ঘষটাতে চলেছে। আশেপাশে আর কোন লোককে দেখতে পাচ্ছে না প্রলয় ঘোষ। হেডলাইটের সোজা আলো রাস্তায় পড়ছে না আর। সামনের গাড়ির টেল-লাইট দুটোও কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাগলের মতো হাত দিয়ে রত্নাকে জাগাতে চেষ্টা করলেন প্রলয় ঘোষ। হাত দুটো স্টিয়ারিং-এ যেন গেঁথে বসে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও হাত দুটোকে নাড়তে পাড়লেন না উনি। সামনে-পেছনে দুপাশে এখন পুরোপুরি অন্ধকার। হঠাৎ ওঁর মনে হোল উনি বোধহয় মরে যাবেন। সকলের অলক্ষ্যে অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তায়, অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে ওঁকে বোধহয় চলে যেতে হবে। কেউ দেখল না—এমন কি যার সঙ্গে গত তিরিশ বছর ঘর করেছেন সে পর্যন্ত নিশ্চিন্তে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে রইল পাশে। ওপরে আকাশের দিকে তাকালেন প্রলয় ঘোষ। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। পাশাপাশি অসংখ্য তারার জটলা আকাশে। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে একটা মানুষ অসহায়ভাবে মরে যাচ্ছে

সে সম্পর্কে তারা উদাসীন। ঘাড়েব কাছে একটা স্পর্শ অনুভব করলেন। বোধহয় কারো হাত। ভয় পেলেন প্রলয় ঘোষ। একটু আগেই দেখেছেন পেছনের সীটে কেউ নেই। সাহস সঞ্চয় করে তবু প্রলয় ঘোষ প্রশ্ন করলেন—'কে ?' নিজের গলাটা কিরকম অদ্ভুত শোনাল। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে গাড়িতে। ডানদিকের কাঁচটা খোলা। কাঁচটা খুলে দিল কে ? শীতে কুঁকড়ে যেতে লাগলেন প্রলয় ঘোষ। পেছনে তাকানোর সাহস নেই। তবু মাথাটা অর্ধেক ঘুরিয়ে উনি আবার প্রশ্ন করলেন—'কে ?' এবার স্পষ্ট অনুভব করলেন কানে ঠোঁট রাখল কেউ। ফিসফিস করে বলল : 'এবার কলকাতায় পুজো দেখতে নিয়ে যাবে, বাবাই ?'

বাবাই ! অবিকল মাটির গলা। ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন প্রলয় ঘোষ। বুকেব মধ্যে হিম। মনে হোল সারা বুক জুড়ে অনেকগুলো গোখরো এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যাক্সিলেটব থেকে পা উঠে গেল। হাত দুটো দিয়ে মুখটা ঢাকলেন। গাড়িটা একমুহূর্ত থেমে গডগড কবে গডাতে লাগল পেছনের দিকে। এই মুহূর্তে প্রলয় ঘোষের মনে হোল মৃত্যু অনেক বেশি আদরের। এই বীভৎস পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্যই বোধহয় উনি মৃত্যুকে কামনা করতে লাগলেন। ছবির মতো জীবনের অনেক মুহূর্ত ধরা পড়ল মনের পর্দায়। চোখ বুজেও প্রলয় ঘোষ সবাইকে দেখতে পেলেন। বাবা-মা, খড়্গপুরের বাড়ি, মাটি, রত্না, পিংকি সবাইকে। কাউকে কিছু বলে যাবার সুযোগ আব নেই। তাই, বোবা চোখ নিয়ে প্রলয় ঘোষ সামনে তাকিয়ে থাকলেন।

খুব জোরে গাড়িটা ধাক্কা খেল কোথাও। খাদের পাশের ছোট্ট পাঁচিলটা ভেঙ্গে গেল বোধহয়। পেটে একটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। নাগরদোলায় নীচে নামার সময় যে অনুভূতি হয় অনেকটা সেরকম। প্রলয় ঘোষ বুঝতে পারলেন গাডিটা খাদের নীচে পড়ছে এইবার। গাড়ি থেকে বেরোবার চেষ্টা করে লাভ নেই জেনেও দরজাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন উনি। নবটা খুঁজে পেলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে সীটে গা এলিয়ে দিলেন প্রলয় ঘোষ। একটু আগের সেই অসম্ভব ভয়টা আর নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রলয় ঘোষ যেন শান্ত হয়ে গেলেন অনেক। আর তো কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই সব শেষ। খাদের ওপর থেকে যে শহরটা দেখা যাচ্ছিল হয়ত সেই শহরেরই কোন এক রাস্তায় ওঁদের আবিষ্কার করবে কেউ আগামীকাল সকালে। হয়ত বা আজ রাত্তিরেই।

আবার একটা ঝাঁকুনি খেয়ে শরীরটা অবশ হয়ে গেল ওঁর। প্রথমটা সব কিছু

তালগোল পাকিয়ে গেল। ঝনঝন করে আওয়াজ হোল চারপাশে। গাড়িটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বোধহয়। হাত দিয়ে মুখটা ঢাকা। হাতের ফাঁক দিয়ে কিছু জলীয় পদার্থ চোখে গিয়ে ঢুকছে। বোধহয় রক্ত। অন্য কোন যন্ত্রণা নেই শবীবে। শুধু হৃৎপিণ্ডটা একটা রবারের বলের মত লাফাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সেটাও শান্ত হয়ে এল। মুখ থেকে হাতটা সরালেন প্রলয় ঘোষ।

চারিদিকে অন্ধকার। আশেপাশে হাত বাড়িয়ে খুঁজলেন কাউকে। কারো গায়ে হাত ঠেকল। কোনরকমে পাশ ফিরে দেখতে চেষ্টা করলেন। ওর পাশেই চাদর মুড়ি দিয়ে আরেকটা মানুষ। শরীরের কোন জোর নেই আর। তবুও অবশ হাত দুটো দিয়ে পাশের মানুষটাকে ক্রমাগত ঠেলতে লাগলেন প্রলয় ঘোষ।

'কি ব্যাপার! ঠেলাঠেলি করছ কেন মাঝরাত্তিরে। সরে শোও একটু। ভাল লাগছে না এখন। খুব ঘুম পাচ্ছে।' রত্না বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলেন। চমকে খাটের ওপর উঠে বসলেন প্রলয় ঘোষ। এতক্ষণে অন্ধকার অনেকটা চোখ সওয়া হয়ে এসেছে। ওপরে তাকিয়ে ঘরের ছাদটা এতক্ষণ অস্পষ্ট দেখতে পেলেন উনি। পাশেই রত্না ঘোষ চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সত্যিই বেঁচে আছেন কিনা দেখার জন্য প্রলয় ঘোষ নিজের পায়ে একটা জোরে চিমটি কাটলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিমটির জোরে অথবা বেঁচে থাকার আনন্দেই হোক ওঁর গলা দিয়ে 'উঃ' করে আওয়াজ হোল একটা।

একটু আগে যেটাকে রক্ত ভেবেছিল আসলে সেটা ঘাম। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ঘামে। গায়ের গেঞ্জী সপ্‌সপ্ করছে ভিজে। কি সাংঘাতিক দুঃস্বপ্ন! একটু দুর্বল বোধ করছেন এখনো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বুকের ভেতর এখনো একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব। বুকে হাত চেপে হৃৎপিণ্ডের অস্থিরতা অনুভব করতে চেষ্টা করলেন প্রলয় ঘোষ। একটু উল্টোপাল্টা হলেও হৃৎপিণ্ডটা অবিরাম গতিতে লাফাচ্ছে। সেই ভয়ংকর রাস্তাটা এখনো অস্পষ্ট মনে পড়ছে। কেলে কেলে মানুষগুলোর নেংটি পড়ে কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো! দার্জিলিং-এর মতো পাহাড়ী রাস্তা। তখনই বোঝা উচিত ছিল। স্বপ্নের মধ্যে সব ভূগোল তালগোল পাকিয়ে যায়। নিউইয়র্ক, দার্জিলিং, সাহেব, দিনমজুর সব কিরকম একাকার। বলতে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে প্রলয় ঘোষ ছুঁয়ে এসেছেন স্বপ্নে। খাটে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে স্বপ্নটাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন উনি।

সব স্বপ্ন মোছা যায় না অত সহজে। আঠার মত অনেক কিছু লেগে থাকে মনে। পিঠে মাটির হাতের ছোঁয়াটা যেন লেগে আছে এখনো। বুকের ভেতরটা এখনো হিম। অবিকল মাটির গলায় সেই 'বাবাই' বলে ডাক।

সত্যিই, মাটিদের নিয়ে পুজোতে কলকাতা গিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। পিংকির জন্মের ঠিক আগের বছর। মাটির বয়স তখন চার। কলকাতা প্রলয় ঘোষের ভাল লাগেনি। বড্ড বেশি লোকজন। বাড়িগুলোও যেন দেশলাই-এর বাক্সের মতো। সূর্যের আলো ঢোকে না। ছোটবেলায় মেয়েটা প্রলয়ের খুব ন্যাওটা ছিল। 'একটু আদর করে দাও তো' বললেই মাড়ি বার করে একগাল হেসে থুতু মাখিয়ে দিত। একবার বাবার কোলে গেলে অন্য কারো কোলে যেতেই চাইত না। অথচ, সব কিছু পরে কিরকম বদলে গেল।

কে যে কখন বদলে গেল বুঝতে পারেননি প্রলয় ঘোষ। ভাগ্য ওঁকে কখনো হাত বাড়িয়ে কিছু দেয়নি। সাধারণ মধ্যবিত্তের মতো সামান্য খাওয়া-পরা বেঁচে থাকার জন্যেই লড়াই করতে হয়েছে ওঁকে। জলের ওপর মাথাটা কোনরকমে ভাসিয়ে রাখতেই এত ব্যস্ত থেকেছেন যে মুখ তুলে চারপাশে তাকানোর সময়ই পাননি কখনো। অন্তত খড়্গপুরে থাকতে। সতেরটা বছর—বলতে গেলে পুরো যৌবনই ফস্কে গেছে খড়্গপুরে। মাটি জন্মাল, মাটি মরে গেল—এখনো মনে হয় এই সেদিন। তাও ভাগ্যিস আমেরিকার ভিসাটা পেলেন। নইলে এতদিনে মাথাটাই হয়ত খারাপ হয়ে যেত। 'সবই ওপরওয়ালার হাত'—মনে মনে ভাবলেন প্রলয় ঘোষ। কে থাকবে, কে যাবে কেউ কখনো সঠিক বলতে পারে না। হাত দেখা, কুষ্ঠি ঠিকুজিতে আর কোন বিশ্বাস নেই ওঁর। হিজলির রমেন বাগচি যা খেল দেখিয়েছে তাতে এসব ব্যাপারে ঘেন্না ধরে গেছে। মাটির হাত দেখে বলেছিল খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে— ছেলেমেয়ে তিনটে। দু'ছেলে এক মেয়ে। আর ওঁর সম্পর্কে বলেছিল—'আপনার এরকম ভাবেই চলবে। তরী ডুববে না আবার ফুলে ফেঁপেও উঠবে না।' ডাহা মিথ্যে! এবা সবাই আন্দাজে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ে! যা বলেছে ঠিক তার উল্টোটি ঘটেছে ওঁর জীবনে। পনের বছর বয়সে মেয়েটা মরেছে পেটের বেআইনি বাচ্চাটা শুদ্ধু—আর প্রলয় ঘোষের মোটেই একরকমভাবে চাননি। এখনকার প্রলয় ঘোষ ডলারের টাকায় দু'দুটো রমেন বাগচিকে দেশে পুষতে পারে। অবশ্য, রমেন বাগচি এখন পোষার ঊর্ধ্বে। গত বছর হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন মাত্র আটান্ন বছর বয়সে। ও যদি সবই জানে, তবে আংটি-টাংটি পড়ে ফাঁড়াটা কাটিয়ে নিলেই পারত। অবশ্য মরা লোকের ওপর তো আর রাগ করার কোন মানে হয় না। রাগ নয়, রমেন বাগচির জন্য দুঃখই হয় খানিকটা। সংসারটা প্রায় পথে বসতে চলেছে ওঁর মৃত্যুর পর। বড় ছেলে সবে কলেজে ঢুকেছিল। এখন ছেড়েছুড়ে একটা ছোট্ট ফ্যাক্টরীতে কাজ

নিয়েছে। কিছু লাইফ্ ইনসিওরেন্সের টাকা আর ফ্যাক্টরীর একটা সামান্য কাজে পাঁচ পাঁচটা মানুষ যে কি করে খাওয়া-পরা-থাকা চালাচ্ছে সে ওরাই জানে। নিজের জীবনেই এ অভিজ্ঞতা ওঁর আছে। সে সব কথা ভাবলেও ভয় লাগে এখন। আর, এসব কারণেই দেশে ফেরার কথা মনেও আনেন না প্রলয় ঘোষ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ দেশে ফিরে যায় আমেরিকা ছেড়ে।

অবশ্য, প্রলয় ঘোষের ভয় পাবার খুব একটা কারণ নেই। তাছাড়া, বলতে নেই, উনি হঠাৎ গত হলেও রত্না বা পিংকি পথে বসবে না কেউ। রত্নার যা হোক একটা চাকরি আছে। একশ হাজার ডলার লাইফ ইনসিওরেন্স। পিংকির স্কুলও শেষ এই বছরে। প্রয়োজন হলে পিংকিও চাকরি করতে পারবে কিছু একটা। কলেজে ঢুকলেই বিয়ের চেষ্টা করতে হবে ওর। যদিও প্রলয় ঘোষের ইচ্ছে পিংকি লেখাপড়া করুক। কাউকে বলেন না উনি, কিন্তু মনে মনে খুব ইচ্ছে পিংকি ডক্টরেট হোক। আমেরিকার পি-এইচ· ডি· বলতে-কইতেই অন্যরকম। কিন্তু ইদানীং ছোট মেয়েকে ভয় পান প্রলয় ঘোষ। মাঝে মধ্যে ভাববাচ্যে একটু আধটু কথা হলেও সেই জন কার্টারের ঘটনাটার পর থেকেই একটা অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে। পিংকি যা জেদী—হয়ত প্রলয় ঘোষ যা বলবেন ঠিক তার উল্টোটাই করে বসবে। তাই খুব বেশি কিছু আর মেয়েকে আজকাল বলেন না উনি। খুব বেশি বললে মেয়ে যদি আবার বিগড়ে যায়। মাটির ব্যাপারে একবার মারাত্মক ভুল করেছেন। আর একবার ওরকম ভুল হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না উনি। তাছাড়া, যা কপালে আছে হবেই। শত চেষ্টা করলেও সব কিছু নিজের ইচ্ছেমত হয় না। তবু মেয়েকে নজরে 'রাখেন যতটা পারা যায়। মেয়েটাও বোধহয় বদলেছে খানিকটা। স্কুলে বা লাইব্রেরী ছাড়া বাড়িতেই থাকে বেশির ভাগ। তবে বয়সের তুলনায় ছোট মেয়ে একটু গম্ভীর। এই বয়েসের মেয়েদের হাসিখুশি হলেই যেন বেশি মানায়। অন্ধকারে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে নিজের ছোটবেলাটা মনে করতে চেষ্টা করলেন প্রলয় ঘোষ।

প্রলয় ঘোষের ছোটবেলা প্রায় ঘটনাবিবর্জিত বললেই চলে। ভাল-মন্দ কোন ঘটনাই খুব বেশি মনে পড়ে না ওঁর। বাড়ির একমাত্র ছোট ছেলে উনি। বড় দিদি ওঁর চেয়ে প্রায় বার বছরের বড়। ওঁর ছ বছর বয়সে দিদির বিয়ে হয়ে যায়। এখনো অস্পষ্ট মনে আছে দিদির বরকে বিয়ের দিন মোটেই ভাল লাগেনি ওঁর। কিরকম ধুমসো কালো, টাক মাথা। জামাইবাবু দিদির থেকে অনেক বড়, প্রায় মায়ের বয়সী। হয়ত-বা মার থেকে বছর তিনেকের ছোট। প্রথম দর্শনে

ভাল না লাগলেও জামাইবাবু কিন্তু লোক ভাল ছিল। ওদের প্রচুর জমিজমা আছে শিলিগুড়িতে। জামাইবাবুই বাড়ির বড় ছেলে। মনটাও খুব উদার ছিল জামাইবাবুর। শ্বশুর বাড়িতে এলে সকলের জন্য নানারকমের সুন্দর সুন্দর জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসত। এখনো মনে আছে প্রথমবার ঝাড়গ্রামে এসে জামাইবাবু ওঁকে ক্যারামবোর্ড কিনে দিয়েছিলেন। ঐ ক্যারামবোর্ডই ছিল প্রলয় ঘোষের জীবনে সবচেয়ে বড় উপহার। বাবা-মার কাছে খুব বেশি কিছু পাননি প্রলয় ঘোষ। দিদির বিয়ে দিয়ে-থুয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন বাবা। একটাই তো ছেলে অথচ পুরো ছোটবেলাটাই প্রলয় ঘোষ বঞ্চিত থেকেছেন। প্রথম প্রথম বাচ্চাটাচ্চা হবার আগে পর্যন্ত দিদি বছরে একবার করে আসত। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। দিদির শাশুড়ি মারা যাবার পর দিদির ঘাড়েই সংসারের গাদাখানেক দায়িত্ব এসে পড়ল। তাছাড়া, দিদি যেন এড়িয়ে যেতে চাইত খানিকটা। জামাইবাবুর সামনে নিজের বাড়ির অবস্থার জন্য লজ্জা পেত বোধহয়। অবশ্য দিদি মুখে কখনো বলেনি। কিন্তু, ওর হাবভাব, চালচলন, আসতে না চাওয়া দেখে প্রলয় ঘোষের তাই মনে হোত ছোটবেলায়।

বাবাকে দোষী করতে পারেন না প্রলয় ঘোষ। শুধু কোনরকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে করতেই জীবনটা কেটে গেল বাবার। মারাও গেলেন হঠাৎ। খুব সাধারণ ভাবেই। রাত্তিরে শুলেন। সকালে আর উঠলেন না। প্রলয় ঘোষ তখন বি· কম· পড়ছেন। সংসার ছোট, তাই সামলে নিতে খুব অসুবিধে হয়নি ওঁর। দুটো তো মাত্র প্রাণী। মা আর ছেলে। টিউশনি জুটিয়ে নিলেন গোটা তিনেক।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় টিউশনি ছিল আঢ্যিদের বাড়ী। নীলরতন আঢ্যির দু'মেয়েকেই পড়াতেন। বড় মেয়ে ছিল রত্না আঢ্যি। সেই এখন ওঁর স্ত্রী। এসব অবশ্য অনেক পরের ঘটনা। টিউশনি করে রাত্তিরে পড়াশুনো চালিয়ে তখন বি· কম· পাস করে গেছেন প্রলয় ঘোষ। ভাল চাকরি-বাকরি কিছুই জোটেনি। এদিকে রত্না আঢ্যিকে বিয়ে করে ফেলেছেন মনের জোরে। রত্না আই· এ পাস করেছেন তখন। মার ইচ্ছে ছিল না এ বিয়েতে। হয়ত বা নীচু জাত বলেই। সম্ভবত টিকবে না বলেই খুব জোর করে আপত্তিও কিছু করেননি।

রঙটা ময়লা হলেও রত্নার চেহারায় একটা আলগা শ্রী ছিল। পাতলা ছিপছিপে চেহারা ছিল ওঁর। রত্নাকে কোলে নিয়ে যে কোন সময় দু'মাইল হেঁটে আসতে পারতেন প্রলয় ঘোষ। উনি নিজেও রোগা ছিলেন বেশ। এখন অবশ্য রত্নাকে দেখলে পুরোনো সেই মেয়েটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাচ্চা হবার আগে পর্যন্ত তবু ফিগার বলে কিছু একটা ছিল। মাটি হবার পর থেকেই

মোটা হয়ে গেলেন রত্না। প্রলয় ঘোষও কম মোটা হননি—তবে উনি মোটা হয়েছেন আমেরিকায় এসে, আর কথায় কথায় গাড়ি চেপে চেপে। এখন একটা থলথলে ভুঁড়ি। উঠতে বসতে কষ্ট হয়। দু ব্লক হাঁটলে হাঁপাতে থাকেন। বয়সটা আস্তে আস্তে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। সব সময়ই একটা ক্লান্তি। খড়্গপুরে থাকতে এখানকার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতেন প্রলয় ঘোষ ' তামাশা ইত্যাদি অন্যান্য উপসর্গ ছিল অনেক, কিন্তু এতটা ক্লান্তি অনুভব করতেন না কখনো। অনেকবার ভেবেছেন একটু ব্যায়াম-ট্যায়াম শুরু করবেন—কিন্তু ভাবনাটা কাজে লাগাননি কখনো। ব্লক দূরে যেতে গেলেও অভ্যাসবশত এখনো গাড়িতে চেপে বসেন উনি। আগের অনেকবারের মতো আজকেও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন প্রলয় ঘোষ—কাল সকালে উঠে খানিকটা ওঠ-বস করে তবে চায়ে চুমুক দেবেন উনি।

মার জন্য দুঃখ হয় মাঝে মাঝে—মাটির জন্য তো বটেই। ওরা দুঃখ কষ্টই দেখে গেল জীবনে। একই বছরে কয়েক মাস আগে পরে দু'জনেই চলে গেল। প্রথমে গেল মাটি,তার মাস পাঁচেকেব মধ্যেই মা। মাটির মৃত্যুর পর থেকেই মা অদ্ভুতভাবে বদলে গেলেন হঠাৎ। মার জীবনে দুঃখ কোন নতুন ঘটনা নয়—অনেক কষ্ট, অনেক দারিদ্র্যের মধ্যেও মাকে দেখেছেন প্রলয় ঘোষ। মাটি যখন মারা যায় তখন কলকাতায় বোনের বাড়িতে ছিলেন উনি। তার পেয়ে এসে পৌঁছলেন দাহ হবার একদিন পরে। আশ্চর্য, একটুও কাঁদেনি বুড়ি। শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রলয় ঘোষের দিকে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। বুড়ি মার চোখের দিকে তাকিয়ে উনি ভয় পেয়েছিলেন খুব। লজ্জাও। আজ কাকে উনি বোঝাবেন যে মেয়েকে উনি ধমকেছিলেন নিজের লজ্জায়, অপমানে কিন্তু মেয়ে যে আত্মহত্যা করবে একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি উনি। লজ্জার কিছু কি বাকি ছিল শেষ পর্যন্ত। মেয়েটার মরার খবরও সব লোকে জানল—আর মেয়েটা যে অন্তঃসত্ত্বা ছিল তাও লোকের অজানা থাকল না। যে ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখল সেই নাকি লোককে বলেছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। অনেক প্রশ্ন করেছিল পুলিশ। অথচ আই· আই· টি'র যে ছেলেটা এই কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী সেই ইন্দ্রনীল সান্যালের নামটা পুলিসের কাছে বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। মেয়েটাই যখন নেই, কি হবে মিছিমিছি ছেলেটার পেছনে দৌড়ে। কেলেঙ্কারি অবশ্য এমনিতেই কিছু কম হোল না। ডক্টর পালই সবাইকে ছড়ালেন। এখানেও বাঙালী ডাক্তার সম্পর্কে প্রলয় ঘোষ খুব সাবধান হয়ে চলেন। বিশেষ করে আমেরিকায় বাঙালী ডাক্তারের বউদের দেখলে প্রলয় ঘোষের রীতিমত ভয়

করে। প্রচুর টাকা আর প্রচুর সময়। গালগল্পগুলো এরাই বেশি করে। এই তো কিছুদিন আগেই একটা পার্টিতে ডাঃ মুখার্জীর স্ত্রী বেশ মজা করে নাকি গল্প করেছেন রত্নাদের কাছে—কার ডায়াবিটিস, কার হার্ট অ্যাটাক, কার মেয়ের খারাপ রোগ আছে ইত্যাদি। তাই, বাঙালী ডাক্তারদের থেকে দশ হাত দূরে থাকেন প্রলয় ঘোষ। এমনকি সামান্য জ্বর-জ্বালা হোমিওপ্যাথী বা অ্যাস্পিরিনে না সারলে সোজা বুড়ো দেখে আমেরিকান ডাক্তারের কাছে চলে যান উনি। ভুলেও বাঙালী ডাক্তারদের ফোন করেন না কখনো। বাঙালী ডাক্তার হলে অবশ্য খানিকটা সুবিধাও হয়। রোগ আর রোগের নানারকম উপসর্গ বাংলায় বোঝাতে সুবিধে। তাছাড়া, চেনাশুনো থাকলে মাঝেমধ্যে বাঙালী ডাক্তাররা বিনা পয়সায় ওষুধ দেন—দেখা হলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন—হয়ত ভালর জন্যেই বলেন। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে এমন ভয় জন্মে যায়—যে হাজার ভালতেও মন টলে না আর। তাছাড়া, কথায় আছে না যে বড়লোকদের চাল ততটা নয় যতটা তাদের বউ আর ছেলেমেয়েদের। সুযোগ পেলেই তারা স্ট্যাটাসটা বুঝিয়ে দিতে ছাড়ে না।

'যাক্‌গে, ডাক্তারদের নিকুচি করেছে'—মনে মনে বললেন প্রলয় ঘোষ। কোত্থেকে কোথায় চলে এলেন উনি। আসলে, মার কথা ভাবছিলেন প্রলয় ঘোষ। মাটির মৃত্যুর পর পরই হেনা অর্থাৎ ওঁর মা যেন নিজেকে গুটিয়ে নিলেন কিরকম। কথা কমে গেল, কমে গেল খাওয়া-দাওয়া। যা একটু-আধটু কথা বলতেন সে সব পিংকির সঙ্গে। প্রলয় প্রশ্ন করতেন মাঝে মাঝে। কি হয়েছে জানতে চাইতেন। হেনা কিছু উত্তর দিতেন না বিশেষ। খুবই বেশি প্রশ্ন করলে বলতেন—'আমার আর কি বলার আছে। যাবার জন্যে তৈরী অথচ ঠাকুর নেন না। আরো কত ভোগ আছে কপালে।' প্রলয় ঘোষ বেশি কিছু বলতেন না—পাছে মা আরো কষ্ট পান। আমেরিকার ভিসার জন্যে অ্যাপ্লাই করার পর মাকে বলেছিলেন উনি। হেনা বলেছিলেন—'আমি আর না। আমার সব দেখা হয়ে গেছে এ জীবনে। শেষ বয়সে বিদেশে আর না। নরক ভোগ তা এ জীবনেই করে গেলাম ঠাকুর। এবার মুক্তি দাও।' ঠাকুর কথা শুনেছিলেন ঠিক। আমেরিকার ভিসা পাবার মাস চারেক আগেই হেনার অবস্থা খারাপ হল হঠাৎ। স্নান করতে গিয়ে বাথরুমে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। দিন চারেক বেঁচে ছিলেন তারপর। ডাক্তার মেদিনীপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে বলেছিল। পাগলের মতো মাথা নেড়েছিল বুড়ি। অর্থাৎ যাবেন না। বাঁচার ইচ্ছেটাই যেন চলে গিয়েছিল হেনার। মৃত্যুকে যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন।

শেষ চব্বিশ ঘণ্টা বড্ড কষ্ট পেয়েছিলেন হেনা। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা চোখের সামনে যেন নবজাত শিশু হয়ে গেলেন। কাপড়-চোপড় নোংরা হয়ে যেত। মাঝে মধ্যে হি হি করে ফোকলা দাঁতে হেসে উঠতেন, কখনো বা অঝোরে ফুলে ফুলে কান্না। জীবনের সমস্ত সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না বোধহয় চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল বুড়ির। কখনো কখনো সবাইকে চিনতে পারতেন—কখনো একদম নয়। শুধু পিংকিকে দেখলেই ওর হাতটা জোরে চেপে ধরতেন। পিংকি ভয় পেত, কাঁদত। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করত—'তোমার কষ্ট হচ্ছে, দিদি ?' শুধু পিংকি কষ্ট হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেই বুড়ি মাথা ঝাঁকাত আর হাসত। যেন নিজের জীবনের দুঃখ কষ্টের ছোঁয়া পিংকির গায়ে লাগবে বলে হেনা ভয় পেতেন। মাঝে মধ্যে মার রকমসকম দেখে এরকম মনে হোত প্রলয় ঘোষেব। শেষের কয়েকঘণ্টা কাকে যেন খুঁজলেন। সবাই দাঁড়িয়ে ছিল ঘরে। পিংকির হাতটা চেপে ধরে আরো ঘুবে কাউকে খুঁজছিলেন। পাগলের মত। পিংকি কানেব কাছে মুখ এনে বলেছিল—'কাউকে খুঁজছ দিদি ?' শেষ পর্যন্ত, কাকে খুঁজছেন মনে করে বলতে পারেননি হেনা। প্রলয় ঘোষের যেন মনে হয়েছিল মা মাটিকে খুঁজছিল। উনি কাঁদছিলেন পায়ের কাছে বসে। পিংকি হঠাৎ বলল—'দাদির হাতটা শক্ত হয়ে গেল কেন ?' সবাই জানত, কেন। দেবতোষ পিংকিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চোখটা কিন্তু খোলাই ছিল হেনার। মুখটাও। শুধ হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল। হেনার মুখের কাছে মুখ এনে প্রলয় ঘোষ একবার চীৎকার করে উঠলেন। ওঁর চীৎকারে শরীরটা শেষ বাবের মত থবথর কবে নড়ে উঠল। ঠোঁট দুটো কাঁপল দু'একবাব। তারপব আবার সব চুপচাপ। শরীরটা গরম ছিল ঘণ্টা দুয়েক। তারপর সেটাও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গায়ের রং চোখের সামনে ফ্যাসফেসে সাদা হয়ে গেল। চোখটা বোজা, মুখটা শান্ত। সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা পৃথিবীর গায়ে মুছে হেনা চলে গেলেন। মার দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে প্রলয় ঘোষ অন্য কথা ভাবছিলেন। ওঁর মনে হচ্ছিল হয়ত বা মাটি একা বলেই মা তাড়াতাড়ি গেলেন। কেন ওরকম মনে হয়েছিল কাউকে বোঝানো যায় না। এ ঘটনার মাস চারেক পরেই আমেরিকার ভিসা নেবার জন্য কনসালেট থেকে ইন্টারভিউ-এর চিঠি পেলেন প্রলয় ঘোষ। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কলকাতায় ভিসা আনতে গিয়ে মাসীর বাড়িতে উঠলেন প্রলয় ঘোষ। মাসী মার থেকে বয়সে অনেক ছোট। মাসীদের বাড়িতে পারতপক্ষে ওঠেন না উনি। মেসোমশাই অবস্থাপন্ন বলেই হোক অথবা অন্য যে

কোন কারণেই হোক মাসতুতো ভাই-বোনদের একটু নাক উঁচু বলে মনে হোত ওঁর। মাসতুতো ভায়েরা দুজনই কৃতী। একজন এঞ্জিনিয়ার, একজন ডাক্তার। দু বোনের বিয়েও হয়েছে খুব বড় ঘরে। এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বলে মোটেই ভায়েদের পরোয়া করতেন না প্রলয় ঘোষ। সুযোগ পেলে উনিও বড় কিছু হতে পারতেন। আরাম করে পড়াশুনো করে ভাল ভাল ডিগ্রী পেতে গেলে সবচেয়ে আগে পয়সাওয়ালা বাবা চাই। যা হয়নি সেজন্যে আজ আর কোন দুঃখও নেই ওঁর। যাই হোক, মাসতুতো ভাইরা তো প্রথম একটু হকচকিয়ে গেল। বি· কম· পাস করা প্রলয় ঘোষ যে হঠাৎ করে এই বয়সে আমেরিকার ভিসা পেয়ে যাবে এটা বোধহয় ওদের খানিকটা অবাক করেছে! মেসোমশাই তো বেশ খুশিই হয়েছেন মনে হল। বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প-টল্প করলেন। প্রশ্ন করলেন: 'চাকরি কি ঠিক হয়ে গেছে?'

প্রলয় ঘোষ মাথা নাড়লেন—অর্থাৎ না। নিজের মধ্যেও অনেকখানি ভয় ছিল। বললেন: 'ওখানে তো শুনছি সবাই চাকরি পায়। যা হোক একটা কিছু জুটে যাবে মনে হয়।'

মাসী প্রশ্ন করলেন—'রত্না, ছুটকি কি সঙ্গে যাচ্ছে?'

'না, আমার কোয়ার্টারটা থাকবে আরো মাস খানেক। তারপর ওরা ঝাড়গ্রামে গিয়ে থাকবে কয়েকমাস—যতদিন না আমি চাকরি-বাকরি পেয়ে একটু গুছিয়ে বসতে পারি। নতুন দেশ, নতুন সংসার। একটু সময় তো লাগবেই। না গিয়ে বুঝতে পারব না। বয়সও তো কম হল না। চাকরি-বাকরি ছেড়ে এই বয়সে ভয়ও লাগছে একটু—'

মাসতুতো ভাই রবীন, যে ডাক্তার, সে একটু টিপ্পনি কাটল—'ক্যালিফোর্নিয়ায় আজকাল নাকি সাধুগিরির খুব ডিমাণ্ড। একটা আখড়া-টাখড়া খুলে বসে পড়তে পারলে তো আব কথা নেই। ওখানে সমস্ত ভারতীয় সাধুরাই নাকি মারসিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে চেপে হলিউডের স্টারদের পাশে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।' টিপ্পনিটা হজম করে নিলেন প্রলয় ঘোষ—একটু হেসে বললেন—'আমার যা বরাত। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় কিনা দেখ্।'

মেসোমশাই বললেন—'কোথায় যাবে ঠিক করেছ কিছু!'

প্রলয় ঘোষ বললেন—'সবাই বলছে নিউইয়র্কে যেতে।'

রবীন হাঁ হাঁ করে উঠল—'খবরদার না। ওখানে দিনদুপুরে মানুষ খুন হয়।'

বাড়িতে অতিথি যখন সকলের সব কথাই শুনতে হবে ওঁকে। মৃদু হেসে বললেন—'আমাদের খুন করবে কেন? আমি অত ভাগ্য করে আসিনি। আর,

করলে করবে। ল্যাটা চুকে যাবে।' প্রলয় ঘোষ মাথাটা ঠাণ্ডা করে রাখলেন বটে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে গাটা জ্বলে যাচ্ছিল ওঁর।

মেসোমশাই-এর মৌখিক ব্যবহারটা কিন্তু খুব ভাল। বললেন : 'এটা একটা সত্যিই সুখবব। যাবার আগে দেখা করে যেও।'

মাসীও জোর দিয়ে বললেন—'হ্যাঁ। দমদম থেকেই তো যাবি। একেবারে বত্না, ছুটকিকে নিয়ে দু'দিন আগে এসে আমাদের সঙ্গে থেকে তবে যাস।'

রবীন টিটকিরি দিতে ছাড়ল না—'একটা অটোগ্রাফও দিয়ে যেও সেই সঙ্গে প্রলয়দা। যদি আমেরিকা গিয়ে ভি· আই· পি· বনে যাও তখনকার জন্যে।'

প্রলয় ঘোষ হেসেছেন, কোন উত্তর দেননি এ কথায়। বি· কম· পাস খড়্গপুরের সামান্য কেরানীর হাতে জলজ্যান্ত আমেরিকার ভিসা—এ ব্যাপারটা বোধহয় কিছুতেই হজম হচ্ছিল না রবীনের। ববীনের আর কি দোষ, আমাদের দেশের একটু অবস্থাপন্ন মানুষেরাই এরকমভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। প্রলয় ঘোষদের মতো সাধারণ মানুষদের ভিসা পাওয়াটাও বোধহয় অপরাধ।

বাইরে পাখীর ডাক শুনতে পেলেন প্রলয় ঘোষ। হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন উনি, তিনটে পঞ্চান্ন, এত ভোরে পাখী ডাকে! বিছানা থেকে নীচে নেমে পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকালেন উনি। এখনো অন্ধকার কাটেনি। লাইলাকের ঝাড়গুলোতে পাতা নেই একটিও। কঙ্কালের মতো ডালগুলো এ ওকে জড়িয়ে জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। ছুটকি লাইলাক খুব ভালবাসে। এখানকার ফুল প্রলয় ঘোষের একটুও ভাল লাগে না। দামড়া, দামড়া—কিরকম পুরুষালি। তাছাড়া গন্ধে সেরকম তেজও নেই। দেশের যুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা এসবের সঙ্গে এখানকার ফুলের কোন তুলনাই হয় না। দু'দুবার দেশ থেকে চারা এনে লাগিয়েছেন। কাঠচাঁপার কলম লাগিয়েছিলেন বাগানে—শীতে মরে গেল। রজনীগন্ধা লাগিয়েছিলেন ঘরের টবে। ডাঁটা বেরোল, ফুল ধরল না। ব্যাকইয়ার্ডে তাই শুধু সব্জি লাগান প্রলয় ঘোষ। ছুটকির ফুলের খুব সখ। খানিকটা জায়গা নিয়ে ও ওখানে অনেক রকমের ফুলের গাছ লাগিয়েছে। গোলাপই আছে তিন চার রকম।

বাথরুমে গিয়ে কপালে, ঘাড়ে জলের ঝাপ্টা দিলেন প্রলয় ঘোষ। তোয়ালে দিয়ে পরিপাটি করে মুছে রান্নাঘরে এলেন। রান্নাঘরটা সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছেন রত্না। গোছানোর ক্ষমতা রত্নার চিরকালের। খড়্গপুরের ছোট্ট কোয়ার্টারটাও ঝকঝকে তকতকে করে রাখতেন। পুরোনো ছেঁড়া শাড়ি জমিয়ে

কেটেকুটে সেলাই করে জানালাগুলোতে সুন্দর পর্দাও লাগিয়ে রেখেছিলেন। এখানে তো কথাই নেই। গ্লাসে ঠাণ্ডা জল ঢেলে ডিনার টেবিলে এসে বসলেন প্রলয় ঘোষ। গলাটা উশখুশ করছে। পাইপ না ধরিয়ে ডানহিল সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করলেন উনি। আজকের রাত্তিরটা স্পেশাল—এখন ঠাণ্ডা জল খেয়ে আরাম করে বসে একটা সিগারেট খেতে দারুণ লাগবে।

আরাম করে ধোঁয়া গিলে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রলয় ঘোষ চোখ বুজে জেগে বসে রইলেন টেবিলে। আজকে উনি যেখানে দাঁড়িয়ে সেই জমিটুকু পুরোপুরি ওঁর আর রত্নার। ছোটবেলায় জামাইবাবুর কাছে ক্যারামবোর্ড ছাড়া আর কারো কাছে কিছু পেয়েছেন বলে মনে পড়ে না। আমেরিকায় এসেও কম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়নি। দেশে থাকতে আমেরিকা সম্পর্কে যে সব রঙীন স্বপ্ন দেখা যায়—এখানে সেগুলো ভেঙ্গে যেতে প্রথম দু'দিন লাগে। একটা সামান্য চাকরি জোগাড় করতেই মাস দুয়েক লেগেছিল ওঁর। কিন্তু হাল ছাড়েননি প্রলয় ঘোষ। জানতেন, এটাই ওঁর জীবনের একমাত্র সুযোগ। তাছাড়া, দেশে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। দেশে থাকতে জীবনের অর্ধেক কিংবা বেশি সময় মুখ ঘষটে কাটিয়েছেন। এখান থেকে শূন্য হাতে ফিরে গেলে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে রাস্তায়। কিছুই পাননি জীবনে, কাজেই হারাবার ভয়ও নেই। দাঁত কামড়ে পড়ে থেকেছেন নিউইয়র্কে। দু'মাস পরে সামান্য চাকরি পেয়েছিলেন একটা—অ্যাকাউন্টিং ক্লার্ক। সপ্তাহে একশ পঁয়ষট্টি ডলার মাইনে। বলতে কইতে ভাল নয় তেমন—তবে মন্দ কি! শুরুর পক্ষে যথেষ্ট। ন'টা পাঁচটা ছাড়াও সপ্তাহে প্রায় দশ ঘণ্টা ওভার টাইম প্রায় বাঁধা। একা মানুষ—রত্না, ছুটকিদের আসতে দেরী আছে। কাজেই, ম্যানহাটানের সস্তার বাড়িতে থেকে কষে টাকা জমিয়েছেন প্রলয় ঘোষ। প্রত্যেক সপ্তাহে ওভার টাইম নিয়ে কেটেকুটে হাতে পেতেন প্রায় দুশো ডলার। বাড়ি ভাড়া যেত সপ্তাহে কুড়ি ডলার—খুবই সস্তা। আসলে দু'জনে একঘরে থাকতেন তাই। উনি এবং একটি গুজরাটি ছেলে। মোহন পারিখ। ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল খুব অদ্ভুতভাবে।

নিউইয়র্কে এসে প্রথমে ওয়াই· এম· সি· এ-তে উঠেছিলেন প্রলয় ঘোষ। ঘরগুলো অনেকটা পায়রার খোপের মত। কোনরকমে শোয়া আর দাঁড়ানো যায়। সব থেকে খারাপ হল বাথরুম। পাশাপাশি অনেকগুলো শাওয়ার। প্রথম দিন বাথরুমে ঢুকে লজ্জায় বেরিয়ে এসেছিলেন প্রলয় ঘোষ। হুদো হুদো দৈত্যের মত লোকগুলো ন্যাংটো হয়ে স্নান করছে পাশাপাশি। কেউ কেউ গুণ গুণ করে

গান গাইছে আবার। গান গাওয়া তো দূরের কথা, জামাকাপড় ছেড়ে আরেকজনের সামনে স্নান করা যায় নাকি। প্রায় দিন তিনেক স্নান না করেই কাটিয়ে দিলেন প্রলয় ঘোষ। এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সীতে একটা অল্পবয়সী বাঙালীর ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। নাম শৈবাল বাগচি। সেই একটা ঘর ঠিক করে দিল প্রলয় ঘোষকে। আপটাউন ম্যানহাটানে। ব্রডওয়েের ওপর। আহা মরি কিছু ঘর নয়। তবে ওয়াই· এম· সি· এ'র তুলনায় স্বর্গ। আলাদা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন বাথরুম। গোলাপী রঙের বাথটব। চাকরি-বাকরি জোটেনি। সপ্তাহে চল্লিশ ডলার ভাড়াটাও একার পক্ষে খানিকটা বেশি। তাহলেও, খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই ঘরটা নিয়ে নিলেন প্রলয় ঘোষ। শৈবাল ছেলেটি ভালই। তবে, একটু অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। সব সময়েই কিরকম একটা গোমড়া কম্যুনিষ্ট কম্যুনিষ্ট ভাব।

সপ্তাহ দুয়েক পরে এক গভীর রাত্তিরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রাত এগারটা-বারোটা নাগাদ প্রলয় ঘোষের দরজায় ধাক্কা পড়ল। পরের দিন অফিস আছে। সবে তন্দ্রা এসেছিল। খানিকটা বিরক্ত হয়েই প্রলয় ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন—'কে?' কোন উত্তর না পেয়ে আবার ইংরিজীতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হু ইজ ইট?'

বাইরে থেকে কে একজন বলল—'কেয়া ম্যায় অন্দর আ সক্‌তা হুঁ। আপসে থোড়ি বাতচিত করনি হ্যায়।'

মাঝরাত্তিরে পরিষ্কার হিন্দী শুনে প্রলয় ঘোষ একটু আশ্চর্য হলেন। পিপহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লোকটাকে দেখলেন উনি। নেহাতই সাদামাটা ভারতীয় ছেলে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো: দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। বয়সও খুব বেশি নয়। বড় জোর বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। মনে মনে বিরক্ত হলেও দরজাটা খুলে ছেলেটিকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন প্রলয় ঘোষ। হাতে একটা বড় সুটকেস ও একটা বড় ব্যাগ নিয়ে ছেলেটি ঢুকে পড়ল ঘরে। প্রলয় ঘোষ প্রশ্ন করার আগেই কাঁচুমাঁচু মুখ করে ছেলেটি বলে উঠল. 'ম্যায় থোড়ি তকলিফ মে হুঁ। কেয়া আপ মুঝে থোড়ি মদৎ কর শকতে হ্যায়?'

প্রলয় ঘোষের হিন্দীর দৌড় বেশি নয়। তাও চেষ্টা করে হিন্দী ইংরিজী মিশিয়ে কোনরকমে বললেন—'বাতাইয়ে—What can I do?'

ছেলেটি যেন একটু স্বস্তিবোধ করল। সামনে চেয়ারটাতে বসে পড়ল ধপ করে। কোন কথা বলার আগে সময় নিল খানিকটা।

হয়ত কিভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে নিল একটু সময়। তারপর ইতস্তত করে বলল: 'বাত এইসি হ্যায়, মেরে জেব খালি হো চুকে হ্যাঁ।'

প্রলয় ঘোষ প্রমাদ গুনলেন। 'জেব' মানে কি ? হয়ত পুরোটা বোঝা যাবে এই আশায় কোন কথা না বলে উনি ছেলেটিব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছেলেটি একটু থেমে খানিকটা অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল : 'কেয়া ম্যায় থোড়ি দেরকে লিয়ে আপকা ইঁযাহা রহ শকতা হুঁ ? ম্যায় আপকা রেন্ট মে থোড়ি সি হিস্‌সা দেনেকি কৌশিশ করুঙ্গা। যিত্‌নি ভি জলদি হো ম্যায় দুসরি জাগাহা কি লিয়ে কৌশিশ করতে রহুঙ্গা।'

মোটামুটি মানেটা যা বোঝা গেল—তাতে ছেলেটি অর্ধেক ভাড়া দিয়ে কিছুদিন থাকতে চায়। মুখেব ওপব না বলে দিতেও খারাপ লাগল ওঁর। তাছাডা বিদেশ বিভুঁযে বিপদগ্রস্ত একটা ভারতীয় ছেলে—কিই বা বদ উদ্দেশ্য থাকতে পারে ! প্রলয় ঘোষ পাযচারি করলেন খানিক। এক গ্লাস জল খেলেন ঢক ঢক করে। অর্ধেক ভাডা দেবে বলছে। ওঁরও খানিকটা সাশ্রয় হবে এতে। যদিও এইটুকু ঘবে দুজনে থাকা একটু কষ্ট তাহলেও মাঝরাত্তিরে ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তাছাডা, সারা জীবন তো আর এখানে থাকছেন না। কাজেই কয়েকটা দিন না হয় একটু কষ্টই হল। ভাড়াটা সপ্তাহে কুড়ি ডলার বাঁচলেও অনেকখানি লাভ। চাকবিব তো কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই এখনো। সাত পাঁচ ভেবে মনটা ঠিক করে ফেললেন প্রলয় ঘোষ। কিন্তু বিছানা তো একটাই। ছেলেটাকে সোফাতে অথবা ফ্লোরে চাদর বিছিয়ে শুতে হবে। আগে থেকেই এসব ব্যাপার স্পষ্ট বলে দেওয়া ভাল। তাই, ছেলেটাকে প্রলয় ঘোষ সাফ বলে দিলেন—'ঠিক হ্যায়, থাকিয়ে। লেকিন বিস্তারা তো একঠোই হ্যায়। আপকো সোফামে শোনে হোগা।'

ছেলেটি হেসে ফেলল। প্রলয় ঘোষের হিন্দী শুনে নয়। আনন্দে। একটা ছাপ পড়ল মুখে। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করলেন প্রলয় ঘোষ। মোহন পারিখ সুটকেশ খুলে জামাকাপড় বার করে গুছিয়ে রাখতে লাগল ক্লোসেটে। একটু অবাকও লাগছিল প্রলয় ঘোষের। ওঁর একা থাকার খবরটা পেল কোত্থেকে মোহন। প্রশ্ন করতে মোহন জানাল যে ও খবর পেয়েছে ঐ ফ্লোরেরই কোণার ঘবের ছেলেগুলোর কাছে। এতক্ষণে প্রলয় ঘোষের মনে পড়ল কোণার ঘরের ছেলেগুলোকে। চার পাঁচটি গুজরাটি ছেলে ঐ ঘরে থাকে এক সঙ্গে। ও ঘরে তিল ধারণেরও জায়গা নেই আর। তাই বোধহয় প্রলয় ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে মোহনকে। যা হবার হয়ে গেছে। ভাল, মন্দ ভাবার আর কোন মানে হয় না। পরের দিন অফিস। তাই আলোটা ঢাকতে মুখে একটা তোয়ালে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন প্রলয় ঘোষ।

বয়সে ছোট, ভিন্ন প্রদেশের ছেলে, কিংবা ওর অনেক ব্যাপারই পছন্দসই না হলেও মোহনের কাছে অনেক কিছু শেখার ছিল। সপ্তাহ তিনেক পরে একদিন অফিস থেকে ফিরে প্রলয় ঘোষ ঘরে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেলেন। সোফার পাশে পাঁচ-পাঁচটা ছালার ইয়া ইয়া বস্তা ডাঁই করা। ঘরের একটা ছোট্ট ট্রানজিস্টার-খুব জোরে হিন্দী গান বাজছে। গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে টেবিলের ওপর রুটি বানাচ্ছে। প্রলয় ঘোষ ঘরে ঢুকতেই ওকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা নেচে নিল মোহন—গুণ গুণ করে গেয়ে উঠল—'কেয়া করু রাম, মুঝে নোকরি মিল গয়া।' 'নোকরি' শুনে চমকে উঠলেন প্রলয় ঘোষ। এই তো দু'তিন সপ্তাহ এসেছে ছেলেটা—এর মধ্যেই চাকরি পেয়ে গেল। ভাগ্য আছে বলতে হবে। একটু দমে গেলেন উনি। মোহন চাকরি পাবার রোমাঞ্চকর উপাখ্যান রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতে লাগল ওঁকে। মাইনে এমন কিছু বেশি নয়—সপ্তাহে দেড়শ ডলার। কিন্তু মোহনের আনন্দটা চাকরির অঙ্ক দিয়ে মাপা যাবে না। ও খালি বারে বারেই বলতে লাগলো—'চলো, শুরু তো হো চুকা।' যেন, শুরু হয়ে গেলে আর কোন ভয় নেই। যেখান থেকে, যেভাবে, যত নীচেই হোক শুরু করাটাই আসল। প্রলয় ঘোষকে কিচেনের ধারে-কাছে যেতে দিল না মোহন সেদিন। বলল : 'আজকা দিন আপনা দিন হ্যায় ইয়ার। আজ ম্যায় তুমহে খানা পাকাকরকে খিলাউঙ্গা।' কাজেই, মুখ হাত ধুয়ে চুপচাপ খাটে বসে থাকলেন প্রলয় ঘোষ। কথায় কথায় ছালার বস্তাগুলোর রহস্য উন্মোচন হল। চিনি, ময়দা, চাল ইত্যাদির পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাগ এক একটা। খেতে যখন হবেই, তখন আর রোজ বাজারে গিয়ে গিয়ে দাম বেশি দিয়ে ছোট প্যাকেট কেনা কেন। এতে সস্তাও হবে—রোজ বাজারে ছোটার থেকে রেহাইও মিলবে। তাই, চাকরির খবরটা পেতেই বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সস্তার সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেছে ও। কথায় কথায় আরো জানাল মাইনে পেলেই আগামী সপ্তাহে ভাড়ার বকেয়া টাকাটা চুকিয়ে দেবে ও। প্রলয় ঘোষ হতভম্ব হয়ে গেলেন। একটু দুর্বলভঙ্গীতে প্রতিবাদ করে বললে—লোকজন ঘরে এলে দেখতে খারাপ লাগবে না ? এ ব্যাপারটাও মোহন ভেবে রেখেছিল বোধহয়। চট করে সুটকেশ খুলে লালের ওপর সাদা ফুল-কাটা টেবিল কভার বার করে বস্তাগুলো ঢেকে দিয়ে তার ওপর ট্রানজিস্টরটা রেখে দিল। এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটল যে প্রলয় ঘোষ কথা হারিয়ে ফেললেন।

এমনিতে রাত্তিরে ভাত না খেলে ঘুম আসে না ওঁর। কিন্তু সেদিন পরিবেশটাই বোধহয় অন্যরকম ছিল। মোহনের তৈরী ডাল, পোড়া পোড়া

হাতে-গড়া পাতলা রুটি পেট পুরে খেয়েছিলেন উনি। একটা ব্রাউন ব্যাগ খুলে একটা সস্তার ওয়াইনও বার করেছিল মোহন। মদ-টদ খাননি বিশেষ কোনদিন। কিন্তু মোহনের 'নোকরি' পাবার মওকায় খেয়ে ফেললেন খানিকটা। খেতে মন্দ না! আর বোতলগুলোও খুব সুন্দর দেখতে। নিউইয়র্ক শহরে বসে পায়ের ওপর পা তুলে বসে সুন্দর বোতল থেকে ওয়াইন ঢেলে খাচ্ছেন ভাবতেই চোখে জল এসে গেল ওঁর। মনে মনে ভাবলেন চাকরি পেয়ে ভাল ঘরটর ভাড়া নিয়ে উনি ওয়াইন কিনে রাখবেন বাড়িতে। রোজ একটু একটু করে খাবেন।

মোহনের কাছে আরো অনেক কিছু শেখার ছিল ওঁর। মোহনই ওঁকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ঢেলে সাজাতে বলল। ডিগ্রীতে বি· কম· লিখতে নিষেধ করল। এদেশের লোকেরা বি কম· চেনে না। প্রলয় ঘোষ মোহনের উপদেশ মত ডিগ্রী বদলে লিখলেন বি· এস·—মেজর ইন অ্যাকাউন্টিং। এরই প্রত্যক্ষ ফল কিনা জানা মুশকিল কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক পরই অ্যাকাউন্টিং ক্লার্কের চাকরিটা পেয়ে গেলেন প্রলয় ঘোষ। আজ, এতদিন পবে মোহনের কথাগুলো পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন উনি। কেন মোহন বলেছিল 'চলো, শুরু তো হো চুকা'—এখন বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রথম প্রাচীরটা পেরোতে পারলেই দিগন্ত খুলে যায় আমেরিকায়। রাজা উজীর না হলেও মোটামুটি আরামে চলে যাবে জীবন। এই মোটামুটি আরামের জন্যই তো এতটা পথ আসা এতটা বয়সে। বলতে গেলে বয়স আন্দাজে বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। তখন ভাবলে ভয় লাগত, এখন ভাবতে মজা লাগে।

মাঝখানে আইল্যাণ্ড মতো করে ব্রডওয়ে রাস্তাটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই আইল্যাণ্ডে ছোট ছোট বেঞ্চ পাতা। এপাশে ওপাশে গাছ। গরমকালে বিকেল থেকেই বুড়ো-বুড়ীরা এই সব বেঞ্চিগুলোতে বসে থাকে। মোহনের দেখাদেখি অফিস ফেবত এসে প্রলয় ঘোষ এই বুড়ো-বুড়ীদের পাশে বসে গল্প করতেন। সাদা আমেরিকান বুড়ো-বুড়ীদের সঙ্গে—কালো বা স্পানিশ নয়। মোহন ঠিকই বলত এদের সঙ্গে রোজ গল্প করলে আমাদের উচ্চারণ খুব ভাল হবে। তাই, উচ্চারণ ভাল করার জন্য প্রায়ই সাদা বুড়ো-বুড়ি দেখলেই অফিস ফেরত ওদের পাশে গিয়ে বসতেন। হিজিবিজি হরেকরকমের গল্প করতেন। এখন আর সে সব হয় না। তখন একা ছিলেন বলে সম্ভব হোত। তাছাড়া, এত বছরের বাঙালী উচ্চারণ কি আর দুদিনে বদলানো যায়! তবে আগের থেকে উচ্চারণ যে অনেক ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগে তো প্রায় প্রত্যেক কথার পিঠেই অফিসের লোকেরা চোখ-মুখ কুঁচকে 'বেগ

ইয়োর পার্ডন' বলত।

আট বছর আগের ঘটনা এসব। কিন্তু এখনো মনে হয় সেদিন। সময় যে কি তাড়াতাড়ি চলে যায় এদেশে! উনি অ্যাপার্টমেন্ট নিলেন। রত্না, ছুটকিরা এল। ছুটকি স্কুলে ভর্তি হল। দুম করে রত্নাও চাকরি পেয়ে গেলেন একটা। গাড়ি, বাড়ি, ফার্নিচার কিছুই বাকি রাখেননি প্রলয় ঘোষ। প্রথম একচল্লিশ বছরে যা ভাবতে পারেননি কখনো, শেষ আট বছরে সুদে আসলে উপভোগ করে নিয়েছেন জীবন। কিন্তু রক্তের জোর আর নেই, শরীরটা বিট্রে করছে, হঠাৎ হঠাৎ এত সুখেও দুঃস্বপ্ন দেখেন মাঝে মধ্যে। ছুটকির জন্য মনটাও খচ্ খচ্ করে সব সময়। একটাই তো মেয়ে—সুখে থাকতে ওকে কেন ভূতে কিলোচ্ছে কে জানে! আসলে, না চাইতেই সুখটা পেয়ে গেছে ছোটবেলায়—তাই বোধহয় ওটাতে কোন মায়া নেই ওর। মাটির ব্যাপারে মনে মনে ওঁর ওপর অভিমান পুষে রেখেছে ছুটকি। উনি কি নিজেই চেয়েছিলেন মেয়েটা মরে যাক। মনে মনে চমকে উঠলেন প্রলয় ঘোষ। কৈফিয়তের ভঙ্গীতে নিজেই নিজের কাছে ঘাড় নাড়লেন। একগলা জলে দাঁড়িয়ে যেখানে সংসার ঠেলতে হয় সেখানে পনের বছরের মেয়েটা একটা বাজে ছেলের পাল্লায় পড়ে পেট বাধিয়ে বসলে কোন বাবা সুস্থ থাকতে পারে না। উনি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক, অন্ধ রাগে মেয়েকে চড় থাপ্পরও মেরেছেন এটাও ঠিক, কিন্তু ঈশ্বর জানেন মেয়েটা মরে যাবে এটা উনি স্বপ্নেও ভাবেননি কোনদিন। নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। আবার পাখী ডাকল বাইরে। ডানদিকে তাকিয়ে প্রলয় ঘোষ দেখলেন বাইরে অন্ধকার আর নেই। একটু একটু আলো ফুটেছে এখন।

গ্লাসটা ঠিক জায়গায় রেখে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন প্রলয় ঘোষ। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। না হলে শরীরটা খারাপ লাগবে কাল। ছুটকির শোবার ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের মধ্যে উঁকি দিলেন উনি। ছুটকি শুয়ে আছে বিছানায়। ওর প্রিয় টেডি-বিয়ারটা কোলের মধ্যে জড়ানো। চাদরটা সরে গেছে গা থেকে। ষোল বছরের মেয়ে টেডি-বিয়ার ছাড়া শোয় না। এখানে আসার পর কিনে দিয়েছিলেন ওটা। খড়্গপুরে ওর সম্পত্তি বলতে কাপড়ের বেড়াল ছিল। ছুটকি ওটাকে 'ম্যাওপুষি' বলত। ওটাকেই বকত, আদর করত, চিমটি কাটত, জড়িয়ে ধরে শুত। আদর করে করে ওটার প্রায় ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছিল। এখানে আসার পর তাই বড়োসড়ো একটা টেডি-বিয়ার কিনে দিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। এখনো ওটাকে জড়িয়ে ধরে না শুলে ঘুম আসে না

মেয়ের। পাশ থেকে ছুটকির মুখ অবিকল মাটির মত। মাটির রঙটা শুধু আরেকটু শ্যামলা ছিল। ঘরে বেশ শীত আছে। রাত্তিরে থার্মোস্টাটটা কমিয়ে রাখেন প্রলয় ঘোষ। নির্ঘাত ঠাণ্ডা লেগে যাবে মেয়েটার। ঘরের ভেতর গিয়ে চাদরটা জড়িয়ে দিলেন গায়ে। মেয়েটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মেয়ের কপালে একটু হাত রাখতে ইচ্ছে হল ওঁর। হাতটা বাড়িয়েও কি মনে করে হাতটা সরিয়ে নিলেন। কয়েকটা মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর, চোরের মত পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন বাইরে। শোবার ঘরে জানালার বাইরে লাইলাক গাছগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এতক্ষণে। গাছের ডালে একটা নাম-না-জানা পাখী। পালকে অনেক রকমের রঙ। প্রলয় ঘোষের দিকে পেছন ফিরে ডালে বসে ঘাড় নাড়াচ্ছে এদিক ওদিক। পর্দাটা সাপটিয়ে বন্ধ করে রত্নার পাশে চাদরের তলায় লেপ্টে গেলেন উনি। চোখটা বুজলেন। যদি ঘুম আসে।

'য়্যু আর লেজি—য়্যু নো দ্যাট ? ফ্যাট্ অ্যান্ড লেজি। ডু য়্যু নো হোয়াট টাইম ইট ইজ ? অলমোস্ট এইট। আই নো ইট'স স্যাটারডে। সো হোয়াট ? য়্যু আর পুটিং অন ওয়েট। কাম অন্ লেটস গো জগিং আউটসাইড। কাম অন্। হোয়াট ? উড য়্যু লাইক মি টু গিভ য়্যু এ কিস ? ওকে ! হিয়ার ইট কামস।' কেউ কাউকে বকাবকি করছে না—রোজই সকালবেলায় উঠে পিংকি টেডি-বিয়ারটাকে এরকম ভাবেই আদর করে। অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে গেছে পিংকির। ঘুমের পরে কুঁড়েমির রেশটা চলছে এখনো। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না নিজের, তাই টেডি-বিয়ারটাকে বকাবকি করে ঘুমটা পুরোপুরি ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছে ও। ওটাকে নিয়ে খানিকটা দলাইমালাই করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও।

বাইরে এখনই রোদ্দুর। সকালবেলা উঠে রোদ্দুর দেখলে খুব আনন্দ হয় পিংকির। বৃষ্টি আর মেঘ দুই দেখতে পারে না ও। ঘুম থেকে উঠে আকাশে মেঘ দেখলেই মনটা খারাপ লাগে। দিনটাই বাজে কাটে কিরকম। কোথাও বেরোতে ইচ্ছে করে না, স্কুলেও না। প্রত্যেকদিন এরকম রোদ্দুর উঠলেই পারে। তাহলেও আবার অন্যরকমের বিপদ। এই তো গত বছর অনেক দিন বৃষ্টি না হবার ফলে শহরের ওয়াটার রিজার্ভ কমে গিয়ে কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড হল সারাটা শহরে। বাগানে জল দেওয়া নিষেধ। ব্যাকইয়ার্ডে গোলাপগুলো বাঁচাতে পিংকির খুব কষ্ট হয়েচে গতবার। তাও দুটো মরশুমী গাছ মরেই গেল। রোজই রোদ্দুর উঠলে অবশ্য এই আলাদা করে ভাললাগা ব্যাপারটা থাকত না।

একঘেয়ে হয়ে যেত। বৃষ্টি আছে, মেঘ আছে তাই রোদ্দুরটাকে এত ভাল লাগে হয়ত।

দরজাটাকে ভাল করে বন্ধ করে নাইটিটা ছেড়ে ফেলল পিংকি। কাল রাত্তিরে ব্রেসিয়ারটা খুলে শুয়েছিল পিংকি। বড্ড গরম লাগছিল ঘরে। আয়নার সামনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াল পিংকি। জামাকাপড় না পরলে নিজেকে একেবারে অন্যরকম দেখায়। মাথার চুলগুলো অবিনাস্ত। চোখে এখনও যেন ঘুম ঘুম ভাব। পিংকিব বাঁ বুকে জরুল আছে একটা। বোঁটার ঠিক ওপরে। শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বুক দুটো একটু ফর্সা। বেশ বড়োসড়ো—গম্ভীর-সম্ভীর। গম্ভীর কথাটা মনে হতেই ফিক করে হেসে ফেলল পিংকি। বুককে কি গম্ভীর বলা যায় কখনো ? এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা মনে আসে ওর। আমেরিকার মেয়েদের তুলনায় ওর বুক দুটো অবশ্য বেশ বড়। জ্যানিস তো রীতিমত হিংসে করে। জিমে সাঁতার কেটে জামাকাপড় ছাড়ার সময়ে পিংকিকে দেখে জ্যানিস একবার বলেছিল--'নো ওয়াণ্ডার, দ্য গাইজ আর ম্যাড অ্যাবাউট য়্যু। য়্যু হ্যাভ নাইস বিগ বুবস। আই ফিল লাইক ক্যারাসিং দেম মাইসেল্ফ।' জ্যানিসটা খুব অসভ্য--যা মুখে আসে তাই বলে। জ্যানিসের অবশ্য বুক বলতে কিছুই নেই প্রায়। এমনিতে লম্বা, চওড়া, খুব মিষ্টি দেখতে। রঙটা একেবারে গোলাপী। অথচ, বুকের জন্য ওব কষ্টের শেষ নেই আর। এর ওর কথামতো নানারকম মালিশ-টালিশ দিয়ে টিপেটুপে দেখেছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সিণ্ডি অবশ্য অনেক কিছু জানে। ও বলেছে হরমোন ইনজেকশন নিতে। সেটা নিতে ভয় পায় জ্যানিস।

মুখে যতই অসভ্য হোক—জ্যানিসকে খুব ভাল লাগে পিংকির। এমন কি বত্নাও জ্যানিসকে খুব পছন্দ করেন। বাড়িতে এলেই গালে হাত দিয়ে আদর করেন ওকে। নিজে সামনে বসিয়ে খাওয়ান। পিংকির সঙ্গে মিশে জ্যানিস আজকাল সন্দেশ, নাড়ু-টাড়ু সব খায়। মাকে খুব পছন্দ করে জ্যানিস। মাঝে মাঝেই পিংকিকে বলে—'আই উইশ আই হ্যাভ এ মম লাইক হার।' জ্যানিসের আসল মা নেই, মারা গেছে অনেকদিন আগে। জ্যানিসের বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী ডরোথী এস্টার্ন এয়ারলাইন্‌সের এয়ারহোস্টেস। জ্যানিসের ভাষায়—'ডটি ইজ হার্ডলি হোম।' আসলে, এয়ারহোস্টেসদের সময়ে-অসময়ে ডিউটি বলেই জ্যানিসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় কম। তাছাড়া, এমনিতেও ডরোথীকে পছন্দ করে না জ্যানিস। বাবাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু ডরোথী সম্পর্কে ওর একটা প্রচ্ছন্ন রাগ আছে কোথাও। জ্যানিসরা বেশ বড়লোক। ওদের থেকে অনেক

বড় বাড়ি। তিন তিনটে গাড়ি। আর, বাড়িটা কি সাজানো! জ্যানিসের বাবার বিরাট প্রেস। দিনরাত্তির ওখানেই পড়ে থাকে। ঐ অত বড় সাজানো বাড়িতে অধিকাংশ সময় জ্যানিসই একা থাকে। মাঝে মধ্যে বন্ধু-বান্ধবীদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে জ্যানিস। ডরোথীকে কিন্তু পিংকির খারাপ লাগেনি। খুব সুন্দর, মার্জিত ব্যবহার। অবশ্য, ওপর থেকে কাউকেই ভাল করে চেনা যায় না। নিজের লোককেই কতসময় চিনতে কষ্ট হয়—ডরোথী তো পর—পিংকি মনে মনে ভাবল।

ঠাণ্ডা লাগছে বেশ। আয়নাতে নিজেকে দেখে একটু লজ্জা পেল পিংকি। কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে মনে নেই। জানালার পর্দাটা হাট করে খোলা। পাশের বাড়ির রান্নাঘর থেকে পিংকির শোবার ঘরটা পুরোপুরি দেখা যায়। পাশের বাড়ির লোকটা বাবার বয়সী—কিন্তু লোকটাকে সহ্য করতে পারে না পিংকি। বাঁদরের মতো দেখতে। পিংকিকে দেখলেই ফ্যাকফ্যাক করে হাসে। আদেখলের মতো ওর বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকটা বাবার বন্ধু অবনীশকাকুর মত। তাড়াতাড়ি পর্দাটা বন্ধ করে ব্রেসিয়ার পরে নিল পিংকি। জগিং স্যুটটা চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। মা'দের ঘরটা ভেজানো। বাবার নাক ডাকার আওয়াজ। সবাই ঘুমোচ্ছে এখনো।

বাড়ির বাইরে স্নিগ্ধ বাতাস পিংকিকে জড়িয়ে ধরল। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পাগুলো নেড়েচেড়ে আলস্য দূর করল ও। ছোটার আগে শরীরটাকে গরম করে নিতে হবে প্রথমে। জ্যানিসের কথামত ও জগিং শুরু করেছে মাস তিনেক আগে। এখন প্রায় নেশা হয়ে গেছে। দৌড় শুরু করতেই পাশের বাড়ির লোকটার মুখোমুখি পড়ে গেল ও। হলদে হলদে ছোপ ধরা কোদালের মত দাঁত বার করে পিংকিকে অভিনন্দন জানাল জেরি, 'গুড মর্নিং। হাউ ইজ মাই ইয়ং লেডী দিস মর্নিং।' পিংকি দৌড়তে দৌড়তে প্রত্যাভিবাদন জানাল : 'গুড মর্নিং।' লোকটাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জোরে দৌড়ে অনেকখানি দূরে চলে গেল পিংকি। না তাকিয়েও পিংকি বুঝতে পারে পেছন থেকে লোকটা ওকে চোখ দিয়ে চেটেপুটে খাচ্ছে।

ছুটতে বেরিয়ে রোজ ভোরেই কার্টারের সঙ্গে দেখা হয় পিংকির। দু'জনে মিলে অনেকখানি রাস্তা একসঙ্গে ছোটে। ছোটে হাঁপায় আর গল্প করে। তারপর ফেরার পথে বাড়ির তিন-চার ব্লক আগেই অন্য রাস্তায় বেঁকে যায় জন। গতবছর সেই কেলেংকারির ঘটনার পর থেকেই পিংকি অনেক সাবধান হয়ে গেছে। আঠার বছর বয়স হতে এখনও বেশ কয়েকমাস বাকি। শুধু শুধু আর

কয়েকমাসের জন্য নতুন করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হতে ও আর রাজী নয়। আঠার বছর পূর্ণ হলে জীবনের সমস্ত দায়িত্ব ওর নিজের। এটা নয় ওটা নয় শুনতে শুনতে ও ক্লান্ত। ও যে একটা মানুষ, ওর যে বুদ্ধিসুদ্ধি আছে এটা যেন কেউ মানতেই চায় না—বাবা না, মাও নয়। বাবা-মা নিজেরাই নিজেদেব মধ্যে ওর জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বহুদিন পার্টিতে মাকে আলোচনা করতে শুনেছে অন্য লোকের সঙ্গে। এখন থেকেই বিয়ে দেবার জন্য যেন উঠে-পড়ে লেগেছে বাবা-মা। যে কোন ছেলে দেখে সম্বন্ধ আনলেই পিংকি যে বিয়ে করবে না—কিংবা পিংকির যে কোন আলাদা মতামত আছে বা থাকতে পারে এ বিষয়ে ওঁরা বড্ড উদাসীন। অনেকদিন বাড়িতে থেকেছে পিংকি। ওর খুব ইচ্ছে আঠার বছর বয়স হলে ও অন্তত কিছুদিন একা থাকবে। একা থেকে কলেজে পড়াশুনো করবে আব পার্ট টাইম চাকবি করবে—যেবকম ইচ্ছে করবে সেরকম। শুধু পড়াশুনো তো অনেকদিন হল। নিজেব চাকরি, নিজের আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট এগুলোর স্বপ্ন দেখে পিংকি অবশ্য, চাকরি পাওযা আজকাল আর অত সহজ নয়। গত বছর পাশ কবেছে জন। চাকরি করবে ভেবেছিল কিন্তু চাকরি না পেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে এই স্প্রিংযে। জনের মন-মেজাজও আজকাল ভাল থাকে না এ কারণে। তাছাড়া, বিয়ের কোন প্রশ্ন ওঠেই না এখন। জনকে ভালবাসে ঠিকই কিন্তু বিয়েব কথা ভাবেনি কোনদিন। আর, বাবা-মার পছন্দ করা কোন বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। চেনাশুনো কাউকেই পছন্দ হয় না ওর।

জন আসেনি আজকে। কিছুক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে থাকল পিংকি। এদিক ওদিক দেখল অনেকবার। কোথাও খুঁজে পেল না জনকে। আরো কিছু সময়ে জনের জন্য অপেক্ষা করে জায়গাটা পেরিয়ে গেল পিংকি। মনটা দমে গেছে একটু। জনের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে ওর। জন আর চার-পাঁচটা সাধারণ ছেলের মত নয়। জন পিংকির জন্য ভাবে, পিংকির কথা শোনে। সেই যে বাবার ওপর রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মাথার উঠেছিল পিংকি—সেদিন জনই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে। জনই ওকে বুঝিয়েছিল—'দে আর ইয়োর ফোক্‌স। দে লাভ য়্যু পিংকি। ইট্ ইজ নট ইয়োর ড্যাড্‌স ফল্ট দ্যাট হি হেট্‌স মি।' ইটস দ্য সোশ্যাল সিস্টেম। হি হেট্‌স মি বিকজ হি লাভ্‌স য়্যু।'

পিংকি মানতে চায়নি—'আই হেট্ দ্য সিস্টেম।'

জন হেসেছে, বলেছে—'এক্‌সেপশন প্রুভস দ্য রুল পিংকি। য়্যু অ্যাণ্ড আই

ক্যান হেট ইট—বাট উই ক্যান্ট চেঞ্জ ইট।'

পিংকি তাও মানবে না—'হোয়াই নট?'

জন একটু গম্ভীর হল। পিংকির দু কাঁধে দু হাত রেখে মুখটা খুব কাছাকাছি এনে বলেছিল—'ক্যান্ট য়্যু সি? উই ডোন্ট কাউন্ট?'

পিংকি বিশ্বাস করেনি তাও। আস্তে আস্তে বলেছে—'আই হেট মাই ফাদার।'

জন কার্টার অদ্ভুতভাবে হেসেছে—একটু চুপ করে থেকে বলেছে—'এ্যাটলিস্ট য়্যু হ্যাভ এ ফাদার। আই নেভার নিউ হু মাই ফাদার ওয়াজ। আই ওয়াজ দ্য চাইল্ড অফ এ ওয়ান নাইট স্ট্যাণ্ড। হি হেট মাই মাদার, ডেটেড হার ফর এ ফিউ ডেজ, স্ক্রু'ড হার ওয়ান নাইট অ্যাণ্ড র‍্যান অ্যাওয়ে। দ্যাট্স লো, য়্যু নো দ্যাট? দ্যাট্স সামথিং য়্যু ক্যান হেট। নট্ ইয়োর ফাদার! হোয়াটএভার ইয়োর ফাদার ডিড, হি ডিড বিকজ হি লাভ্স য়্যু পিংকি।'

অথচ, বাবার ওপর জনেরই রাগ হবার কথা বেশি। বাবা তো জনকেই মারতে গিয়েছিল আগে। এসব গল্প জন আগে কোনদিন বলেনি। এতকাল নিজের সমস্যাটাই বড় করে দেখতো পিংকি। জনের কথা শোনার পর রাগটা কমে গিয়েছিল অনেক। জনের সঙ্গেই ফিরে এসেছিল বাড়িতে। কোন কেলেঙ্কারী অবশ্য হয়নি। কারণ, প্রলয় ঘোষ ও রত্না পার্টি থেকে ফেরেনি তখনো। পার্টি থেকে ফিরে দরজা খুলে পিংকির ঘরে উঁকি মেরেছিল রত্না। পিংকি ঘাপটি মেরে চোখ বুজে শুয়েছিল। মা ভেবেছিল ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরেই বাবা মাকে প্রশ্ন করেছিল—'ছুটকি কিছু খেয়েছে কিনা দেখ তো?' মা কি বলেছিল শুনতে পায়নি পিংকি।

যে জায়গাটায় জন আসে, দৌড়তে দৌড়তে আবার সেখানে ফিরে এল পিংকি। নাঃ নেই। ঘুম থেকে উঠতে পারেনি হয়ত। কিংবা শরীর খারাপও হতে পারে। জনের শরীর খারাপ হবে বিশ্বাস হয় না ওর। কোনদিন সর্দি কাশি পর্যন্ত হতে দেখেনি ও। জনের ফিগার খুব সুন্দর। এমনিতে প্রায় ছ' ফুট লম্বা। রংটাও খুব চকচকে। কুচকুচে কালো নয়। অনেকটা নতুন তামার পয়সার মতো। এক মাথা কোঁকড়ানো কাল কুচকুচে চুল—মাথার ওপর যেন নরম কার্পেট বিছানো। ওদের মধ্যে সাহেবদের রক্ত আছে। ওর ঠাকুমার ঠাকুমা, রোসা কোন সাহেবের ফার্মে ক্রীতদাসী ছিল। সাহেবের আলাদা বউ, ছেলে-মেয়ে ছিল কিন্তু বলতে গেলে ফার্মের যে কোন জোয়ান মেয়েকেই সাহেব বা ওর ইয়ার বন্ধুরা ইচ্ছে মতো উপভোগ করত। নামকা ওয়াস্তে একজনকে বিয়ে

করেছিল রোসা—চল্লিশ বছর বয়সে। একটি মেয়েও হয়েছিল ওদের। কিন্তু বিয়ের আগেই তিন ছেলে দুই মেয়ে ছিল রোসার। কোন সাহেবের ঔরসে এরা হয়েছিল বলা শক্ত কারণ অনেকের সঙ্গেই শুতে হত ওকে। এমনকি একই রাত্তিরে পালা করে যৌন সম্ভোগ করছে দু'তিনজন সাহেব—এরকমও হয়েছে ওর জীবনে। শুধু বাচ্চা হবার আগে পরে মাস ছয়েকের ছুটি পেত এই মেয়েরা। অবশ্য, যৌবনে ভাঁটা পড়লে খানিকটা রেহাই ছিল। সে সময় অনেকেই সংসার পাতত। যেমন রোসা পেতেছিল চল্লিশ বছর বয়সে। জন এসব শুনেছে মা ঠাকুমার কাছে। পিংকির এসব গল্প জনের মুখেই শোনা। দু' এক বছর আগে টেলিভিশনে 'রুটস্' বলে একটা ছবি দেখেছিল পিংকি। তার আগেই জনের কাছে এসব অনেক ঘটনা পিংকি জানত। 'রুটস্' সেরকম ভাল লাগেনি পিংকির। খুব সাজানো-গোছানো আর নাকি কান্নার বহরটা যেন বড্ড বেশি। অবশ্য, এতদিন পরে আর কিই বা এসে যায়।

এখন আর অবশ্য ওরকম নেই। ওপর ওপর কোন ভেদাভেদ চোখে পড়ে না। কিন্তু এটুকু পিংকি বুঝতে পারে সাদা কালো মিশ খায় না এখনো। এমনকি ইস্কুলেও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে পিংকি। যেমন, জ্যানিস বা সিণ্ডি। এরা জনের সাথে কথা বলে, গল্প করে ঠিকই, কিন্তু জ্যানিস বা সিণ্ডির বাড়ির পার্টিতে জন বা অন্য কোন কাল ছেলেকে কোনদিন দেখেনি পিংকি। এমন কি পিংকি জনের খুব ঘনিষ্ঠ জেনেও দুজনকে এক সঙ্গে কোনদিন নেমন্তন্ন করেনি জ্যানিস। অবশ্য, জ্যানিস বা সিণ্ডিকে এব্যাপারে কোনদিন প্রশ্ন করেনি পিংকি। হয়ত বা অপ্রীতিকর কোন উত্তর এড়িয়ে যেতে চেয়েছে ও। বা অন্যান্য ভারতীয় ছেলেমেয়েরাও যে সাদাদের সঙ্গে একবারে মিশে গেছে তা নয়। হয়ত ওখানেও সূক্ষ্ম কোন ভেদাভেদ আছে—কিন্তু কালো-সাদা ব্যাপারটা ওকে বিব্রত করে রীতিমত। এই বিব্রতবোধ করার আরেকটা কারণ হয়ত ওর আর জনের সম্পর্ক। আজকাল এইসব ব্যাপার নিয়ে বড্ড চিন্তা হয় ওর। আগে কেয়ার করত না—এখন করে। দু'এক বছর আগেও ও অনেক বেপরোয়া ছিল। যা মনে হত করত—যা ভাল লাগত বলত। যত বড় হচ্ছে তত ভয় ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আগে শুধু নিজের ভাললাগা বা মন্দলাগাটাই একমাত্র মাপ ছিল ওর কাছে। ইদানীং, ওর সম্পর্কে অন্যেরা কি ভাবছে এ সম্পর্কেও কৌতূহল বাড়ছে। এই বদলে যাওয়াই কি বড় হওয়া ? বড় হওয়া মানেই কি ভয়, সন্দেহ, সংশয় ? নিজের মনে প্রশ্নগুলোকে নিয়ে খেলা করতে করতে রাস্তায় ছুটতে লাগল পিংকি। বেশ রোদ্দুর উঠেছে এখন। সমস্ত

শরীর ভিজে গেছে ঘামে। বুক দুটো বড্ড বেশি দুলছে। ব্রেসিয়াবটা আলগা আছে বোধহয়। রাস্তাটা বেঁকতেই বাড়িটা দেখতে পেল পিংকি। পাশের বাড়ির জেরি জল দিচ্ছে সামনের লনে। পাশে একটা ছোটখাট জাহাজের মত মোটা ওর বউ লুসি সেজেগুজে রঙ মেখে দাঁড়িয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির কাছে এসে পড়ল পিংকি। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে লুসির চীৎকার কানে এল ওর : 'আর য়্যু আউট অফ ইয়োব মাইণ্ড ? লুক, হোয়াট য়্যু হ্যাভ ডান টু মাই ড্রেস ?'

ফিরে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না পিংকির। ওর ঘামে-ভেজা শরীরটা ভাল করে দেখতে গিয়ে হাতের জলের পাইপটা সোজা লুসির গায়ে উঠিয়ে দিয়েছে জেরি। অসম্ভব অপ্রস্তুত হয়ে জেরি এখন 'সরি, হানি', 'সরি, হানি', করছে আর পাগলের মতো লুসির দু-মণি বুকে হাত ঘষছে ক্রমাগত। জল মুছতে গিয়ে হাতের কাদাগুলো লুসির সখের পোশাকে লেপ্টে গেল বোধহয়। বাড়ির দবজা ঠেলে ভেতবে ঢুকতে ঢুকতে পেছনে লুসির চীৎকার শুনতে পেল পিংকি : 'আর য়্যু ব্লাইণ্ড ? হোয়াট'স হ্যাপেনিং টু য়্যু টুডে—য়্যু সুয়েল্ড মাই ড্রেস ?' কি হয়েছে লুসি জানে না কিন্তু পিংকি জানে। আর জেরি মোটেই অন্ধ নয়, ড্যাব ড্যাব করে ও যে কি দেখছিল চোখ বুজে পিংকি তাও বলে দিতে পারে। বেচারি লুসি। ঘরেব ভেতব ঢুকে হাসতে হাসতে জুতো-টুতো না ছেড়ে কার্পেটের ওপরই বসে পড়ল পিংকি।

ঘুম থেকে উঠেই মেয়ের হৈ হৈ হাসিতে হকচকিয়ে গেলেন রত্না। একটু অবাক হয়েই মেয়েকে প্রশ্ন করলেন 'কিবে, এত হাসি কেন ?'

হাসিটা থামাতেই অনেকক্ষণ লেগে গেল পিংকির। যতবার জেরির মুখটা মনে পড়ছে—ততবারই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার জোগাড়। চা ভেজাতে ভেজাতে রত্না আবার বললেন : 'আঃ, কি হয়েছে বলবি তো ? হাসতে হাসতে বিষম খাবি যে এবার।'

জুতোটুতো পবেই রান্না ঘরে এসে মাকে জড়িয়ে ধবে এক পাক ঘুরে নিল পিংকি। হুমড়ি খেয়ে প্রায় মেয়ের ঘাড়ের ওপরই পড়ে গেলেন রত্না। কোনমতে টাল সামলে মেয়েকে বললেন : 'ছাড়, ছাড়, পড়ে যাব যে।'

পিংকি মাকে জড়িয়েই ধরে থাকল : 'কিছুতেই ছাড়ব না, আমি তোমাকে এখন অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকব।'

রত্না মেয়েকে বললেন : 'এই ঘেমো গা নিয়ে তুই একেবারে মাখামাখি করলি আমায়'—বুক থেকে মেয়ের মুখটা তুলে এক দৃষ্টিতে দেখলেন মেয়েকে—'কি

যে এক ছোটা হয়েছে তোর। মুখ থেকে যেন আগুন ছুটছে মেয়ের। হ্যাঁরে, রোজ রোজ ছুটিস কেন এত ?' সযত্নে মেয়ের মুখ থেকে আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিলেন রত্না।

পিংকি বলল : 'ইট'স্ ফান্, মা। তুমিও চল না রোজ সকালে আমার সঙ্গে। দেখবে তোমার এই এত বড় পেটটা কোথায় চলে যাবে। ঠিক জেন ফণ্ডার মতো ফিগার হবে তোমার।'

রত্না হাঁ হাঁ করে উঠলেন--'কি দরকার আমার ফণ্ডা-মণ্ডার মতো ফিগার করে ! আর, তাছাড়া ঐরকম কণ্ঠা বের করা পাতা খটখটে ফিগার নিয়ে আমি কি কচি খুকি সাজব এই বয়সে।' মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আবার গজগজিয়ে উঠলেন : 'ইস, সমস্ত শরীর ভিজে সপ সপ করছে। যা, জামা-কাপড় বদলে আয়—সর্দি বসে এক্ষুনি জ্বর বাধাবি আবার। চা খাবি একটু।'

পিংকি মাথা নাড়ল . 'না, আমি বড় এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস খাব। এখন নয়, জামা-কাপড় বদলে তারপর।' মাকে ছেড়ে পিংকি নিজের শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। অনেকদিন পরে আজ সক্কালবেলা উঠে মনটা ভাল হয়ে গেল রত্নার। অনেকদিন পর পিংকি যেন মন খুলে হাসল আজকে। অনেকদিন পর রত্নাও মেয়েকে আদর করলেন। মেয়ের জন্য বড্ড দুঃশ্চিন্তায় থাকেন রত্না। বড্ড খামখেয়ালী—আর কথায় কথায় অভিমান। রত্নার মাঝে মাঝে মনে হয় এই এত বড় পৃথিবীতে খুব কম মানুষই হয়ত পিংকিকে বুঝতে পারবে। ওঁর নিজেরই অবাক লাগে. মাঝে মধ্যে সন্দেহ হয় মেয়েকে উনি নিজেই কতটুক চেনেন ! দিনকে দিন নিজের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে পিংকি। মেয়ে যত বড় হচ্ছে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন রত্না। মেয়ের যেন একটা আলাদা জগৎ তৈরী হয়ে যাচ্ছে। অথচ, সেই জগতে ঢোকবার চাবিকাঠি জানা নেই ওঁর। মেয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলে খুবই কম—বিশেষ করে সেই নিগ্রো ছেলেটাকে বাড়িতে আনার পর থেকেই মেয়ে আর বাবার মধ্যে একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরী হয়ে গেছে। যা একটু-আধটু কথা বলে মার সঙ্গেই বলে। বাবার কথা উঠলেই ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়ে। রত্না বুঝতে পারেন প্রলয় ঘোষও ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু, ওঁরও একরোখা জেদ। বাপে মেয়েতে ভাববাচ্যে কথা হয় এখন। বাইরের যে কোন লোক দেখলে বেশ অবাক হয়ে যাবেন। যেমন, মেয়ে হয়ত বাইরে বেরুচ্ছে—প্রলয় ঘোষ রত্নাকে বলবেন—'বাইরে ঠাণ্ডা আছে। সোয়েটার পড়ে যেতে বল।' একই ঘরে মেয়ে মাকে উত্তর দেবে—'ভেতরে

গরম জামা আছে, মা। তাছাড়া, এমন কিছু শীত নেই আজ।' কাউকে ফেলতে পারেন না রত্না। ভেতরে একটা অদ্ভুত কষ্ট হয়। কান্না ঠেলে আসে বুক থেকে। এ এমন একটা কষ্ট, এমন একটা লজ্জা যে কাউকে বলা যায় না, বোঝানো যায় না। সব কিছু নিজের মনের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। প্রলয় ঘোষকে দোষও দিতে পারেন না রত্না। কম দিন তো সংসার করলেন না লোকটার সাথে। অনেকখানি জীবন সরীসৃপের মতো মুখ থুবড়ে থুবড়ে কাটিয়েছে লোকটা—আজ যদি সে একটু সুখ চায়, স্বাচ্ছন্দ্য চায়, তাকে দোষ দিতে পারেন না উনি। আর কেউ না জানুক রত্না তো জানেন এমনিতেই বড় মেয়েটা যেন কাঁটা হয়ে বুকে বিঁধে আছে ওঁর। মুখে ভুলে যাবার ভান করেন কিন্তু রত্না বুঝতে পারেন মনের মধ্যে এখনো একটা বিরাট দগদগে ঘা। মাটি মারা যাবার পর প্রথম প্রথম রাতের পর রাত প্রলয় ঘোষ জেগে কাটাতেন। চুপচাপ খাটের ওপর বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতেন। ঘুমোতে পারতেন না কিছুতেই। ভোরের দিকে একটু আধটু ঘুমোলেও চমকে চমকে উঠতেন থেকে থেকে। ভাগ্যিস, আমেরিকার ভিসাটা এসে গেল সেই সময়। নাহলে উনিই বেশিদিন বাঁচতেন কিনা সন্দেহ। আমেরিকায় এসে হৈ হুল্লোড় করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন খানিকটা। হয়ত বা জেদের বশেই। রত্না এসব ঘটনা জানেন তাই, তাছাড়া স্বামী বলে রত্না যতখানি বোঝাবার চেষ্টা করেন—বাইরের মানুষের অত মাথাব্যথা নেই। দেশের নাম শুনলেই প্রলয় ঘোষ রেগে যান—বলেন 'অত দেশ দেশ করার কি আছে? দেশ কি দিয়েছে আমাদের? দেশে থাকতে তো কোন লোককেই বলতে শুনিনি, আহাঃ কি সুন্দর দেশ। এখান থেকে ফিরে যাবার নামটি তো কেউ করে না—অথচ, আদিখ্যেতা করে দেশ বলে কেঁপে কেঁপে ওঠা চাই।' রত্না অবশ্য কথাগুলো মানেন না—এতদিন থেকেও আমেরিকায় ভাল লাগে না ওঁর, কিন্তু স্বামীর জ্বালাটা উনি বুঝতে পারেন, রাজা-মহারাজার মতো না হোক, খেয়ে-পরে সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন খানিকটা—সব কিছু ফেলে দেশে ফিরে নতুন করে কাঙালের মতো থাকা যাবে না আর। দেশের অবস্থাপন্ন আত্মীয়স্বজন যাঁরা দেশে থাকতে ওঁদেরকে একটা করুণামিশ্রিত সহানুভূতির চোখে দেখতেন—এখন তারা আকারে-ইঙ্গিতে কথা শোনায়, বলে—'আমেরিকায় গিয়ে টাকা করার মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? দেশে করতে পারলে বুঝতাম!' এসব কথায় প্রলয় ঘোষ আরো তেলেবেগুনে জ্বলে যান, বলেন—'সহানুভূতি দেখানো যাচ্ছে না তাই বোধহয় এত রাগ।' সবাই অবশ্য এরকম নয়। খড়্গপুরে দেবতোষের স্ত্রী অনিমাদিকে অনেক সুখ-দুঃখের কথা

লিখেছিলেন রত্না। তার উত্তরে দেবতোষদা-অনিমাদি দুজনেই লিখেছেন—'যতই মন খারাপ করুক, দেশে ফেরার কথা স্বপ্নেও ভেব না। দু'এক মাসের জন্য বেড়াতে এলে ঠিক আছে—। কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ছে—বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।' ওঁরা মিথ্যে কথা বলেন না সেটা রত্না খুব ভালভাবেই জানেন। তাছাড়া, ফিরে যাবার প্রশ্ন এমনিতেই আর ওঠে না। শুধু পিংকির জন্যেই যা একটু ভাবনা। ওর একটা দেখেশুনে ঠিকমত বিয়ে দিতে পারলেই ব্যস! এ বিষয়ে একটা ভয়ও মাঝে মাঝে উঁকি দেয় মনে—ওদের কথায় পিংকি কি বিয়ে করবে? বাঙালী ছেলে কাউকেই পছন্দ হয় না ওর।

টেবিলে দু কাপ চা আর বিস্কুটের টিনটা সাজিয়ে প্রলয় ঘোষকে বাইরের ঘর থেকেই ডাকলেন রত্না: 'ওঠো, চা দিয়েছি। সাড়ে দশটা বাজতে চলল!' চাদরের তলা থেকে প্রলয় ঘোষ কি বললেন বোঝা গেল না। তাই রত্না একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকলেন: 'প্রায় দুপুর হয়ে গেল যে! চা খাবে এস!'

প্রলয় ঘোষ একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করলেন। সারারাত্তির যে জেগে বসেছিলেন উনি, রত্না সেটা জানেন না। আজকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে বিকেলে। পার্থ আসবে কলকাতা থেকে। রত্নার বোন শিপ্রাব দেওরের ছেলে। আজকের রাত্তিরটা ওদের কাছেই থাকবে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সবে চাকরিতে ঢুকেছিল। ভিসা পেয়ে চলে আসছে এখানে। শিপ্রা অনেক করে লিখেছে দেওরের হয়ে। আগেরবার দেশে গিয়ে পার্থকে দেখেছিলেন রত্না। তখনো কলেজে পড়ছিল ছেলেটি। পড়াশুনোয় ভাল—দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। একটা ক্ষীণ ধারণা জন্মেছিল মনে মনে। পিংকির সঙ্গে এই ছেলেটির বিয়ে হলে মন্দ হয় না। চেনাশুনো ঘর—সংসারও ছোট। এক ভাই, এক বোন—বাবা-মা। অবস্থা অবশ্য এমন কিছু ভাল নয়। ওঁদের নিজেদের অবস্থাও তো এমন কিছু ভাল ছিল না দেশে। নেহাত আমেরিকায় আছেন—স্বামী-স্ত্রী চাকরি করছেন তাই এখন একটু অন্যরকম। রত্না ভেবে রেখেছিলেন এবার দেশে গিয়ে কথাটা পাড়বেন শিপ্রার কাছে। ভালই হল, ছেলেটা ভিসা নিয়ে নিজেই চলে আসছে।

শোবার ঘর থেকে 'উঃ' করে আওয়াজ হল একটা। কে যেন ধপ করে বসে পড়ল কার্পেটে। রত্না তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গেলেন। কার্পেটের ওপর থেবড়িয়ে বসে আছেন প্রলয় ঘোষ। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত। হাত দিয়ে

কোমরটাকে মালিশ করছেন ক্রমাগত। রত্না বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন—'কি হল ?'

অত যন্ত্রণার মধ্যেও প্রলয় ঘোষ একটু লজ্জা পেলেন মনে হল। খানিকটা অপরাধীর মত বললেন—'ওঠ-বস করতে গিয়ে কোমরে হ্যাঁচকা লেগেছে খুব।' রত্না হেসে ফেললেন। রত্নার হাসি দেখে প্রলয় ঘোষ একটু রেগেই গেলেন—'হাসছ কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ধরে তোল।'

প্রলয় ঘোষ এখন আর রোগা নেই মোটেই। গত নয় বছরে অন্তত কুড়ি বাইশ পাউণ্ড ওজন যে বেড়েছে—ধরে তুলতে গিয়ে সেটা টের পেলেন রত্না। মৃদু হেসে বললেন—'কোনদিন তো কর না। আজ হঠাৎ ওঠ-বস করতে গেলে যে ?'

প্রলয় ঘোষ খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন—'বড্ড ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে—তাই ভাবলাম...' কথাটা শেষ করার আগেই রত্না বললেন—'বয়স হচ্ছে—এখন আর এইসব করার কি দরকার ?'

'বয়স হচ্ছে মানে ?' খেঁকিয়ে উঠলেন প্রলয় ঘোষ—'বাহান্ন বছরটা কি কোন বয়স হল নাকি ? লোকে এই বয়সে নতুন করে বিয়ে থা করে সংসার পাতে এসব দেশে। আশি বছর বয়সে চার্লি চ্যাপলিনের বাচ্চা হয়েছিল জান ?'

রত্না বাধা দিলেন—'সাহেবদের কথা আলাদা। ওরা গরু-টরু খায়।'

প্রলয় ঘোষ এবার সত্যিই রেগে গেলেন—'গরু-টরু খায় তো কি ! আমিও তো অফিসে এক বেলা প্রায়ই গরু খাই।'

গরুর সঙ্গে বাচ্চা হবার কি সম্পর্ক ? আমি বলছি ওরা কত ফিট্ আর তুমি বলছ ওরা গরু-টরু খায়।' রত্না কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন—'আয়োডেক্স মালিশ করে দেব ?'

চেয়ারে বসতে বসতে চমকে উঠলেন প্রলয় ঘোষ :—'আয়োডেক্স ? আয়োডেক্স কোথায় পেলে ?'

'কেন, এখানকার ইণ্ডিয়ান স্টোরে আয়োডেক্স, ডেটল সব কিছুই পাওয়া যায় আজকাল—আমি একটা কিনে এনেছি গত সপ্তাহে।'

'না, না, ইণ্ডিয়ান স্টোরের আয়োডেক্স মাখবে না। ওদেরকে কোনমতে বিশ্বাস করা যায় না—পচা গোবর মাখিয়ে রেখেছে হয়ত'—একটু থেমে প্রলয় ঘোষ বললেন—'আমাকে বরঞ্চ একটু আর্নিকা দাও। ব্যথা বাড়লে একটু সেঁক দেওয়া যাবে রাত্তিরে।'

রত্না উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। পচা গোবরের ব্যাপারটাতে আবার

হাসি পেল ওর। হাসিটা ঢাকতে উনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে আর্ণিকা আনতে ছুটলেন। সামান্য ঘটনা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধাবার কি প্রয়োজন এই সক্কালবেলায়—রত্না মনে মনে ভাবলেন।

চা খেতে খেতে পার্থর কথাটা পাড়লেন রত্না—'কখন প্লেন আসছে খবর নিও একটু।'

সময়টা হিসেব করে প্রলয় ঘোষ বললেন—'বারোটার আগে জানা যাবে না। সবে লণ্ডন থেকে ছেড়েছে এখন।' সকালের দিকে ঘুম হয়েছে একটু। কিন্তু প্রায় সারারাত্তির জেগে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে এখন।

পিংকির ফোন এল একটা। রত্না ফোন ধরলেন। জ্যানিস ফোন করছে। চীৎকার করে ডাকলেন মেয়েকে। পিংকি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। স্নান করে নতুন জামাকাপড় পরেছে পিংকি। আবার, বাইরে বেরোবে মনে হচ্ছে। প্রলয় ঘোষ মেয়েকে একবার দেখলেন কিন্তু কোন কথা হল না দুজনের।

পিংকি ফোন ধরল—'হাই, জ্যানিস' পিংকির কথা শুনে মনে হল জ্যানিসের ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল ও—'ইয়েস আই অ্যাম কামিং। নো, নো, য়্যু ডোন্ট হ্যাভ টু পিক্ মি আপ। আই উইল টেক্ এ বাস। আই উইল স্টার্ট ইন্ অ্যাবাউট টেন মিনিটস্। ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট দ্য নোটস, আই হ্যাভ ইট। ব্রিং সাম গ্রাফ পেপারস্। ওকে, সি য়্যু দেন।'

ফোনটা ছাড়তেই অরেঞ্জ জুস এগিয়ে দিলেন রত্না: 'কি খাবি? অমলেট সসেজ করে দেব।'

পিংকি মাথা নাড়ল—'না, আমি একটু সিরিয়াল খেতে পারি। বেশি খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

রত্না গাঁইগুঁই করতে লাগলেন—'খেতে ইচ্ছে করছে না কেন? একটু সিরিয়াল খেয়ে কি থাকা যায় বেলা পর্যন্ত। একটু পরেই মাথা ধরে যাবে। দুটো রসমালাই দেব!'

চোখ গোল গোল করল পিংকি—'উরি বাপরে। একেবারে কিটকিটে মিষ্টি আর কন্‌সেনট্রেটেড ফ্যাট।'

'ফ্যাট তো কি!' রত্না ধমকে উঠলেন—'এটা তো দুধ-ঘি-ছানা খাওয়ারই বয়স। এখন খাবি না তো কবে খাবি?'

'মা, প্লীজ।' মার মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরল পিংকি।

প্রলয় ঘোষ চা খেতে খেতে হাসলেন। কোন কথা বললেন না। শুধু মেয়ে বেরোবার আগে রত্নাকে বললেন—'আমরা তিনটে নাগাদ বেরোব।' এমন

জোরে বললেন যাতে পিংকি শুনতে পায়।

রত্না মেয়েকে প্রশ্ন করলেন—'কখন ফিরবি ?'

পিংকি বলল—'তার আগেই।'

রত্না আবার বললেন—'পার্থ আসছে আজকে। পার্থকে মনে আছে তোর ? ছোটমাসীর ওখানে দেখেছিলি গতবার—মনে আছে ? ও আসবে আজকে বিকেলে কলকাতা থেকে।'

পিংকির মনে পড়ল না চট করে। বেরিয়ে যাবার আগে পিংকি শুধু বলল—'ঠিক আছে, তিনটের আগে আমি ফিরে আসব, মা।'

মেয়ের পার্থকে মনে পড়ল না বলে রত্না একটু দমে গেলেন। প্রলয় ঘোষের চা খাওয়া শেষ। টেবিল থেকে উঠতে উঠতে রত্নাকে বললেন—'লিস্টটা করে ফেল। বাথরুম সেরে বাজারটা করে নিয়ে আসি।'

হাঁটতে গিয়ে আবার আর্তনাদ করে উঠলেন উনি—কোমরের ব্যথাটা একই রকম আছে—বরং একটু বেড়েছে বোধহয়। প্রলয় ঘোষ কোনরকমে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন—রত্না বাজারের লিস্টটা তৈরি করে চায়ের কাপগুলো মেজে রান্নার জোগাড়-যন্তর করতে থাকলেন। পার্থর কথাটা এখনো মনের মধ্যে ঘুরছে। পার্থ আর পিংকি।

পরীক্ষা সামনে এলেই পিংকির টেনশন শুরু হয়। দু'তিন বছর আগে পর্যন্ত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করত ও। খুব উত্তেজিত থাকে ও এই সময়। খুব ভয় আর নার্ভাস লাগে সব সময়। কারো সঙ্গে বেশিক্ষণ মন দিয়ে কথা বলতে পারে না। যা যা আগে জানত পরীক্ষার আগে সেগুলোও কিরকম ভুলে যাবে মনে হয়। অন্যমনস্ক হয়ে মাথার চুল পাকিয়ে পাকিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। নিজের অজান্তেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে ফেলে মাঝে মাঝে। গত দু'তিন বারে ভয় খানিকটা কমেছে, আগের মতো অতটা নার্ভাসিও হয় না আজকাল। তবু, পরীক্ষা ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ করে না। অথচ, পড়াশুনো করতে ভালই লাগে। পিংকি মনে মনে ভাবে স্কুল পেরিয়ে কলেজে গেলে হয়ত ভয়টা কেটে যাবে, পুরোপুরি। কলেজের কথা ভাবতে পিংকির খুব ভাল লাগে। কলেজ মানেই বড় হয়ে যাওয়া, কলেজ মানেই স্বাধীনতা, কলেজ মানে কৈফিয়ত দেওয়া নয়, কলেজ মানেই চাকরি, আর, চাকরি মানেই নতুন নিজস্ব জীবন। আর কয়েকটা মাস ও যেন অপেক্ষা করতে পারছে না পিংকি।

বাইরেটা খুব সুন্দর। ঝলমলে রোদ। না শীত, না গরম। বাস স্টপে এসে দাঁড়াল পিংকি। একদম ভীড় নেই রাস্তায়। শহরের মানুষেরা অনেকেই ঘুমিয়ে

এখনো। বাসের জন্য এখন কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে! ছুটির দিনে বাসেরও সময়ের ঠিক নেই। পিংকির কিন্তু সময় খুব বেশি নেই। এগারটা বেজে গেছে। তিনটের আগে ফিরতে হবে বাড়িতে। তার মধ্যে লাইব্রেরী গিয়ে কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে হবে। আজকাল যতটা সম্ভব অশান্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে পিংকি। লড়াই করতে ভাল লাগে না আর।

বাস এসে পড়ল। পয়সা ফেলে সামনের সিংগল সিটে বসে পড়ল পিংকি। এই বাসগুলো নতুন ছেড়েছে শহরে। একেবারে নতুন। বসবার জায়গাগুলোও অন্যরকম। দেয়ালে কোন বিজ্ঞাপনের বাহুল্য নেই। বাইরের ওয়েদার আন্দাজে ভেতরে গরম-ঠাণ্ডা খুব সাবধানে নিয়ন্ত্রিত। চারিদিকে টিন্টেড গ্লাস। ভেতর থেকে বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের কিছু বোঝবার উপায় নেই। সামনের স্টপে বাস থামল। একটা বুড়ো মতন লোক উঠল প্রথমে। পেছন পেছন যে দুজন উঠল তাদেরকে দেখে একটু অবাক হল পিংকি। শৈবাল কাকু আর টিয়া কাকিমা। স্লটে ভাড়ার পয়সা ফেলতে ফেলতে শৈবাল পিংকিকে দেখতে পেল—'আরে, পিংকিরানী যে। গুড মর্নিং। এত সকালে কোথায়?'

পিংকি হাসল—'লাইব্রেরী। পরীক্ষা এসে গেল।' টিয়া কাকিমা কি রোগা হয়ে গেছে। ছোট ছোট করে কেটে ফেলেছে চুলগুলো—একেবারে অন্যরকম দেখতে হয়ে গেছে এখন। পিংকির সামনেই লম্বা সিটটায় টিয়া আর শৈবাল বসে পড়ল। পিংকির অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা দেখে টিয়া বোধহয় বুঝতে পারল—প্রশ্ন করল—'আমি বড্ড রোগা হয়ে গেছি, না রে?'

পিংকি একটু হাসল—মাথা নাড়ল অর্থাৎ হ্যাঁ। টিয়া কাকিমার মুখটা যেন বড্ড বেশি গম্ভীর—কি যেন একটা নেই। কয়েক মুহূর্ত টিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে পিংকি বলল—'তুমি অনেক বদলে গেছ। কি যেন নেই।'

টিয়া অল্প হাসল—'কি নেই বল ত?' পিংকি অবাক হয়ে তাকাতে টিয়া বলল—'সিঁদুর আর টিপ!'

এবারে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেল পিংকি—মোটেই কথাটা এভাবে বলতে চায়নি পিংকি। টিয়াকে মোটেই আঘাত দিতে চায়নি ও। টিয়া আবার বলে উঠল: 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন? আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কপালে মনে মনে টিপ লাগিয়ে দেখ্ ঠিক মিলে যাবে'—কথাগুলো বলে আদর করে পিংকির গালটা টিপে দিল টিয়া।

শৈবাল ওদের কথাবার্তা শুনছিল এতক্ষণ। পিংকির দিকে তাকিয়ে শৈবাল

হাসতে হাসতে বলল : 'তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে আজকে। খুব সাবধান। শহরের গাড়ি ঘোড়া থেমে যেতে পারে আজ!'

লজ্জায় পিংকির কানের দুপাশ গরম হয়ে উঠল—কোনরকমে বলল—'ধ্যাৎ কেন মিছিমিছি আমার লেগ পুল করছ সক্কালবেলা।'

শৈবাল পিংকির মুখোমুখি তাকাল—তারপর খুব গম্ভীর হয়ে বলল—'বিশ্বাস না হয় আদেশ করে দেখ। তোমার আদেশে আমি যীশুখ্রীস্টের মত জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারি।'

পিংকির লজ্জা দেখে টিয়া হেসে ফেলল—শৈবালের মাথায় আলতো করে চাঁটি মেরে পিংকিকে উদ্দেশ্য করে বলল—'দে-না আদেশ। দেখবি এক্ষুনি জলে ডুবে নাকানি-চোবানি খাবে।'

শৈবাল এখনো গম্ভীর হয়ে পিংকির দিকে তাকিয়ে—পিংকি হেসে ফেলল এইবার—বলল : 'তোমার সঙ্গে তো আর দেখা হয় না। তাই বাংলা বইও পড়া হয় না আজকাল। তুমি কোথায় থাক শৈবাল কাকু?'

শৈবাল দু'কানে হাত দিল—'ইস্। কাকু। কাকু নামটা শুনলেই ভয় লাগে। বাংলা সাহিত্যে কাকুদের এত বদনাম আছে।'

পিংকি অবাক হল—'কেন?'

শৈবাল এবার বিপদে পড়ল। পাশ থেকে টিয়া খুব জোরে চিমটি কাটল শৈবালকে। তারপর বলল—'তোকে খেপাচ্ছে শৈবাল। তুই একদম কথা বলিস না ওর সঙ্গে।'

পিংকি শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসল—'সত্যি? তুমি আমাকে খেপাচ্ছ?'

শৈবাল বলল—'কতদিন কাউকে খ্যাপাই না বল ত? খ্যাপাব আর কাকে? সবাই তো এমনিতেই খ্যাপা। আমিও।'

শৈবালের লেকচার দেবার ভঙ্গিতে পিংকি আর টিয়া দুজনেই হেসে ফেলল। পিংকি আবার বলল—'তোমার ঠিকানাটা দেবে না শৈবাল কাকু?'

শৈবাল একটু অস্বস্তিতে পড়ল এইবার—দেয়াটা উচিত হবে কিনা বুঝে উঠতে পারল না। পাশ থেকে টিয়া একটা কাগজে ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা লিখে পিংকিকে দিল। পিংকি টিয়াকে বলল—'তোমারটা?'

টিয়া ওর নিজের ঠিকানা লিখে বলল—'নতুন এই ঠিকানায় মুভ করব সামনের শনিবার। ফোন এখনো নেই। শৈবালকে ফোন করে জেনে নিস্।'

ঠিকানার ব্যাপারে শৈবাল অস্বস্তিবোধ করছে এখনো। শৈবালের দিকে তাকিয়ে পিংকি হাসল এইবার। বলল : 'শৈবাল কাকু, আমার আদেশে তুমি সব

করতে পার, বলছিলে না ?'

শৈবাল প্রমাদ গুনল। টিয়ার দিকে তাকাল। টিয়া মুচকি হাসল—'আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন ? জবাব দাও এইবার।'

শৈবাল কাঁচুমাচু হয়ে ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ হ্যাঁ।

পিংকি গম্ভীর হয়ে বলল—'আমাকে একদিন তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন কর জুলাই-এর পর।'

শৈবাল অবাক হল—'জুলাই-এর পর কেন ?'

পিংকি টিয়ার দিকে তাকাল—'জুলাইয়ে আমার আঠার বছর বয়স হবে। তখন আমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে বাবা-মা শুদ্ধ করতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব। অবশ্য, যদি তুমি চাও।'

পিংকির কথায় শৈবাল আর টিয়া হো হো করে হেসে উঠল। শৈবাল বলল—'ঠিক আছে, নেমন্তন্ন করলাম। তুমি জানিও কবে আসবে।'

পিংকি বলল : 'প্রমিস ?'

শৈবাল বলল : 'প্রমিস।'

পাশ থেকে টিয়া শৈবালকে বলে উঠল—'আমি সাক্ষী থাকলাম। প্রমিসটা মনে থাকে যেন।'

আরো কিছুক্ষণ পরে সিট ছেড়ে উঠে পড়ল পিংকি। লাইব্রেরী এসে গেছে। পিংকিকে নামতে হবে। টিয়া বলল : 'ভাল করে পরীক্ষা দিও।'

পিংকি হাসল।

শৈবাল বলল—'যেমন করেই হক, জুলাই পর্যন্ত বেঁচে থাকবই আমি পিংকি।'

পিংকির উত্তর দেওয়া হল না। নেমে গিয়ে বাইরে থেকে হাত নাড়ল পিংকি। বাস ছেড়ে দিল।

লাইব্রেরী থেকে পৌনে তিনটে নাগাদ পিংকি আর জ্যানিস উঠে পড়ল। পিংকিকে বাড়ি পৌঁছুতে হবে তিনটের মধ্যে। ভাগ্যিস, জ্যানিস পৌঁছে দেবে বলেছে। নাহলে নির্ঘাৎ দেরী হয়ে যেত আজকে। আর, ও জানে দেরী হলেই বাবা অদ্ভুতরকম গম্ভীর হয়ে যাবে। ওকে কিছু না বলে মার ওপর রাগারাগি শুরু করবে তখন।

গাড়িতে উঠে জ্যানিস সিগারেট ধরাল একটা। খুব আস্তে চলছে গাড়িটা। খুব ট্রাফিক রাস্তায়। শনিবারের বিকেল—সুন্দর ওয়েদার। তাই, সবাই বেরিয়ে

পড়েছে রাস্তায়। গুনগুন করে গান গাইছিল জ্যানিস। বাইরের দিকে তাকিয়ে পিংকি রাস্তা দেখছিল আর টিয়া-শৈবালের কথা ভাবছিল। অনুপকাকু-টিয়া কাকিমার ডিভোর্সের কথা সবাই জানে। টিয়া কাকিমার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলেনি কোনদিন পিংকি—দূর থেকে অন্যরকম মনে হত। সামনাসামনি কথা বলে আজকে খুব ভাল লাগল ওর। শৈবালকাকুকে অবশ্য ওর চিরকালই ভাল লাগে। ঠিক বন্ধুর মতো মনে হয়। কিন্তু, কাকুদের বদনাম আছে বলল কেন শৈবালকাকু ? টিয়া কাকিমা চিমটি কাটল কেন শৈবালকাকুকে ? এর পরের দিন দেখা হলে টিয়া কাকিমাকে আলাদা করে ও ঠিক এই কথাটা জিজ্ঞাসা করবে।

জ্যানিস পিংকিকে প্রশ্ন করল—'ডু য়্যু সি জন দিজ ডেজ ?'

'সাম টাইমস্'—ওর সঙ্গে জনের যে প্রায় রোজই দেখা হয় এ কথাটা সযত্নে এড়িয়ে গেল পিংকি।

"হাউ ইজ হি ডুইং ?'

'হি গোজ টু সিটি কলেজ'—

'ডাজ হি ?' জ্যানিসকে চঞ্চল মনে হল।

'হোয়াই ডু য়্যু আস্ক ?' জ্যানিস সাধারণত জনের কথা বলে না—তাই একটু অবাক হল পিংকি।

'ওয়েল, উড য়্যু মাইণ্ড ইফ আই আস্ক এ পারসোনাল কোয়েশ্চেন ?' জ্যানিসকে গম্ভীর দেখাচ্ছে এখন।

'গো অ্যাহেড'—পিংকি জানতে চাইল।

'ডু য়্যু গো আউট উইথ হিম ? আই মিন, ডু য়্যু লাভ হিম ?'

'আই লাইক হিম এ লট—মে বি ইট'স লাভ। আই হ্যাভ আস্কড্ দ্যাট কোয়েশ্চেন টু মাইসেল্ফ সেভারাল টাইম্স অ্যাণ্ড অ্যাজ ফার অ্যাজ গোইং আউট উইথ হিম ইজ কনসার্নড—নট রিয়েলি। আই ওয়ান্ট টু, বাট ইট'স ডিফিকাল্ট উইথ মাই পেরেন্টস—য়্যু নো দ্যাট।' জ্যানিসকে মনের কথা বলতে পেরে পিংকি খুশি হল।

জ্যানিস চুপ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত। পিংকি বাইরের দিকে তাকাল। জ্যানিস বলল : 'চেক হিম আউট।'

'হোয়াই ডু য়্যু সে দ্যাট ?' পিংকি জানতে চাইল।

'আই গেস ইট'স নান অফ্ মাই বিজনেস বাট... ' জ্যানিস ইতস্তত করছে কথা বলতে।

'হোয়াট ইজ ইট ?' পিংকি অধৈর্য হল : 'টেল মি জ্যানিস।'

'আই হ্যাভ হার্ড সামথিংস অ্যাবাউট হিম'—জ্যানিস সামনের দিকে তাকিয়ে।

পিংকি বিস্মিত হল—'হোয়াট ইজ ইট ?'

'আই রিয়েলি ডোন্ট নো ইফ ইট্স ট্রু, বাট'··অনেক ইতস্তত করে জ্যানিস বলল : 'আই হার্ড দ্যাট হি ইজ ইন্ ড্রাগস !'

'ড্রাগস !' পিংকির গলায় কথাটা যেন আমূল বিঁধে গেল।

খানিকটা কৈফিয়তের সুরে জ্যানিস আবার বলল : 'অ্যাজ আই সেড, আই রিয়েলি ডোন্ট নো ইফ ইটস ট্রু। চেক হিম আউট, উইল য়্যু ? আই মিন, ইটস্ নান অফ মাই বিজনেস—বাট আই ওয়ান্টেড টু টেল য়্যু অ্যাজ এ ফ্রেন্ড। আই ডোন্ট ওয়ান্ট য়্যু টু গেট হার্ট !' প্রচণ্ড জোরে গাড়িটা ব্রেক কষল জ্যানিস। আরেকটু হলেই ট্রাফিকের লাল বাতি পেরিয়ে চলে যেত ও। একটা সিগারেট ধরিযে জ্যানিস আবার বলল : 'য়্যু আর নট ম্যাড অ্যাট মি, আব য়্যু পিংকি ?'

পিংকি নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ না। ওর মুখটা যেন চেপে ধরেছে কেউ। দম বন্ধ হয়ে আসছে। পিংকি জানালাটা খুলে দিল অনেকখানি। শরীরটা কাঁপছে ওর। তোলপাড় হচ্ছে বুকেব মধ্যে। একটা বিরাট কাঁচেব দেযাল যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা মনে। আশা-আকাঙ্ক্ষার নরম জাযগাগুলোতে সেই টুকরোগুলো বিঁধে যাচ্ছে। ঢোঁক গিলল পিংকি। হঠাৎ যেন পৃথিবীর সমস্ত 'ড্রাগস'—সমস্ত বিষ পিংকিব রক্তে মিশিয়ে দিল কেউ। চোখ বুজে পিংকি দেখতে পেল রক্তের রঙ বদলে যাচ্ছে। অসংখ্য রক্তকণা দানা বেঁধে যাচ্ছে ধমনীতে। জোট বাঁধা রক্ত কণিকাব অসংখ্য দল পাথরের নুড়ির মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছে যাচ্ছে মনে। গলিত শবের গা থেকে পচা মাংসের মত স্বপ্ন আর বিশ্বাসগুলো টুপটাপ খুলে খুলে পড়ছে।

'ইয়োর হোম, পিংকি।' জ্যানিসের কথায় চমক ভাঙল পিংকিব। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। পিংকির দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর গালে একটা আলতো করে চুমু খেল জ্যানিস—বলল : 'আই ডিডন্ট মিন টু স্পয়েল ইয়োর ডে, পিংকি ?' গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে পিংকি জ্যানিসের দিকে তাকাল—হাসল একটু—জ্যানিসের খাবাপ লাগছে কেন। কারোই তো কোন দোষ নেই—জ্যানিসের নয়, ওর নয়—হয়ত বা জনেরও নয়। জ্যানিসের হাতটা চেপে ধরল পিংকি : 'থ্যাঙ্ক য়্যু ফর দ্য রাইড—সি য়্যু ইন স্কুল অন্ মান্ডে।' গাড়িটা চলে গেলে বাড়ির দিকে ফিরল পিংকি।

ট্রেন লেট। আসতে আসতে সন্ধ্যে ছ'টা হবে। রত্না বললেন : 'হ্যাঁরে, তোর মুখটা এত কালো লাগছে কেন? হবেই তো। সকাল থেকে শুধু এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস খেয়ে আছিস। একটু কিছু খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। না খেয়ে খেয়ে অসুখ বাঁধাবি এবার।'

পিংকি হাসল। খেয়ে নিলেই সব অসুখ যদি সেরে যেত! মাকে কিছু না বলে নিজের ঘরের দিকে রওনা হল পিংকি। পেছন থেকে রত্না বললেন : 'তোর চিঠি আছে একটা—দেবজ্যেঠু লিখেছে। আমি খুলিনি।'

দেবজ্যেঠু! দৌড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল পিংকি। দেশের এয়াবোগ্রামগুলোতে এমন বিশ্রীভাবে আঠা মাখানো থাকে যে খোলা যায় না। তাড়াহুড়ো করে খুলতে গিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে গেল খানিকটা। অবশ্য, পড়তে কোন অসুবিধা হয না। ওপবে 'প্রিয নেংটি' কথাটা দেখেই হাসি পেল পিংকির। আঠার বছর বয়স হতে চলল—আর কতকাল ওকে 'নেংটি' বলে ডাকবে দেবজ্যেঠু। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেলল পিংকি—

প্রিয় নেংটি,

তোর চিঠি অনেকদিন পেয়েছি। কুঁড়েমি করে দেরী করে ফেললাম। জানি, তুই রাগ করবি না—আর, রাগ করলে তো ভালই। ফণা তোলা নেংটিকে কি রকম দেখায় খুব জানবার ইচ্ছে রইল। তুই লিখেছিস ফোন করে আমায় পাওয়া যায় না। ফোন করিস না আর। ফোনটা ঘটের মতো বসে থাকে। বাজে না। বোবা বোধ হয়।

তুই আরো লিখেছিস যে মাঝে মাঝে তোর খুব বাগ হয়—সব কিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। এখনো পর্যন্ত তুই ঠিক দিকেই যাচ্ছিস। রাগ হওযাটাও ভাল, ভেঙে ফেলার ইচ্ছেটা আরো ভাল। শুধু একটা কান বাকি আছে এখনো। দেখার চোখ তৈরি করতে হবে। কোথায় কখন কীভাবে কোন জিনিসটা ভেঙে ফেলতে হবে বুঝতে পারা চাই। তার বদলে নতুন কি গড়বি সেটাও জানতে হবে আগে থেকে। নাহলে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোর আরো অসহায় লাগবে। রাগ আর ভেঙে ফেলার ইচ্ছেটা আট আনা, দেখার আর বোঝাটা বাকি আট আনা। যেমন ধর, ইংরেজরা যতদিন আমাদের ওপর অত্যাচার করত—ততদিন আমাদের একটা রাগ ছিল, ওদের রাজত্বটা ভেঙে ফেলার ইচ্ছে ছিল। আগুন জ্বলেছিল সারা দেশে। অথচ, স্বাধীনতাটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ওরা যখন দেশ ছেড়ে চলে গেল, সেই স্বাধীনতা কোলে নিয়ে আমরা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে

থেকেছি। স্বাধীনতা নিয়ে কি করব আমরা ভেবে পাইনি। কোনটা ভেঙে কোনটা গড়ব জানি না। এদিকে রাগ আর ইচ্ছেটাও আস্তে আস্তে একদিন মরে গেল। যেগুলো ভাঙা প্রয়োজন ছিল আমাদের অনাদরে অবহেলায় আবার সেগুলো মজবুত হয়ে উঠল। আমি জানি না, আমি তোকে ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা।

সালুয়ার ভাঙা এয়ারপোর্টটা মনে আছে তোর? তার পাশে বিরাট জঙ্গলটা কেটে ফেলেছে। কারখানা হবে শুনছি। এদিকে এখন বেজায় গরম। আঁইঢাঁই করছি আমরা। আমার ওজন এখন কমের দিকে। দুশো দশ পাউণ্ডের কাছাকাছি। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছি প্রায়। রাত্তিরে দুটো রুটি আর ডাল খাই শুধু। রোগা হওয়ার জন্য রোজ সকালে দৌড়তে লিখেছিস আমাকে। কিন্তু, হিজলির রাস্তাটা যদি ভেঙে যায়।

আরো লিখেছিস যে বানান ভুল হয় বলে বাংলায় লিখতে লজ্জা করে তোর। চিঠিতে কিন্তু তোর বানান ভুল হয়েছে মাত্র একটা। তাছাড়া, ভুলে কোন লজ্জা নেই। আমরা সকলেই ভুল করি। প্রলয়-রত্না কেমন আছে? তাদেরকে পরে লিখব। তুই আমার ভালবাসা নিস। রাগ আর ভেঙে ফেলার ইচ্ছেটাকে বাঁচিয়ে রাখিস। ছোবল মারিস না, ফোঁস করতে থাক। কবে বেড়াতে আসবি আবার? আগে থেকে জানাস।—ইতি দেবজ্যেঠু।

দেবজ্যেঠুর সব কথা বোঝেনি পিংকি। পরে আবার পড়বে বলে চিঠিটা জমিয়ে রাখল বাক্সে। মাথাটা বড্ড ধরেছে। ঘরের ভেতরটা বড্ড গরম। দক্ষিণের জানালার কাঁচটা একটু তুলে দিল পিংকি। বাইরে লাইলাক গাছের ডালে রোদ্দুর লেগে আছে এখনো। জামাকাপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল পিংকি। অর্ধেক চাদরে ঢাকা টেডি-বিয়ারটা চুপচাপ সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। ওটাকে আদর করতে করতে জনের কথা এই মুহূর্তে ভুলে গেল পিংকি। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। অবেলায় ঘুমোলে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করবে জেনেও চোখটা বুজে ফেলল ও।

অফিস থেকে বেরোতেই একরাশ গরম হাওয়া আর রোদ্দুর ঝাঁপিয়ে পড়ল টিয়ার গায়ে। বাইরে রোদ্দুরের বহর দেখলে কে বলবে এখন বিকেল ছ'টা। দিনের আলো বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ঘড়ি গরমকালে এক ঘণ্টা আগে আগে চলে। একদিক থেকে অবশ্য মন্দ না—রাত্তির ন'টা পর্যন্ত এখন দিন। সন্ধ্যে বলে কিছু নেই। বিকেলের পরই যেন সোজা রাত্তির। আমেরিকান

সমাজেব সঙ্গে এর একটা অদ্ভুত মিল আছে। এই সমাজে প্রৌঢ়ত্ব নেই। যৌবন থেকে সোজাসুজি বার্ধক্য। হয় তুমি বেঁচে আছ, উপভোগ করতে পারছ—অথবা তুমি বুড়ো, মরে গেছ। টিয়ার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। ও বেঁচে থাকতে বড্ড বেশি ব্যস্ত, তাই উপভোগ করার সময় নেই ওর।

আসলে ছাব্বিশ বছর বয়সে টিয়া নতুন কবে বড হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় অনুপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় অতশত ভেবে দেখার অবকাশ ছিল না। রাগ, অভিমান ও আত্মসম্মানবোধ আর সব কিছুর চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই মুহূর্তে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা না নিয়েই একটা ছোট সুটকেস হাতে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাত বছরের একটা সম্পর্ক সহজেই ছেড়ে চলে আসতে পারল টিয়া। আজ ভেবে দেখলে ভেতরের ফাঁকিটা ও স্পষ্ট দেখতে পায়। ওদের সম্পর্ক কোন মিনিংফুল রিলেশনশিপ নয়—শুধু একটা প্রাত্যহিক অভ্যাস।

বেরিয়ে এসে প্রথম প্রথম অসহায় বোধ করলেও নতুন এই একক জীবন মন্দ লাগছে না ওব। অনিশ্চয়তা ও দায়িত্ববোধ থেকে একটা অস্বস্তি মনের ওপর ছায়া ফেলে আছে সারাক্ষণ। সব সময় এগিয়ে চলতেই হবে, থামতে পারবে না এই দুশ্চিন্তা মাঝে মধ্যে গ্রাস করছে না তা নয়, তবে এই এগিয়ে চলারও একটা নেশা পেয়ে বসেছে ওকে। পুরোনো অভ্যাসগুলো মুছে নতুন সংকল্প জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন। যা ভাবছে পুরোপুরি নিজেব জন্য ভাবছে। প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক কাজের পেছনে আরেকটা মানুষের জন্য কৈফিয়ত তৈরি করতে হচ্ছে না ওকে। তাই, শত কষ্ট হলেও একা একা নতুন করে বড় হতে টিয়ার ভাল লাগছে।

রাস্তা পেরোবার আগেই কাঁধে একটা শক্ত হাত রেখে টিয়াকে থামিয়ে দিল কেউ : 'ডোন্ট কিল ইয়োরসেল্ফ।' সত্যিই আরেকটু হলে গাড়িচাপা পড়ত টিয়া। ট্রাফিক লাইট কখন লাল হয়ে গেছে খেয়াল নেই ওর। তীব্রগতিতে একটা ট্যাক্সি প্রায় টিয়ার গা ঘেঁষে চলে গেল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। বোধহয় শান্ত করার উদ্দেশ্যেই বুকের ওপর একটা হাত রেখে চোখটা বুজে ফেলল টিয়া। কয়েক মুহূর্ত পরে পেছনে ফিরে লোকটার দিকে তাকাল ও। লোক নয়, নেহাতই ছেলে। দীর্ঘকায়, লাল ছোপ ছোপ গায়ের রং, সোনালী লম্বা লম্বা চুল প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে ঠেকেছে। দেখে মনে হয় বয়স এখনো বিশের কোঠাতেই। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল টিয়া : 'থ্যাঙ্ক য়্যু ফব সেভিং মাই লাইফ !' ছেলেটি মুচকি হাসল : 'য়্যু আর ওয়েলকাম !' পাশ থেকে এক মধ্যবয়স্ক লোক ওদেরকে দেখছিলেন এতক্ষণ। ছেলেটির সঙ্গে চোখাচোখি

হওয়াতে বেশ উদ্ধত ভঙ্গীতে বলে উঠলেন : 'দিজ ক্যাব ড্রাইভারস্ আব বাস্টর্ডস। দে আর দি সেম অল ওভার দি ওয়ারলড্।'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল সঙ্গে সঙ্গে : 'আই এগ্রি।'

অন্য ভদ্রলোক খুব বিরক্ত হয়ে বললেন : 'দিস ইজ এ টেরিবল সিটি। য়্যু মেক ওয়ান মিসটেক অ্যাণ্ড দ্যাটস ইট। পিপল ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট আদার পিপলস লাইভ্স্।'

এই সব কথাবার্তায় টিয়া একটু অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। দোষটা তো ওর নিজেরই। ও তো প্রায় না তাকিয়েই রাস্তা হাঁটছিল। খানিকটা অপরাধীর মতই ও ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল : 'ডোন্ট পিক্ অন হিম, প্লিজ ! ফল্ট লাইজ উইথ মি !'

ছেলেটি কথা না বলে একটু মুচকি হাসল—টিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল : 'ইটস টাইম টু ক্রস দি স্ট্রীট।'

ট্রাফিক লাইট সবুজ হয়ে গেছে। টিয়া রাস্তা পাব হল। কথা না বলে ছেলেটি ওর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। ছেলেটি প্রশ্ন কবল : 'আব য়্যু নিউ ইন দিস কান্ট্রি ?'

টিয়া মাথা নাড়ল—'ইট্স বিন সেভেন ইযারস !'

ছেলেটি বলল : 'আই অ্যাম নিউ ইন দিস সিটি। আই অ্যাম ফ্রম ম্যাসাচুসেট। আই ওয়াজ ব্রট আপ ইন দ্য সাবারবস। আর য়্যু পাকিস্তানী অর ইন্ডিয়ান ?'

টিয়া হাসল : 'ইন্ডিয়ান !'

ছেলেটি বলল : 'হোয়াই ডোন্ট য়্যু হ্যাভ দ্যাট রেড লাইন অন ইয়োর হেড ? আই হ্যাভ সিন দ্যাট উইথ কোয়াইট এ ফিউ অফ দেম। হোয়াট ইজ দ্যাট ?'

টিয়া হেসে ফেলল। মাথায় সিঁদুরের কথা জিজ্ঞেস করছে ছেলেটা। টিয়া বলল : 'দ্যাট্স দি সিমবল অফ ম্যারেজ।'

ছেলেটি অবাক হল : 'হোয়াই রেড ?'

টিয়া নিজেও জানে না—কিছু না ভেবেই বলল : 'ইট'স এ রেড সিগন্যাল। মেন, বি ওয়্যার, ইট্স রেড, ডোন্ট ক্রস দি স্ট্রীট।

দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। ছেলেটি গম্ভীবভাবে বলল : 'ডাজ দ্যাট মিন, য়্যু আর গ্রীণ, আই ক্যান ক্রস দি স্ট্রীট ?'

আচমকা এই কথায় টিয়া একটু থতমত খেয়ে গেল। কানের দুপাশ গরম হয়ে উঠল। মুখের দিকে তাকিয়ে কোন উত্তর দিতে পারল না ও। জিভটা

জড়িয়ে গেল সঙ্কোচে। টিয়ার এই সঙ্কোচ খুব সম্ভবত ছেলেটির দৃষ্টি এড়ায়নি। টিয়ার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে ছেলেটি বলল : 'আই ওয়াজ ওনলি কিডিং। ডিড আই এমব্যারাস য়্যু ?' ছেলেটির ওপব রাগ করা যায় না। ওর কথাবার্তায়, আচরণে একটা অদ্ভুত সবলতা আছে। এর আগেও অনেক আমেরিকান ছেলেকে দেখেছে টিয়া। আমেরিকান ছেলেদেব মধ্যে একটা অকারণ ঔদ্ধত্য প্রথমে নজরে পড়ে। ওদের মানসিক গঠনটাও একটু স্থূল বলে মনে হয় টিয়ার। ওর অফিসের ছেলেগুলোকে দেখে অন্তত ওব তাই মনে হয়। ওদের ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ পায় পৃথিবীতে মাত্র তিনটে জিনিস আছে। হট্ ডগ, গাড়ি আর মেয়েছেলে। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে বোঝা যায় এই তিনটে হল পেট, টাকা আর তলপেট। পেটের খোলটা এদেব অসম্ভব বড়—কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের দোকানে ঢুকলে বোঝা যায়। দুটো চিকেনের টুকরো খেতে টিয়া যেখানে হাঁপিয়ে পড়ে—একটি আমেবিকান যুবক অনায়াসে ছ'সাত টুকরো চিকেন আধ সের কোকাকোলা সহযোগে অনায়াসে উদরে চালান কবে। মেয়েছেলে দেখলেই এদের নালঝোল গড়ায়। এদের হাবভাব দেখলে মনে হবে যে.পৃথিবীর সমস্ত মেয়ে যেন এদের প্রেমে পডতে বাধ্য। অবশ্য, মেয়েগুলোও অল্পবেশি বেসরম। এখানকার মেয়েদের অবস্থা ভাবতীয় মেয়েদের থেকেও অনেক বেশি সঙ্গীন। আসলে ভারতীয় মেয়েরা খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ঘর বাঁধতে গেলে প্রেমে পড়ার প্রয়োজন নেই। পড়াশুনো কর, গান শেখ, মুখে সরটর মাখ—বয়স হলে বাবা-মা দায়িত্ব নিয়ে আপনিই বিয়ে দিয়ে দেবে। বিয়ে ঠিক হল না ভুল হল সে সব পরের ব্যাপাব। আর, তাছাড়া ভুল হলেই বা কি। একটু মানিয়ে টানিয়ে নিলেই হল। সিকিউরিটির কোন অভাব নেই। বাবা-মার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বরের নিরাপদ আশ্রয়। আমেরিকান মেয়েদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। ছোটবেলা থেকেই এদের অ্যাক্সেপ্টবল করে তোলার চেষ্টা করে বাবা-মা। মেয়ের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করা হয়। দশ এগার বছর বয়সের একটা মেয়ের একটা স্টেডি বয়-ফ্রেন্ড না হলে বাবা-মা রীতিমত অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। আর, বয়ফ্রেন্ড হয়ে গেলে ব্যস, নিশ্চিন্ত। অর্থাৎ, শি ইজ ইন দি রাইট্ ট্র্যাক। এখানকার মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ইনসিকিওরড্। পুরুষ দেখলেই ন্যাকামি করাটা তাই বোধহয় এখানকার মেয়েদের স্বাভাবিক রীতি। এখন টিয়া বুঝতে পারে কেন কেলি নিক্‌লস বলেছিল : 'মাই হাসব্যান্ড ওয়াজ সারপ্রাইজড্ দ্যাট আই ওযাজ এ ভার্জিন। হি ডিড্‌ন্ট লাইক ইট্।' তখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল

টিয়ার। এখন কেলির কথাগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে পারে। পঁচিশ বছরের মেয়ে ভার্জিন মানে তার নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল আছে। না হলে অন্য কোন ছেলে তার সঙ্গে শোয়নি কেন? কেলি মারফিকে টিয়া ভুলতে পারেনি। অনুপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেলির অ্যাপার্টমেন্টেই এসে উঠেছিল ও। কেলি একই অফিসে কাজ করত তখন। ছেড়ে দিয়েছে দু'মাস আগে। মানসিক অসুস্থতার জন্য।

'হোয়াই ডোন্ট য়্যু টক?' ছেলেটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

টিয়া এবার লজ্জায় পড়ল। কেলির কথা ভাবতে ভাবতে ছেলেটির অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গিয়েছিল ও। তাড়াতাড়ি বলে উঠল: 'আই অ্যাম সরি। আই...' কি বলবে খুঁজে না পেয়ে টিয়া মাঝপথে থেমে গেল।

ছেলেটি বলল: 'আই নো হোয়াট...'

টিয়া অবাক হল: 'হোয়াট?'

ছেলেটি মুচকি হাসল: 'য়্যু মাস্ট বি অ্যাংগ্রী।'

টিয়া হেসে ফেলল এবার: 'নট অ্যাট অল।' খানিকটা প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই বলল: 'হাউ ডু য়্যু লাইক দি বিগ অ্যাপল?'

বিগ্ অ্যাপল অর্থাৎ ম্যানহাটানের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বলল: 'আই ডোন্ট নো। দেয়ার ইজ এ বিগ লাইন।'

টিয়া কথাটা বুঝতে পারেনি—কিসের লাইন। অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল: 'হোয়াট ডু য়্যু মিন?'

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল ছেলেটি। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল: 'আই অ্যাম অ্যাকটিং ইন এ প্লে রাইট নাও। ইট'স কলড, 'দি লাইন' ইট্ টেল্স সো মাচ অ্যাবাউট দিস সিটি।'

টিয়ার উৎসাহ বাড়ল। ছেলেটি অভিনেতা। টিয়া প্রশ্ন করল: 'য়্যু আর অ্যান অ্যাক্টর?'

ছেলেটি হাসল: 'ইয়েস! ট্রাইং টু মেক ইট ইন দি বিগ সিটি!'

টিয়া আবার কথার জের টানল: 'হোয়াট ইজ দি প্লে অ্যাবাউট?'

টিয়ার পাশাপাশি ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটা গল্প শুরু করল। একটা বড় শহরের বাস স্টপে বিরাট লাইন। লোকের পেছনে লোক, অনেক বয়সের, অনেক মনের। যে আন্দাজে লোকের ভীড়, কানাঘুষায় শোনা গেল অত লোক বাসে ধরবে না কিছুতেই। লাইন চঞ্চল হল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বাড়তে লাগল। প্রত্যেকেই মনে মনে ফন্দী আঁটতে শুরু করল—কি করে

লাইনের নিরাপদ সীমায় পৌঁছনো যায়, যেখান থেকে বাসে ওঠার একটা নিশ্চিন্তি থাকবে। এই নিশ্চিন্তির আশায় মজার মজার ঘটনা ঘটতে লাগল লাইনে। যে মানুষগুলো সুস্থ মানসিকতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল লাইনে, অনিশ্চয়তার ভয় তাদেরকে অসুস্থ করে তুলল। প্রত্যেকের মনের মধ্যেই এখন একই প্রশ্ন—কি করে আগের লোকটাকে পেছনে ফেলে আগে এগিয়ে যাওয়া যায়। মনুষ্যত্ব হারিয়ে তখন শুরু হল মজার খেলা। কেউ টাকার লোভ দেখিয়ে লাইনে জায়গা কিনল—কেউ দেহ বিক্রী করল—একজন অন্যজনকে ঠকাল, চুরি করল, কেউবা গায়ের জোরে জায়গা ছিনিয়ে নিল। একটা সুস্থ লাইন. হিংস্র সাপের মতো হয়ে উঠল।

এতখানি বলে ছেলেটা চুপ করল। খুব জোবে সিগারেটে টান দিল একটা। টিয়ার খুব ভাল লেগেছে গল্পটা। ও প্রশ্ন কবল · 'হোয়াট অ্যাবাউট দি বাস ?'

ছেলেটি হাসল : 'দি বাস নেভার কেম !'

টিয়া চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। ছেলেটি বলল · 'হোয়াই ডোন্ট য়্যু কাম অ্যান্ড সি দি প্লে ওয়ান ডে ?'

কোথায় জানতে চাইল টিযা। কাঁধের থেকে সবুজ ব্যাগটা মাটিতে নামাল ছেলেটা। সবুজ ব্যাগটা অনেকটা ঠাকুমাব ঝুলিব মতো। কি আছে আর কি নেই ! কাগজ খুঁজতে খুঁজতে ছেলেটা কৈফিযতের সুরে বলল 'বেয়ার উইথ মি। আই শুড হ্যাভ সাম পেপার।'

টিয়া একটু হাসল। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা চিঠি ছিঁড়ে কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল ছেলেটার হাতে। ছেলেটা ব্যাগটা বন্ধ করে কাগজটা নিল। ঠিকানাটা লিখতে লিখতে বলল : 'দিস ব্যাগ ইজ এ মেস। ইন ফ্যাক্ট, দিস ইজ অল আই হ্যাভ। আই ক্যারি এভরিথিং উইথ মি অল দি টাইম।'

টিয়া অবাক হল। কথায় কথায় জানা গেল ম্যানহাটানের একটা সস্তা হোটেলে আর একটা লোকের সঙ্গে একটা ঘবে থাকে। বাবা ব্যবসায়ী। মোটামুটি পয়সাওয়ালা লোক। পেনসিলভেনিযাতে বাড়ি। নাটকের নেশা। কলেজে চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে নিউইয়র্কে চলে এসেছে ভাগ্যের খোঁজে। একটা ড্রামা স্কুলে ভর্তি হয়েছে এখানে—আর অফ্ অফ্ ব্রডওয়ের একটা ছোট থিয়েটাবে পার্ট পেয়েছে। সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার মাইনে। জমানো টাকায় স্কুলের খরচ চলে। মাইনের টাকায় হোটেল খরচ আর খাওয়াদাওয়া কোনরকমে চলে যায়। রুমমেট লোকটা সুবিধের নয়। হোটেলটাও বাজে। সন্ধ্যে হলেই নীচের রাস্তায বেশ্যা আর দালালের ভীড। নিউইয়র্কের সস্তাব

হোটলেগুলো প্রায় সবগুলোই একরকম। মালিকের সঙ্গে মেয়েছেলেগুলোর সর আছে। খরিদ্দার ধরে নিয়ে আসার দায়িত্ব এদের। ঘর ভাড়া ছাড়াও মেয়েগুলো বোধহয় কিছু কমিশনও দেয় মালিকদের। সব মিলিয়ে বেশ একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। ছেলেটি কিন্তু এর ভেতরেই দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে। ওর বক্তব্য হল : 'আই ক্যান্ট গেট এ প্যালেস ফর টোয়েন্টি ডলারস এ উইক। আই গট টু ফিনিশ মাই স্কুল।'

ছেলেটির নাম রবার্ট শো। টিয়া কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখে ব্যাগে পুরল।

ছেলেটি বলল : 'মে আই নো ইয়োর নেম?' টিয়া ভাবল দু' এক মুহূর্ত। একটু অস্বস্তিবোধ করছিল হয়ত। ছেলেটি বুঝতে পেরে বলল : 'য়্যু ডোন্ট হ্যাভ টু টেলমি!'

টিয়া লজ্জা পেল আবার। তাড়াতাড়ি বলল : 'টিয়া।'

ছেলেটি দু' একবার নিজের মনে 'টিয়া' 'টিয়া' বলে ডাকল। তারপর বলল : 'ডাজ ইট মিন এনিথিং?'

টিয়া ঘাড় নাড়ল : 'প্যারট।'

রবার্ট টিয়ার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর, খুব আস্তে করে বলল : 'য়্যু আর ভেরি প্রেটি, য়্যু নো দ্যাট।'

টিয়া হাসল : 'থ্যাঙ্ক য়্যু ফর দি কম্‌প্লিমেন্ট।' একটু উসখুশ করে টিয়া বলল : 'আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল!'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টিয়া শুনতে পেল রবার্ট বলছে : 'সি য়্যু ইন দি থিয়েটার।'

পেছন ফিরে তাকিয়ে টিয়া রবার্টকে দেখতে পেল না। সামনে পেছনে এখন গিজ গিজ করছে ভীড়। ঠেলা খেতে খেতে টিয়া এগিয়ে গেল ট্রেনের দিকে। দু' এক মিনিটের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল প্ল্যাটফর্মে। পেছনের মানুষগুলোর ধাক্কায় টিয়া ঢুকে পড়ল ট্রেনের কামরায়। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাঁচের দরজায় কিল-চড় পড়ল কয়েকটা। যারা উঠতে পারল না, তারা রেগে গেছে। একটু আগেই রবার্টের বলা লাইনের গল্পটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই গল্পের সঙ্গে টিয়ার জীবনের অবশ্য খুব একটা সম্পর্ক নেই। ও এখনো লাইনের পেছনেই দাঁড়িয়ে। কে সামনে ঢুকে পড়ল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ওর। শুধু নিজের পায়ে একা একা দাঁড়াতেই ও এত ব্যস্ত যে এগোবার কথা মোটেও ভাবেনি। অবশ্য, ভাবেনি বলা ভুল। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কলেজ শুরু। পি-এইচ· ডি· তে অ্যাডমিশন নিয়েছে টিয়া। টাকা-পয়সা কিছু জমেছে। মানসিক

ভাবসাম্য ফিরে পাচ্ছে আস্তে আস্তে।

বাবা-মা অবশ্য বারবার দেশে ফিরে আসতে বলছেন। বাবা-মার পক্ষে অবশ্য এ চিন্তাটা খুবই স্বাভাবিক। মেয়ে একা একা বিদেশে থাকবে এ ব্যাপারটা মেনে নিতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। ওদের বিয়ে ভাঙার গল্পটাও আগুনের মতো ছড়িয়েছে কলকাতার আত্মীয়স্বজন মহলে। একা একা এদের মোকাবিলা করতে বাবা-মা মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছেন এটাও টিয়া আঁচ করতে পারে। টিয়া অবশ্য যুক্তি তর্কের কোন অবকাশ রাখেনি। বাবা-মাকে ও স্পষ্টই লিখেছে—'দোষ কার এ নিয়ে এখন আর তর্ক করার কোন মানে হয় না। কেউ যদি প্রশ্ন করে বলো আমি অনুপের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছি। সেই অর্থে দোষ বা গুণ সব কিছুই আমার। জানি তোমরা কষ্ট পাবে, আমিও পেয়েছি। বিশ্বাস রাখি নিজের পায়ে দাঁড়াব একদিন। দেবী হোক। এখনও অনেক সময় আমার হাতে।'

আর সেই সময়কে মূলধন করেই টিয়া নিজের মুখোমুখি হয়েছে এখন। বেড়ার ওপারে যে সবুজ ঘাস, যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল একদিন, আজ সেই সবুজ ঘাসের দাম কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিযে দিতে হচ্ছে ওকে। এতটা বয়স পর্যন্ত কারো না কারো ওপব নির্ভর করে এসেছে। প্রথম বয়সে বাবা-মা—তারপর অনুপ। অবশ্য অনুপের ক্ষেত্রে কে কার ওপর বেশি নির্ভর করেছে বলা শক্ত। তা সত্ত্বেও একটা মানসিক আশ্রয় তো বটেই। আর আজ, টিয়া আর তার নিজের জীবন। আর, যে সময়টাকে মূলধন করে রাস্তায এসে দাঁড়িয়েছিল টিয়া, মাঝে মাঝে সেই সময়ের দ্বীপে টিয়া খুব অসহায় বোধ করে। কাউকে প্রশ্ন করে লাভ নেই, কারও কাছে কিছু জানতে চাওয়া বৃথা। কেউ কোন উত্তর দেবে না। সব উত্তর নিজেকেই খুঁজতে হয়। শৈবাল অবশ্য আসে। পাশে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কারো ওপর নির্ভর করতে ইচ্ছে করে না ওর। নির্ভরতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের ভার সব সম্পর্ক সইতে পারে না। একদিক থেকে শৈবাল ওর অনেক কাছের মানুষ। তাই বলে নিজের সমস্যাগুলো জোর করে ওর ওপর চাপিয়ে দিতে টিয়া নারাজ।

কেলি নিকলস-এর কথাটা মাথায় ঘুরছে সেই থেকে। বাড়ি যাবার পথে কেলির সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হয়। টিয়া মনে মনে ভাবল কলেজ থেকে কেলিকে ফোন করবে একবার। যদি বাড়িতে থাকে তবে মিনিট দশ পনেরোর জন্য হলেও একবার ওর বাডিতে যাবে। এমনিতেই বাড়ি ফেরার কোন তাড়া নেই ওর। আজ শুক্রবার। কাল পরশু ছুটি। তাছাড়া, বাড়িতে কেউ অপেক্ষা করে নেই ওর জন্য। টিয়াও কারও জন্য অপেক্ষা করে না

আজকাল।

ম্যানহাটান পেরিয়ে কুইন্‌সের প্রথম স্টপেজে বেশ কিছু লোক নেমে গেল। একেবারে ফাঁকা না হলেও গাদাগাদি ভাবটা এখন অনেক কম। এই সাবওয়ে কারগুলোর মধ্যে টিয়ার নিঃশ্বাস আটকে আসে। একে তো এয়ার কণ্ডিশনারের ছুতোয় জানালাগুলো সব বন্ধ। ভেতরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব অবশ্য একটা আছে। কিন্তু এতোগুলো মানুষের নিঃশ্বাসে বাতাস ভারী হযে গেছে। শুধু স্টপেজগুলোতে দরজা খুললে একঝলক তাজা বাতাস ঢুকে পড়ছে গাড়ির মধ্যে। তাই, কষ্ট হলেও টিয়া দরজার কাছ ছেড়ে নড়েনি। বসেও কোন শান্তি নেই। যে কোন লোক পা মাড়িয়ে দিতে পারে অথবা কোন সহযাত্রীর ভারী ব্রিফকেস নাকের সামনে ঝুলতে থাকবে ক্রমাগত। গাড়ির ভেতরে লোকগুলোকে দেখে টিয়া নিজের মুখের ভাবটা অনুমান করতে পারে। কিছু না বললেও সকলের মুখে চোখে একই ভাষা—আরেকটা দিন শেষ হল। অবশ্য. অন্যান্য দিনের তুলনায় এই ক্লান্তিটা আজ অন্তত একটু কম হওয়া উচিত ছিল। কেননা কাল পরশু ছুটি। উত্তরোত্তর মানুষের মুখচোখের চেহারায় একটা নির্লিপ্ত ভাব লক্ষ্য করে টিয়া। মনে হয় কাউকে প্রশ্ন করলেই সে বোধহয় ঝাঁপিয়ে উঠবে—সোম থেকে শুক্র অফিসের কাজ। শনি রবি বাড়ির কাজ। ছুটি তো আমাদের কি? কথাটা অনেকাংশে সত্যি। টিয়া তো একা মানুষ অথচ দুটো ছুটির দিনে ওর অজস্র কাজ। জামা-কাপড় কাচা, বাজার করা, বাড়ি ঘর-দোর গোছানো। আগামী সপ্তাহের জন্য রান্না করা তো আছেই। অফিস থেকে ফিরে নিজের জন্য রান্না করতে ওর একটুও ইচ্ছে করে না। আর, মাসখানেক পরেই তো ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। কাজেই বাড়ি ফিরতে ফিরতে এখন প্রায় রাত দশটা হবে সপ্তাহে তিনদিন। তখন তো রান্নাবান্নার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। আরাম পৃথিবীর কোথাও নেই। বিশেষ করে পৃথিবীর উন্নততম দেশে তো নয়ই। শুধু কাজ করার উন্নত যন্ত্রপাতি কিছু বেশি। টিয়া দেখেছে এতে কাজ আরো বাড়ে—কমে না। ঝি চাকর রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এরাও প্রায় টিয়ার সমানই মাইনে পায়।

ডনদিকে তাকাতেই অবনীশ মুখার্জির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। অবনীশ ও সুলেখা পাশাপাশি বসে আছেন। টিয়াকে দেখতে পেয়েই অবনীশ বলে উঠলেন: 'আরে, টিয়া যে!'

টিয়া অল্প হাসল। কিছু উত্তর দেবার আগেই সুলেখা চিন্তিত স্বরে বললেন: তোমার খবর কি? কোথায় আছ? এত রোগা হয়ে গেলে কেন? শরীর

খারাপ ?'

পর পর এতগুলো প্রশ্নে টিয়া একটু হকচকিয়েগেল। কিছু উত্তর না দিলেও খারাপ দেখায়। তাই, আস্তে করে বলল : 'শরীর খারাপ কিছু নয়। চুলটা বড্ড ছোট করে কেটে ফেলেছি তাই বোধহয় রোগা দেখাচ্ছে।'

অবনীশ হাসলেন : 'হ্যাঁ, তাই হবে। অন্যরকম দেখাচ্ছে তোমাকে। কোথায় আছ এখন ?'

টিয়ার উত্তর দিতে ভাল লাগে না এইসব কথায়। তবুও, অভদ্রতা হয়ে যাবে এই ভয়ে বলল : 'কুইন্‌সেই অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি।'

সুলেখা একটু হাসলেন—'সেই আমেরিকান মেয়েটার সঙ্গেই আছো এখনো ?'

টিয়া সত্যি সত্যি অবাক। দেখা না হলেও ওর নাড়ী-নক্ষত্র বোধহয় সকলেরই জানা। প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য টিয়া বলল : 'বড্ড গরম পড়েছে না আজ ?'

অবনীশ উঠে দাঁড়িয়ে টিয়াকে বসতে অনুরোধ করলেন সীটে। টিয়া বসতে চাইল না—বলল : 'সারাদিন তো বসে বসেই আছি—দাঁড়িয়ে ভাল লাগছে। আপনি বসুন।'

সুলেখাকে আবার চিন্তিত মনে হল : 'তুমি তাহলে এখানেই থেকে গেলে ?'

সুলেখার কথা শুনলে টিয়ার গা জ্বালা করে। ডাক্তারের ছুরির মতো কেটে কেটে ভেতরে ঢুকতে চায়। প্রশ্নেব ধরন-ধারণগুলো কিরকম অদ্ভুত। দেখতেই পাচ্ছে এখানে অথচ প্রশ্ন হল এখানেই থেকে গেলে। অর্থাৎ, হাঁড়ির খবর যদি কিছু পাওয়া যায় ! মনে মনে চটে গেলেও—টিয়া মুখে কিছু বলল না—চুপ করে রইল। সব দিক থেকেই অন্ধকার টানেলের মধ্যে ট্রেনটা থেমে গেল হঠাৎ। ট্র্যাকে অন্য কোন ট্রেন আটকে আছে বোধহয়।

অবনীশ টিয়াকে বললেন : 'আমাদের বাড়িতে এসো না একদিন ? একা একাই তো আছ।'

টিয়া বলল : 'যাবো।' তারপর, একটু ইতস্তত কবে বলল : 'আসলে, এত কাজ থাকে।' কাজ থাকে একথা সত্যি। তবে এত কিছু কাজ নেই যে ও যেতে পারে না। সকলের বাড়িতে যেতে ভাল লাগে না। অনুপের সঙ্গে এদের বাড়িতে অনেকবার গেছে ও। কিন্তু এখন কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। একমাত্র নীলাদ্রিদার বাড়িতে ও মাঝে মাঝে যায়। বনানীদির কোথাও একটা প্রাণের টান আছে নিশ্চয়ই। প্রায়ই ফোন করেন। মাঝে মধ্যে এসে জোর করে টিয়াকে তুলে নিয়ে

যান গাড়ি করে। আবার নামিয়েও দিয়ে যান। আর, অবনীশদা ? বছর খানেক পর এই প্রথম দেখা। কোনওদিন ভুলে ফোনও করেননি। আজ হঠাৎ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কত আপনার ! তাদের এই মেকি ভদ্রতাগুলো সহ্য হয় না কিছুতেই।

টিয়ার ভাবনায় ছেদ পড়ল। সুলেখা বললেন : 'জানো তো, গত সপ্তাহে অনুপ এসেছিল।'

পাছে অনুপের প্রসঙ্গ উঠে পড়ে সেই ভয়ে টিয়া প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল। অস্ফুট স্বরে বলল : 'ও'। এমন ভাব দেখাল যাতে মনে হতে পারে অনুপ এল কি এল না তাতে টিয়ার কিছু যায় আসে না। একটা কৌতূহল অবশ্য মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকল। কিন্তু নিজে থেকে টিয়া কোন প্রশ্ন করতে চায় না। তাছাড়া, সত্যিই তো অনুপের জীবন সম্পর্কে টিয়ার এমনিতে কোন উৎসাহ নেই।

অবনীশ কিন্তু প্রসঙ্গটা ছাড়লেন না। টিয়াকে বললেন : 'জানো তো, তোমার জন্য খুব কষ্ট পায় অনুপ।'

টিয়া হাসল : 'কষ্ট পায় কেন ? আমি তো ভালই আছি।' ভাল আছি—কথাটার ওপর অহেতুক জোর দিল টিয়া। ওর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় সুলেখা বোধহয় একটু অবাক হলেন। হয়ত, কথাটা বিশ্বাস করেননি সুলেখা। তাই পুরোনো কথার জের টেনে বললেন : 'তোমার ফোন নাম্বার চাইছিল।' অনুপ ফোন নাম্বার চাইছিল। আবার কোন নতুন মতলব আছে নাকি মাথায় ! টিয়া একটু অবাক হল। বিস্ময়টা এঁদের সামনে প্রকাশ না করে বলল : 'আমি অ্যাপার্টমেন্ট পাল্টাব শীগগিরি। নতুন বাড়িতে গিয়ে ফোন করব।'

মিথ্যে কথা বলাটা ইদানীংকালে অভ্যেস করে ফেলেছে টিয়া। অ্যাপার্টমেন্ট পাল্টানোর কথাটা হঠাৎ মাথায় এলো কেন জানে না। মোদ্দা কথা, সবাইকে ফোন নাম্বার দিতে চায় না ও। আগে এসব ভনিতার প্রয়োজন ছিল না। এখন টিয়া সব কিছু মেপেজুকে করে। ওর পছন্দমত কয়েকজন ছাড়া টিয়া আর বেশি কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। সামাজিকতা একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। আগে টিয়া দেখেছে এই মেলামেশা আর নেমন্তন্ন আর পার্ক একবার পেয়ে বসলে আর সব কিছু লাটে উঠতে বাধ্য। ওর এখন অনেক কাজ সামনে। নতুন করে কেরিয়ার তৈরি করতে হবে ওকে। শুরু করেছে একেবারে নীচের ধাপে। যে আত্মবিশ্বাসে ভর করে এই জীবনটাকে বেছে নিয়েছে টিয়া—যেমন করেই হোক সেটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। মনে মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

একটা পরিকল্পনা জন্ম নিচ্ছে—এই সময়টায় মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। একটা একলা মেয়ে—আমেরিকায় মাইনরিটিদের মধ্যেও মাইনরিটি। কাজেই, এ সময় নিজেকে সামাজিকতার ডামাডোলে হারিয়ে ফেলতে চায় না টিয়া।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। সুলেখাদি কিছু মনে করলেন কিনা কে জানে। একটু হাল্কা করার জন্য টিয়া বলল : 'আপনারা দেশে যাচ্ছেন কবে, অবনীশদা ?'

'দেশ তো ক্রমশ মরীচিকা হয়ে উঠছে ভাই !'

'কেন ?' টিয়া অবাক হল।

'এদেশ-ওদেশ দুটো আলদা চরকি। যখন দেশের চরকিতে ঘুরতাম—তখন আমেরিকা বলতেই লাল-নীল নানা রঙের ফুল মনে আসত। ভাবতাম দেশে যা যা করতে পারিনি—এদেশে এলে সেগুলো কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেব। তারপর, এদেশে এসে এখানকার চরকিতে ঘুরতে লেগেছি। দেশে যা যা করতে পারিনি সেগুলো করা হল। করার নেশাটা কিন্তু গেল না। আরো বেশি নেশা পেয়ে বসল। প্রথম প্রথম ডজ গাড়িতেই কি আরাম লাগতো। ছোট অ্যাপার্টমেন্টটাকেই মনে হতো স্বর্গ। তারপর, আরেকটু চাইলাম। ভাবলাম একটা বাড়ি কিনলে কেমন হয় ? সুলেখাও চাকরিতে ঢুকে গেল সেই কারণে। তারপর মনে হল—আরেকটু বড় গাড়ি। বড় গাড়ি এল। আসলে এদেশের চরকিতে এমন ঘুরতে লেগেছি—দেশে যাবার পয়সা নেই। স্থাবর-অস্থাবর বাঁধা পড়ে আছি। দেশে থাকতে আমেরিকায় আসার পয়সা ছিল না। এখন আমেরিকায় বসে দেশে যাবার কথা ভাবলে ভয় লাগে। না গিয়ে গিয়ে দেশের ওপর টানটাও কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। শুধু গল্প শুনতে ভাল লাগে।'

সুলেখা বললেন : 'ছেলেমেয়েরা যত বড় হচ্ছে—ওদের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। স্কুলে আমেরিকান বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় সবসময়।'

'কিরকম ?' ছেলেমেয়ের ব্যাপারটা টিয়ার ঠিক জানা নেই।

'এই তো দেখ না, বড় ছেলে দীপঙ্কর এখন ষোলোয় পড়ল। প্রথমত ও ইতিমধ্যেই পাকাপোক্তভাবে নিজের নাম পাল্টে দীপ্ করে নিয়েছে। তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে লাঠালাঠি। বন্ধুরা নাকি খেপায় ! নিজের আলাদা গাড়ি চাই ! তাছাড়া, নিত্যি নতুন বায়না লেগেই আছে। আজ সামার ক্যাম্প—কাল বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া—পরশু আরেকটা কিছু। না বললেই মুখ ভার। বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা না দিতে পারলেই তারা নাকি বলে—চীপ ! দেশে তো যেতেই চায় না।'

টিয়া হাসল : 'দেশ তো ওর একটাই সুলেখাদি। আমরা জোর করে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেশ বললে ওরা মানবে কেন ?'

সুলেখা কিন্তু বেশ গম্ভীর হয়েই আছেন। অবনীশ গজ গজ করে উঠলেন . 'তাই বলে বাপ-ঠাকুর্দার দেশে যাবে না ? বাংলা বলা তো ছেড়েই দিয়েছে। যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে আমেরিকান হতে এদের আর বেশি দেরি নেই। আমবা তবু কোনমতে বাঙালীয়ানার ধ্বজা বজায় রেখে যাচ্ছি—আমাদের পরের জেনারেশন বাংলা ভাষাটাকে তুলে দিয়ে ছাড়বে।' অবনীশের শেষের দিকের কথাগুলো রীতিমত উত্তেজিত।

টিয়া কিন্তু দীপঙ্করের দোষটা বুঝতে পারছিল না কিছুতেই—তাই ও আবার বলল : 'কিন্তু, অবনীশদা, আপনি যদি আপনার ছেলেকে বাঙালী করে রাখেন—সে তো এই সমাজে বেমানান হয়ে যাবে। ষোলো বছরের একটা ছেলের পক্ষে একই সঙ্গে বাঙালী ও আমেরিকান হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা যখন এদেশে স্থায়ীভাবে থাকব ঠিক করেছি তখন আগামী জেনারেশনের এই পরিবর্তনটুকু আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। দু নৌকোয় পা দিয়ে আমরা যে দ্বন্দ্বে ভুগছি ওদের মাথাতেও সেই দ্বন্দ্ব চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ওরা আগে আমেরিকান, পরে বাঙালী। আমরা কিরকম ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছি—না এদিক, না ওদিক। সেদিক থেকে ওদের কোন দ্বিধা নেই। ওরা পুরোপুরি নতুন দেশের মানুষ।'

সুলেখা মাথা নাড়লেন—হয়ত টিয়ার কথাটা বিশ্বাস করলেন খানিকটা। মুখটা গোমড়া করে বললেন : 'আমাদের যে কত ঝামেলা। দেশে তো ছেলেমেয়ের জন্য মুখ দেখানো দায়। লোকে তো টিপ্পনি কাটতে ছাড়ে না। কথা উঠলেই বলে ছেলেমেয়ে যে পুরো ট্যাঁশ হয়ে গেল। খুব কষ্ট হত প্রথম প্রথম। চেপেচুপে ধরে বাংলা হাতের লেখা শেখাতাম, অক্ষর চেনাতাম, বাংলা বই পড়ানোর চেষ্টা করতাম।'

টিয়া বাধা দিয়ে বলল : 'আপনার দুঃখের কোন কারণ নেই। কলকাতার অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের কনভেন্টে পড়া ছেলেমেয়েরা আজকাল বাংলা লিখতে বা পড়তে পারে না। আজকাল ওটাই তো কোয়ালিফিকেশন। এ নিয়ে মন খারাপ করার কোন মানে হয় না। ওরা বড় হোক। আমরা ওদের চোখ দিয়ে নতুন দেশটাকে দেখতে পারি। এটাও আমাদের নতুন শেখা হবে। ওরা বড় হলে ওদের হয়ত ইচ্ছে হবে আমাদের চোখ দিয়ে আমাদের দেশটাকে দেখতে। বড় হলে দেখবেন এ ইচ্ছেটা ওদের ঠিক আসবে। তামাটে চামড়া আর সাদা

চামড়ার বিরোধটা থাকবেই। আর, সেই বিরোধ থেকেই নিজের শিকড়টা খুঁজে পেতে চাইবে সবাই। একদিন সেটাই হবে ওদের অহংকারের জায়গা! আমার শুধু ভয় হয়, ওরা যখন জানতে চাইবে, তখন আমরা ঠিক ঠিক শেখাতে পারব তো?'

সুলেখা বললেন: 'কেন, পারব না কেন?'

টিয়ার মুখে চোখে চিন্তার ছাপ পড়ল: 'ওরা তখন কিন্তু বাংলা অক্ষর, ভাষা, ঠাকুমার ঝুলি এর থেকে অনেক বেশি কিছু জানতে চাইবে। সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। আমাদের যোগ্যতা যাচাই হবে তখন। আমাদের সত্যিকারের কিছু শেখাবার আছে কিনা।'

অবনীশ প্রতিবাদ করলেন—'আমাদের জেনারেশনে আমরা তো সংস্কৃতি বজায় রাখার চেষ্টা করছি, ওরা যদি না টেনে নিয়ে যায় সেটা ওদের দোষ।'

টিয়া বিশ্বাস করল না কথাটা: 'অবনীশদা, আপনি আমার থেকে অনেক বেশি দেখেছেন। কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি ভারতীয় সংস্কৃতি মানে পচা হিন্দী ছবি আর বাঙালী সংস্কৃতি মানে দুর্গাপুজো, রবীন্দ্রনাথের পুজো, আর এলোমেলো কিছু নাচ, গান, থিয়েটার। এই সংস্কৃতির উদাহরণ কি ওদের কাছে যথেষ্ট?'

সুলেখা আপত্তি করলেন টিয়ার কথায়: 'যেটুকু পারি, আমরা বজায় রাখছি। এর চেয়ে বেশি আমাদের সময় কোথায়? সুযোগই বা কই?'

টিয়া সুলেখার হাতে আলতো করে টোকা দিয়ে বলল: 'আমিও সেই কথাই বলতে চাইছি সুলেখাদি। সময়, সুযোগ এবং খানিকটা অনিচ্ছায়। যে সংস্কৃতির নমুনা আমরা এখানে রাখছি সেটা নেহাতই সামান্য। আসলে এটা আমাদের সময় কাটানোর হাতিয়ার। সমাজে আমরা স্ট্রেঞ্জার! তাই, অবসর সময়ে আমরা 'দেশ' 'দেশ' খেলি। আর, সেই খেলাতে নতুন জেনারেশনের আপত্তি বলে আমাদের এত ভাবনা। সত্যি করে ভেবে দেখুন তো সুলেখাদি তাই কিনা?'

সুলেখা হাল ছেড়ে দিলেন এবার: 'তোমার মতে আমাদের তাহলে কি করা উচিত?'

টিয়া হেসে ফেলল: 'আমার কথাগুলো প্রায় বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছে, না? জানি না, কি করা উচিত! তবে জানি, এ খেলায় যোগ না দিলেও দীপঙ্করের কোন ক্ষতি নেই। নিজস্ব ধ্যানধারণা তৈরী হলে ওরা নিজেরাই একদিন শিকড়টাকে খুঁজে ফিরবে।' অবনীশ হাসলেন। সুলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'টিয়া এখন আর টিয়াটি নেই। আগে কিরকম চুপচাপ বসে থাকত, অল্প অল্প কথা বলত—এখন কিরকম খই ফুটছে দেখ।' তারপর টিয়াকে

বললেন : 'তুমি কি বলতে চাও এই যে পুজো, নাচ, গান, বাজনা করছে বাঙালীরা—এর কোন প্রয়োজন নেই ?'

টিয়ার গলায় উত্তেজনা এখন অনেক কম : 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। প্রথম জেনারেশনের জন্য প্রয়োজন আছে। ওগুলো ছাড়া দমবন্ধ হয়ে যাবে। ফার্স্ট জেনারেশন হল দু পৃথিবীরই বাইরের জীব। টাকা, বাড়ি, গাড়ি বাদ দিয়েও মন বলে যে অবাধ্য বস্তুটা আছে সেটাকে ভুলিয়ে রাখতে চারপাশে তৈরী হয়েছে দেশজ পোশাকের কিছু রঙীন খেলনা। রঙগুলো মুছে দিলে যে কাঠামোটা বেরিয়ে পড়বে তার সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। আসবার সময় আমরা পুরনো খেলনাগুলো সঙ্গে এনেছিলাম, এখন ইচ্ছেমত তাতে আবোল-তাবোল রঙ লাগাচ্ছি।...'

টিয়া হয়ত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল—সুলেখা থামিয়ে দিয়ে বললেন : 'সবাই কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।' সত্যিই তাই। কামরায় আশেপাশের লোকেরা খানিকটা অবাক হয়েই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। টিয়া একটু লজ্জা পেল। সাধারণত এত কথা ও বলে না। আজকে হঠাৎ যে কি হল। অনেক দিনকার ভাবনাগুলো সব ছাডা পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। দীপঙ্করের কথায় এত কথা ভীড় করে এল। ও যে এত কথা বলতে পারে ও নিজেই জানতো না কখনো।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই স্টেশনটা এসে গেল। টিয়া নেমে যাবার আগে অবনীশ আর সুলেখা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলেন : 'একদিন এসো কিন্তু।'

টিয়া হাসল 'চেষ্টা করব। একটু গুছিয়ে নি।' আর বেশি কিছু বলা গেল না। টিয়া নেমে যেতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। টিয়া হাঁটতে শুরু করল ভীড়ের মধ্যে। ওকে নীচের তলা থেকে আরেকটা ট্রেনে উঠতে হবে। তারপর বাসে করে কলেজ। রোদ্দুরে এখন একটা লালচে আভা। এই রোদ্দুরে সবাইকে কিরকম যেন বিষণ্ণ দেখায়।

মেন স্ট্রীটে পৌঁছতে সাতটা বেজে গেল। সাড়ে সাতটার সময় কলেজে পৌঁছনোর কথা। কাজেই, দেরী হয়নি খুব একটা। বড্ড ক্লান্ত লাগছে এখন। খিদেও পেয়েছে খুব। স্টেশন থেকে রাস্তায় বেরিয়েই টিয়া একটা কফি শপে ঢুকে পড়ল। অন্তত একটা কিছু পেটে না পড়লে ও আর চলতে পারবে না কিছুতেই। দোকানে ঢুকে কাউন্টারের সাজানো সারি সারি টুলের একটাতে বসে পড়ল টিয়া। যে সব খাবারের নামটাম সুন্দর করে লেখা আছে তার একটাও খেতে ইচ্ছে করল না ওর। এক কাপ কফি আর একটা ডোনাট চাইল। টিয়ার

অ্যাপার্টমেন্ট এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই। কিন্তু এখন বাড়ি যাবার কোন মানে হয় না। অহেতুক দেরী হয়ে যাবে কলেজে।

দেখতে দেখতে এই পাড়াতে প্রায় বছরখানেক হয়ে গেল টিয়ার। এই অঞ্চলে হরেক জাতের মানুষের বাস। চীনে, জাপানী, পুয়েটিরিকান ও ভারতীয় সব মিলিয়ে বেশ একটা বসতি। সারা মেন স্ট্রীট জুড়ে বাজার। এরই মধ্যে একটি অংশে পর পর অনেকগুলো ভারতীয় দোকান। জামাকাপড়, আনাজপাতি, রেস্টুরেন্ট অ্যাপ্লায়ান্স—সব রকমের দোকান আছে এ পাড়ায়। এখানকার অনেক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ভারতীয়রা কিনে ভাড়া বসাচ্ছে। ভারতীয় দোকানগুলো পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে একটু হাঁটলেই ডানদিকে কুইন্স বোটানিকাল গার্ডেন। সামনের ফুটপাথে সারা গরমকাল জুড়ে ফ্রি মার্কেট বসে—অনেকটা কলকাতার হকার্সদের মতো। নানারকম সস্তার জিনিসপত্র বিক্রী হয় এখানে। ঘিঞ্জি অঞ্চল হলেও বাড়িভাড়া কিছু কম নয় এখানে। অনুপের বাড়ি থেকে এসে কেলির কাছে যে বাড়িটায় প্রথম উঠেছিল—সেটাও ওব এখনকার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে হাঁটাপথের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু, বাসে ট্রেনে যারা যাতায়াত করে তাদের পক্ষে এই অঞ্চল সব দিক থেকেই সুবিধাজনক। হাতের কাছে বাস, ট্রেন, বাজার। গাড়ি কেনার কথা টিয়া ভাবতেই পারে না।

কফিশপ থেকে বেরোনোর আগে কেলি মাবফিকে ফোন করল টিয়া। কেলি বাড়িতেই ছিল। ফোন তুলেই সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল : 'হু ইজ দিস।'

টিয়া মজা করল একটু : 'এ স্ট্রেঞ্জার।'

অপর প্রান্তে হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। কোন উত্তর নেই। ঘাবড়ে গিয়ে টিয়া তাড়াতাড়ি বলল : 'হ্যালো, কেলি ! দিস ইজ টি।' কেলি টিয়াকে আরো ছোট করে টি বলে ডাকত। উত্তর না পেয়ে টিয়া আবার নিজের পরিচয় দিল। কেলি লাইনটা কাটেনি এখনো। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে কেলি বলল : 'আর য়্যু রিয়েলি টি ?'

টিয়া একটু অবাক হল। কেলির গলা কিরকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে হল ওর।

টিয়া আবার বলল: 'ডোন্ট য়্যু রেকগ্নাইজ মাই ভয়েস।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেলি বলল : 'হোয়াট টাইম ইজ ইট ?'

টিয়া সময় দেখে বলল : 'কোয়ার্টার আফটার সেভেন।'

কেলি চমকে উঠল : 'হোয়াই ডিডন্ট য়্যু গো হোম ইয়েট ?'

কেলির কণ্ঠস্বর টিয়ার কাছে খুব অপরিচিত লাগছে। কি রকম অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথা বলছে ও। মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠল। টিয়া বলল : 'আই অ্যাম

গোইং টু স্কুল। উড য়্যু বি হোম টু নাইট ?'

কেলি যেন অনেক দূর থেকে কথা বলল : 'আই অ্যাম অলওয়েজ হোম। হোয়াই ?'

টিয়া বলল : 'অন মাই ওয়ে ব্যাক, আই উইল ড্রপ অ্যাট ইয়োর প্লেস ফর এ ফিউ মিনিটস। ইজ ইট ও কে ?'

কেলি যেন জীবন্ত হল এবার : 'দ্যাট উড বি নাইস।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একই কথা আবার বলল কেলি : 'দ্যাট উড বি ভেরী নাইস। বাট… '

টিয়া তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল : 'বাট হোয়াট ?'

কেলিকে খুব চিন্তিত মনে হল : 'য়্যু উডন্ট গেট লস্ট, রাইট ?'

টিয়া অবাক হয়ে বলল : 'নো, হোয়াই ?'

কেলির কণ্ঠস্বরে এখন একটা অদ্ভুত স্বস্তি : 'নাথিং। আই ডোন্ট নো হোয়াই আই থট য়্যু মাইট গেট লস্ট ?'

সময় হয়ে গেছে। টিয়া ফোন ছেড়ে দেবার আগে বলল : 'আই উইল বি দেয়ার অ্যাট নাইন!'

কফি শপ থেকে বেরিয়ে একটুখানি হেঁটে গিয়ে বাসে উঠল টিয়া। অফিস ছাড়ার পর কেলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি ওর। আজ ওর কথার ধরন-ধারণ বেশ অদ্ভুত লাগল টিয়ার। এমনিতে কেলি খুব হুল্লোড়ে মেয়ে। অফিসেও টিয়ার সঙ্গে যেচে প্রথমে আলাপ জমিয়েছিল ওই। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কেলি টিয়াকে খুব আপন করে নিয়েছিল। ও নিজের সব কথা টিয়ার কাছে বলত। টিয়াও খুব সহজেই ওকে অনুপের কথা বলতে পেরেছিল। কেলি শুনেই বলেছিল : 'কাম অ্যান্ড স্টে উইথ মি। আই ডোন্ট হ্যাভ এ বিগ অ্যাপার্টমেন্ট। বাট উই উইল ম্যানেজ!'

কেলির অ্যাপার্টমেন্টটা সত্যিই এমন কিছু বড় নয়। দুটো ছোট ছোট ঘর। বেশ অগোছালো। জিনিসপত্র এখানে ওখানে ছড়ানো। কিন্তু, মানুষ হিসাবে কেলিকে ভাল লেগেছিল টিয়ার। কেলিরা জাতে আইরিশ। ওর দাদু, দিদিমা আয়ারল্যান্ড থেকে এদেশে এসেছিলেন প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে। পর পর দুটো জেনারেশন ধরেই ওরা পিটসবার্গে আছে। ওর দাদু ছিলেন স্টিল ওয়ার্কার। ওর বাবাও তাই। ওদের পরিবারে একমাত্র কেলিই নিউইয়র্কে থাকে। বাকি সবাই এখনো পিটসবার্গের কাছে পিঠেই থাকে। কেলি বিয়ে করে নিউইয়র্কে এসেছিল বছর সাতেক আগে। বছর দুয়েকের মধ্যেই বিয়েটো ভেঙ্গে যায়। ওর বর চলে যায় ওয়েস্ট কোস্টে। কেলি আর পিটসবার্গে ফেরেনি।

অবশ্য, প্রত্যেক বছর থ্যাঙ্কসগিভিং-এর ছুটিতে ও পিটসবার্গ যায়।

ছোট কিংবা মনের মত না হলেও টিয়া কেলির ওখানেই উঠে পড়ে প্রথমে। সেই সময় সস্তায় একটা মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজছিল টিয়া। তাছাড়া, একা একা থাকেনি কোনদিন। তাই কেলির সঙ্গে থাকতে ও সহজেই রাজী হয়ে যায়। প্রথম প্রথম ভালই লাগছিল ওর। কখনো একা একা লাগত না। কাজের পরে সব সময়ই কিছু না কিছু করত ওরা। ছুটির দিনে হয় সিনেমা যেতো কিংবা টই টই করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত ওরা। ইচ্ছে না কবলে রান্না করত না। বাইরে কোন সস্তার দোকানে খেয়ে নিত।

কিন্তু, খুব কাছাকাছি থাকারও একটা বিপদ আছে। আরেকজনের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই বড় হযে চোখের সামনে ধবা পড়ে। মাঝে মাঝে এক আধটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য কবত টিয়া। কেলি কোন পুরুষকে সহ্য কবতে পারে না। যেমন, অনুপের কথা উঠলেই বলত : 'মেন আর অ্যানিম্যাল্‌স।' অনুপের সঙ্গে টিয়া থাকতে পারেনি এটা সত্যি কিন্তু জন্তু ভাববাব কোন কারণ ঘটেনি কখনো। নিজের আগেকাব স্বামীব কথা উঠলে মুখ চোখের ভাব বদলে যেত ওর। কথায় কথায় বলত : আই উডন্ট লেট এনি ম্যান টাচ মি এগেন !' মনে মনে অবাক হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করত না টিয়া। অফিসেও ছেলেদের সাথে খুব অসঙ্গত ব্যবহার করত কেলি। কখনো কখনো টিয়া বুঝিযে বলেছে—'তোমার স্বামী খুব ভাল লোক ছিল না হয়ত কিন্তু তার মানে এই নয় যে পৃথিবীব সব ছেলে খারাপ।'

কেলি এ কথা মানে না। ওর মতে—'মেয়েরা বড্ড নবম, ছেলেরা ইচ্ছেমতো তাই মেযেদের আঘাত কবে আনন্দ পায়, শারীবিক ও মানসিক ভাবে। একমাত্র মেয়েবাই মেযেদেরকে ভালবাসতে পারে।' টিযা খুব রেগে প্রশ্ন করেছিল—'হোয়াট অ্যাবাউট ইয়োর ফাদার ?'

কেলি খুব শান্ত স্বরে উত্তর দিয়েছিল—'আই অলওয়েজ হেটেড হিম।'

নতুন বাড়িতে আসার পর মাঝে মধ্যে শৈবাল টিযার সঙ্গে দেখা করতে আসত। হাবেভাবে কেলি বুঝিয়ে দিত শৈবাল আসুক এটা ওর পছন্দ নয়। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে টিযা। শৈবালের সঙ্গে কথা বলা বা বেড়াতে যাওয়া ও একদম দেখতে পারে না। কখনো-সখনো হাবেভাবে প্রকাশ করে ফেলত, বলত—'হি ইজ এক্‌স্‌প্লয়েটিং য়্যু।' টিয়া অবাক হতো। ও তো-নিজের ইচ্ছেয শৈবালের সঙ্গে মেশে। তাছাডা, শৈবাল আর যাই হোক সুবিধাবাদী নয়। কি স্বার্থ থাকতে পাবে ওর ?' কেলি বিশ্বাস করে না। ও বলে : 'দি ওয়ার্স্ট

কাইণ্ড অফ এক্সপ্লয়েটেশন ইন দিস ওয়ার্লড ইজ ইমোশনাল। হি ইজ মেকিং য়্যু ইমোশনালি ডিপেণ্ডেন্ট অন হিম। ইফ্ য়্যু বিকাম ইমোশনালি—য়্যু উইল নেভার বি ইয়োরসেল্ফ এগেন।' তর্ক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে টিয়া চুপ করে যেত একসময়।

শৈবালের সঙ্গেও কেলিকে নিয়ে কথা হয়েছে বহুবার। শৈবাল বলত—'মনের ব্যারাম। সম্ভবত অনেক ছেলের কাছে আঘাত খেয়েছে জীবনে। তাই মনের ভেতরে পুরুষ সম্পর্কে একটা তীব্র আতঙ্ক আর ঘৃণা। বাবাই সম্ভবত ওর জীবনের প্রথম পুরুষ যে ওকে আঘাত করেছিল। সেই থেকেই পুরুষ সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ সম্ভবত সৃষ্টি হয়। তারপর ভবিষ্যৎ জীবনে বয়ফ্রেণ্ড কিংবা স্বামীর কাছেও আঘাত পেয়ে সেই ধারণা আস্তে আস্তে বিশ্বাস ও পরে অবসেশনে পরিণত হয়েছে।'

শৈবাল আরো বলেছিল—'তুমি ওখানে থাকতে পারবে না টিয়া।'

টিয়া মাথা নেড়েছিল—'ও কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসে। আমার জন্য যা করে তুমি ভাবতে পারবে না। তোমার নিশ্চয় রাগ হচ্ছে।'

শৈবাল হেসে বলেছে—'রাগ নয়, সন্দেহ।'

শৈবালের কি সন্দেহ হয়েছিল টিয়া জানত না সেদিন তবে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল মাসখানেকের মধ্যে। টিয়ার তখন জ্বর। ও অফিস যায়নি দু'দিন। প্রথম দিন অবশ্য কেলি অফিস গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন কেলি গেল না ছোটবেলায় মা যে রকম সেবা-শুশ্রূষা করত সেই রকম যত্ন করে টিয়ার সেবা করত ও। বিছানা থেকে উঠতে দিত না। খাবার-দাবার তৈরী করে মুখের কাছে এগিয়ে দিত। সন্ধ্যেবেলা ওরা দুজনে পাশাপাশি শুয়েছিল বিছানায়। টিয়ার মাথা ধরেছিল খুব। ও চোখ বুজে পড়ে ছিল বিছানায়। কেলি প্রশ্ন করল—'ডু য়্যু স্টিল হ্যাভ দি হেডেক?' টিয়া বোধহয় হ্যাঁ বলেছিল। কেলি ওর হাত টিয়ার কপালে রাখল। ওর সুন্দর নরম আঙ্গুলগুলো দিয়ে টিয়ার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

অনেকদিন আগের কান্নাটা সেদিন সারা শরীর জুড়ে এল। বহুদিন পর একটা ভালবাসার হাত ওর কপাল থেকে শুষে নিল অনেক উত্তাপ। বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি, অন্ধকার, শরীরের ব্যথা সব কিছু মিলিয়ে টিয়া চীৎকাব করে কাঁদল। যন্ত্রণায় নয় সম্ভবত আনন্দে। ও নিজের আঙ্গুলগুলো দিয়ে কেলির আর একটা হাতের আঙ্গুলগুলো জড়িয়ে ধরল। বিদেশে একা একা জীবনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য টিয়া যে মনটাকে পাথরের মতো করে তুলেছিল—সেই পাথর

চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে ঝরণা হয়ে গেল। কেলিও জড়িয়ে ধরল টিয়াকে। টিয়ার সমস্ত শরীরে কেলি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কপালে চুমু খেল। ভেজা চোখে চুমু খেল। টিয়া আর কেলি পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিযে রইল। কেলি খুব আস্তে করে বলল: 'আই লাভ য়্যু।'

তারপরের ঘটনার জন্য টিয়া প্রস্তুত ছিল না। খুব অপ্রত্যাশিতভাবে কেলি ঝুঁকে পড়ে টিয়ার ঠোঁটে চুমু খেল। বিস্ময়েব ঘোর কাটতে না কাটতেই কেলি পাগলের মত চুমু খেতে লাগল টিয়াকে। ঠোঁটে, গলায়, বুকে। আর সেই ভালবাসাব হাত হঠাৎ কিরকম সাপের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল টিয়ার শরীরের বিভিন্ন খাঁজে। টিয়া লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। কেলি তখনো শুয়েই আছে। অস্পষ্টভাবে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'হোয়াট ইজ দি ম্যাটাব! ডোন্ট য়্যু লাভ মি?'

টিয়া এ কথায় কোন উত্তর দিল না। চোখের জল মুছে ঘরের লাইটটা জ্বালিয়ে দিল। ঘরটাকে অসম্ভব কুৎসিত লাগছে এখন। কেলির দিকে তাকাতে পারল না ও। কেলি আবার প্রশ্ন করল: 'ডোন্ট য়্যু লাভ মি, টি?' টিয়াব চোয়াল শক্ত হল। কেলির দিকে পেছন ফিরে ও খুব দৃঢ় কণ্ঠে বলল: 'তুমি যাকে খুঁজছ, আমি তা নই।' মেয়েটা চুপ করে শুযে রইল বিছানায়। টিয়া বসে রইল চেয়ারে। অনেক রাত্তির পর্যন্ত ঘুম এল না সেদিন।

বাসা বদলাতে হবে। সব সময় একটা অস্বস্তি নিয়ে থাকা যায় না। তাই, প্রথম বাসাবদলের মাস চারেকের মধ্যেই টিয়াকে নতুন বাসার সন্ধানে বেরোতে হল আবার। শৈবাল আর ও অনেক খুঁজে একটা অ্যাপার্টমেন্ট পেল। ভাড়া অনেক বেশি। তা হোক, তবু নতুন কোন ঝামেলায় আর পড়তে চায় না টিয়া।

পরে অবসর সময় অনেকবার ঘটনাটাকে ঠাণ্ডা মাথায় বিশ্লেষণ কবে দেখেছে ও। কেলির ওপর রাগের থেকে দুঃখই হয়েছে বেশি। কেলি ক্ষমা চেয়েছে অনেকবার। শুধু তাই নয়, টিয়া চলে আসবে শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল ও। বলেছে—'ডোন্ট লিভ।' ততদিনে টিয়া মন ঠিক করে ফেলেছে। টিয়ারও কষ্ট হয়েছিল খুব। মন থেকে ও মেয়েটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি কখনও। কেলির একটু হিস্টিরিয়া মতনও ছিল বলেই টিয়ার ধারণা। একটু উত্তেজিত হয়ে গেলেই কিরকম কাঁপত আর দাঁত দিয়ে আঙ্গুলের চামড়া কাটত।

অন্য বাড়িতে যাবার পরও কেলির সঙ্গে অফিসে দেখা হত রোজই। সামনাসামনি পড়ে গেলে দু'চারটে মামুলি কথাবার্তা হত। কিন্তু কেমন যেন

একটা অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। অনেক চেষ্টা করেও খুব সহজ হতে পারেনি টিয়া। এদিকে কেলিও অদ্ভুতভাবে পাল্টে যেতে লাগল চোখের সামনে। অন্য লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত কম। প্রায়ই দেরী করে অফিসে আসত। তারপর, কথা নেই বার্তা নেই দুম করে অফিসে আসা বন্ধ করে দিল একদিন। জানা গেল মানসিক অসুস্থতার জন্য ও আপাতত বাড়িতে বসে আছে। অনেকদিন থেকেই খবর নেবে ভাবছিল টিয়া। আজ ওকে ফোন করে মনটা খারাপ লাগছে হঠাৎ। কথাবার্তা শুনে কিরকম যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল ওকে।

কলেজে গিয়ে মনটা ভাল হয়ে গেল টিয়ার। অ্যাডমিশন নেবার সময়েই ফেলোশিপের জন্য ফর্ম ভর্তি করে রেখেছিল ও। অবশ্য, আগে থেকেই জানত অ্যাপ্লাই করা মানেই পাওয়া নয়। মনে মনে ধরেই নিয়েছিল প্রথম সেমেস্টারের পুরো খরচটা হয়ত নিজেকেই দিতে হবে,কারণ জাতীয় অর্থনীতির দুর্দশার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও এখন রীতিমত সঙ্গীন। দশ পনের বছর আগেও গাদা গাদা গ্রান্ট ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এমন কি বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য যারা এসব দেশে আসত—ফেলোশিপের টাকায় তাদের বেশ ভালভাবে চলে যেত। আজকাল বিদেশী ছেলেমেয়ে তো দূরে থাক, এখানকার ছেলেমেয়েদেরই সুযোগ সুবিধে দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সেদিক থেকে টিয়ার ভাগ্য যথেষ্ট ভাল বলতে হবে। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ফেলোশিপ পেয়ে গেল টিয়া। অবশ্য তার জন্য অতিবিক্ত কিছু পরিশ্রমও করতে হবে ওকে। সপ্তাহে দুদিন ক্লাস নিতে হবে ওকে। এছাড়া প্রফেসরের সঙ্গে একটা প্রজেক্টে কাজ করতে হবে অতিরিক্ত সময়। অর্থাৎ, তিনটে সন্ধ্যে নিজে ছাত্রী আর দুটো সন্ধ্যে ও শিক্ষিকা। অর্থাৎ, সপ্তাহে পাঁচটা দিনই আপাতত বেশ কিছুদিনের জন্য ঠাসবুনুনি হয়ে যাবে টিয়ার জীবনে। কিন্তু, পড়াশুনোর জন্য আলাদা খরচ আর থাকল না। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার ব্যবস্থা হয়ে গেল। অর্থাৎ,ফেলোশিপের টাকায় পড়াশুনোর খরচ দিব্যি চালিয়ে নিতে পারবে ও। বাড়তি খাটনির কথা এই মুহূর্তে ভুলে গেল টিয়া।

ক্লান্তি যতটা শারীরিক তার চেয়ে বেশি বোধহয় মানসিক। ঘণ্টাখানেক আগেও যে ক্লান্তিটা দেহমন জুড়ে ছিল—কলেজ থেকে বেরিয়ে তার চিহ্নমাত্র অনুভব করল না টিয়া। রাস্তায় বেরিয়ে ওর নিজেকে প্রজাপতির মতো হাল্কা মনে হল। এখনও আলো আছে। আকাশের বেশ খানিকটা মেঘে ঢেকে গেছে। মেঘগুলোয় এখন একটা অদ্ভুত রঙ। সারি সারি অনেক মেঘ স্তূপীকৃত হয়ে

আছে আকাশের মাঝখানে—বিভিন্ন ভঙ্গীতে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পাহাড়—এ ওর কাঁধে মাথা দিয়ে অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। আর সূর্যটা লুকিয়ে পড়েছে মেঘগুলোর বুকে। শুধু আলোকরশ্মি বিভিন্ন সরলরেখায় মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাতেই মেঘগুলোর গায়ে একটা অদ্ভুত বর্ণালী ছটা। অস্ত যাওয়ার আগে পৃথিবীকে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সূর্য। টিয়া মনে মনে ভাবল, আর কিছুক্ষণ পরেই মেঘগুলো সিঁদুর মাখবে গায়ে। তারপর মুখ কালো করে বসে বইবে সান্ধ্যারাত্তির।

বাসটাসগুলো এখন বেশ ফাঁকা। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে গেছে প্রায় সবাই। এতক্ষণে টিয়াব বেশ ছুটি ছুটি লাগছে। যাবার পথে কেলির সঙ্গে একবার দেখা কবে ঘরে ফিরবে ও। বাড়িতে গিয়ে লম্বা একটা স্নান। ওর মনে হল বাথটবে জল জমিয়ে অনেকক্ষণ সেখানে মাথা হেলিয়ে শুযে থাকবে টিয়া। বান্না করতে একদম ইচ্ছে কবছে না আজ। কেলির বাড়ি থেকে ফেরার পথে ম্যাকডোনাল্ড থেকে হ্যামবার্গার তুলে নিলেই হবে। ইদানীং কালে এই সব সস্তাব খাবার বেশ অভ্যেস করে ফেলেছে টিয়া। প্রথম প্রথম স্বাদ পেত না। এখন মন্দ লাগে না।

কেলিব ঘরের বেল বাজাতে দরজা খুলে দিল একটা অপরিচিত মেয়ে। এই মেয়েটিকে আগে কোনদিন দেখেছে বলে মনে হল না ওর। টিয়া কিছু বলার আগেই হেসে বলল : 'য়্যু মাস্ট বি টি।'

টিয়া কোন কথা না বলে হাসল। ঘরে ঢুকে কেলিকে কোথাও দেখতে পেল না টিয়া। মেয়েটি বুঝতে পেরে বলল : 'প্লীজ, টেক এ সিট। শি ইজ ইন দি শাওযাব।' টিয়া কোচটায় বসলে মেয়েটি শোবার ঘবে অদৃশ্য হল।

ঘরটার বেশ বীভৎস চেহারা। টিয়া থাকতে গুছিয়ে রেখেছিল অনেক। এখন আবার যে কে সেই। ঘরে কিন্তু দামী দামী জিনিস আছে অনেক। স্টিরিওটা মাটির ওপর বসানো ঘরের কোণায়। তার ওপর একটা ওয়াইনের গ্লাস। খানিকটা ওয়াইনও রয়েছে তাতে। অনেকদিন আগেকার। কারণ পুরু শ্যাওলা জমেছে সেখানে। বুক শেল্ফের বইগুলো ইতস্তত এদিক ওদিক ছড়ানো। বেডকভারটা অতি ব্যবহারে জীর্ণ। বহুদিন কাচা হয়নি। টিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে ওর পুরোনো ঘরের চেহারাটা দেখছিল।

বাথরুম খোলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকালো টিয়া। বাথরুম থেকে যে মেয়েটি বেরিয়ে এল তাকে দেখে টিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দু'মাস আগেও যে মেয়েটিকে অফিসে দেখেছে টিয়া, এখন তাকে দেখে চিনতে

কষ্ট হচ্ছে ওর। পরনে একটা ঝোলাঝালা সাদা এক পিস জামা পা পর্যন্ত। মুখখানা সাদা মোমের মত। মনে হয় একবিন্দু রক্ত নেই শরীরে। চোখ দুটো কিরকম অস্বাভাবিক। টিয়ার দিকে তাকিয়ে কিরকম অদ্ভুত কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কেলি। শুধু ঠোঁটটা কেঁপে উঠল একবার।

টিয়া এগিয়ে এসে কেলির সামনে দাঁড়াল। কেলি কোন কথা না বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল। টিয়া হাতে হাত রাখল। কেলি এগিয়ে এসে টিয়াকে জড়িয়ে ধরল। গালে চুমু খেল একটা। টিয়ার অবাক হয়ে তাকানোর ভঙ্গী বোধহয় কেলির চোখ এড়ায়নি : 'হাউ ডু আই লুক ?'

টিয়া কি বলবে বুঝে পেল না প্রথমে। তাছাড়া, মিথ্যে কথাটা চট করে বলতে ওর মুখে বাধল এখন : 'য়্যু হ্যাভ লস্ট সাম ওয়েট।'

কেলির মুখে একটা আবছা হাসি হঠাৎ এসে মিলিয়ে গেল আবার। ডান হাতের একটা আঙ্গুল মুখে দিয়ে দাঁতে মাংস কাটতে লাগল কেলি। টিয়া আবাব প্রশ্ন করল : 'হাউ ডু য়্যু ফিল ?'

কেলিব আঙ্গুলটা ওর মুখেব মধ্যে। কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানাল ভাল। হঠাৎ কি মনে হতে কেলি তৎপর হয়ে টিয়াকে বসিয়ে দিল কোচে। পেছন ফিরে কিচেনের দিকে যেতে যেতে বলল . 'উড য়্যু লাইক সাম কাপ অফ টি ?'

এখন চা খেতে একটুও ইচ্ছে নেই টিয়ার . তাই বাধা দিয়ে বলে উঠল · 'নো, থ্যাঙ্কস। লেট মি হ্যাভ এ গ্লাস অফ প্লেন ওয়াটার।'

কেলি কোচে এসে বসেছে। ওর সামনে টিয়ার অস্বস্তি লাগছে বেশ। কেলি শুধু অবাক হয়ে টিয়াকে দেখছে। ওর দৃষ্টির সামনে টিয়া কুঁকড়ে গেল একটু। একটা অপরাধবোধ মনের ভেতরে আনাগোনা করছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার! টিয়া মনে মনে ভাবল—ওর তো কোন দোষ নেই—বরঞ্চ কেলিই অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছিল ওর সাথে। অথচ, এক্ষুনি টিয়ার মনে হচ্ছে কেলির বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ওর কোথাও একটা সম্পর্ক আছে। নিজেকে নিষ্ঠুর বলে মনে হল হঠাৎ।

কেলির ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল আবার। বিড় বিড় করে বলল : 'আই ডোণ্ট গো আউট এনি_মোর !'

হ্যাঁ, না কিছুই বলাই হয়ত এখানে অবাস্তব। কেলি আপন মনেই বলতে লাগল : 'দেয়ার ইজ সো মাচ ক্রাউড ইন দি স্ট্রীট। সো মেনি পিপল, সো মেনি কারস, ট্রেনস অ্যান্ড বাসেস। নো বডি নোজ মাই অ্যাড্রেস। আই ফিল আই উইল গেট লস্ট। সাম বডি উইল পুশ মি ওভার দি এজ।'

শোবার ঘর থেকে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে এ ঘরের কোণায়। টিয়া কিছু বলার আগেই মেয়েটি ইঙ্গিতে নিষধ করল টিয়াকে। টিয়া কেলির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। এই সেই হুল্লোড়ে মেয়েটা—যার মুখ চোখ কথা বলত মাত্র বছর খানেক আগেও—তার এই অদ্ভুত অসহায় অবস্থাটা ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। কেলি তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে টিয়াকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে টিয়া উঠল। কেলির হাতে হাত রেখে বলল : 'লেট মি টেক্ অফ টু-নাইট। আই উইল কাম এগেন।'

কেলি যেন ভয় পেল : 'য়্যু উইল গেট লস্ট।'

টিয়া প্রতিবাদ জানানোর আগেই মেয়েটি বলে উঠল : 'আই উইল ওয়াক হার টু সি বাস স্টপ।'

কেলি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। টিয়ার দিকে ফিরে বলল : 'জেনিফার লাভস মি, য়্যু নো।'

কেলি কিছু ভেবে কথাটা বলেনি—কারণ ভেবে কথা বলার মতো ক্ষমতা এখন ওর নেই। তবু এই কথার ভেতরের একটা অদৃশ্য চাবুক টিয়াকে আঘাত করল। চোখটা জ্বালা করছে। মাথার ভেতরে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। আজকের কেলিকে না দেখলেই বোধহয় ভাল হত ওর।

বাইরে রাস্তায় নেমে জেনিফার বাস স্টপ পর্যন্ত টিয়ার পাশে হাঁটল। টিয়া প্রশ্ন করল : 'হাউ লং হ্যাজ শি বিন লাইক দিস ?' জেনিফার বলল : 'শি ইজ মাচ বেটার নাও। শি হ্যাজ এ লং হিস্টরি অফ নার্ভাস ডিজিজ। শি উইল বি অলরাইট।' টিয়া আস্তে আস্তে হাঁটছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাতাসে আর উষ্ণতা নেই। অন্ধকার রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ল্যাম্প পোস্টের লাইটগুলো একটা আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে। টিয়ার মনটা এখন একদম শূন্য। কিছু ভাবছিল না টিয়া। জেনিফার নরম গলায় বলল : 'উড য়্যু ডু হার এ ফেবার ?'

টিয়া অবাক হয়ে জেনিফারের দিকে তাকাল। ওর মুখটা অন্ধকারে দেখা যায় না। আগের মতন নরম গলাতেই জেনিফার বলল : 'প্লীজ, ডোন্ট কাম এগেন।'

ছোট্ট অন্ধকার রাস্তাটা মেন স্ট্রীটে মিশে গেল। জেনিফার বোধহয় থেমে গেল সেখানেই। টিয়ার মনে নেই। ও হাঁটছে তো হাঁটছেই। সময় যেন অনেকক্ষণ আগে জেনিফারের সঙ্গেই থেমে গেছে। মাথার যন্ত্রণাটা বেড়েছে। কলেজ থেকে বেরোনোর সময় যে ক্লান্তিটা উধাও হয়েছিল—হঠাৎ যেন দলবল নিয়ে সে আবার দখল করে নিল টিয়াকে। সোজা রাস্তাটাকে পাহাড় মনে হল ওর। টিয়া এখন কেলির মতই অসহায়। যে কোন মুহূর্তে ও এখন হারিয়ে

যেতে পারে। পা টেনে তবুও টিয়ার শরীরটা এগিয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ডের দিকে।

ঘরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে লাগল ওর। সমস্ত দরজা, জানালা বন্ধ। একই বাতাস ছোট্ট পরিসরে ঘুরপাক খাচ্ছে সারাদিন। লাইটটা জ্বালিয়ে টিয়া তাড়াতাড়ি ব্যালকনির দরজাটা খুলে দিল। পনেরোতলা ওপরের বাতাসটা এখন বেশ ঠাণ্ডা। এই ব্যালকনিটা টিয়ার খুব প্রিয়। অফিস থেকে ফিরে একটা চেয়ার নিয়ে ও অনেকক্ষণ এখানেই বসে থাকে। এই বারান্দা থেকে পুরো কুইন্‌স আর ম্যানহাটান দেখা যায়। ওপর থেকে সব কিছুই অন্যরকম দেখায়। একটু দূরেই পাশাপাশি বিরাট দুটো হাইওয়ে লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে আর গ্র্যান্ড সেন্টাল পার্কওয়ে কিরকম বিরাট পাইনবনের মতো এঁকেবেঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। গাড়িগুলোকে ভাল করে বোঝা যায় না। কালো সুতো দিয়ে বাঁধা বিরাট আলোর মালা। একদিকে সাদা, অন্যদিকে লাল। অর্থাৎ, যে গাড়িগুলো এদিকে আসছে তাদের হেডলাইট আর যেগুলো শহরের দিকে যাচ্ছে তাদের টেল লাইট। পাশাপাশি চলতে চলতে হাইওয়ে দুটো প্রায় গা ঠেকাঠেকি করে আবার ছিটকে গিয়েছে দুপাশে। বাড়ির নীচের রাস্তাটা এখন প্রায় অন্ধকার। শুধু রাস্তার দুপাশে লাইন দিয়ে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। এ পাড়ার বাসিন্দাদের গাড়ি। বেশির ভাগ সময় রাস্তাতেই পড়ে থাকে।

রাত কত হয়েছে ওর মনে নেই। স্নান করাও হয়নি। ব্যালকনিতে বসে কখন যে ওর চোখ দুটো বুজে গেছে জানে না। ঘুম ভাঙ্গল টেলিফোনের শব্দে। ধড়মড় করে উঠে বসল টিয়া। ঘুমের ঘোরে টেলিফোনের রিংগুলোকে অন্যরকম মনে হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল টিয়া. 'হ্যালো।'

'তোমার কি ব্যাপার বল তো?' শৈবালের গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'কেন, কি ব্যাপার?'

'তুমি ভুলে গেছ?'

না, কিছু মনে নেই টিয়ার। এই মুহূর্তে সব কিছু ধোয়ামোছা, পরিষ্কার। টিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলল · 'প্লীজ, মনে করিয়ে দাও।' টিয়ার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে এখনো।

'নতুন চারচাকা নিয়ে আজ বেরিয়ে পড়ার কথা ছিল।'

আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে আসছে সব কিছু। শৈবালের গাড়ি ডেলিভারি পাবার কথা আজ। একদম ভুলে গেছে টিয়া। আজকাল অনেক কিছুই ওর মনের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে। টিয়া লজ্জা পেল : 'বিশ্বাস করো, একদম ভুলে গেছি।'

শৈবাল চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। টিয়া আবার বলল : 'রাগ করলে ?'
'যাবে ?'
টিয়ার খুব ক্লান্ত লাগছে এখন, একটু চুপ করে থেকে ও বলল : 'কোথায় যাবে ভাবছ ?'
'চল না, লেক জর্জ যাই।'
লেক জর্জের নামে মনটা নেচে উঠল ওর। নামটা অনেকদিনের চেনা। যাওয়া হয়নি কোনদিন। টিয়া হেসে বলল : 'যেতে পারি, দুটো শর্তে।'
'হুকুম হোক।'
'এক নম্বর—বারোটার আগে বেরোতে পারব না। কারণ একটা লম্বা স্নান করতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর—আমি গাড়িতে ঘুমোলে তুমি রাগ করতে পারবে না। লেক জর্জে গিয়ে আমাকে জাগিয়ে দেবে। রাজী ?'
'আমার কোন বিকল্প নেই। আছে কি ?'
'না। তাছাড়া আবার বিকল্প আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি চলে এস।'
'তুমি তো লম্বা স্নান করবে, আমি ভ্যারাণ্ডা ভাজব এখন গিয়ে ? আমি একটু পাড়ার মোড়ে গিয়ে বসি।'
'বারে যাচ্ছ ?বেশি ড্রিংক কর না কিন্তু। মনে রেখ, সারা রাস্তা তোমায় একা একা জেগে গাড়ি চালাতে হবে।'
'ছোট্ট একটা ব্র্যাণ্ডি। ডাক্তাররা কি বলে জান ?'
'কি ?'
'ব্র্যাণ্ডি হার্ট ভাল করে। ধমনীতে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পরমায়ু বাড়ে, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। মুখ চোখ দিয়ে জ্যোতি বেরোয়।'
'গাড়িটা কিরকম খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'
'তোমার থেকে ফর্সা। মানে সফ্ হোয়াইট। ভেতরটা নীল। এখনও বেশ আড়ষ্ট। আলাপ হয়নি ভাল করে।'
'আমি রাখছি। কথা বললে দেরী হয়ে যাবে আরো।'
ফোনটা রেখে প্রস্তুতি শুরু হল টিয়ার। এদেশে বলেই হয়ত এতটা সম্ভব ! সকাল সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে রাত ন'টায় বাড়ি ঢুকেছে টিয়া। আবার, মধ্যরাতে পাড়ি জমাবে দুশো মাইল দূরে। কলকাতার লোকে শুনলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না হয়ত। যথেচ্ছাচারের ব্যাপারে এই দেশ আইডিয়াল। ইচ্ছেটাই বড় কথা। কোন কৈফিয়ৎ চাইবে না কেউ, বিরাট বিরাট রাস্তা পড়ে আছে সামনে। যেখানে খুশি যত খুশি যাও। পোশাক ঠিক করতে গিয়ে টিয়া বিপদে পড়ল।

এটা কিছু নতুন নয় ওর। শাড়ি পরতে ইচ্ছে করছে না ওর। অনেক ভেবে-চিন্তে একটা ঘিয়ে রঙের ম্যাক্সি বেছে নিল টিয়া।

বেরোতে বেরোতে প্রায় রাত একটা বেজে গেল। শৈবালের গাড়িটা বেশ বড় ও সুন্দর। মারকারি কুগার। নতুন গাড়ির চেহারাই আলাদা। ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আলোতেও চকচক করছে। সীটের নতুন চামড়া, ভারনিস্, আয়নার সঙ্গে ঝোলানো এয়ার ফ্রেশনার সব কিছু মিলিয়ে একটা নতুন নতুন গন্ধ ছড়িয়ে আছে গাড়ির ভেতরে। সিংহীর মতো একটা চাপা গুরু গম্ভীর গর্জন করে গাড়িটা স্টার্ট হল। টিয়া সামনে বসতে চেয়েছিল। শৈবাল জোর করে ওকে পেছনে পাঠাল। সামনে বসলে টিয়ার ঘুম হবে না একথা সত্যি। ঠিক এই মুহূর্তে অবশ্য ঘুম পাচ্ছে না টিয়ার। তাও জুতোটা খুলে পেছনের সীটে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসল টিয়া। জানালাটা খোলা। টিয়ার চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। শৈবাল সামনের দিকে তাকিয়ে। একটা হাত আলতো করে স্টিয়ারিং-এর ওপর রাখা। সাদার ওপর লাল স্ট্রাইপ দেওযা একটা সুন্দর জামা পরেছে শৈবাল। ওর লম্বা লম্বা চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। সামনেব আয়নাতে ওর মুখটা অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে টিয়া।

'খুব ক্লান্ত লাগছে?' শৈবাল সামনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'এখন নয়।'

'যতক্ষণ না ঘুম আসে একটা গান কর।'

'গলা ভেঙ্গেচুরে শেষ হয়ে গেছে। গান গাইতে ভাল লাগে না একদম।'

'সব সময় সম্পূর্ণ গান শুনতে ভালও লাগে না। ভাঙ্গাচোরা গানই অনেক সময় সম্পূর্ণতা নিয়ে আসে।'

'জানালাটা বন্ধ কর।' একটু শীত শীত লাগছিল টিয়ার। এই শহর প্রতি মুহূর্তে বদলায়। চারঘণ্টা আগের থেকে তাপমাত্রা এখন প্রায় কুড়ি পঁচিশ ডিগ্রী নেমে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিউইয়র্ক থ্রুওয়ের ওপর মারকারি কুগার নিঃশব্দে ছুটছে। কখন আপনমনে গান শুরু করল টিয়া—'তুমি কিছু দিয়ে যাও।' টিয়ার গলাটা সত্যি ভাঙ্গা। সুরগুলো ঠিকমত পর্দায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। তবুও শুনতে ভাল লাগছে শৈবালের। বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, ও পাশের লেনগুলো দিয়ে মাঝেমধ্যে এক-আধটা গাড়ি উল্কার মতো ছুটে যাচ্ছে, ডানদিকে—বাঁদিকে যতদূর চোখ যায় গভীর জঙ্গল। গানের কথাগুলো গাড়ির ছোট্ট পরিসরে

ঘুরপাক খাচ্ছে বারবার। গাইতে গাইতে গলাটা পরিষ্কার হচ্ছে ক্রমশ। কথাগুলো কান্না হয়ে মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

গান শেষ করল না টিয়া। মাঝপথে থেমে গেল। শৈবাল চুপ। টিয়া খুব ক্লান্ত স্বরে বলল : 'দম পাচ্ছি না। হাঁপিয়ে যাচ্ছি। মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

'জল খাবে? দাঁড়াব সার্ভিস এরিয়াতে?'

টিয়া আপত্তি জানাল : 'না থাক। চল এগিয়ে যাই। থামলে দেরী হয়ে যাবে।'

টিয়া খুব সাধারণভাবেই কথাটা বলেছিল। অথচ শৈবালের অন্য কথা মনে এল। থামলে দেরী হয়ে যাবে। একনাগাড়ে কতখানি ছুটবে টিয়া। মুখে কিছু না বলে শৈবাল সামনের দিকে তাকাল। টিয়ার গলা পাওয়া যাচ্ছে না আর। সামনের আয়নায় টিয়ার মুখটাও দেখা যাচ্ছে না আর। ঘাড় ঘুরিয়ে শৈবাল দেখল টিয়া শুয়ে পড়েছে পেছনের সিটে। কুঁকড়ে-মুকড়ে জড়োসড়ো হয়ে। এই মুহূর্তে ওকে ঠিক অসহায় শিশুর মতো লাগছে। শৈবাল মনে মনে ভাবল ঘুমোলে সবাইকেই হয়ত অসহায় মনে হয়। এখনো অনেকটা রাস্তা। পাছে ঘুম পেয়ে যায় এই ভয়ে শৈবাল একটা সিগারেট ধরাল। পাশের জানালাটা সামান্য নামাল যাতে ধোঁয়াগুলো বাইরে বেরিয়ে যায়। একটানা চালিয়ে সোজা লেক জর্জে পৌঁছে যেতে চায় ও।

চোখ মেলে ভয় পেল টিয়া। ঘুমচোখে সব কিছুই অচেনা লাগল ওর। ধড়মড় করে উঠে বসল পেছনের সীটে। শৈবাল সামনের সীটটাকে রিক্লাইনার করে শুয়ে আছে মাথা হেলিয়ে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল টিয়া। সরু এই পাহাড়ী রাস্তায় ওর থেকে বেশ খানিকটা নীচে একটা বিরাট লেক। নদীর ওপারে ধূসর রঙের পাহাড় আবছা দেখা যাচ্ছে। দুটো পাহাড়ের মাঝখানের আকাশটা লাল। বোধহয় সূর্য উঠছে। কাল কলেজ থেকে বেরোনোর সময় যে সূর্য বিদায় নিচ্ছিল আজ এই মুহূর্তে সে আবার আলো নিয়ে আসছে। একটা নতুন পৃথিবী জন্ম নিচ্ছিল টিয়ার চোখের সামনে। সামনের লম্বা লম্বা গাছগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। পাতাগুলো এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। বাতাসে জল আর মাটির একটা অদ্ভুত গন্ধ। জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে একটা গভীর শ্বাস নিল টিয়া। বিস্তীর্ণ জলরাশি যেন পটে আঁকা ছবি। কোন ঢেউ নেই, চঞ্চলতা নেই। গম্ভীর-সম্ভীর একটা যুবতী মেয়ের মতো চুপ করে শুয়ে আছে পাহাড়েব কোলে। মুগ্ধ চোখে টিয়া তাকিয়ে থাকল।

আকাশের যে অংশটা লাল—সেখান থেকে রক্তগোলক দেখা গেল। সারা

পাহাড়ের গায়ে আবীর ছড়িয়ে, মুখ ভর্তি আবীর মেখে সূর্য উঁকি মারল আকাশে। পাখীরা গেয়ে উঠল গান। স্নিগ্ধ বাতাস জড়িয়ে ধরল টিয়াকে। এখানে গাড়ি পার্ক করে, দরজাগুলো লক করে ক্লান্ত হয়ে শৈবাল অঘোরে ঘুমোচ্ছে। লম্বা চুলের একগোছা কপালের ওপর পড়েছে। শৈবালের চুলে হাত দিতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিল টিয়া। আজকাল একটা অদ্ভুত লজ্জা পেয়ে বসেছে ওকে। এই বিদেশে শৈবালকে ওর একমাত্র আপনজন বলে মনে হয়। তাই ছুঁতে ভয় করে। ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে কোথাও একটা মিথ্যে অধিকারবোধ জন্মায়। অকারণ প্রত্যাশা বাড়ে। রাগ, অভিমান জমে জমে পাহাড় হয়।

টিয়া অস্ফুট স্বরে বলল : 'এই দেখ।'

শৈবাল চোখ মেলে টিয়াকে দেখল। আবার চোখ বুজল। আবার তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল টিয়ার দিকে। তারপর চোখ বুজে বলল : 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

টিয়া লজ্জা পেল : 'ধ্যুৎ। সূর্য উঠছে দেখ।'

শৈবাল চোখ মেলে তাকাল আবার। ওপরে নীচে দুটো সূর্য এখন। পাহাড়ের কোলে শুয়ে থাকা যুবতীর বুকে এখন আরেকটা সূর্যের ছায়া। শৈবাল আধোশোয়া ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল বাইরে।

'চল না, জলের কাছে যাই।' টিয়া আবদার করল।

'ওরে বাপরে, এটা মোটেলের প্রপার্টি। ট্রেসপাসিং হয়ে যাবে।'

'কিছু বলবে না। চল না এই সরু রাস্তাটা দিয়ে নেমে যাব। লেকটা তো আমরা চুরি করে নিয়ে যেতে পারব না, পাহাড়টাও নয়। কিছু বলবে না আমাদের।'

'জেল খাটতে রাজী আছ?'

'হ্যাঁ।'

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তাটা প্রায় লেকের ধার পর্যন্ত গেছে। গাড়ি থেকে একটা ছোট্ট পায়ে চলার পথ ধরে ওরা এগোল জলের দিকে। দূর থেকে যাকে গম্ভীর মনে হচ্ছিল কাছে এসে তার চাঞ্চল্য অনুভব করতে পারল টিয়া। ছোট ছোট অনেক ঢেউ জলের বুকে। সেই ঢেউগুলোই দৌড়তে দৌড়তে এসে বড় হয়ে আছাড় খাচ্ছে তীরে। ধূসর পাহাড় এখন রঙ পাল্টে সবুজ। টিয়া ছুটে চলে গেল জলের ধারে। স্কার্টটা একটু তুলে জলে পা ডোবাল টিয়া।

শৈবাল বলল : 'ঠাণ্ডা লাগছে না তোমার?'

'ঠাণ্ডা লাগছে, ভাল লাগছে'—টিয়া বেশ অন্যমনস্ক।

'দি মোস্ট বিউটিফুল থিংস ইন দিস ওয়ার্লড আর ফ্রী।' শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপরেই থেবড়িয়ে বসে পড়েছে শৈবাল।

সূর্য রঙ পাল্টাছিল ধীরে ধীরে। আরেকটু পরেই রোদ্দুর ঠিকরে পড়বে এখানে। মুহূর্তগুলো হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে। শৈবাল অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করল : 'কি ভাবছ ?'

টিয়া উত্তর দিল না। কালকে রাত্তিরে অসম্পূর্ণ গানটা হঠাৎ করে আবার গেয়ে উঠল ও। এখন ওর গলাটা অনেক পরিষ্কার। স্বর নির্ভুলভাবে গিয়ে পর্দায় লাগছে। শৈবালের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল টিয়ার দিকে।

গান অনেকক্ষণ থেমে গেছে। সুর যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল এখন। কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না শৈবাল। হঠাৎ পেছন থেকে পরিষ্কার বাংলায় পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল : 'আপনারা বাঙালী ?'

চমকে দু'জনেই পেছন ফিরল। এক ভদ্রলোক যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ওরা কেউ জানে না। মুখ দেখে ওঁর বয়স অনুমান করা শক্ত। হাত ধরে একটি ফুটফুটে ছেলে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে। টিয়া ওর মুখের দিকে তাকাতেই বাচ্চাটি বেশ গম্ভীর মুখে বলল : 'ভাল। আবাব কর।'

টিয়া হেসে ফেলল। ভদ্রলোক বললেন · 'আজকে ভোরে আপনার তৃতীয় ফ্যান।'

ভদ্রলোক বললেন : 'হ্যাঁ। পুরো সপ্তাহের জন্যেই একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছি আমরা। আপনারা ?'

শৈবাল হাসল : 'আমরা অনধিকার প্রবেশ করেছি এখানে। খুব ভোরে এসে পৌঁছেছি এখানে। লেক দেখে লোভে পড়ে নেমে পড়লাম।'

টিয়া ছেলেটিকে কাছে ডাকল : 'আমার কাছে এস। তোমার নাম কি ?'

ছেলেটি বাবার হাত ছেড়ে এক পাও নড়ল না। আবার গম্ভীর মুখে বলল : গৌতম। কাছে গেলে আবার করবে ?'

টিয়াও কপট গাম্ভীর্য এনে বলল : 'আগে এস।'

এক পা দু পা করে গৌতম এগিয়ে এল টিয়ার কাছে। টিয়া হাত বাড়িয়ে গৌতমকে নিজের বুকে চেপে ধরল। অনেক আদর করল। আদরের চোটে অস্থির হয়ে গেল গৌতম। একটুও না হেসে টিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল : 'ধ্যুৎ, তুমিও ঠিক মার মতন ?'

টিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করল : 'কেন ?'

গৌতম বলল : 'মাও খালি চটকায়।'

ওর বাংলা শুনে টিয়া, শৈবাল দুজনেই বিস্মিত। শৈবাল প্রশ্ন করল : 'এদেশে থেকেও এত সুন্দর বাংলা বলে কি করে?'

ভদ্রলোক হাসলেন : 'আমরা যে শুধু বাংলায় কথা বলি ওর সঙ্গে। আসুন না আমাদের বাড়ি। একসঙ্গে চা খাওয়া যাক।'

টিয়া শৈবালের দিকে তাকাল। গৌতম টিয়ার থুতনিটা নেড়ে বলল : 'চল না। বাড়ি গিয়ে আবার করবে তো?'

টিয়া আবার আদর করল গৌতমকে। ভদ্রলোক হাসলেন : 'আপনার নতুন ফ্যান কিন্তু নাছোড়বান্দা।'

টিয়া গৌতমকে বলল : 'তুমি আমাকে ভালবাস?'

নির্দ্বিধায় ঘাড় নাড়ল গৌতম। টিয়া প্রশ্ন করল : 'কেন?'

গৌতম হাসল—নতুন সকালের মতো সেই হাসি টিয়ার বুকে বিঁধে গেল।

গৌতম বলল : 'তুমি যে গান কর।'

হাঁটতে হাঁটতে শৈবাল বলছিল : 'আশ্চর্য! ও গান এত ভালবাসে?'

ভদ্রলোক বললেন : 'ওর মা যে গান করে শোনায় দিনরাত্তির।'

গাড়িটাকে নীচে রেখে ওরা হেঁটে হেঁটেই ওপরের দিকে উঠল। বাতাসের সেই স্নিগ্ধ ভাবটা কেটে যাচ্ছে। রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

ওঁদের কটেজটি বেশ সুন্দর। বাইরে টানা লম্বা বারান্দা। গৌতম বাড়িতে এসেই ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভদ্রলোক ওঁদেরকে বারান্দায় বসিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিদায় নিলেন। বারান্দা থেকে লেক আর পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায়। শৈবাল প্রশ্ন করল : 'এখানে থাকবে না কি আজ?'

টিয়া চিন্তায় পড়ল। রবিবার দিন ওর অনেক কাজ। সারা সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত হতে হবে ওকে। এখানে থেকে যেতেই লোভ হচ্ছিল। শৈবাল হাসল : 'মন ঠিক করতে পারছ না?'

টিয়া হেসে ফেলল : 'না, আজকেই ফিরে যাই চল। সকালটা লেকের চারপাশে ঘুরে বিকেলের দিকে রওনা হয়ে গেলেই হবে।'

ভদ্রলোক বোধহয় চায়ের জল চাপিয়ে বেরিয়ে এলেন। একটু পরে ভদ্রমহিলা আর গৌতমও এল। চায়ের সঙ্গে আড্ডা জমে উঠল। শৈবালদের থাকার ইচ্ছে নেই জেনে ভদ্রলোক বললেন : 'তাহলে এক কাজ করুন। এখানেই মুখ হাত ধুয়ে ভাল একটা ব্রেকফ্রাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ুন। সকাল

দশটা নাগাদ প্রথম নৌকোটা ছাড়ে লেক জর্জের ওপর। এই ট্রিপটা খুব সুন্দর। টিয়া সঙ্কোচ কবছে দেখে ভদ্রলোক বললেন : 'আমার কথা না শুনলে কিন্তু আপনার ফ্যানকে ডেকে পাঠাব এক্ষুনি। দেখি তখন আপনি কি করে না বলেন।'

টিয়া হেসে ফেলল : 'এ যে রীতিমত ব্ল্যাকমেইল।'

শৈবাল বাথরুমে গেলে টিয়া ভদ্রমহিলাকে কিচেনে হেল্প করতে গেল।

ভদ্রমহিলা বললেন : 'আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন ?'

টিয়া একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। তারপর জড়তা কাটিয়ে বলল : 'আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। আমরা বন্ধু।'

ভদ্রমহিলা অবাক হলেন একটু। এবার ওঁর অপ্রস্তুত হবার পালা। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হল।

গৌতম বাঁচিয়ে দিল দুজনকেই। ও এসে বলল : 'জানো মা, এ মেয়েটা ঠিক তোমার মত গান করে।'

ভদ্রমহিলা বিস্মিতভাবে ছেলের দিকে তাকালেন—'তুই কি করে শুনলি ?'

গৌতম টিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল : লেকের ধারে বসে গাইছিল। আমি আর বাবা শুনেছি।' তারপর টিয়াকে বলল : 'তুমি আবার করবে ?'

টিয়া ওর গালটা টিপে দিয়ে বলল : 'তুমি বললে আমি হাজার বছর ধরে গান গাইতে পারি।'

'ধ্যুৎ।' গৌতমের চোখে মুখে অবিশ্বাস—'হাজার তো অনেক বেশি।'

'অনেক বেশি তুমি চাও না ?'

'হ্যাঁ চাই কিন্তু...' ছেলেটি ইতস্তত করল : 'ততদিনে আমি বুড়ো হয়ে আকাশে চলে যাব।'

টিয়া অবাক হয়ে গেল : 'কে বলল তুমি আকাশে চলে যাবে ?'

গৌতম খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল : 'হ্যাঁ, আমি জানি। দাদু যে বুড়ো হয়ে আকাশে চলে গেল।'

টিয়া কোন কথা বলতে পারল না। গৌতমকে বুকে জড়িয়ে ধরল আবার। ওর নাকে নাক ঘষে বলল : 'তুমি আমার বন্ধু হবে ?'

গৌতম মাথা নাড়ল। টিয়া ফিসফিস করে বলল : 'তাহলে আমি তোমাকে অনেক গান শোনাব।'

ভদ্রমহিলা এবার হাসলেন : 'আমরা ওর নাম দিয়েছি বক্তিয়ার খিলজি। এত বকবক করে দিন-রাত্তির।' তারপর ছেলেকে বললেন : 'এ্যাই, দেখ তো বিয়ে

করবি একে ?'

গৌতম অনেকক্ষণ টিয়াকে দেখে বলল : 'না।'

টিয়া অবাক হল : 'কেন ? আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ হয় না ?'

গৌতমকে চিন্তিত মনে হল। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে বলল : 'আচ্ছা করব।' বলেই ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। টিয়া ও মহিলা দু'জনেই সশব্দে হেসে উঠলেন।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে শৈবাল ও টিয়া বিদায় নিল। ভদ্রলোক ওঁর বাড়ির ঠিকানা দিলেন। অনেক করে আসতে বললেন ওদের। যাবার আগে বেশ মজার গল্প করছিলেন : 'জানেন মশাই, দেশে থাকতে অন্যরকম ছিল। কোথাও বেড়াতে যাবার আগে অনেক ভেবেচিন্তে যেতাম যাতে কোন বাঙালীর দেখা না পাই! দার্জিলিঙ কি কাশ্মীরে গিয়ে কোন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হলে মন খারাপ হয়ে যেত। মনে মনে খিঁচিয়ে উঠতাম—এখানেও বাঙালী। আর, এখানে যেন বাঙালী দেখলে মন হাঁকুপাকু করে। আসলে আমরা যেখানে থাকি সেখানে বাঙালী নেই বললেই চলে। বাংলা গান শুনে কিরকম নির্লজ্জের মতো আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম। আপনারা কিছু মনে করলেন কিনা ভেবেই দেখিনি।'

শৈবাল বাধা দিয়ে বলল : 'আমাদেরই লাভ হল বেশি। বেশ খানিকটা জুলুম করে গেলাম।'

টিয়া বলল : 'আমার তো সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে পাকাপাকি। গৌতম আমাকে বিয়ে করবে বলেছে।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। গৌতম লজ্জা পেল বোধহয়; মার শাড়িতে লুকোল। মুখ তুলল না আর। টিয়া অনেকবার ডাকল। তাও ওকে আদর করল না কিছুতেই।

গাড়িটা আবার উঠে পড়ল সেই পাহাড়ী রাস্তায়। এরই মধ্যে রাস্তায় অনেক লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। ঝকঝকে রোদ্দুর এখন বাইরে। ঘুমটা ভালমত হয়নি—টিয়ার চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে একটু। ঘুমচোখে আলোর দিকে তাকানো যায় না কিছুতেই। তবুও দৃশ্যপটের এই পরিবর্তন ওর ভাল লাগছিল। গত একবছরে নিউইয়র্ক শহরের বাইরে যায়নি ও। এখান থেকে মাত্র দুশো মাইল দূরে অথচ বাড়ির কথা ভুলেই গিয়েছে টিয়া।

সম্ভবত ভ্রমণকারীদের জন্যই লেক জর্জের ধার দিয়ে গড়ে উঠেছে অজস্র মোটেল, দোকান, বাজার। তার ফলে লেক জর্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হানি

হয়েছে যথেষ্ট। শুধু লেক জর্জ বলে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানগুলোই মানুষ আস্তে আস্তে ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত করে ফেলছে—শুধু মাত্র দুর্গম অঞ্চলগুলি ছাড়া। লেকের পাড় ঘেঁষে এমন গিজগিজ করছে দোকান আর বাড়ি যে লেকটাকে দেখাই যায় না মাঝে মাঝে। লেক জর্জ টাউনশিপের ভেতরে খানিকটা এলোমেলো ঘুরে শৈবাল আর টিয়া এসে পৌঁছল হারবারে। এখান থেকে নৌকোগুলো ছাড়ে। মাঝারি গোছের একটা মোটর বোট ভাড়া করল ওরা। গাইড ও ড্রাইভার ছাড়া আরো প্রায় আটজন যাত্রী এ নৌকোয়।

দশটা নাগাদ মোটরবোট ছাড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের দোকানপাট, মোটেল অদৃশ্য হয়ে নৌকো এসে পড়ল লেকের মাঝখানে। গাইড একটি আমেরিকান মেয়ে। লাল রঙের একটি লম্বা স্কার্ট পরে মেয়েটি বোটের রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বোটটা লেকের মাঝখ.নে এসে পড়ার পর ও বলতে শুরু করল লেক জর্জের ইতিহাস।

'যে পাহাড়ের কোলে লেক জর্জ শুয়ে সেটা হল অ্যাডিরনডাক পর্বতমালা। লম্বায় ত্রিশ মাইলের কাছাকাছি। গ্লেসিয়ার থেকে জন্ম নিয়ে পাহাড়-পর্বতের গা বেয়ে নেমে ঝরণার সঙ্গে মিশে জল এসে পড়েছে মাটিতে।

'শ্বেতাঙ্গ মানুষরা এখানে পৌঁছনোর অনেক আগে এই অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানদের ইরোকই জাতির যাতায়াত ছিল বলে জানা যায। ওরা এই লেকের পাড ঘেঁষে উত্তবে গিয়ে ওদেবই অন্যান্য জাতি অ্যালগনকিনস্ আর হুরনদের আক্রমণ করত প্রায়ই। তখন রেড ইন্ডিয়ানরাই ছিল আমেরিকার একমাত্র অধিবাসী। তাই বলে যে শান্তি ছিল তা নয—ওদের এক জাতি আরেক জাতির মধ্যে মারামারি লেগেই থাকত। ১৬৪৬ সালের বসন্তে প্রথম শ্বেতাঙ্গ ফাদার জগুয়েস ইংলন্ডের জর্জ টু'র নামে এই লেকের নামকরণ করেন লেক জর্জ।

'ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় লেক জর্জ অনেকগুলো যুদ্ধের সাক্ষী। প্রথম বিরাট যুদ্ধকে বলা হয় ব্যাটল অফ দি লেক জর্জ। এই যুদ্ধে বৃটিশ জেনারেল উইলিয়াম জনসন ফরাসী, ক্যানাডিয়ান ও রেড ইন্ডিয়ানদের সম্মিলিত সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দেন। লেক জর্জের শহরে এই যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হয়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। দুটো ফোর্ট তৈরী হয়েছিল এখানে—প্রথমটা হল ফোর্ট উইলিয়াম হেনরি যেটা তৈরী করেছিলেন জেনারেল জনসন আর দ্বিতীয়টি হল ফোর্ট জর্জ যেটা তৈরী করেছিলেন জেনারেল অ্যামহার্স্ট। ফোর্ট জর্জের ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে এখানে। তারপর আমেরিকান রেভল্যুশনের

সময় এথেন এ্যালেনের সৈন্যবাহিনী ফোর্ট টাইকনডেরোগা দখল করে নেয়।'
টিয়ার কানে সব কথা ঢুকছিল না। ও তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল অন্য কোথাও। শৈবাল বলল,'এই যে ভীড় দেখছ এখানে, সে শুধু তিন চারটে মাস। শীত এলেই দোকানপাট বন্ধ, লোকজন নেই। তখন কিন্তু লেক জর্জের অন্য রূপ।লেক জর্জের অনেকখানি জমে যায় শীতে—এক একটা জায়গায় পুরু বরফের আস্তরণ। আমি প্রথম এসেছিলাম শীতে। বরফের ওপর দিয়ে অনেকখানি হেঁটে আমরা লেক জর্জের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছিলাম।'
'ভাবাই যায় না, না ?' টিয়া অবাক হয়।
'খুব ভীড় নেই, তবে মানুষজন থাকে। বড় ছেলেমেয়েরা স্কেটিং করে লেকের ওপর। আর, সর্বাঙ্গে বরফের চাদর মুড়ে ঐ অ্যাডিরনডাক পাহাড় জবুথুব হয়ে বসে থাকে। আর, এই সাদা বরফের ওপর সূর্যের আলো পড়ে অদ্ভুত একটা রূপোলি রঙ ধরে আকাশে। ভাল করে চাওয়া যায় না এই আলোতে। মনে হয় যেন অন্ধ হয়ে যাব।'
'শীতকালে আমার সঙ্গে আরেকবার আসবে শৈবাল ? এই সবুজ জোয়ান পাহাড়গুলো সাদা থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে যাবে ভাবতেই পারি না!'
'কমিশন লাগবে।' শৈবাল সকৌতুকে বলল।
টিয়া গম্ভীর হয়ে গেল। শৈবালের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল,'আর কি কমিশন চাও ?' কথাটার ভেতর একটা অদ্ভুত খোঁচা ছিল। শৈবাল লজ্জা পেল বোধহয়। মুখের হাসিটা তবু বজায় রেখে বলল,'আমি কিন্তু কিছু ভেবে বলিনি কথাটা।'
টিয়া চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল,'জানি। আজকাল কথায় কথায় খুব রাগ হয়ে যায়। বোধহয় দিন দিন আমি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছি।'
'আমাদের সকলের ভেতরেই কিছু না কিছু ছেলেমানুষী আছে।'
'একটা খবর তোমাকে দিতে খুব ইচ্ছে করছে।'
'কি ?' শৈবালের চোখে মুখে আগ্রহ।
'আমি কলেজে ফেলোশিপ পেয়েছি একটা। কোর্স ওয়ার্কের পয়সাটা উঠে যাবে। তবে দুটো সন্ধ্যেয় ক্লাস নিতে হবে।'
'ফুল টাইম চাকরি চালিয়ে এত পড়াশুনো, পড়ানো—তোমার শরীর সহ্য করতে পারবে ?'
টিয়া অন্যমনস্ক হল,'করালেই হবে।'

শৈবাল হাসল 'আমারও একটা ছোট্ট খবর আছে।'
'কি ?'
আমি ছুটি নিয়েছি। কলকাতা যাব।'
'বিয়ে করবে ?'
শৈবাল অবাক চোখে তাকাল, 'কেন ?'
টিয়ার কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ, 'এই তো নিয়ম। আমেরিকায় ভারতীয় ছেলেরা চাকরি করে টাকা জমায়, গাড়ি কেনে, ভাল অ্যাপার্টমেন্ট নেয়, ঘর সাজায়, তাবপর হঠাৎ একদিন কলকাতায় পৌঁছে টোপর পবে মন্ত্রোচ্চারণ করে একটি বাঙালী মেয়েকে উদ্ধাব করে নিয়ে আসে।'
'তাবপর ?' শৈবালের গলায় কৌতুক।
'তারপব আব কি।' ঠোঁট উল্টোলো টিয়া—'দে লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার।'
'খোঁচাটা লাগল কিন্তু লাগল না', শৈবাল হাসল—'আমার ক্ষেত্রে কথাটা, খাটল না। বিয়ে করাব কথা ভাবিনি। তাছাড়া আমি সেই রাজকন্যেকে হন্যে হযে খুঁজে বেডাচ্ছি।'
'কি রকম ?' টিয়া হাসল।
'দুর্গম প্রাচীরের ওপারে যে রাজপ্রাসাদ তারই একটি ছোট্ট জানালা থেকে রাজকন্যে একবার চাষার ছেলেকে প্রশ্ন করেছিল, স্বাধীনতা কি ? চাষার ছেলে বলেছিল—ঐ যে দূরে পাহাড়গুলো দেখছ, ওগুলো পেরোলেই যে সবুজ সমতলভূমি সেটাই স্বাধীনতা। সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই চাষার ছেলেটা দেখেছে রাজকন্যা প্রাসাদের মোহ কাটিয়ে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সবুজ ঘাসের দিকে। রাজকন্যের জন্য তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।'
রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল টিয়ার মুখে—বোট থেকে ঝুঁকে পড়ে আপন মনে জলে হাত ডুবিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। একটা অদ্ভুত আনন্দে শরীরটা যেন থর থর করে কাঁপছে। সূর্যের আলোয় অ্যাডিরনডাক পাহাড়ের দঙ্গল যেন হাসছে। লেকের বুকের ঢেউগুলো একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে। এত কষ্ট হয় কেন ? বাইরের রোদ্দুরের বুকের ভেতর এখন রূপোলি রং।
'এই'—অনেকক্ষণ পর শৈবাল ডাকল।
টিয়া মুখ তুলে তাকাল। শৈবাল বলল, 'খোঁচা দেবে আর কখনো ?'
এখনো শৈবালের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছে না টিয়া। জলে হাত

ডুবিযে ও বলল, 'কাউকে আঘাত যে ইচ্ছে কবে দিই তা নয়। সবুজ উপত্যকা এখনো অনেক দূব। ততদিনে প্রাসাদের রাজকন্যে ভেঙ্গেচুবে কতখানি বদলাবে কে জানে। তাছাড়া বাজকন্যের চোখ যদি পাল্টে যায়?'

শৈবাল হাসল, 'যায় যাবে। এই গল্পটা তখন নতুন কবে ভাবা যাবে। এই অপেক্ষা কবাব মুহূর্তগুলোই একমাত্র সত্য। ভবিষ্যতেব ক্যাসেল তৈবী কবাব স্বপ্নে বর্তমান মুহূর্তগুলোকে সে হাবিয়ে ফেলতে বাজী নয়।'

টিয়া চুপ কবে গেল। ছোট ছোট ঢেউগুলোকে আঘাত কবে মোটববোট তীব্র গতিতে এগিযে চলেছে লেকের ওপর দিয়ে। মেয়েটি এখনো কথা বলে চলেছে। এমনিতে সুন্দব চেহাবা। তবে গালে আব ঠোঁটে বং না মাখলে মেযেটিকে বোধহয় আবো সুন্দব লাগত। গৌতমেব কথা মনে পড়ল ওব। টোপা কুলেব মতো গাল, টানা টানা চোখ,এরকম একটা ছেলে হলে বেশ হয়। তাদেব জন্য জীবনেব সমস্ত কষ্ট সহ্য করা যায়।

টিয়া মনে মনে বলল, 'তোমাকে আমি রোজ গান শোনাব। অনেক গান।'

শৈবাল এখন দূবেব পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে। পাহাড়েব একদিকে এখন ছাযা। লেক জর্জেব ওব দিযে পাখীব মতো ডানা মেলে একটা মানুষ উড়ে যাচ্ছে। স্কাই ড্রাইভাব। পাশের পাহাড় থেকে লাফিযে পড়েছে আকাশে। নদী পাব হযে অন্য পাবে কোথাও গিয়ে পৌঁছবে হয়ত। একা এত উঁচু দিয়ে উড়তে উড়তে নীচেব পৃথিবীটাকে কেমন দেখতে লাগে ভাবতে চেষ্টা করল শৈবাল।

শৈবালেব গাড়ি নিউইযর্ক শহরে ঢুকল প্রায় রাত দশটায। মনটা এখন খাবাপ লাগছে টিযাব। একটা অসহ্য ক্লান্তি সারা শবীরে। তবুও শৈবালকে ঘবে আসতে বলল টিযা 'একটু বসে যাও।' শৈবাল গাড়ি থেকে নামেনি। ও বলল 'একবাব তাপসেব কাছে যাই। সঞ্জয়দের বেস্টুবেন্টে স্ট্রাইক চলছে এখনো। একবাব ওদেব সঙ্গে দেখা কবে আসি।'

লবিটা ফাঁকা। দবজাটা খুলে এলিভেটরের সামনে গিযে দাঁড়াল টিযা। লবির দু'দেযালে আযনা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও অনেকগুলো টিয়াকে দেখতে পেল। প্রত্যেকটি টিযাই এখন ক্লান্ত। মুখ চোখে একটা কালচে ভাব। অ্যাপার্টমেন্টের দবজা খুলতে খুলতে টিয়া ভাবল এক গ্লাস জল খেয়ে ও শুয়ে পড়বে আজ। কাল সকালে উঠে কাজের কথা ভাবা যাবে আবার।

ঘবে ঢুকতেই একটা নিচ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করল টিয়াকে। হাত বাড়িযে লাইটটা জ্বালানোব আগেই কেউ একটা ওকে জড়িয়ে ধরে মুখটা চেপে ধরল। টিয়া কিছু বোঝার আগেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। লক করার আওয়াজ

হল একটা। হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে কে বা কারা ওকে নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে। ব্যাপারটা এত চকিতে ঘটল যে টিয়া চীৎকার করতেও ভুলে গেল।

ঘরের কোণার টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে উঠল হঠাৎ। যে হাতটা ওর মুখটা চেপে ধরেছিল সে পেছন থেকে ফিসফিস করে বলল—'ইফ য়্যু কেয়ার ফর ইয়োর লাইফ, ডোন্ট শাউট অ্যান্ড ডোন্ট ট্রাই টু প্লে এনি ফাকিং গেমস !' ওকে ধাক্কা দিয়ে সোফার ওপর ফেলে দিল লোকটা। দেয়ালের সঙ্গে মাথাটা ঠুকে গেল টিয়ার। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে গিয়েও হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরল ও।

যে লোকটা ধাক্কা দিল, তাকে এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেল টিয়া। মোটাসোটা মাঝ বয়সী লোক। মাথায় টাক। ঘরের অন্যপ্রান্তে দরজার সামনে আর একটা লোক। বয়স কম। ঢ্যাঙা রোগা। ওর হাতে একটা কিচেন নাইফ। দুজনেরই গায়ের বং হলদেটে। আব ইংরিজী উচ্চারণ শুনে এদেরকে স্প্যানিশ বলে মনে হয়।

ঢ্যাঙা রোগা লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসল। নীচের পাটির দুটো দাঁত নেই। অন্য সমস্ত দাঁতগুলোতে নোংরা হলদেটে ছোপ। লোকটা খ্যাক্ খ্যাক্ করে বলল : 'বি এ ডল। নো স্ক্রিমিং, নো হার্ট, ওকে।'

'এতক্ষণে ঘরটার দিকে ভাল করে তাকাল টিয়া। টি ভি-র স্ক্রীনটা ফেটে চৌচির। সারা কার্পেট জুড়ে কুচো কুচো কাচ। ওর ছোট্ট বই-এর শেল্ফটা উল্টোনো। বইগুলো মেঝেময় ছড়ানো। ক্লোজেট থেকে ওর সুটকেসটা কার্পেটের ওপর হাঁ কবে খোলা। সুটকেসের ভেতরে ওরই রাজ্যের জিনিস। ওপবে ছোট রেকর্ডার আর হেয়ার ড্রায়ারটা দেখা যাচ্ছে।

'এনি মানি ?' মোটা লোকটা নরম গলায় প্রশ্ন করল।

টিয়া কোন কথা বলতে পারল না। শুধু কোনরকমে ব্যাগটা দেখিয়ে দিল। ব্যাগটাকে এক ঝটকায় খুলে মেঝের ওপর উপুড় করল লোকটা। টাকাগুলো হাতে নিয়ে গুনল। তারপর মনে মনে বলল : 'তোয়েন্তি ওয়ান ! মাই গড, য়্যু আর চিপ।' টিয়া লক্ষ্য করল লোকটা 'ট' কে 'ত' ও 'ড' কে 'দ' করে উচ্চারণ করছে। ব্যাগের ভেতরে সোনার দুল ছিল এক জোড়া। একটা নিয়ে মোটা লোকটা ছুঁড়ে দিল সঙ্গীকে। অন্য লোকটি খুব মনোযোগে দুলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল : 'গোল্ড ?'

টিয়া মাথা নাড়ল, অর্থাৎ হ্যাঁ। ঢ্যাঙা লোকটা বিজ্ঞের মতো বলল : 'আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। এইট নাইনটি নাইন স্টাফ।' অবহেলা করে দুলটা ছুঁড়ে দিল লোকটা।

ঢ্যাঙা লোকটা এতক্ষণে এগিয়ে এল টিয়ার সামনে। ওকে আপাদমস্তক দেখে আবার বিশ্রীভাবে হাসল। পাশের লোকটার দিকে তাকয়ে বলল : 'মাই গড়, শি উড বি এ গুড ফাক্।' মোটা লোকটা খুব জোরে ঢেঁকুর তুলল একটা।

টিয়ার খুব শীত শীত করছে হঠাৎ—হাত পা যেন অবশ, চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা যেন দুলছে। ঢ্যাঙা লোকটা নতজানু হয়ে টিয়ার মুখোমুখি বসল। আর একজন তখন ফ্রীজ থেকে পাঁউরুটি আর চিজ বের করেছে কিছু। একটা পাউরুটির টুকরো কামড়ে লোকটা বলল : 'লেট্স হ্যাভ এ পার্তি!'

ছুরির ডগা দিয়ে টিযার সমস্ত শরীরে সুড়সুড়ি দিতে লাগল লোকটা। টিয়া কাঠের মত স্থির হয়ে বসে বইল। গলাটা যেন টিপে ধরেছে কেউ। মরীয়া হয়ে শুধু একটা শব্দ উচ্চাবণ করতে পাবল টিয়া : 'প্লীজ।'

ঢ্যাঙা লোকটার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অদ্ভুত হেসে মোটা লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল : 'টম! শি টোল্ড প্লীজ। শি ক্যান্ট ওয়েট এনিমোর। শি ওয়ান্টস টু হ্যাভ ইট রাইট নাও।' মোটা লোকটার মুখ ভর্তি একগাদা পাঁউরুটি আর চিজ। কাজেই ওর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

ছুরির ফলাটা এসে থামল কণ্ঠনালীর কাছে। ড্রেসটাকে টেনে ধরে ছুরির একটানে জামাটা মাঝখান থেকে কেটে দিল লোকটা। টিয়া দু হাত দিয়ে কাটা জামাটাকে জুড়বার চেষ্টা কবল। টিয়াব হাতে ছুরি দিয়ে একটা ছোট্ট খোঁচা মারল লোকটা। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেল টিয়ার।

ছুরিটা এখন বুক আর পেটের মাঝখানের নরম মাংসটায় খেলা করে বেড়াচ্ছে। টিয়ার বুকের ভেতর একটা কাঁপুনি শুরু হল। মুখ চোখ স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করল ও। ছুরিটা এখন ব্রেসিয়ারের তলায়। একটুও না নড়ে টিয়া আস্তে অথচ দৃঢ কণ্ঠে বলল : 'আই অ্যাম টেকিং ইট অফ্। গেট দি নাইফ আউট।'

থেমে গেল ছুরিটা। লোকটা ফোকলা দাঁতে হাসল আবার। টিয়া সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল কোনমতে। কাটা জামাটা ছেড়ে ফেলল। উপরে নীচে শুধু দুটো অন্তর্বাস এখন। গাল ভর্তি খাবার নিয়ে মোটা লোকটার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল। টিয়া আবার খুব দৃঢ় কণ্ঠে বলল : 'পুট দ্যাট নাইফ ডাউন। ইট টার্নস মি অফ।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো লোকটা ছুরিটা গুটিয়ে পকেটের মধ্যে ঢোকাল। টিয়া খুব অনুনয়ের সুরে বলল : 'উড য়্যু গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লীজ।' ঢ্যাঙা লোকটি ফ্রিজের দিকে এগোতেই টিয়া আড়চোখে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল

একবার। চকিতে নজরে পড়ল ব্যালকনির দরজাটা আলতো করে ভেজানো। লোক দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অস্পষ্টভাবে ঢ্যাঙা লোকটাকে বলতে শুনল টিয়া : 'লেট মি গো ফার্স্ট।'

জলটা খেতে খেতে টিয়া লোকদুটোর দিকে তাকাল। ওরা যেন শো দেখবে বলে হাঁ করে তাকিয়ে আছ এদিকে। বাঁচা অসম্ভব। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় টিয়া। ঢ্যাঙা লোকটা ধমকে উঠল : 'কাম অন, টেক ইট অফ্।' টিয়া একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আস্তে করে পেছন ফিরল। একটা হাতে পিঠে ব্রেসিয়ারের হুকটা টেনে খুলে ফেলল ও। পেছনে একটা 'উস' করে আওয়াজ হল। মোটা লোকটা জিভ চাটল বোধহয়। ব্যালকনির দরজাটা এখন টিয়ার সামনে। বাঁচুক না বাঁচুক টিয়া একবার শেষ চেষ্টা করবেই। পলকের মধ্যে টিয়া ছুটল ব্যালকনির দরজাটার দিকে। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলতেই বারান্দাব ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ও। দাঁতে দাঁত চিপে কে যেন বলে উঠল : 'দি ব্রড ইজ প্লেয়িং ফাকিং গেম।' বোধহয় ঢ্যাঙা লোকটা।

পরক্ষণেই ওর চুলটা টেনে ধরল কেউ। ওর নগ্ন বুকের ওপর থাবার মতো বসে গেল একটা হাত। কে যেন হেঁচডাতে হেঁচড়াতে ওকে টেনে নিয়ে চলল পেছনে। টিয়ার মুখ থেকে গোঙানীর মত আওয়াজ বেরোচ্ছিল একটা। মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা। সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল মুহূর্তে। চোখটা ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। একরাশ থোকা থোকা অন্ধকার ঘিরে ফেলল টিয়াকে। অন্ধকারের কোন মুখ নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। কাউকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় টিয়া শেষবারের মতো হাত বাড়াল। একটা বিরাট কালো গহ্বর মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে। তারপর, টিয়া আর জানে না।

লক্ষ লক্ষ চোখ ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। টিয়া এখন তাকিয়ে। ওপরের প্রত্যেকটি চোখ জ্বলছিল। চোখ বুজে টিয়া আবার তাকাল। মনে হল বিরাট অন্ধকারে অজস্র রূপোলি রঙের ফুল। ওরা টিয়াকে দেখে হাসছে। ভুল। ওগুলো ফুলও নয়, চোখও নয়, ওগুলো আকাশের তারা। চাঁদটাকে অসম্ভব কুৎসিত মনে হল ওর। ফ্যাকাশে সাদা রঙের থুত্থুড়ে বুড়ি যেন দলবল নিয়ে টিয়াকে দেখতে লেগেছে। জ্ঞান ফিরেছে একটু আগে। মাথায়, বুকে, কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা। টিয়ার পাটা রেলিং-এর দিকে,মাথাটা ব্যালকনির দরজায়। হাত দিয়ে নিজের নগ্ন বুক দুটোকে ঢাকল টিয়া। ভোর রাত্তিরের নিঃস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দমকলের গাড়ি গেল একটা। টিয়া চমকে উঠল।

নিজের শরীরটাকে টানতে কখনো এত কষ্ট হয়নি আগে। টলতে টলতে

ঘরের ভেতরে এসে ব্যালকনির দরজাটা বন্ধ করল নিঃশব্দে। নীচের অর্ন্তবাসটা অটুট রয়েছে এখনো। বুভুক্ষ জন্তুদুটো খাবার ফেলে রেখেই পালিয়েছে। তাও ওদের স্পর্শ যেন সারা শরীরে লেগে আছে ওর। গা ঘিনঘিন করছে। চুলের গোড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা। কাটা জামাটা এখনো মেঝের ওপর। ঢিলেঢোলা একটা জামা পড়ল টিয়া। ঘরের দরজাটা লাগিয়ে শক্তহাতে চেন লকটা বন্ধ করল ও। জানালার পর্দাগুলো ভালভাবে বন্ধ করল। ক্লান্ত পায়ে বিছানায় গিয়ে শুল ও।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর মা-বাবার ছবিটা ফ্রেমে বাঁধানো। এই দুটো মানুষের জন্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে লোভ হয়। টিয়া এই মুহূর্তে ভালবাসার কথা ভাবল। পাশাপাশি আরেকটা মানুষের মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। যত কষ্টই হোক, নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে এদের। নিজের পায়ে শক্তভাবে দাঁড়াতে হবে। নিজের শরীরটাকে আদর করছিল টিয়া। তারপর একটা বাচ্চা মেয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে ও ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরে এখন ভোর হচ্ছে। লেক জর্জে দেখা লাল সূর্যটা লাফিয়ে উঠেছে আকাশে। আজকে টিয়া সেটা দেখতে পেল না।

চেয়ারটাকে জানালার দিকে ঘুরিয়ে বাইরে বৃষ্টি দেখছিল শৈবাল। ছাদ থেকে কার্নিশের অনেকখানি শূন্যে ঝুলে থাকায় বৃষ্টির জল সোজাসুজি জানালায় এসে পড়ে না। কিন্তু বৃষ্টি ছিটকে ছড়িয়ে অসংখ্য জলবিন্দু জমা হয়েছে কাচে। ছোট ছোট জলবিন্দু এ ওর গায়ে ঢলে বড় হয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচে। উইপিং উইলো গাছের একটা বেশ বড়সড় ডাল জলের ভারে নুয়ে উঁকি মারছে ডান দিকের কোণায়। পাতাগুলো জলে ভিজছে, হাওয়ায় দুলতে দুলতে ওরা কখনো বা জানালায় মাথা ঠুকছে। জলে ভিজে সবুজ রঙটা কি রকম অদ্ভুত দেখায়। মনে হয় এক্ষুনি বুঝি সবুজ গলে গলে পড়বে পাতা বেয়ে। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এখন অজস্র নীল। মাটিতে, জানালার কাচে শৈবালের মুখে রোদ্দুর আর ছায়ার লুকোচুরি। এক দঙ্গল মেঘ পালাতেই আলো দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই আরেক দঙ্গল বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলছে সূর্যকে। এক দঙ্গল কালো গর্ভবতী মেঘ আকাশে এলোচুল উড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণে। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টিটা দক্ষিণে চলে যাবে। কাচের গায়ে রোদ্দুর লেগে জলবিন্দুগুলোতে রামধনু রঙ ধরবে তখন। তারপর, এরা বাতাসে মিশে যাবে এক সময়। শুধু ধুলো আর কাদার ওপরে অসংখ্য দাগ লেগে থাকবে কাচে। তবুও, এই মুহূর্তে বৃষ্টি আর রোদ্দুর একসঙ্গে দেখতে ভাল লাগছে শৈবালের। আজকের দিনটা অন্যান্য

দিনের থেকে অনেক আলাদা। আজ চোখ যা দেখছে মন তাকেই বলছে সুন্দর।

'মে আই হ্যাভ দি হোয়াইট এলিফ্যান্ট, প্লীজ ?'

দরজার বাইরে জন প্রাইসকে দেখে মুচকি হাসল শৈবাল : 'হোয়াই এলিফ্যান্ট ? ডোন্ট য়্যু ওয়ান্ট এনিথিং এল্স ফ্রম ইন্ডিয়ান্স ?'

'ইয়েস। এ টার্বান।'

সেই কবে হলিউডে মাথায় পাগড়ি-পড়া মানুষ, মহারাজা এবং যাদুকরদের দেখানো শুরু হয়েছিল—সেই থেকে ভারতীয় দেখলেই পাগড়ি আর হাতির কথা মনে পড়ে এদের। এ ছাড়া দাবিদ্র্য, তাজমহল আর যোগব্যায়াম—এ তিনটে যোগ করলেই মধ্যবিত্ত আমেরিকানদের কাছে ভারতবর্ষের ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথম প্রথম শৈবাল লেকচার দিত—বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করত। ইদানীংকালে এসব ব্যাপারে কথা বাড়াতে ওর ইচ্ছে করে না। সত্যিই তো দারিদ্র্য ছাড়া ভারতবর্ষের আর কি বিস্ময়কর ঠেকতে পারে এদের কাছে। কাঁহাতক আর ঐতিহ্য বলে চেঁচানো যায়। শৈবাল হেসে বলল : 'আই অলওয়েজ নিউ—য়্যু আর হ্যাপি উইথ ভেবি লিটল্।'

জন ভেতবে ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে আকাশটা দেখল। ডানদিকে তাকিয়ে বলল : 'দিস ট্রি উড বি গন নেক্সট উইক।'

শৈবাল জানে। উইপিং উইলো গাছটাকে কেটে ফেলা হবে। শিকড়গুলো বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ফুটপাতে ফাটল ধরেছে। সেই ফাটলে অজস্র ছোট ছোট আগাছা জন্মেছে। আগামী সপ্তাহে এতক্ষণ অবশ্য শৈবাল কলকাতায়। শৈবাল অন্যমনস্কভাবে বলল . 'আই উইল ফরগেট দি ট্রি বাই দেন।'

জন প্রাইস ঘুরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল : 'য়্যু আব এ লাকি সান অফ্ এ বিচ। য়্যু গট অল অ্যাট ওয়ান্স। প্রোমোশন, ভেকেশন, এ ট্রিপ টু হোমল্যাণ্ড, উইমেন, ওয়াইন,'—একটু থেমে জন প্রশ্ন করল শৈবালকে—'ডু য়্যু হ্যাভ গুড ওয়াইন ইন ইণ্ডিয়া ?'

'নো। উই ওনলি বিলিভ ইন স্ট্রং কান্ট্রি লিকারস। মা কালি। ড্রিংক অফ দি গডেস কালি।' শৈবাল গম্ভীরমুখে বলল।

জনের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল : 'নেভার হার্ড ইট। হোয়াট ইজ ইট লাইক ?'

'ক্যান্ট কমপেয়ার। আই গেস ইট ইউ বি সামথিং লাইক যেসাস স্কচ, ইফ দেয়ার ওয়াজ এনি। ডিভাইন।'

দুজনে প্রায় একসঙ্গে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে জন বলল : 'ইন্ডিয়ান

উইমেন আর বিউটিফুল। আই উড লাইক টু গো টু বেড উইথ অ্যান ইন্ডিয়ান গার্ল ?' দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর—'বাট, দে আর সো টাফ টু গেট।'

ভারতীয় নারীর আদর্শ নিয়ে লেকচার দেবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল শৈবাল। তারপর হেসে বলল : 'ডোন্ট ওয়েট টু লং, ট্রাই হার্ডার। য়্যু উইল গেট ওল্ড প্রীটি সুন।'

'সিক্সটি থ্রী ইজ নট ওল্ড। আই স্মোক ফাইভ সিগারস, ওয়ার্ক টেন আওয়ারস, ড্রিংক টু শটস অ্যান্ড গেট লেড টোয়াইস এ নাইট। আই অ্যাম গোয়িং প্রীটি স্ট্রং। গেট মি অ্যান ইন্ডিয়ান গার্ল, উইল য়্যু ? মাই গ্র্যান্ডসন ডেটস হিণ্ডু গার্ল। মাই গড, শি ইজ সো বিউটিফুল', বুকপকেট থেকে একটা বেঁটে মোটা চুরুট বের করে ধরাল জন।

দাদু ও নাতির ভারতীয় নারীতে সমান আসক্তি দেখে হেসে ফেলল শৈবাল : 'হোয়াই ডোন্ট য়্যু পুট অ্যান অ্যাড ইন ইন্ডিয়ান নিউজপেপার।' শৈবাল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জন বলে উঠল : 'লেটস গো আউট ফর এ কাপল অফ ড্রিংকস টু নাইট, বেথ অ্যান্ড আই হ্যাভ প্লান্ড টু গিভ য়্যু এ ওয়ার্ম সেন্ড-অফ।'

মনে মনে প্রমাদ গুণল শৈবাল। আজ সন্ধ্যেবেলায় অনেক কাজ। পরশু অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যের সময় ফ্লাইট। আজ সন্ধ্যেবেলা তাপসদের সঙ্গে দেখা করার কথা। জিনিসপত্র কিছুই কেনা হয়নি এখনো। তবুও, জনকে না বললে খারাপ দেখাবে বলে রাজী হয়ে গেল শৈবাল : 'আই ক্যান অ্যাফর্ড ওনলি কাপল অফ আওয়ারস! আই হ্যাভ টু ডু এ লট অফ শপিং।'

'হাউ লং হ্যাভ য়্যু বিন হিয়ার ?'

'ক্লোজ টু সেভেন ইয়ারস।'

'ইজ দিস দি ফার্স্ট টাইম সিন্স ?'

'ইয়েস।'

'হাউ ডু য়্যু ফিল ?'

'আই এ্যাম সো এক্সাইটেড দ্যাট আই ডোন্ট ফিল এনিথিং।' শৈবাল সত্যি কথাই বলল।

'আই ক্যান ইমাজিন। ওয়েল, আই উইল লিভ য়্যু উইথ ইয়োর ড্রিম্‌স্। উই উইল টেক অফ অ্যাট ফাইভ।'

জন চলে যাবার পরও শৈবাল সাতপাঁচ ভাবছিল। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা

ওর মনকে অবশ করে ফেলছে ক্রমশ। যে কলকাতাকে পেছনে ফেলে সাত বছর আগে নিউইয়র্কে পাড়ি দিয়েছিল ও, যে শহরের কথা ও একদিনের জন্যও ভুলতে পারেনি, সেখানে যাবার দিন যতই এগিয়ে আসছে শৈবালের মানসিক অস্থিরতাও চরমে পৌঁছচ্ছে। অস্থিরতার একটা কারণও অবশ্য আছে। কলকাতায় গোটা দুয়েক ইন্টারভিউ জোগাড় করেছে ও। অনেকদিন থেকেই মনে মনে ভাবতে শুরু করেছে শৈবাল যে ও কলকাতা ফিরে যাবে। মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপনের কোন প্রতিশ্রুতি পেলে ও ওখানেই থেকে যাবে এরকম একটা ইচ্ছে নিয়েই ও চাকরি-বাকরির জন্য চেষ্টা-চরিত্র শুরু করেছিল। শৈবালের চাহিদা বেশি নয়। অনেকের কাছেই শুনেছে যে আমেরিকান অভিজ্ঞতার দৌলতে মন্দ-নয় গোছের একটা চাকরি জোটাও খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে দুটো ব্যাপারে পিছুটান অনুভব করছে শৈবাল। এক হল টিয়া। বলতে গেলে এই মেয়েটা আর কলকাতা এখন দুই সতীন। এই মেয়েকে ছেড়ে যাবার কথা শৈবাল ভাবতে পারে না। কখন কিভাবে যে টিয়া ওর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে ভেবে দেখার সময় পায়নি ও। টিয়াকে অনেক কথা বলার আছে ওর। কিন্তু সময় আসেনি। শৈবালও চায় টিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াক। ততদিন শৈবাল ওর জন্য অপেক্ষা করবে। দু'দিন আগে চাকরিতে ওর প্রমোশনটাও ওকে মানসিকভাবে দুর্বল করেছে খানিকটা। সাত বছর আগে যে অনিশ্চয়তার মধ্যে নিউইয়র্কে জীবন শুরু করেছিল শৈবাল, আজ সে অনিশ্চয়তা নেই। অর্থও যেমন এসেছে, স্বীকৃতিও। অফিসে বা অন্যান্য জায়গায় এ দেশীয় মানুষদের ব্যবহারে মনে হয় ওরা যেন শৈবালকে মেনে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। নিজেদের একজন বলে হয়ত ওরা বিশ্বাস করে না কিন্তু মৌখিক ব্যবহারে একটা সমর্থনের আভাস পায় শৈবাল। নিজের অজান্তেই গত সাত বছরে শৈবাল ভেঙ্গেচুরে অনেক বদলেছে। শৈবাল এখন দুটো মানুষ। একটা মানুষ এখনো কলকাতার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। অন্য মানুষটা আমেরিকাকে মেনে নিচ্ছে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। একটা মানুষ ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছে—অন্যজন বলছে : 'কেন ফিরে যাবে ? দেশ তোমাকে কি দিয়েছে যা আমেরিকা দেয় নি ?' একটা মানুষ হাঁপাচ্ছে, বলছে—'আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম চাই,—ছুটতে ভাল লাগে না'—অন্য মানুষটা খিলখিল করে হাসছে—'পৃথিবী দৌড়বে আর তুমি থেমে যাবে এটা অবাস্তব। পকেট গরম থাকলে মুঠো মুঠো বিশ্রাম কিনতে পারবে জীবনে কিন্তু থেমে গিয়ে বিশ্রাম মানে সারেণ্ডার, মৃত্যু।'

এই দুটো মানুষ অবিরাম কলহ করে শৈবালের মনে। মাঝে মাঝে শৈবালের মনে হয় সত্যিই তো, নতুন দেশ তো অনেক কিছু দিয়েছে—কি হবে ফিরে গিয়ে—কিন্তু পরক্ষণেই ছটফটিয়ে ওঠে ও—সেই মাটি, সেই মানুষজন, সেই কফি হাউস, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। ওখানকার জীবনের ফেলে আসা দুঃখ-কষ্ট,গাদাগাদি করে অভাব অনটনের মধ্যে বেঁচে থাকা—সব কিছু সত্ত্বেও মাটির একটা তীব্র টান অনুভব করে শৈবাল। নতুন দেশে প্রাচুর্যই স্বাভাবিক, তাই প্রাচুর্যে তৃপ্তি নেই। তৃপ্তির খোঁজে তাই এত অস্থিরতা—মরিউয়ানা, হিরোইন ইনজেকশন, যৌনবিকৃতি, শহরে শহরে খুন। প্রাচুর্যের খোলসে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। খোলস ছেড়ে বেরোনোর জন্য তাই বোধহয় এত বিকার। এসব শৈবাল বুঝতে পারে। অথচ নতুন দেশের প্রতি একটা দুর্বলতা ও মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না কিছুতেই।

শৈবালকে মন ঠিক করতেই হবে যত শিগগিরি সম্ভব। সময়টা বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এবারেব কলকাতা যাওযাটা শুধু সাত বছর পর বেড়াতে যাওয়া নয়, নিজেব জীবন সম্পর্কে একটা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে হবে ওকে।

এমনিতেই অনেক বছর চলে গেল দেখতে দেখতে। এর মধ্যে একবারও কলকাতা যায়নি খানিকটা ইচ্ছে করেই। অচেতন মনে কোথাও হয়ত একট জেদ ওকে আটকে রেখেছিল এখানে। নতুন দেশেব বাসিন্দাদের কাছ থেকে একটা সমর্থন পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠছিল ক্রমশ। চাকরির ক্ষেত্রে মোটামুটি খানিকটা সুনাম অর্জন করেছে শৈবাল। আগে নিজেকে যেমন গুটিযে রাখত অনেকখানি আজকাল পরিচিত আমেরিকান মানুষজনের সঙ্গ মন্দ লাগে না ওর। যে সময় এখানকার জীবন আস্তে আস্তে গা-সওয়া হতে শুরু করেছে—তখনই ওর মনে হয়েছে দেশে যাওয়া প্রয়োজন। এব আগেও মা প্রত্যেক চিঠিতেই প্রায় লিখেছে একবার অন্তত ঘুরে যেতে। শৈবাল যাযনি। তীব্র ইচ্ছেটাকে দমন করে অপেক্ষা করেছিল শৈবাল। হয়ত বা সিঁড়ির কোন নির্দিষ্ট ধাপে পৌঁছতে চেয়েছিল ও। ওর চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতিটুকু নিজের মনেও প্রতিফলিত হয়। শৈবাল বুঝতে পারে না মন যা চায়—ও সেটা সব সময় করে না কেন। হয়ত বা তীব্রভাবে শৈবাল কিছু চায় না কোনদিন। তাই এই পিছুটান। প্রত্যেক মুহূর্তে যে মানুষ দেশেব কথা ভেবেছে—সে কি করে সাত বছরের মধ্যে একবারও যায়নি ? এ প্রশ্নটা ওর নিজের কাছেও বারবার ফিরে আসে ইদানীং। বড্ড বিব্রতবোধ করে শৈবাল। কলকাতা গিয়ে নিজের সঙ্গে

একটা বোঝাপড়া করতে চায় ও। এ বোঝাপড়াটা হয়ত এত সহজ নয়। কিন্তু এড়িয়ে যাবার সময় নেই আর। এমনিতেই অনেকটা সময় পেরিয়েছে।

দাদুও দেরী করেছিলেন। কলকাতায় আসবেন কি আসবেন না এই দোটানার মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় পাবনায় থেকে গিয়েছিলেন। জিতেন্দ্রজিৎ। ওঁর ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রযোজনে অনেক আগেই ওঁর কলকাতায় চলে আসা উচিত ছিল হয়ত। খালি হাতেই বুকভর্তি হাহাকার নিয়ে আসতে হল শেষ পর্যন্ত। পাবনা শহরের দুর্দান্ত উকিল, চুয়াত্তর বছর বয়সে কলকাতায় এসে আলিপুর কোর্টের উঠোনে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরলেন অর্থ রোজগারের আশায়। বাবার ওপর নির্ভরশীল হতে চাননি কোনদিন। কোনরকমে দু-চারটে খদ্দের পেতেন কখনো-সখনো। নিজের ছেলেমেয়ের কাছেও হাত পাতার কথা ভাবতে পারেননি কোনদিন। যেটুকু উপার্জন করতেন, নাতি নাতনীর জন্য খরচা করতেন আর বুড়োবুড়ির হাতখরচা চালাতেন। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস ছাড়া উঠতেন না। বাবা খুব রাগারাগি করতেন সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠাব জন্য। বলতেন : 'বয়স হয়েছে। শুধু শুধু শরীরের ওপর অত্যাচার করেন কেন ?' জিতেন্দ্রজিৎ বাবার কথায় আমল দিতেন না—হেসে বলতেন : 'সেকেণ্ড ক্লাস মন্দ কিসে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ 'দাদু' ডাকে, সিট ছাইড়্যা দ্যায়. পয়সাও কম। শুধু শুধু পয়সা বেশি দিয়া ক্লাস দেখাইয়া লাভ কি।' এটা জমিদারী অহংকার নয়, মা বলতেন বাঙালে গোঁ। দাদুর ভেতরকার যন্ত্রণাটা শৈবাল খানিকটা অনুভব করতে পারত। মা-বাবাও বুঝতেন। কিন্তু কিছু করার ছিল না। যত জোর ছিল নাতি-নাতনীর ওপর। সন্তু আর শৈবালকে প্রায়ই বলতেন : 'কালো গাড়ি চাপায়া ইলেকট্রিকে পোড়ায়ো না, কাঁধে করে নিয়া যাব্যা।' শুধু কাঁধে চাপা ছাড়া আর কারো ওপর কোন জুলুম করেননি। এমনকি শেষ দিনও। কোর্টে গিয়েছেন সকালে। সময়মত ফিরেছেন। প্রাত্যহিক অভ্যাসে সন্ধ্যাহ্নিক করে জলখাবার খেয়ে নিজের বিছানায় শুয়েছেন। বাড়িতে সেদিন অনেক লোক। এমনিতেই কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না। কিছুক্ষণ পর দাদি হাউ-মাউ করে এসে মাকে ডেকেছেন—'ও অনিমা, একবার গোপালকে ডাক। উনি সাড়া দেন না।' কলকাতায় আগে ডাক্তার ডাকার নিয়ম। তাড়াহুড়োতে ভাল ডাক্তার পাওয়া গেল না। মাঝারী গোছের ডাক্তার এলো বাড়িতে। হাবভাব দেখে বললো—সেরিব্রাল। অক্সিজেন ট্যাংক এল। দুটো নল পুরে দেওয়া হল নাকে। শৈবাল একমনে দাদুকে দেখছিল। নাড়ি ধরে বসেছিলেন বাবা। ডাক্তারবাবু

বললেন : 'প্রার্থনা করুন, উনি যেন চলে যান। ফিরে এলেও বোধশক্তিরহিত হয়ে থাকবেন হয়ত বাকী জীবন।' তবু মানুষ মৃত্যুকামনা করতে পারে না। সন্তু মেসোমশায়ের গাড়ি করে বড় ডাক্তারের কাছে গেল—যদি হাসপাতালে ভর্তির কোন ব্যবস্থা করা যায়। ওরা ফেরার আগেই দাদু চলে গেলেন। এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে শৈবালের—নাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে জেনেও বাবা দাদুর মুখের কাছে মুখ এনে চীৎকার করে ডাকলেন—'বাবা।' একবার যেন ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল দাদুর। একটু যেন চোখ মেললেন। কয়েক মুহূর্ত। চোখটা একটুখানি খোলাই রইল। ভুরুটা শান্ত হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু নলটা সরিয়ে নিলেন। চোখের পাতাদুটো বন্ধ করে দিলেন হাত দিয়ে। লোকজনের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দাদি পাগলের মতো দাদুকে আদর করছিলেন আর আবোল-তাবোল বকছিলেন। দাদুর কথামতো আরো অনেকের সঙ্গে শৈবাল ও সন্তু কাঁধে চাপিয়ে দাদুকে নিয়ে গিয়েছিল শ্মশানে। মারা যাবার কিছুক্ষণ পরই দাদুর চেহারা অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেল। সেই আগেকার চেহারা। কয়েক বছর পর আবার শৈবালকে শ্মশানে যেতে হয়েছিল। এবার সন্তুকে নিয়ে। সে সব অনেক পরের ঘটনা। তার মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেল। জিতেন্দ্রজিৎ মারা যাবার সময় দুজনেই এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিল। শৈবাল বি· ই· কলেজে, সন্তু যাদবপুরে। দুজনেরই তখন থার্ড ইয়ার। দাদুর বয়স হয়েছিল—দাদু যেতেনই। তবু শৈবালের মনে হত দাদু আরো আগে কলকাতায় এলে কিংবা একেবারে না এলে আরো কয়েক বছর বেঁচে যেতেন হয়ত। আসলে দাদুর বাঁচতে ইচ্ছে করছিল না আর। কলকাতার জীবনে দাদু বেঁচে থাকার কষ্টটাই অনুভব করছিলেন শুধু।

টিয়াকে অফিসে ফোন করল শৈবাল। ফোনটা টিয়াই ধরল : 'হ্যালো।'

'কি ভাগ্যি, মহারাণীকে একবারেই পাওয়া গেছে। আজ দিনটা নিশ্চয়ই ভাল যাবে।'

'তাই ?' টিয়া একটু চুপ করে বলল . 'তোমার ওপব হিংসে হচ্ছে জানো তো ?'

'তোমার কথাটা বাঁধিয়ে রাখলে হত। আমার মতন অপদার্থর ওপর কারো হিংসে হয় এটা প্রথম জানলাম। কি করছ এখন ?' শৈবালের গলায় কৌতূহল।

'কি আর করব। কাজ। আমাদের মতো নীচুতলার মানুষদের খেটে খেতে হয়। আমরা তা আর ম্যানেজার নই—আর আমাদের প্রমোশনও হয় না অত তাড়াতাড়ি।' খোঁচা নয়, নেহাতই কৌতুক মেশানো গলায় টিয়া কথা বলছে।

'তুমি কিছুতেই আমাকে খ্যাপাতে পারবে না আজ। আমি রাগব না ঠিক করেছি।'

'আমার এত ঘুম পাচ্ছে, জান। কাল প্রায় দুটো পর্যন্ত পড়াশুনো করেছি। তোমার ফ্লাইট কখন?'

'শনিবার আটটা নাগাদ।'

'জিনিসপত্র গোছানো হয়েছে?'

'কেনাই হয়নি। গোছানো অনেক পরের ব্যাপাব। আমাকে গোছানোর জন্য একটা লোক দরকার। বেশ মাঝে মাঝে এসে গুছিয়ে দিয়ে যাবে।'

'ঠিকে ঝিদের মতন? কত মাইনে দেবে বল? আমার বেশ টাকার টানাটানি যাচ্ছে। ভাল করে লোভ দেখালে চলেও যেতে পারি।'

'ভালবাসা দিতে পারি।' শৈবাল হাসল।

'ভালবাসা এই মুহূর্তে আমার কাছে অনেক জমে আছে। একা ডিভোর্সড মেয়ে তো। চারপাশে কত লোক যে ভালবাসাব ডালি সাজিয়ে বসে আছে—তুমি যদি জানতে। কিন্তু ভালবাসা দিয়ে টিউশন দেওয়া যায় না, বাজার করা যায় না। ভালবাসা শুধু জ্বলে, পুড়ে ছাই হয়।'

শৈবাল চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। টিয়া কথা বলল আবার: 'রাগ করলে?'

'না, এবার আমাব হিংসে হচ্ছে। বেশ বোকাবোকা লাগছে। তোমার কাছে কথায় হেরে যেতে আমার খুব ভাল লাগে আজকাল। এক সময় আমি বলতুম, তুমি শুনতে। আজকাল তুমি যখন বল, আমি উত্তর দিতে পারি না।'

'উত্তর দিতে হবে না। কখন রওনা হবে, পরশু? আমি দুপুর বেলায় যাব।'

'আমি তুলে নিয়ে আসতে পারি।'

'না। আমি সাবওয়েতে চলে যাব। সকালবেলায় একটা কাজ আছে। ওটা সেরে সোজা তোমার ওখানে হাজির হবো। তুমি বাড়িতে থাকবে তো?'

'আমিও সকালবেলায় বেরোব। আশা করছি দুটোর মধ্যে ফিরব।'

'তখন দেখা হবে তাহলে। আমার যা ঘুম পাচ্ছে, কি করে সন্ধ্যেবেলায় ক্লাস নেব জানি না। বাড়ি ফিরতে দশটা হবে ভাবতেই চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'আজকের দিনটা ক্লাস কেটে দাও।'

'ওটা সোজা রাস্তা। আমি এক্ষুনি কফি খাব এক কাপ। শনিবার দেখা হবে তাহলে। ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

টিয়া ফোন ছেড়ে দিল। শৈবাল চুপচাপ বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। অনেকদিন আগে যে বিবাহিতা মেয়েটির সঙ্গে শৈবালের আলাপ হয়েছিল আজকের টিয়ার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। আজকেব টিয়া নতুন মানুষ। টিয়া কোনকালেই আর পাঁচজন বাঙালী মেয়ের মতো নয়। আগেও ছিল না, এখন তো নয়ই। টিয়ার এই পরিবর্তন শৈবালের ভাল লাগছে—নিজে দুর্বলও বোধ করছে। ওর যেন হঠাৎ মনে হচ্ছে টিয়া অনেক পেছন থেকে এসে ওকে ছুঁয়ে ফেলছে। শৈবাল তাল বাখতে না পারলে ওকে ছেড়ে টিয়া হয়ত অনেক দূরে চলে যাবে। তখন শৈবাল আব ওকে ছুঁতে পারবে না কোনদিন। অথচ, একটা অসহ্য ক্লান্তি শৈবালকে ঘিবে ধরছে ক্রমশ। ওর খালি মনে হচ্ছে, এই জীবন। এখানেই থেমে যাওয়া যাক। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেটাই হোক জীবনের লক্ষ্য। টিয়াকে সব কিছু কথা খুলে বলতে ইচ্ছে করে। ভয় হয়, টিয়া যদি থামতে না চায়। তবু শৈবালকে বলতেই হবে। মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে একদিন। ক্রমশ বাংলা উপন্যাসেব স্বপ্নসর্বস্ব মধ্যবিত্ত নায়কে পরিণত হয়ে যাচ্ছে ও। অনেকদিন ধরে এই ভাবনাটা শৈবালকে ঘিবে বসে আছে।

মোটাসোটা বেশ কিছু ফাইল হাতে বেথ ঘবেব ভেতরে ঢুকল। শৈবাল মুখ তুলে হাসল : 'হোয়াট ক্যান আই ডু য়্যু ফর ডার্লিং—নিজের কানেই 'ডার্লিং' শব্দটা অদ্ভুত শোনাল ওর।

বেথ চোখ বড় করে হাসল। মৃদু স্বরে বলল : 'ফার্ষ্ট টাইম।'

শৈবাল গম্ভীর হয়ে বলল : 'দেয়ার ইজ এ ফার্ষ্ট টাইম ফর এভরিথিং।'

বেথ মাথা নাড়ল : 'সাউণ্ডেড সো নাইস।'

'হোয়াট ?'

'ডার্লিং। ইট ওয়াজ এ রিয়াল সারপ্রাইজ। স্পেশালি, হোয়েন ইট কামস ফ্রম য়্যু।'

শৈবাল উত্তর দিল না। ফাইলগুলো নামিয়ে রেখে বেথ বলল : 'ফলো-আপস ফর টু ডে।'

শৈবাল বলল : 'হ্যাভ এ সিট। লেট মি গো ওভার দিজ রাইট নাও। ডোন্ট কাউন্ট অন মি টু-মরো।'

'হোয়াই ?'

'আই উইল বি ইন এ মিটিং দি হোল মর্নিং। অ্যান্ড, আই উইল লিভ আর্লি।'

বেথকে বসিয়ে রেখে চটপট কাজগুলো সেরে নিল শৈবাল। যে তিন সপ্তাহ

ও দেশে থাকবে—সে সময়ে কি কি ফলো-আপ করতে হবে এবং ডিপার্টমেন্ট থেকে কি কি রিপোর্ট যাবে বুঝিয়ে দিল বেথকে। বেথ মনে করিয়ে না দিলে শৈবাল ভুলে যেত যে মিটিং আছে সাড়ে তিনটেয়। জ্যাকেটটা কাঁধে চড়াতে চড়াতে শৈবাল বলল : 'সি য়্যু অ্যাট ফাইভ। রেডি ফর দি ডেট ?'

বেথ হাসল : 'মিস্‌ড ইট।'

'হোয়াট।'

'ডার্লিং।' হাসতে হাসতে দুজনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিস থেকে বেরিয়ে বারে পৌঁছতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল। এটা ঠিক বার নয়। অফিসের কাছাকাছি একটা ছোট ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট। ইচ্ছে করলে শুধু ড্রিংকও করা যায় এখানে। এতটুকু ক্লান্ত লাগছে না আজকে। আসলে মানসিক উত্তেজনা ওর ক্লান্তিটাকে ঢেকে রেখেছে। একটা ছোট টেবিল নিয়েছে ওরা তিনজন। সুন্দর কাচের গ্লাসে একটা মোমবাতি জ্বালানো। বাইরে রোদ্দুর নেই, তবে আলো আছে এখনো। দিন ছোট হয়ে আসছে। শীত আসতে আর দেরী নেই।

অল্প আলোতে বেথকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। বেথের রঙটা এত সাদা যে বেশি আলোতে মাঝে মাঝে ওকে রক্তশূন্য মনে হয়। গালে, চোখের পাতায় খুব বেশি রং নেই আজ। মোমবাতির আলো ওর লাল স্কার্টে ঠিক্‌রে মুখের ওপর কাঁপছিল। শৈবাল ভাল করে চোখের দিকে তাকাল। বেথ শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসল। জন প্রাইস বলল : 'আই অ্যাম নট গোইং ব্যাক টু মাই ওল্ড লেডি টু-নাইট।'

'উই উইল ড্রিংক টু দ্যাট।' ব্লাডি মেরিতে ছোট্ট চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো শৈবাল। 'বেথ ওয়ান্টস টু স্পেন্ড দি নাইট উইথ মি।' জন প্রাইসের মুখ-চোখের ভঙ্গী বেশ উদাসীন।

'হাঁ, হাঁ। সো, দ্যাটস দি বিগ স্ক্যান্ডাল'—হাসি হাসি মুখ করে বেথের দিকে তাকাল শৈবাল।

বেথের মুখ বা কান আরো লাল হল কিনা বোঝা গেল না। হয়ত বা অস্বস্তি এড়াবার জন্য গ্লাসে মুখ ডোবাল বেথ। তারপর মুখ তুলে চুল ঝাঁকিয়ে বলল : 'অ্যাট ইয়োর রিস্ক, ড্যাড।'

'আই উইল টেক এনি রিস্ক ফর য়্যু মাই চাইল্ড। আর য়্যু গেম ?' বেশ গম্ভীর হবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও একটুকরো হাসি আলগা লেগে আছে জনের ঠোঁটে।

'ওকে, আই অ্যাম গেম। বাট, য়্যু হ্যাভ টু বি উইথ মি অল ইভনিং। ডু য়্যু

হ্যাভ স্ট্রং হার্ট ?'

'ইট্‌স এ হার্ট শেপ্‌ড ইন মেরিন্‌স, ট্রাই ইট।' জন শৈবালকে চোখ টিপল।

'রাইট আফটার ড্রিংক, আই অ্যাম গোইং স্কেটিং ফর কাপল অফ আওয়ারস। আই হোপ য়্যু স্কেট।'

'ডু য়্যু স্কেট ? ব্যাক আউট উইথ অনার, জন।' শৈবাল একরাশ ধোঁয়া ওড়াল

'দ্যাটস ক্রেজি। চার্মিং লেডিস ডোন্ট গো স্কেটিং আফটার ড্রিংক। দে গো টু বেড।' জনের কথা বলার ভঙ্গীতে শৈবাল হেসে ফেলল।

'য়্যু আর সেলফিস !' জনের দিকে তাকিয়ে বেথ হাসল : 'আই উইল গো আউট উইথ শৈবাল টু নাইট।'

'ও ইয়া। দ্যাটস রাইট—দিস ইজ দি ইন্ডিয়ান নাইট। হি গেটস দি লেডি। শৈবাল, য়্যু স্কেট টু নাইট,' জন দীর্ঘশ্বাস ফেলল—'আই উইল গো ব্যাক টু মাই ওল্ড লেডি।'

এবার লজ্জা পেল শৈবাল। জন আর বেথ দুজনেই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শৈবাল ঢোঁক গিলে কোনরকমে বলল : 'আই মে ফল।'

বেথ খিলখিল করে হেসে উঠল এবার : 'হোল্ড অন টু মি, জাস্ট ফর টু নাইট।' অনেক চেষ্টা করেও বেথের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারল না শৈবাল। ওর কানের দু' পাশ গরম হয়ে গেছে। পাছে কেউ বুঝতে পারে সেই ভয়ে গ্লাসটা নিয়ে মুখ ঢাকল ও।

তের বছরে অবশ্য গা-সওয়া হয়ে গেছে কিন্তু প্রথম প্রথম এ দেশের ছেলে-মেয়েদের সামনে খুব অস্বস্তিবোধ করত শৈবাল। এদের কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে একটা খুব খোলামেলা ব্যাপার আছে যেটা শৈবালের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। মৌখিক অশ্লীলতা এদের একটা স্বাভাবিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বোধহয়। এই অশ্লীলতা কিন্তু নেহাতই হাসিঠাট্টার ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ এতে কিছু মনে করে না। তাই এদের কথায়-বার্তায় অনবরত অশ্লীল শব্দ রোজ শুনতে শুনতে সেই শব্দগুলো আজকাল ওর কানে নিরীহ শোনায়। দেশে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘরোয়া পরিবেশে অনেক অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছে শৈবাল কিন্তু তাই বলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে শৈবাল বলতে পারবে না—'আরে বাঞ্চৎ, কেমন আছিস ?' এরা কিন্তু অনায়াসে একজন আরেকজন জড়িয়ে ধরে বলতে পারে—'য়্যু ফাকিং সান অফ এ গান।' শৈবালের মনে হয় অশ্লীল কথাগুলো কোনকালেই জাতে ওঠেনি আমাদের দেশে। সবাই লুকিয়ে

লুকিয়ে শেখে—সংকীর্ণ পরিবেশে ব্যবহার করে। সামনাসামনি যারা ব্যবহার করে তারা ছোটলোক কিংবা মস্তান। এই অশ্লীল শব্দগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে ওরাই। অথচ এদের দেশের মানুষদের কোন কুণ্ঠা নেই ব্যবহারে। যে কোন মেয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে জন প্রাইস তাকিয়ে দেখবেই। ভাল ফিগার হলে তো কথাই নেই। খুব সম্ভব বলে উঠবে—'মাই গড, শি হ্যাজ গট রিয়াল বিগ টিট্‌স।' অথবা বলবে—'এ বিউটিফুল পিস অফ অ্যাস।' অথচ, রক্ত টগবগিয়ে ফুটলেও শৈবাল কোন মেয়ে সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও বলতে পারবে না—'কি রকম ডবকা বুক দেখেছিস।' কিংবা 'কি সুন্দর পাছা।' কথাগুলো ভাবতে ভাবতে শৈবাল হেসে ফেলল। বোধহয় এটা ভাষার গুণ। ইংরিজীতে গালাগালগুলো অনেক শিল্পসম্মত শোনায়। তাহলেও, শৈবাল এখনো এসব কথাগুলো ব্যবহার করতে লজ্জা পায়।

'হ্যাভ য়্যু এভার কনসিডারড গোইং ব্যাক টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড নট কাম ব্যাক ?' বেথ প্রশ্ন করল।

'হোয়াট ডু য়্যু আস্ক ?' চমকে উঠল শৈবাল। হঠাৎ মনে হল ওর বুকের ভেতরটা বোধহয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বেথ। শৈবাল একটুক্ষণ চুপ করে বলল : 'আই ডোন্ট নো। নেভার গেভ ইট এ সিরিয়স থট।' কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু বেথকে সত্যি কথাটা বলতে চাইল না ও।

বেথকে এখন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। অস্পষ্ট স্বরে বেথ আবার বলল : 'আই অলওয়েজ ওয়াণ্ডার। মাই গ্রাণ্ডফাদার কেম টু দিস কান্ট্রি অ্যাজ অ্যান ইমিগ্রান্ট। হি নেভার ওয়েন্ট ব্যাক বাট হি নেভার লাইক্‌ড দিস কান্ট্রি!'

শৈবাল বেশ বিপদে পড়ল এবার। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করল বেথকে : 'ডু য়্যু ?'

বেথ যেন অবাক হল : 'আই হ্যাভ নো চয়েস। দিস ইজ মাই হোম। আই হ্যাভ নেভার বিন টু এনি আদার।' শৈবাল কি উত্তর দেবে জানে না। মুখ তুলে ও চোখের দিকে তাকাল। কিন্তু কথা বলল না। আবার একটা মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করল না ওর। আশ্চর্য হল মনে মনে। এখনও মিথ্যে কথা বলতে খারাপ লাগে ওর। এখনো সত্যি কথা বলতে ভয় পায়। বিল মিটিয়ে ওরা তিনজন যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন পৌনে আটটা। ইতিমধ্যে ওখানকার রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। এই অঞ্চলে দোকানপাট খুব বেশি নেই। যা আছে সন্ধে ছটা নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার ওপর সারি সারি সব প্রাইভেট বাড়ি। এমনকি এই ছোট্ট রেস্টুরেন্টটাও আসলে একটা প্রাইভেট বাড়ি।

একতলা আর বেসমেন্টটাকে রি-মডেল করে রেস্টুরেন্ট বানিয়েছে। মালিক ওপরতলায় থাকে।

বেথ বলল : 'উড এনিওয়ান গিভ মি এ রাইড টু মেন স্ট্রীট ?'

জন প্রশ্ন করল : 'হোয়ার আর য়্যু গোয়িং ?'

'আই অ্যাম নট টু টেল য়্যু দ্যাট।' বেথ মুচকি হাসল।

'আই অ্যাম গোয়িং দ্যাট ওয়ে। কাম অন, লেটস গো।'

জন শৈবালের পিঠে বিরাট একটা চড় কষিয়ে বলল : 'ওযাচ হিজ হ্যান্ড, বেথ। য়্যু ক্যান্ট বিলিভ ইন্ডিয়ানস। সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে এখন। আকাশের বিভিন্ন অংশে থোকা থোকা লাল রঙ লেগে রয়েছে এখনো। নর্দার্ন বুলেভার্ড ধরে শৈবাল পশ্চিমে রওনা হল, বেথ নিঃশব্দে বসে আছে পাশে। রাস্তায় কোন লোক নেই বললেই চলে। বেশি জোরে যাওয়ারও উপায় নেই এইসব রাস্তায়। কোথা থেকে আচমকা পুলিশ এসে টিকিট দেবে কে জানে।

'সি ইজ নিউ, ইজন্ট ইট ?' বেথ আস্তে আস্তে বলল।

শৈবাল মাথা নাড়ল, অর্থাৎ হ্যাঁ। গাড়িটা সত্যিই নতুন। মুখ ফিরিয়ে বেথকে একবার দেখল শৈবাল। অন্ধকারে ওর মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। শৈবাল বলল. 'হোয়াট উড য়্যু লাইক ফ্রম ইন্ডিয়া ?'

'হোয়াই ?' বেথ অবাক হয়ে তাকাল।

'আই উড লাইক টু ব্রিং সামথিং ফর য়্যু।'

'থ্যাঙ্ক য়্যু শৈবাল। ব্রিং এনিথিং য়্যু লাইক। আই উড লাভ দ্যাট।' বেথ খুব অস্পষ্ট স্বরে বলল।

'হুইচ ইজ ইয়োর ফেবারিট কালার ?' শৈবাল জানতে চাইল।

সত্যিই কালো রঙটা বেথকে সুন্দর মানাবে। মনে মনে ঠিক করল শৈবাল কলকাতা থেকে কালো সিল্কের স্কার্ফ আনবে ওর জন্য।

মেন স্ট্রীটে পৌঁছনোর একটু আগেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে বেথ নেমে গেল। শৈবাল হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল—'আর য়্যু গোয়িং স্কেটিং ?'

বেথ হাসবার চেষ্টা করল। অল্প আলোতে ওকে কিরকম ম্লান দেখাচ্ছে এখন। হয়ত বা ক্লান্ত। বেথ বলল 'নট রিয়েলি। আই ওয়াজ কিডিং আই হ্যাভ টু গো হোম। মাই ডটার ইজ সিক।'

শৈবাল অপ্রস্তুত বোধ করল একটু. 'আই অ্যাম সরি টু হিয়ার দ্যাট। হোয়াট

ইজ ইট ?'

বেথ মাথা নাড়ল : 'নাথিং সিরিয়স। বাট আই উড লাইক টু স্টে উইথ হার টু নাইট। উড য়্যু লাইক টু কাম আস ফর এ কাপ অফ কফি ?'

'থ্যাঙ্ক য়্যু,বাট নো থ্যাঙ্ক য়্যু। আই অ্যাম লেট অলরেডি। সি য়্যু টুমরো।' সত্যিই অনেক দেরী হয়ে গেছে আজ। শহরে গিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে আজ ; একটুক্ষণের জন্যে হলেও হাজিরা দিতে হবে কাল। মিটিং আজ সকালে।

'হোয়াট টাইম ইজ ইয়োর ফ্লাইট ?'

'এইট থার্টি, স্যাটারডে এয়ার ইন্ডিয়া।'

'ইজ ইট ইন কেনেডী ?' বেথ প্রশ্ন করল। শৈবাল মাথা নাড়ল। অর্থাৎ হ্যাঁ।

'গুড নাইট সেন।' অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়ল বেথ।

কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করে শৈবাল গাড়িটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে নিল। একটুখানি এগিয়ে গেলেই মেন স্ট্রীট। এই অঞ্চলটা শৈবাল বেশ ভালভাবেই চেনে। টিয়ার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে এখানকার প্রায় প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এই ওরা গেছে কোন না কোন সময়। ঘড়ি দেখল শৈবাল। সাড়ে আটটা। টিয়া নিশ্চয়ই কলেজে। মেন স্ট্রীটে ঢুকে একটা পার্কিং মিটারে গাড়িটা দাঁড় করাল শৈবাল। এমনিতে দিনের বেলায় এ অঞ্চলে অনেক লোকজনের ভীড়। আগে সন্ধেবেলাতেও অনেক দোকান খোলা থাকত। ইদানীংকালে চটপট দোকান বন্ধ করে দেয় সবাই। এলাকাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। চুরি, ছিনতাই লেগেই আছে। বেশ কয়েকটা দোকানে বন্দুক দেখিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে যাবার ঘটনাও প্রায় শোনা যায়। শৈবাল যে দোকানটায় ঢুকল ওটা আসলে তরি-তরকারির দোকান। কোরিয়ানরা চালায়। এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দোকানটায় ঢুকে পড়ল শৈবাল।

কাউন্টারে কেউ নেই। দু'একটা লোক বাজার করছে এদিক ওদিক। বাঁ-দিকের কোণায় একটা মেয়ে তরি-তরকারি সাজিয়ে রাখছে ঠিকমত। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শৈবাল মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল।

'এক্সকিউজ মি, ম্যাম।' শৈবাল মেয়েটিকে ডাকল।

মেয়েটি ঘুড়ে দাঁড়াতে শৈবাল চমকে গেল একটু। মেয়েটার ডান গালে একটা বীভৎস কাটা দাগ। থুতনির কাছ থেকে প্রায় কান পর্যন্ত। পুরো গালটাই যেন কুঁকড়ে গেছে। তা সত্ত্বেও মুখটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হল ওর। চোখ দুটো খুব পরিচিত।

মেয়েটাও যেন হকচকিয়ে গেল কয়েকমুহূর্ত। সামলে নিয়ে বলল : 'ইয়েস ?'

'মে আই হ্যাভ এ প্যাক অফ সিগারেট প্লীজ ?' শৈবাল এক দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে।

মেয়েটাও অস্বস্তিবোধ করছে একটু। এদিক ওদিক তাকিয়ে আর কোন কর্মচারীকে দেখতে না পেয়ে মেয়েটা নিজেই এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে। শৈবাল প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করছিল—হঠাৎ কেন ওর মনে হল মেয়েটাকে আগে কোথাও দেখেছে।

শৈবাল কি সিগারেট নেবে মেয়েটা জানতে চাইল। শৈবাল মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এখনো। মেয়েটা কিন্তু স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই প্যাকেটটা এগিয়ে দিল শৈবালকে। পকেট থেকে টাকা বের করে শৈবাল হঠাৎ বলে বসল : 'হাভেন্ট উই মেট বিফোর ?'

মেয়েটা ক্যাশ রেজিস্টার খুলতে খুলতে বলল : 'আই ডোন্ট থিংক সো।'

এরপর আর কোন কথা বলা চলে না। খুচরো পকেটে পুরে রাস্তায় বেরিয়ে এল শৈবাল। গাড়িতে ওঠার আগে আরেকবার পেছন ফিরে তাকাল ও। মেয়েটা এখনো এদিকেই তাকিয়ে আছে। শৈবাল তাকাতেই তাড়াহুড়ো করে মেয়েটা সরে গেল পাশে। সিগারেট ধরাল শৈবাল। আরাম করে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল। ওর মাথার ভেতর থেকে মেয়েটা কিছুতেই যাচ্ছে না। অথচ শৈবাল মনে করতে পারছে না কিছুতেই। স্মৃতির সেলগুলো কেমন যেন সব নড়বড়ে হয়ে গেছে।

ম্যানহাটানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত পৌনে দশটা বাজে। সোজা রেস্টুরেন্টের সামনে হাজির হল শৈবাল। প্ল্যাকার্ড হাতে জনা ছয়েক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। তাপস, অজয়,রথীন—এদের কাউকেই দেখতে পেল না শৈবাল। কি ব্যাপার, লোক এত কম কেন ? বাকি সব কোথায় ? তাপস আসেনি ?'

'চলে গেছে। শ্রীকান্তর বসায় পাবেন।' ওদের মধ্যে একজন বলল।

'শ্রীকান্তর বাসায় ?' শৈবাল অবাক হল একটু।

'ওর নতুন ঝামেলা হয়েছে। বাড়িওলা এভিকশন নোটিশ দিয়েছে। বাড়ি নাকি ভেঙ্গে পড়বে। এক্ষুনি নাকি বেরিয়ে যেতে হবে ওদের।'

'কিছু ভাল খবর আছে আপনাদের ?' শৈবাল প্রশ্ন করল।

দু'একজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কেউ কোন উত্তর দিল না। একটি আমেরিকান দম্পতি রেস্টুরেন্টে ঢুকতে গিয়ে ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল

একটু। একটি ছেলে এগিয়ে গিয়ে বলল : প্লিজ, ডোন্ট ডাইন হিয়ার স্যার।'

শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। ওদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিতভাবে ওদের বোঝাতে শুরু করল ঘটনাটা। অপেক্ষা করার সময় নেই শৈবালের। গাড়িটাও রাস্তার উল্টোদিকে ফায়ার-হাইড্রান্ট এর সামনে বে-আইনীভাবে পার্ক-করা।

'বাসাটা কোথায় ?' শৈবাল জানতে চাইল।

এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে নিয়ে ছুটে রাস্তাটা পার হয়ে গেল শৈবাল। এদের মধ্যে একটা উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করার মতো। সবাই যেন কেমন মন-মরা। পাঁচ মাস আগে যখন সবাই মিলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল—এদের মধ্যে যে আগুন দেখেছিল শৈবাল আজ সে উত্তাপ নেই। একটু দূরেই একটা খালি সিটার দেখে গাড়িটা পার্ক করল শৈবাল।

শ্রীকান্তের বাড়ির সামনে বিরাট ভীড়। দুটো দমকলের গাড়িও দাঁড়িয়ে রয়েছে পর পর। পাড়ার সমস্ত লোক বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। ভীড় ঠেলে একটু এগোতেই তাপসকে দেখতে পেল শৈবাল। তাপসের দু হাতে দুটো বড় সুটকেস। কিছু বলার আগে তাপস বলে উঠল : 'একটু হাত লাগাবি ? মালগুলো বাইরে বের করতে হবে।'

উত্তর কলকাতার কিছু কিছু পুরোনো বাড়িতে সদর দরজা পেরলেই যেমন ছোট্ট এক টুকরো উঠোন, টুয়েলফ্‌থ স্ট্রীটের বাড়িগুলোও তেমনি। উঠোন পেরিয়ে দোতলা চৌকোণা একটা বাড়ি। সরু লবির দু'পাশে সারি সারি ঘর। ঘরগুলো ঠিক পায়রার খোপ। বেশ বোঝা যায় একটা বড় ঘরের মাঝখানে দেওয়াল তুলে ঘর বানানো হয়েছে। ঘরের একপাশে একটা শোবার জায়গা—অন্যদিকের কোণায় একটা ওভেন আর বেসিন। মাঝখানে একটা দরজায় পর্দা ঝুলছে। বোধহয় বাথরুম। ঘরে বাইরে তাপমাত্রায় কোন তারতম্য আছে বলে মনে হল না ওর।

শৈবালকে দেখে শ্রীকান্ত লজ্জা পেল। একটু হাসি ফুটল মুখে : 'আপনি কি করে খবর পেলেন ?'

'রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম। ওরা বলল।' শৈবাল নিজেও লজ্জা পাচ্ছিল বোধহয়। শ্রীকান্তর সামনে দাঁড়িয়ে ওর নিজেরও অস্বস্তি লাগছিল খুব। সহজ হবার চেষ্টা করে বলল : 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

'তাড়াতে চায় বোধহয়। এমনিতেই তো সারা শীত হিটিং বন্ধ ছিল। গরম জামাকাপড় পরে কম্বল গায়ে দিয়েও শীতে কাঁপি রাত্তিরে। বললে মুখ খিঁচিয়ে

ওঠে লোকটা। বলে—পছন্দ না হয় চলে যাও। তাও, মানিয়ে নিয়েছি সবাই। শহরের মধ্যে ঘর—কাজের কাছাকাছি। সাতদিন আগে থেকে নতুন উপদ্রব শুরু করেছে লোকটা। সারা বাড়িতে গরম জল নেই গত সাতদিন। হঠাৎ আজ সকালে বলেছে—বাড়ি খারাপ। যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোক এসেছে দুপুরে। সারাদিন ধরে দেখে-টেখে ওরাও বলল তালা মেরে দেবে বাড়িতে। অনেকগুলো ভায়োলেশন আছে।' অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে শ্রীকান্ত হাঁপাতে লাগল।

'কত ভাড়া দেন এখানে?' শৈবাল প্রশ্ন করল।

'আড়াইশ ডলার। অবশ্য হিটিং, ইলেকট্রিক নিয়ে। হিটিং তো নেই, ধরুন শুধু ইলেকট্রিক। শহরের মধ্যে এর কাছাকাছি ভাড়ায় কোন ঘর মেলে না আজকাল। তাছাড়া হঠাৎ করে এই শহরে কোথায় যাই বলুন। এ তো আর দেশ নয় যে কোন আত্মীয়ের কাছে গিয়ে উঠে পড়লাম। তাছাড়া, রেস্টুরেন্টের কাজটাও পাঁচমাস হল বন্ধ। অন্য কোন রেস্টুরেন্ট কাজও দিতে চায় না। পিকেটিং করেছি—আমরা নাকি কমিউনিস্ট। ওরা কোন ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না।' শ্রীকান্ত বিছানা আর তোষক ভাঁজ করে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

বাসনপত্তরগুলো একটা প্যাকিং বাক্সর মধ্যে পুরছিল শৈবাল। তাপস ঘরে ঢুকল। পাশেই সঞ্জয়। সঞ্জয় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি শ্রীকান্তদা। ঘর বাড়িওয়ালার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে না।'

শ্রীকান্ত অবাক হয়ে তাকাল। ওর মুখে কোন পরিবর্তন লক্ষ করল না শৈবাল। কোন উত্তর না দিয়ে লুকাস আবার কাজে মন দিল। সঞ্জয় ঘরের ভেতরে ঢুকে লুকাসের কাছে এসে দাঁড়াল। শৈবাল বলে উঠল : 'তাই বলে এই বাড়িতে থাকা কি সম্ভব?'

'সেটা ঠিক। হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু ছেড়ে গেলে গেল। বরঞ্চ সবাই যদি একসঙ্গে রুখে দাঁড়াই তবে বাড়িওয়ালা পিছু হটতে বাধ্য।' তাপস খুব জোরের সঙ্গে বলল। হয়ত বা অস্বস্তিকর পরিবেশের জন্যেই, তাপসের গলাটাও কেমন যেন দুর্বল শোনালো শৈবালের কাছে।

শ্রীকান্তর দশ-বার বছরের ছেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সঞ্জয় প্রশ্ন করল—'কিরে?' সঞ্জয়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বলল : 'মা ডাকে।'

শ্রীকান্ত মুখ তুলে তাকাল : 'ক্যান্?'

'জানি না।' ডেভিড পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লুকাস কাজ থামিয়ে চুপচাপ বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর তাপসের দিকে ফিরে বলল: 'একটা সিগারেট দিন।'

লুকাস চলে যেতে তাপস বলল: 'তোর বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে নাকি?'

শৈবাল হাসল। হ্যাঁ দেরী হয়ে যাচ্ছে ঠিক। তবু, এই মুহূর্তে দেরীর কথা ভাবতে লজ্জা করছে। শৈবাল প্রশ্ন করল: 'কি করবে এরা?'

সঞ্জয় বসে পড়ল খাটের ওপর। 'জানি না। আর ভাবতে পারছি না।'

'ভাবতে হবে না। নে, হাত লাগা। আমরা যতটা পারলাম করলাম। আমাদের হোটেলেও একটা ঘর পাওয়া যেতে পারে। ইচ্ছে করলে লুকাসদা সেখানেও যেতে পারে।' তাপস আর একটা প্যাকিং বাক্সে মাল ভর্তি করতে লাগল।

'বাকি সবাই?' প্রশ্নটা যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে এল শৈবালের মুখ থেকে।

তাপসের কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ পেল: 'অনেকেই নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে এতক্ষণে। তাছাড়া, রেড ক্রস থেকে বলেছে থাকতে দেবে যতদিন না এ সারানো হয় বা নতুন কোন ঘরের বন্দোবস্ত হয়। দুর্ঘটনার ওপর কারো হাত নেই।'

সঞ্জয় এতক্ষণে খালি বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছে। ও আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল: 'তাছাড়া ব্যাপার কি জানেন শৈবালদা, এত বয়সে শ্রীকান্তদার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এদেশে আসা উচিত হয়নি। এদেশে শ্রীকান্তদার মত লোক একেবারে বেমানান।'

'বেমানান' কথাটা শুনে হাসি পেল শৈবালের। সঞ্জয় এমনভাবে কথাটা বলল যেন শ্রীকান্ত ছাড়া বাকি সবাই এদেশে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু পাছে সঞ্জয় আঘাত পায় তাই কোন তর্কের মধ্যে না গিয়ে শৈবাল বলল: 'শ্রীকান্ত এল কি করে এদেশে?'

'বেশ কয়েকবছর আগে য়ুনাইটেড নেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কুক হয়ে এসেছিল। সে ভদ্রলোক ফিরে গেছেন অনেকদিন। শ্রীকান্ত থেকে গেছে। এই রেস্টুরেন্ট স্পন্সর করেছে ওকে। বছর দুয়েক হল গ্রীন কার্ড পেয়েছে। তার আগে পর্যন্ত বলতে গেলে বিনে পয়সায় কাজ করেছে ওখানে। গ্রীন কার্ড পাবার পর বউ ছেলেমেয়ে এসেছে বছরখানেক হল। এর মধ্যেই পর পর দুটো ঝামেলা।' তাপস আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দরজায় শ্রীকান্তকে দেখে চুপ করে গেল ও।

শ্রীকান্ত মৃদুস্বরে বলল : 'আমরা এ বাড়িটাতেই থাকি। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোকেরা বলেছে যে পেছনের ঘরগুলো তালা দেবে না ওরা। নিজের ঝুঁকিতে আমরা থাকতে পারি। লুকাস রোজারিও চলে যাচ্ছে। আমরা ওর ঘরে যাব।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল শ্রীকান্তর দিকে। ওর মুখে বিন্দুমাত্র কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না শৈবালের। নিঃশব্দে একটা প্যাকিং বাক্স হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল শ্রীকান্ত। বেশ খানিকটা চুপচাপ। তাপসই প্রথম কথা বলল, 'চল রাস্তা থেকে মালগুলো নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাই।' আরো ঘণ্টাখানেক পর তাপসের অ্যাপার্টমেন্টের উল্টোদিকে একটা ছোটখাট রেস্টুরেন্টে শৈবাল, সঞ্জয় আর তাপস চুপচাপ বসে ছিল। প্রত্যেকেই এখন ক্লান্ত। হয়ত শ্রীকান্তর ঘটনাটা ভুলতে পারছিল না কেউ। অনেকক্ষণ পর সঞ্জয় কথা বলল : 'ভাল খবর পেয়েছ, শৈবালদা?'

'কি রকম?' নিরুৎসাহ কণ্ঠস্বর শৈবালের।

'তাপসদা চাকরি পেয়ে গেছে। আমিও।'

শৈবাল তাপসের দিকে তাকায়। তাপস মৃদু হেসে বলল : 'তোকে ফোন করব ভেবেছিলাম দুপুরে। শ্রীকান্তর ঘটনাটা এত আচমকা ঘটল।'

সত্যিই ভালো খবর। অন্য সময় হলে শৈবালই হয়ত সবচেয়ে খুশি হত। তবুও অভ্যাসবশে শৈবাল বলল : 'কনগ্রাচুলেসনস।' কথাটা মৃদু শব্দের মত বাতাসে ভেসে গেল। তাপসের কানে হয়ত বা কথাটা বিদ্রূপের মত শোনাল। তাপস কোন উত্তর দিল না।

আরো কিছুক্ষণ পর শৈবাল বলল : 'রেস্টুরেন্টের কি হল?' য়ুনিয়ন কি বলছে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সঞ্জয় বলল : 'কেস টিকবে না। তুমি তো জান আমরা ওয়াক-আউট করার পর রাতারাতি মালিক দশজন লোক আনিয়েছে দেশ থেকে—প্লেন ভাড়া দিয়ে। এদিকে লোকাল য়ুনিয়নও শালা হারামী। প্রথমে তো আমাদের খুব উসকেছিল। মালিকের বক্তব্য ছিল ওরা য়ুনিয়ন করতে দিতে চায় না। এখন য়ুনিয়নের সঙ্গে কথা বলার পর মালিক বলছে, ঠিক আছে কর্মচারীদের বেশির ভাগ যদি চায় য়ুনিয়ন হোক। কিন্তু ওরা নতুন লোক এনেছে অনেক। কাজেই যারা বেরিয়ে গেছে তাদের থেকে জনা পাঁচকের বেশি নেয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়—তাও, ওরা পছন্দমত বেছে নেবে। কাজেই মেজরিটি পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এখন য়ুনিয়ন আমাদেরকে উল্টো চাপ দিচ্ছে।'

শৈবাল বাধা দিয়ে বলল : 'তোরা তো চাকরি পেয়ে যাবি, তোদের তো

রেস্টুরেন্টের চাকরি না হলেও চলবে। ওদের চাকরিগুলো ফিরিয়ে দিক।'

তাপস হাসল : 'ম্যানেজমেন্ট কম চালু নয়। কিছু লোককে ওরা নেবে ঠিকই। কিন্তু সবাইকে নয়। ভেতরের খবর হচ্ছে শ্রীকান্তকে ওরা কিছুতেই নেবে না।'

'কেন ?'

সঞ্জয় সিগারেট ধরালো একটা : 'কারণ খুব সোজা। মালিকও তো ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। ওরা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমরা টিকব না। তাই, কোপটা মারছে শ্রীকান্তর ও আরো দু'একজনের ওপর—যাতে, কথাটা ছড়িয়ে যায় লোকের কানে কানে। মনোবল ভেঙ্গে যায়। আমবা বোধহয় হেরে যাব।'

শৈবাল চমকে উঠলো কথাটায়। কি আশ্চর্য মিল। অনেকদিন আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আরেকজন কথাটা বলেছিল। শৈবাল যখন এঞ্জিনিয়াবিং পাশ করে বেরোল সন্তু তখন নিরুদ্দেশ। হঠাৎ উদয় হত কখনো। নিজের বাড়িতে থাকতে পারত না। ওদের বাড়িতে রাত কাটাতো মাঝেমধ্যে। বড়মা জানতে পারলে দেখা করতে আসতেন। বড়মাকেও লুকিয়ে চুরিয়ে আনতে হত। কারণ, বড়মার ওপরে অন্য পার্টির পুলিশের কড়া নজর ছিল। কারণ, তাদের ভালবাসার প্রতি এদের অগাধ বিশ্বাস।

একটুর জন্যে সন্তু বেঁচে গেল সেদিন। শৈবালদের বাড়িব পেছনেই বিরাট স্টুডিও। সন্তু স্টুডিও'র পাঁচিল টপকে পাড়ায় ঢুকতো। সোজা রাস্তায় চলাফেরা করা বন্ধ হয়েছিল অনেকদিন আগেই। শৈবাল বাড়িতেই ছিল। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ঢুকেই মাকে বলল : 'ন'কাকীমা খাবার দিন।' ওব চেহারা দেখে মাব চোখে জল এসে গিয়েছিল। সন্তু মাকে জড়িয়ে ধরে একপাক ঘুরে নিল—'আর কয়েকটা দিন ন'কাকীমা। তারপর ভাল ছেলে হয়ে যাব।'

মা বললেন : 'সবাইকে কষ্ট দিতে ভাল লাগে!'

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল সন্তু। একটু চুপ করে বলল : 'নিজেও পাই। ফেরা যায় না ন'কাকীমা। রাস্তা বন্ধ।'

শৈবালের ঘরে এসে বিছানায় শুতে গিয়ে সন্তু আর্তনাদ কবে উঠল। শৈবাল প্রশ্ন করল, 'কিরে ?'

'মলম-টলম দে তো। পিঠ ভর্তি ঘা। আরাম করে শুতে পারি না আর।'

সন্তুর পিঠের অবস্থা দেখে শৈবাল চমকে উঠল। গা ভর্তি দাগড়া দাগড়া ঘা। প্রায় সবগুলোই বিষিয়ে গেছে মনে হল ওর। শৈবাল ভয় পেয়ে গিয়ে বলল : 'এ দশা হল কি করে ? এ তো সাধারণ মলমে সারবে না।'

'হবে আবার কি করে ?' গজ গজ করে উঠল সন্তু—'শালা ভদ্রলোকের চামড়া ছোটলোকের খাবার সইতে পারে না, বুঝলি ? মনের জোরে চালিয়ে যাচ্ছি এখনো।'

মাকে না ডেকে শৈবাল নিজেই প্রাথমিক পরিচর্যা করল খানিকটা। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে শৈবাল বলল : 'তোকে একটা কথা বলব সন্তু ?'

সন্তু হাসল : 'ন'কাকীমার কথাগুলো রিপিট করিস না প্লীজ !'

'না, এই মুহূর্তে আমি মোটে ইমোশ্যানাল নই। তবে কথাগুলো তোকে বলা দরকার। বড়মা আর বড়দা জ্যাঠা আর কতদিন নিতে পারবেন জানি না। ওদের দিকে তাকানো যায় না। বড়মা ফিট হয়ে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে।' বাধা দিয়ে সন্তু বলল : 'তুই ভেবেছিস, আমি জানি না ?'

'হ্যাঁ জানিস, এটুকু বুঝতে পারছি। কিছু করা যায় না আর ?'

সন্তু অন্যদিকে তাকাল : 'না, ওদের জন্যেই আমার এখন দূরে থাকা দরকার। আমি এখন ওয়ান অফ দি প্রাইম টারগেটস।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোকে ?'

'বল।'

'মনে জোর পাচ্ছিস ?'

সন্তু যেন চমকে গেল একটু। চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল : 'তোর প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। মনকে জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। মাঝেমধ্যে দিশেহারা লাগছে একটু। অর্গানাইজেশন খুব নড়বড়ে। কম্যুনিকেশান চ্যানেলগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। অনেকেই নিজের মত চালাচ্ছে। সেন্ট্রাল কমিটি থেকে ভালমতো ডিরেকশন নেই। সেন্ট্রাল কমিটিও ভাগ হয়ে যাচ্ছে শুনছি। অথচ, সময়টাকে মুঠোয় চেপে বন্ধ করা যাচ্ছে না। মাথা ঠাণ্ডা করে যে ভাবব তার উপায় নেই আর। মনে হচ্ছে আমরা হেরে যাব। আমার বুদ্ধি, আমার বোধ, আমার বিশ্বাস বলছে আমরা হেরে যাব।' সন্তু চুপ করে গেল হঠাৎ।

শৈবাল চুপ করে রইল। সন্তু আবার বলল : 'আমি জানি তুই কি ভাবছিস। এদিক ওদিক খবর পাচ্ছি অনেকেই বলে গেছে হয়ত পালিয়ে যাওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু আমার নয়, দলের সকলেরই। কিন্তু কি জানিস ? তার জন্যেও যেটুকু পরিকল্পনা প্রয়োজন সেটুকুও সম্ভব নয় এখন। আগে কলকাতায় অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার মনে মনে আমাদের সমর্থন করত। আমাদের দলের ছেলেরা পাড়ায় বা বস্তিতে শেল্টার পেত অনায়াসে। কারণ তারা বিশ্বাস করতো

আমাদের সততায়। এখন তারা আমাদের দেখলে ভয় পায়, আঁতকে ওঠে। পুলিশ আর অন্য পার্টি মিলে এই প্যানিক সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছে। কাউন্টার করে কোন লাভ নেই জেনেও কাউন্টার করতেই হবে আমাদের। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এই ফাঁদ থেকে বেরোতে পারছি না আর। শুধু একটা জিনিস পেয়েছি জীবনে। চোখের সামনে এত লোককে মরতে দেখেছি—যে জীবন আর মৃত্যু সম্পর্কে আলাদা কোন অনুভূতি নেই আর।'

'আমি শুধু ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। কয়েকজন মানুষের বাঁচা মরার কথা বাদ দিলে—মূল রাজনৈতিক আদর্শের কতটুকু বেঁচে থাকবে বলে তোর মনে হয়! কৃষক-শ্রমিকের কিছু যোগাতে পাবলি তোরা?'

'জানি না। এটুকু বুঝতে পারছি এবারের মত সব শেষ। ইট'স নট ইভেন এ গ্লোরিফায়েড এন্ড। অর্গানাইজেশন বাদ দিলেও আমাদের মূল সমস্যাটা কোথায় জানিস? আমাদের মতো ভদ্দরলোকদের ওরা বিশ্বাস করে না। আসলে আমরা দুঃখ দেখিনি, মন্বন্তর দেখিনি—পুকুরের বুনো শাক খেলে এখনো আমাদের চামড়ায় ঘা হয়। আর, তুই যে রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলছিস সেটা বেঁচে থাকল না মরে গেল তাতে কিছু এসে যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে মানুষ ঠকেই এসেছে—আর তাছাড়া আমাদের আদর্শে নিশ্চয়ই ওদের ভয় আছে। নাহলে ওরা মরীয়া হয়ে উঠেছে কেন? আমাদের আদর্শ যে ঠিক এটা প্রমাণ হয়নি তবে ওদের যে কোন আদর্শ নেই এটা বোধহয় সমাজ ধরে ফেলেছে। ক্ষমতার জোরে ওরা তাই আদর্শের গলা টিপে ধরেছে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সন্তু এমন সময় কলিং বেল বাজল। তড়াক করে খাট থেকে নেমে জানালার কাছে চলে এল। শৈবাল দরজার দিকে এগোতেই পেছন থেকে জাপটে ধরল সন্তু। ফিস ফিস করে বলল: 'আগে জিজ্ঞেস করবি বাইরে থেকে। বাইরে থেকে যদি কেউ বলে—ন'কাকীমা কেমন আছেন?—তুই বলিস, কে? ও বলবে আমি ভোলা রে শৈবাল। নাহলে দরজা খুলিস না। দরজা ভাঙ্গবার আগেই আমি কেটে যাব।'

শৈবাল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সন্তু কয়েক লাফে ছাদে উঠে গেল। ইতিমধ্যে কলিং বেলটা বেজে উঠল আবার। শৈবাল এপার থেকে জিজ্ঞেস করল, কে? কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। শৈবাল দরজার এপাশে ঘামতে লাগল। একটু পরেই বাইরে থেকে কেউ প্রশ্ন করল—ন'কাকীমা কেমন আছে?' শৈবাল আশ্বস্ত হল। দরজা খুলে দিল চট করে। একটা রোগা বেঁটে মত ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে। শৈবাল হাসিমুখে বলল: 'আসুন'। এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে ঢুকে পড়েই

দরজাটা বন্ধ করে দিল। শৈবাল বলল : 'সন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' ছেলেটি ভীষণ দৃষ্টিতে শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল : 'কে বলল আপনাকে ?'

শৈবালের বুকটা ধড়াস করে উঠল। সমস্ত কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। একটা ভয় কিলবিলিয়ে উঠল সারা দেহে। নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল ওর। ছেলেটি মৃদু হাসল এবার : 'আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেননি।'

'কেন ?' শৈবাল অবাক হল।

'প্রথমত আপনার ওয়েট করা উচিত ছিল যতক্ষণ না আমি বলি—আমি ভোলা-রে শৈবাল। দ্বিতীয়ত, আমি ঢুকতেই আপনি হুট করে বললেন—সন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। ওটা কি আপনার বলার কথা ছিল ?' ছেলেটি এবার হাসল। বলল : 'খুব রেগে যাচ্ছেন তো ?'

'না, রাগ নয়, লজ্জা পাচ্ছি।' সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে শৈবাল বলল।

'আপনি তো শৈবাল ?' ছেলেটি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আপনার নাম ?'

ছেলেটি বলল : 'পাঁচু। একটু থেমে ঘুরে দাঁড়াল শৈবালের দিকে—'একটা কথা রাখবেন ?'

শৈবাল অবাক হল : 'বলুন ?'

'রাস্তায় কখনো যদি আমার সঙ্গে বা সন্তুর সঙ্গে দেখা হয়, প্লীজ ডেকে কথা বলবেন না। না চেনার ভান করে চলে যাবেন। আপনাদের ও আমাদের লাইফের পক্ষে এটা খুব জরুরী। পরে যদি ভুলে যাই তাই এখন বলে রাখলাম।' ছেলেটি ততক্ষণে দোতলায় পৌঁছে গেছে।

'কি ব্যাপার, একতলা থেকে দোতলায় উঠতে যে এক যুগ কাটিয়ে দিলি !'

মুখ তুলে ওপরে তাকিয়ে শৈবাল দেখলো সন্তু মিটি মিটি হাসছে।

পাঁচু নামে ছেলেটি হাসল : 'শৈবাল আমার ওপর খুব রেগে গেছে নিশ্চয়ই।'

'কেন ?' সন্তু প্রশ্ন করল।

'কত জ্ঞান দিয়েছি, নিজেরই খারাপ লাগছে।'

শৈবাল হেসে উঠল : 'একটু চা খান, ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমরা ছাদে যাচ্ছি। চা হলে ডাকিস।' সন্তু আর ছেলেটি ওপরে চলে গেল। ইঙ্গিতটা বুঝতে শৈবালের কোন অসুবিধে হয়নি। ওর প্রবেশ নিষেধ।

যেরকম আচমকা এসেছিল সেরকমই চলে গেল সন্তু। যাবার আগে

শৈবালকে শোবার ঘরে নিয়ে এল ও। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল : 'যেতে হবে। ন'কাকীমাকে সামনাসামনি বলতে পারব না। মাকে বলিস—আমি ভাল থাকার চেষ্টা করব প্রাণপণ।'

শৈবাল চুপ করে রইল। ও জানে কথা বলে কোন লাভ নেই।

'আর'—কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল সন্তু।

'বল'—

'একটা কাজ করতে পারবি আমার জন্যে ?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

পাঁচুর কাছ থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট নিয়ে শৈবালের হাতে দিল সন্তু : 'এটা আজকেব মতো লুকিয়ে রেখে দে কোথাও। কাল এই ঠিকানায় একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করবি। প্যাকেটটা সঙ্গে নিস না। কলিং বেলটা গুণে গুণে তিনবার বাজাবি। এগারটা থেকে বারটার মধ্যে পৌঁছবি। মেয়েটা তোর জন্য অপেক্ষা করবে। মেয়েটি প্রশ্ন করবে—কি চাই। তুই বলবি সেজ জেঠুর খুব অসুখ। তারপর মেয়েটা তোকে বলে দেবে কোথায় প্যাকেটটা দিতে হবে।'

'এত মনে থাকবে না।' শৈবাল বেশ অসহায়বোধ করল। কি করতে হবে—কোথায় যেতে হবে সব।

এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল সন্তু : 'এতে লেখা আছে। তুই তো আমার থেকে অনেক মেধাবী ছাত্র। চিরকাল ফার্স্ট হয়েছিস। একটু মুখস্থ করে কাগজটা ছিড়ে ফেলিস, প্লীজ।' চলে যেতে গিয়ে আরেকবার পেছন ফিরল সন্তু। শৈবাল হাসল : 'মুখস্থ করব। তোর কোন ভয় নেই।' সন্তুও হাসল : বিপদে পড়িস না, প্লীজ।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? ইচ্ছে না হলে উত্তব দিস না '

'বল'—সন্তু তাকাল।

'কি আছে প্যাকেটে ?'

'সেজ জেঠুর ওষুধ।'

'কি ওষুধ ?'

'বুলেট।'

'আজ আমাদের হোটেলেই শুয়ে পড়বি চল। কাল ভোরবেলা উঠে চলে যাস।' তাপস উঠে পড়ল। শৈবাল ঘড়ি দেখল। প্রায় একটা বাজে। অসম্ভব ঘুম পেয়েছে এ কথা সত্যি। তবুও ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল ওর। মৃদু স্বরে

বলল : 'সকালবেলা বড্ড জ্যাম থাকে রে। কাল সকালেই মিটিং।'

'আমি খুব ভোরবেলা তুলে দেব আপনাকে। এত রাত্তিরে নাই বা গেলেন। আপনি রীতিমত ঢুলছেন।' সঞ্জয় হেসে বলল।

'গুণে গুণে আর পনের মিনিট আড্ডা মেরে—তোকে শুতে পাঠিয়ে দেব। প্রমিস।' তাপসের কথা বলার ভঙ্গীতে শৈবাল হেসে ফেলল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোতেই এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস শৈবালকে আদর করল। মুখ উঁচু করে জোরে শ্বাস নিল শৈবাল। অলসভঙ্গীতে ওরা তিনজন হাঁটতে লাগল রাস্তায়। লোকজনের কোন কমতি নেই। এ অঞ্চলে এখনো অনেক দোকানপাট খোলা। এ শহরের ঘুম নেই।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল তাপস। সোফা বেড়ে একটা ছেলে শুয়েছিল। আলো জ্বালতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে। তাপস বলল : 'সরি। আপনি উঠবেন না, শুয়ে পড়ুন।'

'ঘুম আসছে না। জেট ল্যাগ চলছে বোধহয় এখনো। তাছাড়া নীচে গাড়ি চলার একটানা আওয়াজ—আমি জেগেই ছিলাম।'

'চা খাবেন?' তাপস প্রশ্ন করল।

'চলতে পারে। জল বসাব?' ছেলেটি উঠে পড়ল।

'আমি বসাচ্ছি। আপনি আরাম করুন।'

শৈবাল হাত তুলে নমস্কার করল : 'আমি শৈবাল বাগচি।'

'ইন্দ্রনীল সান্যাল।'

'কবে এলেন?' শৈবাল প্রশ্ন করল।

'সপ্তাহখানেক। তাপসদা যা উপকার করলেন আমার!'

'শুনতেও ভাল লাগছে, বলে যান।' তাপস হাসল। তারপর শৈবালকে বলল : 'আমি এই ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছি জানিস। আসলে এই শহরই।'

শৈবাল হাসল। কোন উত্তর দিল না। ওর চোখ জড়িয়ে আসছিল। চা খেতে ইচ্ছে করছিল না ওর।

'তোর সুটকেসে একটু জায়গা হবে?'

'হবে। কিছু দিবি?'

'হ্যাঁ একটা প্যাকেট। খুব বড় নয়। একটু পৌঁছে দিবি বন্দনার বাড়িতে? কয়েক ফাইল ওষুধ। ওর মার খুব অসুখ।'

একই সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার চমকে উঠল শৈবাল। তাপস বোধহয় অস্বস্তিবোধ করল একটু। বলল : 'তোর অসুবিধে হবে না তো?'

শৈবাল লজ্জা পেল : 'তুই আমার সঙ্গে ভদ্রতা শুরু করেছিস ?' চেয়ারটার ওপর রেখে দে। নাম, ঠিকানাটা লিখে রাখিস ওপরে।'

'প্যাকেটের ওপর একটা ছোট নাম এঁটে দিয়েছি। নাম, ঠিকানা লেখা আছে ওতেই।'

'কতদিনের ছুটি আপনার ?' ইন্দ্রনীল প্রশ্ন কবল।

'সপ্তাহ তিনেক।'

'শুয়ে পড়। কাল সকালে উঠতে পারবি না।'

· 'কোথায় ?'

'ঐ খাটটায় আমাদের দুজনকে ধরে যাবে। তুই লাথি ছুঁড়িস না তো ঘুমের ঘোরে ?' তাপস চায়ের কাপগুলো গুছিয়ে বাখল। ইন্দ্রনীল হো হো করে হেসে উঠল। তাপস আর শৈবাল শুয়ে পডল পাশাপাশি। কিছুক্ষণ আগেও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল শৈবালের। সে ঘুমটা হঠাৎ যে কোথায় উধাও হল কে জানে। মাঝখানে আর দুটো দিন আর রাত্রি। তারপর কলকাতায পৌঁছে যাবে ও। কলকাতায় গিয়ে কখন কার কার সঙ্গে দেখা করবে মনে মনে জল্পনা-কল্পনা শুরু করল শৈবাল। কতদিন ও যাত্রা দেখেনি। কফি হাউস এখনো নিশ্চযই সেইরকমই আছে—বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এত বছর কোন যোগাযোগ নেই। ওরা নিশ্চয়ই ভাল আছে। খারাপ হলে খবর পেত। কলকাতা থেকে ভাল খবর আসে না কখনো—এটা লক্ষ্য কবে দেখেছে শৈবাল। একবাব সবাই মিলে দীঘা গেলে কেমন হয় ? মুসৌরী অথবা নৈনিতাল। অনেকদিন ঝালমুড়ি খাওয়া হয়নি। চেতল মাছ—সেই পাতলা বড়ি-বেগুনের ঝোল। ঋত্বিক এখন বোম্বেতে। গিয়েই ওকে একটা ফোন করতে হবে। ও না হলে ঠিক জমবে না। দরকার হলে একবার ঘুরে আসা যেতে পারে। মা-বাবা ওকে দেখে নিশ্চযই অবাক হয়ে যাবে। এযারপোর্টে সবাই আসবে বোধহয়। বিছানায শুযে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করতে লাগল শৈবাল। ভুলে গেল ওর মাত্র সপ্তাহ তিনেকের ছুটি—ভুলে গেল ওর বয়স বেড়ে গেছে সাতবছর—ভুলে গেল অনেক কিছু বদলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়—আর এটাও ভুলে গেল কাল সকালে ওর একটা মিটিং আছে। চোখ বুজে সারারাত্তির জেগে শুয়ে রইল শৈবাল।

শনিবার দুপুরে টিয়া পৌঁছল প্রায় দুটোয়। সারা ঘরে জিনিসপত্তর ছড়িয়ে শৈবাল বিভ্রান্ত হয়ে বসেছিল। টিয়া ঢুকতেই শৈবাল বলল : 'নাও, গোছাও।

আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।'

ঘরের অবস্থা দেখে টিয়া হেসে ফেলল : 'তুমি ইচ্ছে করে করনি, আমার জন্যে বসেছিলে।'

'তুমি জানতে, আমি করব না—তাই তুমি তাড়াতাড়ি এসেছ। চা খাবে ?'

'না ; শরীর খারাপ। পেটে ব্যথা।' টিয়া জিনিসপত্র পুরতে লাগল সুটকেসে।

'বাচ্চা হবে ?' শৈবাল চায়ের জল চাপালো।

টিয়া শৈবালের দিকে তাকাল। কোন উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ—তারপর শৈবাল টিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর, মৃদুস্বরে বলল : 'আমি কিন্তু ইয়ার্কি করছিলাম।'

টিয়া তাও কোন উত্তর দিল না। শৈবাল আবার বলল : 'আর কথা বলবে না আমার সঙ্গে ?'

টিয়া আস্তে আস্তে মুখ তুলল। টিয়ার চোখ দেখে শৈবাল ভয় পেল। টিয়া বলল : 'আর কোনদিন এরকম কথা বোল না। আঘাত লাগে।'

শৈবাল টিয়ার কাঁধে হাত রাখল, টিয়ার মাথাটা দুহাতে ধরে ওর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল : 'তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি, কথাটা বিশ্বাস কর ?'

'করি। আজকাল এমন হয়। হঠাৎ রাগ হয়—আঘাত লাগে।'

টিয়ার মুখটা এখন শৈবালের খুব কাছাকাছি। টিয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শৈবাল। টিয়ার মুখে সে লাবণ্য আর নেই। কপালের রগগুলো দেখা যাচ্ছে। কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। মুখে একটা কালচে ছোপ। শৈবালের মনে হল টিয়া অনেক রোগা হয়ে গেছে। শুধু চোখ দুটো পাল্টায়নি।

'বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে না আমার ?'

'হ্যাঁ, জলাপেত্নীর মত।'

'আর দেখো না, খারাপ লাগবে।' টিয়া শৈবালের হাত দুটো ধরল : 'তুমি যদি রাগ না কর, একটা কথা বলব। আমি এয়ারপোর্টে যাব না। এখান থেকে বাড়ি চলে যাব।'

'কেন ?'

'এয়ারপোর্ট যেতে আমার ভাল লাগে না, খুব কষ্ট হয়। জানলা দিয়ে নীল আকাশ দেখতে পেলে জেলখানার মানুষদের যেমন কষ্ট হয়—সমস্ত যন্ত্রণাগুলো বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে যায়। আমরা তো সবাই এখন একেকটা দ্বীপ—' টিয়া চুপ করল।

'এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না?'

'পারছি কই! চলে যাবার স্বপ্নটাই সুন্দর। আসলে আমরা হয়ত যেতে চাই না কেউই।' টিয়া ম্লান হাসল।

'কলকাতায় দুটো ইন্টারভিউ পেয়েছি, দেখে আসি।'

'সিকিওরিটি খুঁজছ?'

'নিশ্চয়ই। ওটাও তো আরেকটা দ্বীপ।'

'তা ঠিক।' টিয়া হাসল : 'তোমার একটা কথা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে খুব লোভ হচ্ছে। অনেকদিন আগে তুমি উল্টো কথা বলেছিলে। আমি তখন খুব ভীতু ছিলাম—বরকে ছেড়ে একা একা বেরিয়ে পড়ার কথা আমি ভাবতেই পারতাম না। তুমি একদিন বলেছিলে স্বাধীনতা আর সিকিওরিটি দুটো আলাদা জিনিস। মনে আছে?'

'হ্যাঁ মনে আছে। এখনো সেটা আমি বিশ্বাস করি।'

'ভিয়েতনামের স্বাধীনতা মানুষের স্বাধীনতা এখনো এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে শেষ বাত্তিরে স্বাধীনতা উৎসবের আনন্দও যেমন সত্যি, পরের দিন ভোরের হাহাকারও সত্যি। আমরা গৌরবটুকু দেখি, হাহাকারটা ভুলে যাই। গৌরবের রেশটুকু মিলিয়ে যাবার আগেই নতুন বিপ্লবের সূচনা—কন্‌সেপ্ট অফ কন্টিনিউইং রেভল্যুশন। কেউ হারে, কেউ জেতে। আমি হিরো নই টিয়া। আমি সাধারণ মানুষ। আমি আদর্শের জন্য অথবা স্বাধীনতার জন্য জীবনের সমস্ত সিকিওরিটিকে বাজী রাখতে ভয় পাই। সন্তুর জন্য একবার সামান্য ঝুঁকি নিয়েছিলাম জীবনে কারণ সন্তুকে আমি খুব ভালবাসতাম, ফ্যাতন গুণ্ডার পাইপগানে বুক ঠেকিয়ে বড়মা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একবার, কারণ সন্তু বড়মার ছেলে। তাই বলে বড়মা বা আমি কমরেড নই। আমাদের সে বিশ্বাসের জোর নেই।'

শৈবাল থামত কি না সন্দেহ—টিয়া মুখ চেপে ধরল হাত দিয়ে : 'আর থাক।' শৈবাল হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল : 'তোমাকে বলেছিলাম কারণ এদেশে মিনিমাম সিকিওরিটি আছে। দেশ হলে বলতাম কিনা সন্দেহ। আরো বলেছিলাম, কারণ—' কথাটা শেষ করল না ও।

'কারণ কি?' টিয়ার চোখেমুখে কৌতুক।

'জানতাম, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'আমার কথা ভেবেছিলে কখনো?'

'কি কথা?' শৈবাল অবাক হয়ে তাকাল।

'আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা।' টিয়া মুখ নীচু করে সুটকেস গোছাচ্ছিল—না হ'লে এই মুহূর্তে শৈবালের রক্তশূন্য মুখটা দেখলে ওর ভয় লাগত।

নিঃশব্দে উঠে গেল শৈবাল। চায়ের জলটা কখন থেকে ফুটছে। টিয়া বলল: 'আমিও চা খাব। দুধ একটু বেশি দিও। চিনি দিও না।'

এই মুহূর্তে টিয়াকে প্রশ্ন করতে ভয় লাগছে শৈবালের। টিয়ার মুখে চোখে কোন পরিবর্তন নেই। ও গুনগুন করে গান গাইছে এখন। শৈবাল চায়ের কাপটা টিয়ার কাছে রেখে পাশের ঘরে চলে গেল। অনেকক্ষণ কোন কথা নেই। শুধু একটা অস্পষ্ট সুর কানে আসছে শৈবালের।

'ও ঘরে কি করছ', গান থামিয়ে টিয়া কথা বলল।

'অ্যাটাচিতে পাসপোর্ট আর টুকটাক জিনিসপত্তর ভরছি।'

'এ ঘরে নিয়ে এস।'

শৈবাল এ ঘরে এল। টিয়া বলল: 'আমার সামনে বোস। আর কিছুক্ষণ পরেই তো তুমি চলে যাবে।' মুখোমুখি বসল ওরা দুজন। টিয়া আবার কথা বলল: 'এতদিন পর দেশে যাচ্ছ, মুখ গোমড়া করে যেও না। এখানকার ছেলেরা কিরকম ভাবে দেশে যায় জানো?'

শৈবালের হাসি পেল: 'কিরকমভাবে?'

'দেশে যাবার আগে ভাল সেলুনে চুল কাটে। ভালো দোকান থেকে লিভাইস জিন কেনে—তার সঙ্গে দামী শার্ট। কাঁধে মিজোলটা কিংবা সাইকন। পায়ে চকচক করে জুতো। আমেরিকা থেকে যাবার আগে কতরকম প্রিকসন নিতে হয়।'

'কেন?'

'ওমা। তুমি কি বোকা গো। দেশে যদি কেউ বলে ফেলে—আপনি আমেরিকা থেকে এলেন বোঝাই যাচ্ছে না। কি লজ্জার কথা। প্রথমেই ডিফারেন্সটা দেখিয়ে দিতে হবে। মেড ইন হংকং বা কোরিয়া হলে মাথা কাটা যাবে। ব্র্যাণ্ড নেম হওয়া চাই।' টিয়ার হাত পা নেড়ে কথা বলা দেখে সত্যিই শৈবাল হেসে ফেলল। তারপর বলল: 'একটু আগে যদি বলতে। ইমপ্রেস করার একটু সুবর্ণ সুযোগ মিস করলাম।'

টিয়া গম্ভীর মুখে বলল: 'আরেকটা সুযোগ আছে। মাইনেটাকে টাকায় বলতে পার। অনেকের চোখ বড় বড় হয়ে যাবে।'

শৈবাল বলল: 'তুমি কি রেগে যাচ্ছ আমার ওপর?'

স্যুটকেসটা বন্ধ করে টিয়া উঠে পড়ল। চায়ের কাপ দুটো নিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলল : 'না, রাগ নয়, তোমার ওপর তো নয়ই।'

শৈবাল টিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল : 'আমার দিকে তাকাও।'

টিয়া মুখ তুলল . ওর চোখে জল। শৈবালের হাত দুটো শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে বলল : 'যদি না পারি ?'

'কি ?'

'চাকরি, পড়াশুনো, একা একা ঘরে ফেরা, এই নির্বাসন।'

টিয়ার চুলগুলো হাত দিয়ে পুরো এলোমেলো করে দিল শৈবাল : 'জান, কলকাতা থেকে তোমার জন্য কি আনব ?'

টিয়া তাকাল। শৈবাল বলল : 'কাজল।'

টিয়া হেসে ফেলল।

টিয়াকে নামিয়ে দিয়ে শৈবাল এয়ারপোর্টে পৌঁছল প্রায় সন্ধ্যে সাতটায়। কাউন্টারে অসম্ভব ভীড়। অধিকাংশই ভারতীয়। মালপত্তর চেক-ইন করে শৈবাল যখন ওপরে উঠল তখন বোর্ডিং শুরু হয়ে গেছে। গেটটা আরেক প্রান্তে। ওয়েটিং লাউঞ্জ থেকে দরজা ঠেলে বেরোতেই সামনে যাকে দেখতে পেল শৈবাল তাকে মোটেই আশা করেনি ও।

'আই থট য়্যু উইল মিস দি ফ্লাইট।' বেথ হুড মিটিমিটি হাসছে। ওর হাত ধরে পাঁচ ছ'বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে অবাক হয়ে শৈবালের দিকে তাকিয়ে।

'ইয়োর ডটার ?'

'ইয়েস। রিটা।'

'হাউ ইজ সি ফিলিং নাও।'

'এ লট বেটার। উই ডিসাইডেড টু গিভ য়্যু এ সারপ্রাইজ রাইট রিটা ?' বেথের প্রশ্নে খুব গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল মেয়েটা।

শৈবাল এখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে বেথ ওর সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করতে এসেছে। ওরা আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগোচ্ছিল।

'উড য়্যু লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ কফি অর সামথিং ?' শৈবাল প্রশ্ন করল।

'নো থ্যাঙ্কস। য়্যু গো অ্যাহেড।'

শৈবালের কফি খাবার খুব ইচ্ছে ছিল না। গেটের সামনে লাউঞ্জে ওরা গিয়ে বসল খানিকক্ষণ।

'আই ওয়াণ্ডার হোয়াট ইন্ডিয়া ইজ লাইক' বেথ মৃদুস্বরে বলল।
শৈবাল চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল : 'ইটস এ রিচ কান্ট্রি উইথ মোস্টলি পুয়োর পিপল।'
'হোয়াট ডু দে হ্যাভ ইন ইন্ডিয়া ?' এই প্রথম কথা বলল রিটা।
'টাইগারস, স্নেকস, পিককস, এলিফ্যান্টস অ্যাণ্ড পিপল।' শৈবাল বেথের দিকে তাকিয়ে হাসল।
'ডু দে হ্যাভ ম্যাকডোনাল্ডস ?' রিটাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হল।
'নো, দে ডোন্ট হ্যাভ ম্যাকডোনাল্ডস। বাট দে ডু সেল হ্যামবার্গারিস।'
ফাইন্যাল বোর্ডিং কল শুনতেই শৈবাল উঠে পড়ল। বেথের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ও। বেথ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে শৈবালকে চুমু খেল একটা :'বঁ ভয়াজ।'
শৈবাল কিছু বলার আগেই রিটা বলে উঠল : 'হোয়াই ডিড য়্যু কিস হিম মামি ?'
বেথ অবাক হয়ে তাকাল—'হোয়াই নট ? হি ইজ মাই বস্ ?'
রিটা চুপ করে শৈবালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল : 'হি ইজ সো ডার্টি।'
বেথ অপ্রস্তুত বোধ করল। সামলে নিয়ে বলল : 'হি ইজ ডার্ক বাট নট ডার্টি। হি ইজ টল, ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম।'
রিটা একটু ভাবল। তারপর মাকে প্রশ্ন করল : 'মে আই কিস হিম ?'
বেথ আর শৈবাল হেসে ফেলল।

আরো কিছুক্ষণ পর এয়ার ইন্ডিয়া জাম্বো বিক্রমাদিত্য তীব্র গতিতে দৌড়ে ডানা মেলল আকাশে। প্লেনটা অসম্ভব কাঁপছে। জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল শৈবাল। মাটি দেখা যায় না—শুধু অসংখ্য জোনাকির মত নিউইয়র্ক শহরটা জ্বলছে। আলোগুলো দুলছে, কাঁপছে, হারিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বাইরে একটানা একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। চারিদিকে তাকাল শৈবাল। প্লেনভর্তি লোক—অথচ সবাই নিস্তব্ধ। সিট বেল্টের সাইনটা না নেভা পর্যন্ত একটা অনিশ্চয়তা এখনো সবাইকে ঘিরে আছে। বাইরে এখন নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। প্লেনের পাখাটা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। শৈবাল অস্ফুট স্বরে বলল : 'গুড বাই নিউইয়র্ক, ফ্রিডম ফর থ্রী উইকস।' সিট বেল্টের সাইনটা নিভতেই লোকগুলো যেন জেগে উঠল। মৃদু গুঞ্জন শুরু হল চারপাশে। শৈবাল বাইরেই তাকিয়ে রইল। অন্ধকারে ও কি দেখছে কে জানে!

আকাশে দিনরাত্তিরের কোন হিসেব নেই। ঘড়িতে সময় দেখার কোন মানেই হয় না। এদেশের রাত্তির হয়ত ওদেশের সকাল। এই মুহূর্তে নীচে মাটি আছে কিনা জানা নেই, থাকলেও এটা দুই পৃথিবীর মাঝের কোন আকাশ। একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে বিশাল চেহারার বিক্রমাদিত্য দিগ্বি উড়ে চলেছে। প্লেনের নাম ময়না, টিয়া না হয়ে জাহাঙ্গীর, চন্দ্রগুপ্ত, রাজেন্দ্র, চোলা ইত্যাদি বিদঘুটে রাজাদের নামে কেন হয় কে জানে। কত সুন্দর সুন্দর পাখী আছে—তারা কি দোষ করল! রাজা-মহারাজারাই যেন দেশ। প্লেনের গায়েও তাদের নাম। পশ্চিমী দুনিয়ার পাশাপাশি ভারতবর্ষকে দাঁড় করাতে গিয়ে ইতিহাস থেকে মহারাজাদের ধরে আনা চাই। অথচ বাইরের পোশাকটা খুলে নিলে ভেতরকার উলঙ্গ ক্রীতদাস মনোবৃত্তি কুৎসিতভাবে উঁকিঝুঁকি মারে। পচা গলা কংকালকে ঢেকে রাখতে সোনার জলে পালিশ করা এইসব পোশাক দেখলে গা জ্বলে যায় শৈবালের।

আসলে শৈবালের মেজাজটা বিগড়ে গেছে শুরু থেকেই। ওর পাশেই মাঝখানের চারটে সীট খালি ছিল প্লেন ছাড়ার আগে। টেক-অফ করার একটু আগেই এক বৃদ্ধ ভারতীয় ভদ্রলোক ওখানে এসে বসেছিলেন। দেশে অবশ্য একটু তাড়াতাড়ি বুড়ো হয় মানুষ—তাহলেও ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় অন্তত পঁয়ষট্টি-সত্তর তো বটেই। প্লেন ছাড়ার পর পরই একটি এয়ারহোস্টেস এসে কথাবার্তা বলে ভদ্রলোককে তুলে দেয় ওখান থেকে—নির্দিষ্ট আসনে ফিরে যেতে বলে। বুড়োমানুষ—হয়ত ভেবেছিলেন লণ্ডন পর্যন্ত ঘুমিয়ে যাবেন। এসব ক্ষেত্রে তর্ক করে কোন লাভ হয় না। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে ফিরে যান। একটু পরেই সেই এয়ারহোস্টেসটি একটি কুড়ি-পঁচিশ বছরের বিদেশী তরুণীকে নিয়ে এসে ঐ চারটে সীট দিয়ে দেয়। শুধু কি দেয়া—তোয়াজ দেখে শৈবালের মাথা খারাপ হবার যোগাড়। ওপর থেকে কম্বল নামিয়ে, চারটে কুশন সাজিয়ে সেই মেয়েটির শোবার ব্যবস্থা হল। অভ্যর্থনা দেখলে মনে হবে যেন জ্যাকি কেনেডী উঠেছে প্লেনে। শুধু শৈবাল নয়, আশেপাশের অনেকেই ঘটনাটা লক্ষ করেছে—কিন্তু কেউ কোন কথা বলেনি। হয়ত বলা প্রয়োজন মনে করেনি কিংবা মনে করেনি ঘটনাটা এমন কিছু যা নিয়ে খামাখা সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়। অথচ, শৈবালের মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে গেল এই ঘটনায়। বুড়ো ভদ্রলোকের জন্য নয়—ওকে শৈবাল চেনেও না কিন্তু শৈবালের মনে হলো বিক্রমাদিত্যর তোষাখানার এই বাঁদী যেন ওর সারা মুখে থুথু ছিটিয়ে চলে গেল। এয়ারহোস্টেস চলে যাবার আগেই ইসারায় ওকে ডাকল শৈবাল : 'মে আই টক

টু য়্যু ফর এ সেকেণ্ড, ম্যাম ?'

মহিলা শৈবালকে দেখে বোধহয় একটু বিরক্তই হলেন : 'সাম ওয়ান উইল বি রাইট উইথ য়্যু।' বলেই আবার পেছন ফিরলেন মহিলা।

'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক টু সাম ওয়ান এল্‌স। আই ওয়ান্ট টু টক টু য়্যু।' শৈবাল গলা চড়াল।

দুটো আইলের মাঝখানের পথে থমকে দাঁড়ালেন মহিলা। ভ্রূদুটো সামান্য কুঁচকে গেল মুহূর্তের জন্য। তারপরই স্বাভাবিক ভঙ্গীতে মহিলা শৈবালের সামনে এসে দাঁড়ালেন : 'ইয়েস ?'

'আই হ্যাভ নাথিং এগেইনস্ট দিস ইয়ং লেডি। ইন ফ্যাক্ট, শি ইজ কোয়াইট চার্মিং। বাট, য়্যু কুড হ্যাভ শোন মোর রেসপেক্ট টু দ্য ওল্ড ম্যান।' মাথা ঠাণ্ডা রেখে সোজাসুজি মহিলার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল শৈবাল। বোধহয় বেশ জোর ছিল গলায়। আশেপাশের অনেকেই নড়েচড়ে বসল।

মহিলা চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন : 'আই টেক ইনস্ট্রাকশনস ফ্রম মাই সুপারভাইসার—নট ফ্রম য়্যু।' কণ্ঠস্বর আগেকার মতই মোলায়েম অথচ আবেগহীন।

'ইন দ্যাট কেস, প্লীজ কনভে দিস মেসেজ টু ইয়োর সুপারভাইসার। অ্যাণ্ড ইফ ইয়োর সুপারভাইসার টেকস ইনস্ট্রাকশনস ফ্রম ক্যাপটেন—প্লীজ কনভে দি মেসেজ টু দি ক্যাপটেন'—শৈবালের কথায় পেছন থেকে দু'একজন হো হো করে হেসে উঠলেন।

'আই উইল।' মেয়েটির আচার-আচরণে কোন পরিবর্তন নেই। শান্তভাবে কথা দুটি উচ্চারণ করে মহিলা পেছন ফিরছেন। মেয়েটির উত্তেজনার অভাবেই হয়ত শৈবাল আরো বেশি অপমানিত বোধ করল। তাই বোধহয় একটু চেঁচিয়েই বলল : অলসো টেল হিম দিস কাইণ্ড অফ পলিসি ইস ডিসগাস্টিং।'

আকাশ-সঙ্গিনী শৈবালের কথার কোন উত্তর দিলেন না—দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে মিলিয়ে গেলেন। সারাটা শরীর কাঁপছে। কেন এরকম হয় ও জানে না। হঠাৎ হঠাৎ তুচ্ছ কোন ঘটনা কেন যে শরীর-মন তোলপাড় করে ও বুঝতে পারে না। হয়ত আর সকলের কাছে তুচ্ছ—কিন্তু শৈবালের গায়ে লাগে। মানুষ হিসাবে অপমানিত বোধ করে ও। প্লেনে বেশ ঠাণ্ডা অথচ শৈবালের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে! বুকের ভেতরে ধক ধক। বুকের বাঁদিকে হাত দিয়ে হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন স্পষ্ট টের পেল শৈবাল। শিরা-উপশিরার রক্তের নদীতে এখনও অনেক ঢেউ। নিজেকে সামলে নেবার জন্য চোখ বুজল

শৈবাল।

'মে আই টক টু য়্যু ফর এ মিনিট ?' ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই—মেয়েলি কণ্ঠস্বরে চোখ মেলে তাকাল শৈবাল। যে বিদেশী তরুণীকে আকাশ-সঙ্গিনী আরাম করে শুইয়ে দিয়েছিল বিছানায়, সেই মেয়েটি এখন শৈবালের সামনে দাঁড়িয়ে। শৈবাল কিছু বলার আগেই মেয়েটি আবার বলল : 'মে আই সিট হিয়ার ফর এ কাপল অফ মিনিটস ?' ইঙ্গিতে শৈবালের পাশের খালি সিটটা দেখাল মেয়েটি।

'ইটস নট মাই সিট। হেল্প ইয়োরসেল্ফ।' শৈবাল চোখ বুজল। ও অবাক হয়েছিল একটু কিন্তু কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না ওর। মেয়েটি পাশে বসল—চোখ বুজেও সেটা টের পেল শৈবাল। পুরো ব্যাপারটাতে শৈবাল বেশ বিব্রত বোধ করছিল। আর কোন কথা বলতে ভাল লাগছিল না ওর।

মেয়েটি তবু কথা বলল : 'মে আই ?' খুব সন্তর্পণে মৃদু স্বরে কথা বলছিল মেয়েটি।

শৈবাল পাশ ফিরে মেয়েটির দিকে তাকাল। সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটি। ডাগর ডাগর সাগর রং-এর চোখ। সোনালী রঙের অগোছালো অপর্যাপ্তচুল। লালচে সাদা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আকাশ রং-এর স্কার্ট। শৈবাল বলল : 'ইয়েস !'

'আই ডিডন্ট নো।' মেয়েটি মুখ নীচু করল।

'আই নো। ইট হ্যাপেনড বিফোর য়্যু কেম।' শৈবাল মৃদু হাসল।

'হোয়াট হ্যাপেনড ?'

'অ্যান ওল্ড ম্যান টুক দোজ সীটস। শি আস্‌কড হিম টু গো ব্যাক টু হিজ সিট। আই থট ইট ওয়াজ আনফেয়ার। নট দ্যাট আই হ্যাভ এনিথিং এগেইনস্ট য়্যু। টু দি কনট্রারি, য়্যু আর এ ভেরী চার্মিং লেডি।'

মেয়েটি মুখ নীচু করল—লজ্জা পেল বোধহয়। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : 'থ্যাঙ্ক য়্যু। হু ইজ দ্যাট ম্যান ?'

'ইটস নট ইয়োর ফল্ট।' শৈবাল তাড়াতাড়ি বলল।

'আই নো। বাট আই ফিল সো টেরিবল। ক্যান য়্যু শো মি হোয়ার হি ইজ ?' মেয়েটির গলায় অদ্ভুত অনুনয়।

'আই ডোন্ট নো হিম ইদার। হি মাস্ট বি সামহোয়ার আপ ফ্রন্ট।' সামনের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক কোথায় বুঝতে পারল না শৈবাল। একটা সিগারেট ধরালো ও।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর মেয়েটি হঠাৎ বলল : 'আই নো। দ্য হস্টেস ক্যান টেল।'

শৈবাল কিছু বলার আগেই মেয়েটি সিট ছেড়ে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বোধহয় মহিলার উদ্দেশ্যে। পুরো ব্যাপারটা এখন এত নাটকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রীতিমত অস্বস্তিবোধ করছে ও। আশেপাশের অনেকেই এখন ঘুরে ফিরে শৈবালকে দেখছে। যা হয়ে গেছে এখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—বলে-কয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ফিরিয়ে আনলেও ঘা'টা শৈবালের মনে থেকেই যাবে। অপরাধ অবশ্য মারাত্মক কিছু নয় কিন্তু মনোবৃত্তির মধ্যে একটা ইতরামি ওকে অস্থির করে তুলেছিল। এখন অবশ্য লজ্জা লাগছে ওর। বিশেষত বিদেশী তরুণীর সামনে কথাগুলো না বললেই ভাল ছিল। কি ভাবল মেয়েটা!

মেয়েটি ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে শৈবালের পাশে বসে রইল বেশ খানিকটা সময়। শৈবালের কৌতূহল হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু ও কোন কথা বলতে চাইছিল না। মেয়েটি নিজের থেকেই কথা বলল এক সময় : 'হি রিফিউজড টু কাম। আই অলমোস্ট বেগড, য়্যু নো।'

'ইট ওয়াজ নট ইয়োর ফল্ট। ডোন্ট ফিল ব্যাড।' শৈবাল সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল।

মেয়েটি হঠাৎ পাশ ফিরে সোজাসুজি শৈবালের দিকে তাকাল : 'ইট ওয়াজ নট ইয়োর ফল্ট ইদার। হোয়াই ডিড য়্যু ফিল ব্যাড?'

এই প্রতিপ্রশ্নে শৈবাল হকচকিয়ে গেল খানিকটা। উত্তব দেওয়ার কোন মানে হয় না। মন থেকে ভারটা জোর করে সরিয়ে ফেলার জন্য অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল এই মুহূর্তে। পরমুহূর্তেই ওর হাসি পেল। মনে কি কোন অটোমেটিক সুইচ আছে যেটা টিপলে দুঃখগুলো চলে যায়। শৈবাল আপন মনে হাসল।

ওর হাসিটা বোধহয় মেয়েটির দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণ মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল : 'হোয়াই ডু য়্যু লাফ?'

শৈবাল চমকে গেল একটু। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : 'আই প্রমিসড মাইসেল্ফ আই উইল হ্যাভ এ গুড টাইম ইন মাই ফার্স্ট ভেকেশন ইন ফাইভ ইয়ারস।'

শৈবালের কথা বলার ভঙ্গীতে মেয়েটি হেসে ফেলল : 'য়্যু আর রাইট—ইটস নট আস। হোয়াই শুড উই বদার।' একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি আবার বলল : 'ডিড য়্যু কাম টু ভিজিট ইউ এস?'

'আই লিভ দেয়ার।' শৈবাল মৃদু স্বরে বলল।
'হোয়ার অ্যাবাউট ?'
'নিউইয়র্ক।'
'আই অলওয়েজ ওয়ন্টেড টু স্টে ইন নিউয়র্ক। বাট ইটস্ টু এক্সপেন্সিভ।'
'হোয়্যার ডু য়্যু লিভ ?' শৈবাল জানতে চাইল।
'ডুলুথ, জর্জিয়া। এ স্মল টাউন। দিস ইন আই ফার্স্ট টাইম টু ইন্ডিয়া।'
'হোয়্যার ইন ইন্ডিয়া ?'
'আই অ্যাম গোইং টু বম্বে।'
'ডু য়্যু নো এনিওয়ান দেয়ার ?' ইটস এ টাফ্ সিটি ইফ য়্যু আর এ স্ট্রেঞ্জার।'
'আই নো এ কাপল অব গাইজ। দে কিপ রাইটিং টু মি ইটস এ লট অফ ফান। হোয়্যার আর য়্যু গোইং ?'
'ক্যালকাটা।' শৈবাল মৃদু হাসল : 'উড য়্যু লাইক টু কাম ওভার ?'
'হাউ ইস ক্যালকাটা ?'
'ইটস লট অফ ফান। ইটস এ ম্যাড হাউস। আই লাভ ইট।' কলকাতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শৈবাল বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।
মেয়েটি চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল : স্ট্রেঞ্জ।'
শৈবাল বিস্মিত হল : 'হোয়াই স্ট্রেঞ্জ ?'
মেয়েটি বলল : 'আই উড হ্যাভ থট আদারওয়াইজ।'
'হোয়াই ?'
'আই থট ক্যালকাটা ওয়াজ সর্চি, ইট হ্যাজ লট অফ বেগারস, পিপল লিভ অন দ্য স্ট্রীটস্!'
'দ্যাটস কোয়াইট রাইট। বাট ইট ইজ অলসো দ্য বেস্ট।'
'হোয়াই ডু য়্যু সে দ্যাট ?' মেয়েটি অবাক হল।
শৈবাল মেয়েটির দিকে তাকাল। প্রশ্ন করল : 'য়্যু ওয়ান্ট টু সি ইন্ডিয়া, রাইট ? য়্যু ওয়ান্ট টু সি রিয়াল পিপল, রিয়াল সিটিস অ্যাণ্ড প্লেসেস, রাইট ?'
'ইয়েস।'
'দেন, হোয়াই ডু য়্যু গো টু এ সিটি দ্যাট ইজ অ্যান ইমিটেশন অফ আমেরিকা। উডন্ট য়্যু রাদার লাইক টু সি রিয়াল ইন্ডিয়া ? ক্যালকাটা ইজ এ প্লেস হোয়্যার য়্যু ক্যান সি দি বিউটি অ্যাণ্ড দি বিষ্ট ইন ওয়ান প্লেস।' অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে শৈবাল প্রায় হাঁপাচ্ছিল।
'ইট সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং। আই ওয়ান্ডার হোয়াই আই থট ইট ওয়ান

ডিফারেন্ট।'

'ইটস নট ইয়োর ফল্ট। এ পার্সন ইন ইন্ডিয়া থিংকস আমেরিকা ইজ ডিফারেন্ট।'

'হোয়াট ডু দে থিংক ?'

'দে প্রবেবলি থিংক এভরিবডি ইন আমেরিকা ইজ মিলিওনেয়ার, দেয়ার ইজ গুড প্লেস অ্যাণ্ড দেয়ার ইজ এ ব্যাড প্লেস কলড হারলেম। দে অলসো থিংক দ্যাট ব্ল্যাক হুডলামস লিভ ইন হারলেম, দে ওয়াক দি স্ট্রীট উইথ রাইফলস অ্যাণ্ড কিল গুড পিপল। বাট আই নো, অ্যাণ্ড য়্যু নো বেটার দ্যান মি দ্যাটস নট ট্রু।'

'হোয়াট ইজ রিয়াল ইন্ডিয়া দেন ?' মেয়েটির বিশ্বাস কাটেনি এখনও।

'হোয়াট য়্যু হ্যাভ, হাউ ইজ পুয়োর ইন্ডিয়া উইথ লট অফ রিচ পিপল। আই উড লাইক য়্যু টু সি এ রিচ ইন্ডিয়া উইথ এ লট অফ পুয়োর পিপল। দেয়ার ইজ এ বেটার ওয়ান্ডার দ্যান তাজমহল।'

'হোয়াট ইজ ইট ?'

'দ্য হাইট অফ পেন, সাফারিং অ্যাণ্ড হিউমান মিজারি! য়্যু উড সি হাউ পিপল সারভাইভ এগেইনস্ট সো মেনি অডস্। ইট উইল বি অ্যান এক্সপিরিয়েন্স অফ লাইফটাইম।' শৈবাল চুপ করে গেল।

ডিনার এসে গেছে। রঙ-বেরঙের প্লাস্টিকের থালায় আমিষ-নিরামিষ হরেক রকম। প্লেনে প্রথম ওঠার সময় এয়ার ফ্রেশনার, লজেন্স, অরেঞ্জ জুস আর আকাশ-সঙ্গিনীদের শাড়ি থেকে যে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল সেটা চকিতে উধাও হল। তার বদলে চিকেন-কারি, পোলাও-এর গন্ধে ভরে গেল সারাটা প্লেন। মেয়েটা নিরামিষ খাবার নিতে শৈবাল অবাক হল।

'আর য়্যু এ ভেজিটারিয়ান ?'

'স্ট্রিকট্‌লি।' মেয়েটি হাসল—'আই ডোন্ট লাইক মিট।'

'আই উড হ্যাভ থট আদারওয়াইজ।'

মেয়েটি খিলখিল করে হাসল। যারা সুন্দর তারা না সাজলেও সুন্দর। শৈবাল আড়চোখে মেয়েটিকে দেখল আবার। মেয়েটি প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে কাঁটা-চামচ বের করতে করতে বলল : 'আই হার্ড ইন্ডিয়ানস ইট উইথ টু ফিংগারস।'

'ইয়েস। মোস্ট অব দেম! স্পুন অ্যান্ড ফর্ক আর এক্সপেনসিভ। অ্যাট হোম আই অলসো ইট উইথ টু ফিংগারস।'

'টিচ মি।'

শৈবাল বিপদে পড়ল এবার। এয়ার ইন্ডিয়ার এই কেতাদুরস্ত পরিবেশে হাত দিয়ে খাওয়া যে বাঞ্ছনীয় নয় সে কথা মেয়েটিকে কীভাবে বোঝানো যায় বুঝে উঠতে পারল না ও। তবু একবার যখন বলে ফেলেছে কথাগুলো ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তাই শৈবাল বলল : 'ওয়াশ ইয়োর রাইট হ্যান্ড ক্লিন বিফোব য়্যু স্টার্ট।'

অনেক আড়ম্বর আয়োজনের পর মেয়েটির দু' আঙুলে খাওয়ার ছিরি দেখে শৈবাল হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। মেয়েটি ছাড়বার পাত্রী নয়—বাচ্চা মেয়ের মতো সারা মুখে হাতে মাখিয়ে খাওয়া শেষ করে তবে ছাড়ল। মেয়েটি ওঠার আগে শৈবাল আবার বলল : 'য়্যু হ্যাভ টু রিমেমবার দি লাস্ট রিচ্যুয়াল।'

'হোয়াট ইজ ইট নাও?' মেয়েটিকে বেশ বিপর্যস্ত লাগছে এখন।

আঙুলগুলো একটা একটা করে চেটেপুটে শৈবাল বলল : 'য়্যু হ্যাভ টু লিক ইয়োর ফিংগারস ক্লিন বিফোর য়্যু ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ড'

'হোয়াই?' মেয়েটি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'ইট কম্প্লিটস দ্য মিল।' শৈবাল হাসল।

আশেপাশে অনেক যাত্রীই উঁকিঝুঁকি মারছিল। আকাশ-সঙ্গিনীদেরও অনেককে একাধিকবার যাতায়াত করতে দেখল শৈবাল। কিন্তু সেই মহিলাকে আর একবারও দেখতে পায়নি। হয়ত লজ্জা পেয়েছেন মহিলা। মাঝে মধ্যে এইসব এয়ার হোস্টেসদের দেখলে মনে হবে এরা বোধহয় সব কলের পুতুল। কাজকর্ম, কথা বলা, হাঁটাচলা, মাপা হাসি সবই বোধহয় মগজের ভেতর আগে থাকতে প্রোগ্রাম করা। এই মরা-মরা ভাবটা শৈবালের অসহ্য লাগে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা না বলেও মৌখিক ব্যবহার ও চালচলনে আর একটু মানবিক ভঙ্গী থাকলে যেন ভাল লাগে।

ডিনারের পর মেয়েটি উঠে গেল। টান টান হয়ে চারটে সিট জুড়ে শুয়ে পড়ল। এক ঘুমে লন্ডন। প্লেনে ঘুম আসে না শৈবালের। বাইরের একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজটা বেশ ক্লান্তিকর। মাথার ওপর দিয়ে জড়িয়ে হেডফোনটা দু' কানে লাগাল শৈবাল। অল্প ভল্যুমে নাইনথ্ সিম্ফনি বাজতে লাগল কানে। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল খুব একটা ভাল বোঝে যে শৈবাল তা নয়। তবে শুনতে শুনতে একটা নির্বোধ ভাল লাগা জন্মে গেছে খানিকটা। ধৈর্য ধরে এখন তাও শুনতে ইচ্ছে করছে না ওর। একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ, কিছুক্ষণ পর পর প্লেনের একটা নড়বড়ে ভাব—বাইরে একটু জোরে বাতাস দিলেই হল—বিক্রমাদিত্য টালমাটাল। আবার ক্যাপটেনের গলা, সিট বেল্ট

লাগাও—আবার কিছুক্ষণ পর সব কিছু শান্ত। সামনের দেয়ালে একটা হিন্দী ছবি চলছিল। কথাগুলো অর্ধেক বুঝতে পারে না শৈবাল। তাই কানে নাইনথ্ সিম্ফনি লাগিয়ে—হিন্দী ছবির নায়িকার দিকে তাকিয়েছিল শৈবাল। নায়িকা-নায়কের সঙ্গে একবার পাহাড়, একবার লেক আর কখনো গভীর জঙ্গলের মধ্যে নাচানাচি ও ছেনালি করছিল। শৈবাল কিছু ভাবছিল না, ও কিছু শুনছিল না, ছবিটাও দেখছিল না। ও একটা ক্লান্তি অনুভব করছিল। একটু তন্দ্রা এসেছিল হয়ত—কিন্তু ব্রেকফাস্টের তাড়ায় সে তন্দ্রা টিকল না। শৈবালের ঘড়ির রাত তিনটেয় ব্রেকফাস্ট এল টেবিলে—লণ্ডনে এখন প্রায় ভোর। আরো ঘণ্টা দেড়েক পর হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছে গেল ওরা। সারারাত না ঘুমিয়ে শৈবালের দু' চোখে জ্বালা। বাইরে না গেলে কেমন হয় শৈবাল সবেমাত্র যখন ভাবনাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছে তখনই পাশ থেকে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও :

'লেটস গো জগিং—হোয়াট ডু য়্যু সে ?'

শৈবাল মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটিকে দিনের আলোয় আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘুমিয়ে উঠে চোখগুলো ফোলা ফোলা। চুলগুলো একটু আগেই সযত্নে আঁচড়ানো। শৈবাল অবাক হল একটু। এখন না গেলে বেশ খারাপ লাগবে। সুন্দরী মেয়েদের না বলা যায় না। মুনি, ঋষি, ক্ষমতাবান পুরুষেরা কেলিয়ে যান—শৈবাল তো সাধারণ মানুষ। কথাগুলো ভেবে ওর হাসি পেল। শৈবাল বলল : 'আই ডোন্ট মাইন্ড।'

প্লেনের সামনেব দরজায় সেই মহিলার সঙ্গে দেখা। চোখাচোখি হতে শৈবাল হেসে বলল : 'গুড মর্ণিং।'

মহিলা মাথা নাড়লেন শুধু। মুখে কোন পরিবর্তন নেই। অন্যান্য দিনের মতো আজকের ডিউটি শেষ। কাল রাত্তিরের ঘটনাটি এতক্ষণে মহিলা ভুলে গেছেন হয়তো।

পাশ থেকে মেয়েটি বলল · 'সি মাস্ট বি ভেরী অ্যাংগ্রি।'

'হোয়াই ?'

'সি মাস্ট হ্যাভ ফেল্ট ইনসাল্টেড লাস্ট নাইট।'

'আই ডোন্ট থিং ইট ম্যাটারস। আই ডোন্ট থিংক ইট'স হার ফল্ট। শি ইজ এ পুয়োর ভিকটিম অফ এ ওয়র্থলেস সিস্টেম। শি ডাজন্ট ইভেন নো ইট।' শৈবাল বিড় বিড় করে বলল।

'থারস্ট উই অল ভিকটিমস্ ?' মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি।

শৈবাল অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল—কোন উত্তর দিল না। ও সানগ্লাসটা বের করে পরল। সারারাত্তির না ঘুমিয়ে রোদ্দুরটা চোখে লাগছিল খুব। ওয়াকওয়ের ওপর দিয়ে পাশাপাশি ওরা দুজন লাউঞ্জের দিকে এগোচ্ছিল। বাইরে রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে শৈবালের হঠাৎ কলকাতার কথা মনে হল। মনে হল এখন অনেকদিন ছুটি। কোথাও হাজিরা দেবার নেই প্রত্যেক সকালে। প্রত্যেকদিনের চব্বিশটা ঘণ্টাই ওর নিজের। আর কয়েক ঘণ্টা পরই কলকাতা। এখনো বিশ্বাস হয় না।

চোখের সামনে মেয়েটির ডান হাতটা নেচে গেল বারদুয়েক। শৈবাল চমকাল। মেয়েটি বলল : 'আর য়্যু অ্যাওয়েক ?'

শৈবাল হাসল। ওর মুখ ভর্তি এখন রোদ্দুর। লম্বা লম্বা পা ফেলে মেয়েটির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শৈবাল বলল—'ভেরি মাচ।'

হিথ্রো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের সামনে বিরাট লাইন। লাউঞ্জে ঢুকবার আগে সিকিউরিটি চেক। লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল শৈবাল। এমনিতে এই এয়ারপোর্টটা বিরাট বড়। বেশ সাজানো গোছানো। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার জন্য লোকও কম রাখেনি এরা। তবে লন্ডনের এয়ারপোর্টে নামলে একটা বিশেষ ব্যাপার চোখে পড়বে প্রথমেই। ঝাড়পোঁছ যারা করে তারা অধিকাংশই মহিলা। আর, অধিকাংশই ভারতীয়। যদিও প্রত্যেক কাজের ডিগনিটি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যুক্তির দিক থেকে অকাট্য—শৈবালের একটু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল।

ভেতরে ঢুকে মেয়েটি প্রথমেই বলল—'বিয়ার খাবে ?'

শৈবাল মাথা নাড়ল—অর্থাৎ না। সকাল-দুপুর বলে কিছু নয়—ওর অমৃতে অরুচি নেই কখনো। তবে গতকাল থেকে এক ফোঁটা মদও গলায় ঢালেনি ও। খানিকটা ভয়ে। এত বছর পর প্রথম দেখে মা যদি মুখে গন্ধ পায়। ছোটবেলায় মাকে ভয় পেত, খারাপ লাগত। আজকের ভয় পাওয়াটা অন্য—আজ মা আঘাত পেলে ওর খারাপ লাগে। বিশেষ করে এতদিন পর। পাছে মেয়েটি কিছু মনে করে তাই শৈবাল তাড়াতাড়ি বলল : 'তুমি নাও, আমি কোক খাব।'

বিয়ার আর কোক নিয়ে ওরা লাউঞ্জের সোফায় এসে বসল। হাতে পায়ে কোমরে একটু ব্যথা ব্যথা করছে। একটু হেঁটেচলে বেড়ালে বোধহয় ভাল হত। তবু শৈবালের একটু হাত পা ছড়িয়ে বসতে ইচ্ছে করছিল। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। কোকে চুমুক দিয়ে মাথাটা সোফার গায়ে হেলিয়ে পা ছড়িয়ে বসল ও। একটু পরে মেয়েটি বলল—'আমি একটু ঘুরে আসছি।'

শৈবাল মাথা নাড়ল : 'যদি ঘুমিয়ে পড়ি যাওয়ার সময় জাগিয়ে দিও । লন্ডনে থেকে যাওয়ার কোন উদ্দেশ্য নেই আমার ।'

মেয়েটি বলল : 'টেক এ কুইক ন্যাপ—আই উইল বি ব্যাক ইন এ ফিউ মিনিটস ।'

হিথ্রো এয়ারপোর্ট একটা ছোটখাট পৃথিবী । চারিদিকে তাকিয়ে শৈবাল প্রায় সব দেশের মানুষকেই দেখতে পেল । এই সেই বিলেত । নিউইয়র্কে আসার সময় লন্ডন হয়ে আসেনি শৈবাল । আজকাল যেমন আমেরিকা আসার চল হয়েছে, আগে লোকে বিলেতে আসত । আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাঙামামা প্রথম বিলেত এসেছিল । রাঙামামার বিলেত যাওয়াটা ভাল করে মনে নেই ওর । তবে ফেরত আসাটা স্পষ্ট মনে আছে । রাঙামামার বিলেত যাওয়া নিয়ে হৈ চৈ হয়েছিল খুব । দাদু বিলেত যাওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । রাঙামামা দাদুর কথা শোনেননি । পালিয়ে গিয়েছিলেন । দাদুর কাছে টাকাকড়িও নেননি । বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে জাহাজের টাকা যোগাড় করেছিলেন । দাদু নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন মনে মনে—কিন্তু মুখে কিছু বলেননি কখনো । তখনকার দিনে প্লেনে করেও খুব বেশি লোক বিলেত যেত না । সবাই প্রায় জাহাজে করে যেত । রাঙামামা যাওয়ার পথে জাহাজের একটা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল । সেটা এখনো মার আলমারীতে আছে ।

আজও স্পষ্ট মনে আছে রাঙামামা যখন ফিরে আসে শৈবাল সেবার ক্লাস এইটে উঠল । অনেকদিন থেকে জল্পনা-কল্পনা করছিল সকলে—কে কে যাবে স্টেশনে। জাহাজ নোঙর করেছিল বম্বেতে । সেখান থেকে ট্রেনে । শৈবালের কাছে রাঙামামা ছিল হিরো—প্রায় নেতাজীর মতো । হাওড়া স্টেশনে রাঙামামাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল শৈবাল । রাঙামামার কালো রঙটা কিরকম চকচক করছিল । কে রাঙামামার পাশে বসবে ট্যাক্সীতে তাই নিয়ে কত টেনশন । তারপর বাড়িতে ফিরে সুটকেস্ খোলা—সে আর এক পর্ব । সুটকেস থেকে একের পর এক অদ্ভুত সুন্দর চকচকে সব জিনিস বার করছিল রাঙামামা । মাকে আর বাবাকে ঘড়ি দিয়েছিল রাঙামামা । মা প্রাণে ধরে ঘড়িটা পরেনি কখনো । বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন । সেই বাক্সেই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েকবছর পর । শৈবাল পেয়েছিল 'মেড ইন ইংলন্ড' লেখা একটা ছোট সুন্দর দেখতে রং দেশলাই-এর বাক্স । সেই সন্ধ্যেতেই সন্তুর বাড়িতে গিয়ে দেশলাইটা দেখিয়েছিল শৈবাল । বড়দা জ্যাঠা-বড়মা কেউ বাড়িতে ছিল না । পূরবীদি ওপরের ঘরে বসে পড়ছিল । ও আর সন্তু বাইরের ঘরে বসে দেশলাই

জ্বালাচ্ছিল। আইডিয়াটা প্রথম সন্তুই দিল।

'সিগারেট খাবি ?'

'সিগারেট ?' শৈবাল যেন ভূতের নাম শুনল।

'আছে খাবি ?' সন্তুর মুখে কোন উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই।

'তুই সিগারেট খাস ?' শৈবাল অবাক হয়ে সন্তুকে প্রশ্ন করল।

'খাবি কিনা বল।'

'কোথায় পাবি ?'

'বাবার পকেটে।'

'বড়দা জ্যাঠা যদি টের পায়।' শৈবালের কিরকম ভয় ভয় লাগছিল।

'দূর! সিগারেট কি কেউ গুণে গুণে খায়। আমি আগেও দু-একটা টেনে দেখেছি—বাবা টের পায়নি। পোড়াও আছে কিন্তু আনা যাবে না। দিদি ওপরে বসে পড়ছে।'

না বলতে প্রেস্টিজে লাগল ওর। তাই সাহস সঞ্চয় করে শৈবাল ঘাড় নাড়ল। একটা গোটা চকচকে সিগারেট নিয়ে কিছুক্ষণ পর নীচে নেমে এল সন্তু। ক্যাপস্টান। শৈবাল শুঁকে দেখল দু'চারবার। একটা অদ্ভুত গন্ধ। একটু কষ কিন্তু খুব খারাপ নয়।

'দে ধরিয়ে দি।' পায়ের ওপর পা তুলে সন্তু বলল।

অনায়াসে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো সন্তু। গলগল করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। শৈবাল অবাক হয়ে দেখছিল। ভয়ের থেকেও সন্তুর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ওর।

'নে, টান দে। প্রথমবার একটু আস্তে টানিস—না হলে কাশি হবে।'

প্রথম টানটা কি বিশ্রী। তেতো, গরম, কড়া তামাকের গন্ধে শৈবালের কাশি হচ্ছিল। তবু এর মধ্যে অন্য রকম একটা মাদকতা ছিল। খারাপ লাগলেও হাল ছাড়েনি শৈবাল। কাশি চেপে অনেকগুলো টান দিয়েছিল। ভাল না লাগলেও প্রথম সিগারেট খাওয়ার মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করেছিল। সবাই করে। প্রথম সিগারেট খাওয়া, প্রথম মিথ্যে কথা বলা, প্রথম মদ খাওয়া, প্রথম মেয়ের শরীর ছোঁয়া কেউ ভুলতে পারে না। মেড ইন ইংল্যান্ড দেশলাইয়ে ধরানো প্রথম সিগারেট তাই এখনো স্পষ্ট মনে আছে ওর। তারপর কত ঘটনা ঘটছে, কত ঘটনা স্মৃতি হয়েছে, কত স্মৃতি ধূসর হয়েছে—বড় হবার সময়কার কিছু কিছু মুহূর্ত আঠার মতো লেগে আছে মনে। সেই সব মুহূর্তগুলোর প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি উত্তেজনা, প্রতিটি অনুভূতি ওর মুখস্থ।

সেই সময় আর আজ অনেক তফাত। আজ আর বিলেত যাওয়া নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। জাহাজে করে কেউ বিলেত যাচ্ছে শুনলে লোকে হাসবে। আমেরিকা-লন্ডন আজকাল লোকে হরদম যাচ্ছে। যাদের একটু পয়সা আছে দেশে তারাই আমেরিকা বেড়িয়ে যাচ্ছে যখন-তখন। অবশ্য একটা দেশ বেড়ানো আর সেখানে থাকা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এখনো চাকরি খুঁজবার দিনগুলো ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। প্রত্যেকটা দিন চাকবির এজেন্সীগুলোতে ঘোরা। চাকরি যে পাবে এরকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিল সপ্তাহ তিনেক পর। যে দুশো ডলার পকেটে নিয়ে এসেছিল তারও মেয়াদ প্রায় শেষ। শেষের দিকে ডিগ্রী লুকিয়ে কেরাণীর চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করত। খাম লাগানো, চিঠি বিলি করা, ফাইল গোছানো যা হয একটা চাকরি। কোনমতে বেঁচে থাকাই তখন সবচেয়ে বেশি জরুরী। বিরাট বিরাট বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খুব ছোট মনে হত নিজেকে। কতদিন ভেবেছে দেশে ফিরে যাবে। লজ্জায় পারেনি। আজও দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবে। আজকের কারণটা অবশ্য অন্য। সেদিন যে কারণে ফিরতে চেয়েছিল সে কারণে নয়। এতদিন পরেও নতুন দেশ ওর কাছে আপন হল না। দোষ হয়ত ওর নিজের অনেকখানি। চেষ্টা করলে ও নিশ্চয়ই বদলে নিতে পারত নিজেকে। কত লোকই তো নিয়েছে। পারুক না পারুক চেষ্টা তো করেছে। অথচ ওর মনে হত পুরোনো মানুষটাই সব। অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও পুরোনো মানুষটাকে ও মেরে ফেলতে পারেনি। তাই, ঐশ্বর্যের মধ্যে নির্বাসিত শৈবাল ওর মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে আসল আমিকে। যে আমিটা কাঁদে, ভালবাসে। যে আমিটার একমাত্র ঐশ্বর্য তার স্মৃতি। কেউ কেউ বুঝতে পারে। হয়ত বা টিয়া। একদিন টিয়া বলেছিল : 'আসল তুমিটা ভীষণ নরম। তোমার বাইরের রুক্ষতা একটা মুখোস। ওটা সরে গেলে যে কেউ তোমাকে আঘাত করতে পারে।'

শৈবাল ম্লান হেসেছে—'আসল আমিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে এই মুখোসটা ছাড়া গতি নেই। তাছাড়া প্রত্যেকটা মানুষেরই হয়ত একটা করে বাইরের মুখোস থাকে।'

টিয়া বলল : 'আমার কিন্তু নেই।'

'তাই বোধহয় আসল তুমিটা দুঃখ বেশি পাও জীবনে।'

'দুঃখ তুমিও পাও, মুখোসটার জন্য বাইরের মানুষ বুঝতে পারে না।'

টিয়া বুঝতে পারে। অনায়াসে সে শৈবালের ভেতরটা হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে। শৈবাল তাই টিয়াকে ভয় পায় খুব। সব ভালবাসাই কি এইরকম ?

নিজেকে খুব দুর্বল মনে হয় আজকাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললাম তো এই ভদ্রলোক। আমি ঠিক দেখেছি—আমার মনে আছে।'

পরিষ্কার বাংলা শুনে চমকে উঠল শৈবাল। পেছন ফিরে দেখল এক বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন গায়ে গায়ে লাগান উল্টোদিকের ডিভানে। দেখেই চিনতে পারল শৈবাল। প্লেনের সেই ভদ্রলোক। শৈবাল তাকাতেই ভদ্রলোক হাসলেন।

শৈবাল বলল : 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?'

ভদ্রমহিলার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উনি হাসিমুখে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক নড়েচড়ে বললেন : 'আপনি বাঙালী ?'

শৈবাল হেসে ফেলল : 'এখনো সন্দেহ হচ্ছে ?'

ভদ্রলোক বললেন : 'আমরা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। আপনি ?'

'আমিও কলকাতায় যাচ্ছি, ছুটিতে।'

'আমেরিকায় থাকেন ?'

'হ্যাঁ, নিউইয়র্কে।'

'আমার ছেলে-বউ থাকে আমেরিকায়। ওদের কাছে গিয়েছিলাম। এখন ফিরে যাচ্ছি।'

'কিরকম লাগল আমেরিকা ?'

দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ম্লান হাসলেন ভদ্রলোক : 'ভালই। অনেক কিছু দেখবার মতো। তবে—' কথাটা শেষ না করে চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক।

'কতদিন ছিলেন ?'

'মাস তিনেক। ছেলে অবশ্য বলেছিল বছরখানেক থেকে যেতে।'

'থেকে এলেই পারতেন।'

'না বাবা, আমরা বুড়ো হয়েছি—আমাদের ভাল লাগে না—'এতক্ষণে ভদ্রমহিলা কথা বললেন।

'কেন ?' শৈবাল অবাক হল।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। সারারাত্তির বসে বসে এসে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন : 'তিন মাসেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কিছু করার নেই। তাও নাতিটা ছিল বলে এ ক'টা দিন তবু টিকেছি।'

'নাতি কত বড় হল ?' শৈবাল হাসল।

'দশমাস। ওর ওপরেই বড্ড মায়া। ও না থাকলে বোধহয় মরেই যেতাম। বাবা-মা তো সকাল থেকে কাজে। ফেরে সেই সন্ধ্যের সময়। এখানে বড্ড কাজ। সুবিধে যেমন বেশি, খাটুনিও বেশি। দুদণ্ড বসে যে কেউ কারো সঙ্গে গল্প করবে—তার পর্যন্ত সময় নেই।' ভদ্রলোককে বেশ উত্তেজিত মনে হল।

'তেমনি ওখানে দুদিন ছুটি।' শৈবাল হেসে বলল।

'ছুটি না ছাই—'ভদ্রমহিলা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ছুটির দিনেও তো কাজ। বাজার দোকান, ঝাড়া-পোছা, জামা-কাপড় কাচা। বাড়ি কিনেছে। কার্পেট পরিষ্কার করতেই তো এক বেলা। আমি তো স্পষ্ট বলে দিয়েছি ছেলেকে—আমি আর আসছি না। মরে গেলেও দেশেই আরাম। ইচ্ছে হয় তোমরা আসবে দেশে।'

'ছেলে কি বলছে?'

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন : 'ওরা আর ফিরবে বলে মনে হয় না। আমরাও ধরি না। হয়ত মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসবে দেশে। তবে নাতিটার জন্যে কষ্ট হবে খুব। ও কি আর আমাদেরকে চিনতে পারবে—না দেখলে চিনবে কি করে। তা আমরা আর কি করব? তা বলে এদেশে থাকতে পারব না। ওদের ইচ্ছে ওরা থাকবে।'

'দীপুর মোটেই ইচ্ছে নেই—সুমিতাই তো...' ভদ্রমহিলা রেগে উঠলেন।

'আঃ তা কি করবে। ওদের সংসার—ওরা যা ভাল বুঝবে। তুমি কি আর ঠেকাতে পারবে ওদের?' ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন।

'ভারী বোঝে। মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই সব বুঝে গেছে। খালি বউ চিনেছে। বউ যা বলবে তাই। একেবারে পর করে দিল ছেলেকে।' ভদ্রমহিলা গজ গজ করে উঠলেন।

শৈবালের সামনে বেশ অপ্রস্তুত বোধ করলেন ভদ্রলোক। একটু ম্লান হেসে বললেন : 'আজকাল ছেলেমেয়েরা অনেক তাড়াতাড়ি বোঝে। তাই না, বলুন?' শৈবালকে সালিসি মানলেন ভদ্রলোক।

কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে শৈবাল মৃদু হেসে চুপ করে রইল। ভদ্রমহিলা নিজের মনে গজগজ করতে লাগলেন : 'বোঝে না ছাই। এসব দেশে মানুষ শুধু নিজেরটা বোঝে।'

প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য শৈবাল বলল—'নাতি কথা বলে?'

নাতির কথায় ভদ্রমহিলার মুখে হাসি ফুটল : 'পুরো কথা বলতে পারে না। বাবা-মা-দাদাই কয়েকটা কথা বলতে শিখেছে। রেলিং ধরে দাঁড়ায়। হাত ঘোরালে নাড়ু দেব বললেই ছোট পাঁউরুটির মতো হাতটা বনবন ঘোরাতে

থাকে। এয়ারপোর্টে সুমিতা যেই বলল—বল দিদা টাটা, অমনি হাত ঘুরিয়ে বলল—'দিদা, তাতা।' ভদ্রমহিলার চোখে জল এল—কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছলেন ভদ্রমহিলা।

'ওয়ান্ট টু গো ব্যাক, ইটস টাইম।'

মেয়েটি ফিরে এসেছে। শৈবাল কিছু বলার আগেই মেয়েটি ভদ্রলোককে দেখে বলে উঠল—'হায়, হাও আর য়্যু?'

ভদ্রলোক হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন: 'অল রাইট।'

শৈবাল ভদ্রলোককে বলল: 'সময় হয়ে গেছে। বেশি দেরী করবেন না।'

শৈবাল উঠে পড়ল। এগিয়ে যেতে যেতে ও স্পষ্ট শুনতে পেল ভদ্রমহিলা ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন—'বউ নাকি?'

ভদ্রলোক কি বললেন শুনতে পেল না ও। পাশ থেকে মেয়েটি বলল: 'ইজ হি স্টিল অ্যাংগ্রী?'

'হোয়াই?'

'হি সিম্‌ড টু বি ভেরী অ্যাংগ্রি লাস্ট নাইট।'

একটু চুপ করে থেকে শৈবাল বলল 'আই ডোন্ট থিংক সো।'

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। একটা তুচ্ছ কারণে শৈবালের খুব আনন্দ হচ্ছিল। কাউকে এসব কথা বলা যায় না। কাল রাত্তিরে মেয়েটি যখন ভদ্রলোককে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল, শৈবাল সাত-পাঁচ অনেকরকম ভেবেছিল। মেয়েটি একা ফিরে আসাতে মনে মনে খুশিই হয়েছিল শৈবাল। হাসিমুখে ফিরে এসে সিটগুলো জুড়ে শুয়ে পড়লে হয়ত ভদ্রলোকের আরাম হত অনেক। কিন্তু যে অহংকারে আরামটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভদ্রলোক সেই অহংকারকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল শৈবাল। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে মানুষ বেঁচে থাকে বোধহয় এই অহংকারের জোরে। এই অহংকারই বোধহয় স্বাধীনতা। যুক্তি-তর্ক নিয়ে এই অহংকারকে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া বৃথা। সবাইকে এসব কথা বলাও যায় না। বিশেষ করে এই মেয়েটিকে তো নয়ই। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে অহংকারের আলাদা কোন মূল্য নেই। কিছু না থেকেও যে অহংকার—সেটাকে লালন পালন করতে মনের জোর চাই। ঐ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আর কিই বা আছে ঐ মনের জোরটুকু ছাড়া, একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া। সেই বিশ্বাস আর মনের জোরেই ছেলে বউ-এর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে হয়ত ফিরে চলে যাচ্ছেন দেশে।

বোর্ডিং লাউঞ্জে বেশ ভীড়। বসবার জায়গা পেল না ওরা। মেয়েটি বলল.

'সিমস টু বি লিটল ইন্ডিয়া।'

সত্যিই তাই। অধিকাংশই ভারতীয় এখন। দু'একজন বিদেশী যে নেই তা নয়,তবে অনেকেই বোধহয় নেমে গেছে লণ্ডনে। শৈবাল হেসে বলল : 'য়্যু হ্যাভ টু কাউন্ট অন ইন্ডিয়ানস ফ্রম নাও অন্।'

মেয়েটি খুব গম্ভীর মুখে বলল 'বাট, য়্যু সেড দে আর নট রিয়াল ইন্ডিয়ানস।'

ওর কথা বলার ভঙ্গীতে শৈবাল হেসে ফেলল।

একটাও সিট ফাঁকা নেই আর। ছোট জানালা দিয়ে চড়া রোদ্দুর শৈবালের মুখে চোখে লাগছিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। দাড়ি, পাগড়ি সহ এক শিখ ভদ্রলোক বসেছেন ওর পাশেই। মেয়েটা এখন নিজের সিটে চলে গেছে প্লেনের সামনের দিকে। প্লেনে এখন নতুন আকাশ-সঙ্গিনীর দল। সিট বেল্টটা কোমরে শক্ত করে বেঁধে সানগ্লাসটা পরেই শৈবাল চোখ বুজল প্লেন ছাড়ার আগেই। কখন যে আকাশে উড়ল টের পায়নি ও।

পুরোপুরি ঘুম ভাঙল বম্বের একটু আগে। মাঝখানে খাবারের জন্য দু'একবার ডেকেছে। একবার তাকিযে আবার চোখ বুজেছে। খেতে ইচ্ছে হয়নি ওর। আকাশ-সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা কবতে সে বলল—আধঘণ্টার মধ্যেই বম্বে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করবে প্লেন। আকাশটা এখন পরিষ্কার। নীচে মেঘের সাগর। শৈবাল তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুতে বাথরুমের দিকে এগোল।

বাথরুমের সামনে বিরাট লাইন এখনো। প্লেনে বাথরুম খালি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। চোখে ঘুম লেগে আছে এখনো। একটু মুখ-চোখে জল না দিলে অস্বস্তি হয়। শৈবাল দাঁড়িয়ে বইল ওখানে। বাথরুমের উল্টো দিকের ছোট্ট জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকাল শৈবাল। প্লেনটা বোধহয় নীচে নেমেছে একটু। নীচে মেঘের ফাঁক দিয়ে সবুজের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। দিনটা খুব সুন্দর। চারিদিকে ঝকঝকে রোদ্দুর। মেঘের গায়ে রোদ্দুর পবে রূপোলি রঙ ধরেছে। অনেক দূরে মেঘের ওপর আরেকটা ছোট প্লেন দেখতে পেল শৈবাল। কতদূরে আন্দাজ করা যায় না। আকাশে দূরত্ব সম্পর্কে বোধটা বোধহয় কমে যায় অনেক। গতিও অনুভব করা যায় না। একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজটা না থাকলে মনে হবে প্লেনটা বোধহয় থেমে আছে আকাশে।

'গুড মর্ণিং'—মেয়েলি কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গল।

পেছনে তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখতে পেল শৈবাল। পরনে এখন অন্য পোশাক। জীন্স-এর ওপর পাতলা লাল টপ। ও হেসে বলল—'গুড মর্ণিং।

আর য়্যু রেডি ফর ইন্ডিয়া ?'

'আই অ্যাম। আই ডোন্ট নো ইফ সি ইজ।' ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল মেয়েটা।

'আই ডোন্ট নো। আই হ্যাভন্ট সিন হার এ লং টাইম'—শৈবাল অন্যমনস্ক হল।

'হাউ ক্যান আই গেট ইন টাচ উইথ য়্যু ইফ আই গো টু ক্যালকাটা ? গিভ মি ইয়োর নাম্বার।'

শৈবাল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল : 'দেয়ার ইজ নো ফোন ইন দ্য হাউস। পিপল ইন ইন্ডিযা ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট কলিং পিপল। দে জাস্ট পে এ ভিজিট।' একটু থেমে শৈবাল বলল : 'ডু য়্যু হ্যাভ এ পেন, আই উইল রাইট দ্য অ্যাড্রেস।'

মেয়েটি ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটা পেন আর নোটবই বের করল। শৈবাল খসখস করে ঠিকানা আর কি করে যেতে হয়, লিখল। মেয়েটি একটু দেখে বলল—'হাউ ডু য়্যু প্রোনাউন্স ইয়োর নেম ?

'শৈবাল।'

দু-একবার চেষ্টা করে মেয়েটি নামটা ঠিক উচ্চাবণ করল।

শৈবাল একটু হেসে বলল · 'আমি কিন্তু তোমার নাম জানি না এখনো।

'এপ্রিল', মেয়েটি একটু থেমে বলল : 'এপ্রিল অলব্রাইট।'

'পারফেক্ট।'

'হোয়াই ?'

'এপ্রিল ইজ অলওয়েজ ব্রাইট।'

মেয়েটি পেন আর নোটবই ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল : 'আই অ্যাম সো এক্সাইটেড।'

'সো অ্যাম আই।'

'য়্যু গ্রু আপ হিয়ার। আই মিন, য়্যু নো হোয়াট টু এক্সপেক্ট, আই ডোন্ট।'

তা ঠিক—শৈবাল মনে মনে ভাবল। শৈবালের কাছে দেশটা নতুন নয় মোটেই। পঁচিশটা বছর কম কথা নয়। ভাল, খারাপ সব কিছুই শৈবাল দেখেছে। অথচ দেশটা পুরোনো হল না কোনদিন। মনেরও চোখ আছে। সেই চোখ দিয়ে শৈবাল সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। কলকাতার বাড়ির আনাচ কানাচ ওর মুখস্থ। পাশের উঠোনে সেই ঝাঁকড়া শতদলি জবার গাছ। রথের মেলায় রাসবিহারীর মোড় থেকে কেনা। বাড়ি ফিরে দাদুকে দেখিয়েছিল

শৈবাল। মৃদু হেসে বলেছিলেন—'দাদু, বোধহয় তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছে ওরা।'

শৈবাল খুব লজ্জায় পড়েছিল। কিন্তু দাদুর কথা বিশ্বাস হয়নি। তাই বলেছিল—'তবে যে গাছের সঙ্গে এতবড় ফুল।'

দাদু হেসে ফুলটা গাছ থেকে খুলে নিয়েছিলেন—সবুজ সুতো দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। দাদু সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—'গাছটা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে জবাই।'

পরের দিন দাদু গাছটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন পাশের উঠোনে। খানিকটা জেদের বসেই শৈবাল গাছটার যত্ন করতো খুব। পরের বর্ষায় সেই গাছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া শতদলি জবা ফুটল। সেবারই দাদু-দাদি পুজোর ছুটিতে পাবনা থেকে কলকাতা বেড়াতে এসেছিলেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে শৈবাল দাদুকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল পাশের উঠোনে।

এ বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর চোখের সামনে তৈরি হতে দেখেছে শৈবাল। তিন কাঠা জমি কিনে অনেকদিন ফেলে রেখে দিয়েছিলেন বাবা। বাড়ি করার পয়সা ছিল না। সেই জমির অর্ধেক বিক্রী করে বাড়ির কাজ শুরু হয় অনেক বছর পর। ছাদ পেটাই-র পর কতদিন গরমকালে শৈবাল মার সঙ্গে ছাতে গিয়ে শুয়েছে। একা একা ছাতে শুতে পারত না শৈবাল। মা না থাকলে ভয় লাগত। ছাতে অজস্র ফুলের টব। গোলাপ আর রজনীগন্ধা মিশে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোত।

দোতলার উঠোনে দেয়ালে লাগান সেই আদ্যিকালের পেণ্ডুলাম ঘড়ি। প্রায় দাদুর বয়সী। পাবনা থেকে সম্পত্তি বলতে দাদু শুধুই ঘড়িটা আনতে পেরেছিলেন বোধহয়। দক্ষিণের ঘরটা রাস্তার ঠিক ওপরেই। পাবনা থেকে চলে আসার পর ওটাই হল দাদুদের ঘর। অনেক বড হয়েও শৈবাল দাদির কাছে গিয়ে শুত। দাদি পাবনার গল্প বলতেন। পিঠে সুড়সুড়ি দিতেন। দক্ষিণের জানালার পর্দা হাওয়ায় উড়ে যেত। বাড়ির সব কটা পর্দা মার সেলাই করা। চাকরি পাবার পর হ্যাণ্ডলুম হাউস থেকে নতুন পর্দার কাপড় কিনে এনেছিল শৈবাল। উল্টোদিকের ঘরটা রান্নাঘর। ঘরটার কথা মনে হতেই শৈবালের হাসি পেল। একটা ঘটনার কথা মনে আছে এখনো। ঐ ঘরের জানালা দিয়ে গোকুল ঘোষদের বাড়ির কলতলা দেখা যায়। বাথরুমে কোন ছাদ নেই। কোনরকমে একতলা টালির ছাদের বাড়ির পেছনে কলতলা। ওদের বাড়ির সবাই ওখানে স্নান করত। গোকুলের বউ শ্রাবণীকে জামাকাপড ছেড়ে ঐ কলতলায় স্নান করতে দেখেছিল শৈবাল। অবাক হয়ে গিয়েছিল শৈবাল। প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে

দেখত। সন্তুকেও বলেছিল। সন্তু বিশ্বাস করেনি। তাই সন্তুকেও দেখিয়েছিল শৈবাল। এক অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে দিনগুলো কাটত সে সময়। ছোট ছোট গোঁফ উঠছে, গলার স্বর পাল্টে যাচ্ছে, গোকুলের বউকে স্নান করতে দেখলে সারা শরীরটা শির শির করত, গলাটা শুকিয়ে কাঠ। সামনাসামনি দেখা হলে খুব অপ্রস্তুত বোধ করত শৈবাল। শ্রাবণী বৌদির মুখের দিকে তাকাতে পারত না ও। কোনরকমে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। শ্রাবণীকে যে কেন বৌদি ডাকত শৈবাল কে জানে। পাড়ায় কমবয়সী সব বউদেরই বৌদি ডাকা রেওয়াজ। গোকুলদাকে শৈবাল পছন্দ করত না একদম। হাড় জিরজিরে কুঁজো মত চেহারা। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সব সময় লুঙ্গি পরে খালি গাযে ঘুরে বেড়াত সারা পাড়া।

অথচ এই গোকুলদাই সন্তুকে বাড়িতে রেখেছিল কত রাত্তিরে। শৈবালদের বাড়িও সন্তুর পক্ষে নিরাপদ ছিল না শেষের দিকে। পাড়ায় সবাই ভয় পেত। গোকুলদাই বাবাকে বলেছিল : 'মেসোমশাই, সন্তুকে আমাদের বাড়িতে পাঠায়ে দিবেন। আপনার বাড়িতে থাকলে জানাজানি হয়। কলতলার গায়ে ঠেকা ঘরটাতে সন্তু গিয়ে শুয়েছে অনেকদিন। গোকুল ঘোষের মা-বাবা থাকতেন ঐ ঘরে। সন্তু মেঝেতে শুত। ভোররাত্তিরে চলে যেত। বুড়োর হাঁপানির রোগ ছিল। প্রায় রাত্তিরই বিছানায় বসে বসে বুক চেপে দুলত। বুড়ি শুয়ে শুয়ে হাওয়া করতো বুড়োকে। বুকটা পেটের মধ্যে ঢুকে যেত। প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হত এই বোধহয় দমটা বন্ধ হয়ে যাবে। সন্তু শৈবালকে বলেছিল একদিন : 'বুড়োর হাঁপানি দেখে আমার দেশের কথা মনে হয়। গোটা দেশটা যেন বুক চেপে দুলছে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন ক্রাইসিস।'

শৈবাল প্রশ্ন করেছিল : 'তোর ভয় লাগে না ঘুমোতে ?'

অদ্ভুতভাবে হেসেছিল সন্তু : 'কিছুই লাগে না। বোধগুলো কিরকম নির্জীব হয়ে গেছে আজকাল। কেউ মরলেও দুঃখ হয় না আজকাল। বেঁচে থাকলে আছি, না থাকলে নেই। হয় আমি যাব, নয় শুয়োরের বাচ্চারা যাবে। ভাববার সময় নেই। ভাবাও ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন। কাজেই এক ঘুমে রাত্তির কাটে আজকাল। শুধু মাঝে মধ্যে ঘুম ভাঙলে বুড়োর হাঁপানির আওয়াজ কানে আসে। শ্রাবণী বৌদি ভোর চারটেয় ওঠে। উনুন জ্বালায়। চা করে দিয়ে ডাকে। আমি উঠে পড়ি। সারারাত্তির হাঁপিয়ে বুড়ো ভোরের দিকটায় একটু শোয় তখন।'

'কি করে তোর ঘুম হয় কে জানে।'

সন্তু কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল 'বুড়ো আমাকে খুব ভালবাসে জানিস তো ?'

'কেন ?'

'কেন কে জানে। বোধহয় মনে করে আমি আর বেশিদিন নেই, তাই।' সন্তু মুখ বেঁকিয়ে হেসেছিল।

সত্যিই তাই। সন্তুর জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল। যতই সবাই ভালবাসুক, ওকে আড়াল করার ক্ষমতা ছিল না কারুর। ও নিজেই সব আড়াল হারিয়ে ফেলেছিল।

মন্টু, বাবলু, বাসু ওরা সব কেমন আছে কে জানে। পুরো পাড়াটা চোখ বুজলেই স্পষ্ট দেখতে পায় শৈবাল। দোতলায় ওর ঘরের জানালা দিয়ে উত্তরে তাকালেই সেই পানাপুকুর। পানাপুকুরের ওপারে একটা ছোট্ট শিব মন্দির। পাশেই বিরাট গাছ। তার পাশেই খাটাল। সন্ধ্যে হতে না হতেই শিব মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসত। শাঁখ বাজত অনেক বাড়িতে। পাশে শিবুদের বাড়িতে রেডিওতে যে নাটক চলত, ওর ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পেত শৈবাল। পশ্চিম দিকে চৌধুরী বাড়ির মেয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়া মুখস্থ করত। শিবুর বোন গান শিখত মাস্টারের কাছে। শিবুর বোনটা দেখতে বেশ ভাল ছিল। খুব বেঁটে আর পা'গুলো ধনুকের মতো সামান্য বেঁকা বলে পাড়ায় সবাই ওকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট বলত। ওকে দেখলেই আবার মন্টুর বুক ধড়ফড় করত। ফার্স্ট ব্র্যাকেট নামটা বাসুর দেয়া। বাসু মন্টুর পেছনে লাগত খুব। মেয়েটাকে দেখলেই মন্টুকে কনুই দিয়ে ঠেলে বলত 'কি লেখাপড়া শিখবে গুরু। সরল জানো না ? কি করে ব্র্যাকেট থেকে বের করতে হয় ভুলে গেছ ?' মন্টু রেগে গেলে কথা বলতে পারত না—এমনিতেই তোতলা—রেগে গেলে কথা প্রায় আটতে যেত। মাঝে মধ্যে মরীয়া হয়ে গেলে বলত 'স-স-স-ব স-সময় ই-ইয়ার্কি ভাল লা-লা-গে না।' শিবুদের সামনের বাড়িতে ওপরের তলায় কমলাদি আর বীণাদি ভাড়া থাকত। দুই বোন। কমলাদি বিধবা। বীণাদির স্বামী আরেক জনের সঙ্গে থাকতেন। কমলাদির মেয়েটা পঙ্গু ছিল। কোমর থেকে পুরো নীচটা লুলো। একটা গাড়িতে বসে বারান্দায় রেলিং ধরে এপাশ ওপাশ বেড়াত। অথচ মেয়েটাকে দেখতে খুব মিষ্টি ছিল।

কেয়াদের বাড়িটা ছিল একটু দূরে। শৈবালের খুব ভাল লাগত মেয়েটাকে। বাবলুর দিদির বিয়েতে আলাপও হয়েছিল। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে তখন খুব লজ্জা লাগত ওর। খালি খালি শ্রাবণী বৌদির কথাটা মনে পড়ত। কেয়ার

মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না শৈবাল। কেয়া পরে বাবলুকে বলেছিল—'আপনার বন্ধু কি মেয়ে নাকি ?' খালি মাটির দিকে তাকিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে।' সত্যিই তাই, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই বুক কাঁপত সে সময়। আর, ওর বয়সী সব মেয়েদেরই বাচ্চা মনে হত সে সময়। শ্রাবণী বৌদির মত কেউ ছিল না। মাঝে মধ্যে সেই বিচিত্র রঙিন ছায়াছবির মতো ছোটবেলাটা ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। যে সময়টা সব কিছু ভাল লাগা এত নিরপরাধ। ছোটবেলায় বোধহয় সকলেই পথের পাঁচালীর অপু। কেউ গ্রামের, কেউ শহরের।

বড় হয়ে সব কিছু বদলে গেল। জীবন অন্যভাবে এগোল। বড় হয়ে যখন কেয়ার সঙ্গে আলাপ হল ভাল করে—কেয়াকে তখন আর ভাল লাগল না ওর। কেয়াকে যে সময় ভাল লেগেছিল সে সময় কেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেনি শৈবাল। বড় হয়ে ব্যাপারটা উল্টে গেল। কেয়া শৈবালের সামনে পড়লে লজ্জা পেত। চোখের দিকে তাকালে মুখ নামিয়ে নিত। কেয়া তখন শ্রাবণী বৌদির মতো বড়ো হয়েছে। কিন্তু শৈবালের চোখ পাল্টে গেছে ততদিনে। কলেজের বন্ধুরা অন্যরকম। কফি হাউসে যে সব মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হল কেয়ার তুলনায় তারা অনেক স্মার্ট। পাড়ায় বেশি ফিরত না শৈবাল। কফি হাউস সে সময় ওর তীর্থস্থান। কলেজে নতুন বন্ধু হল অনেক। স্কুলের বন্ধুরাও হায়ার সেকেণ্ডারীর পর অনেকে একই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হল।

কফি হাউসে প্রথম দিনটা স্পষ্ট মনে পড়ে এখনও। দোতলায় পৌঁছুতেই একটা অদ্ভুত গর্জনে হকচকিয়ে গিয়েছিল শৈবাল। অমিত, মনীশ, সঞ্জিত আর শৈবাল একটা টেবিল নিয়ে বসেছিল। সেই প্রথম আর সকলের দেখাদেখি কোল্ড কফি অর্ডার দিল শৈবাল। তেঁতো আর একটা বোঁটকা গন্ধে ওর গাটা গুলিয়ে উঠেছিল প্রথম চুমুকে। পরে নেশা ধরেছিল। অবশ্য কোল্ড কফি বলে নয়—পুরো কফি হাউসটাই স্বপ্নের মতো হয়ে গেল। ওদের মধ্যে অমিত ছিল সব থেকে স্মার্ট।—প্রথম প্রথম শৈবালের তাই মনে হত। চট করে যে কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে পারত। প্রথম দিন অমিত যখন বলেছিল ও বিশ্বাস করেনি। অমিত বলেছিল—'বেট ফ্যাল। আমি সামনের টেবিলের মেয়েগুলোর পাশে গিয়ে বসব।'

মনীশ বলেছিল—'ফেলছি। এক প্যাকেট চারমিনার।'

'চারমিনারে হবে না। ক্যাপস্টান চাই। চারমিনারে জাস্ট চোখ মারতে

পারি ।'

শৈবালের একটু ভয় আর লজ্জা লাগছিল। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ক্যাপস্টান বেশ দামী বাজী। মনীশ তাই ধরেছিল এবং হেরেছিল। অমিত গিয়ে একজন মেয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কি বলল শৈবাল শুনতে পায়নি। ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলছিল আর হাসছিল। কিছুক্ষণ পর একটা চেয়ার নিয়ে অমিত ওদের মধ্যে বসে পড়ল। মনীশ, সঞ্জিত আর শৈবাল হাঁ করে বসে রইল।

কয়েক মিনিট পব অমিত উঠে এল ওদের টেবিলে। হাত বাড়িয়ে বলল . এক টাকা পঁচিশ।'

মনীশ ভ্যাবলার মতো হাত ঢোকাল পকেটে। অমিত আবার বলল : 'মোগলাই খাওয়ালে আলাপ করিয়ে দিতে পারি।'

চমকে গেল ওরা তিনজন। মনীশ একগাল হেসে বলল :'মাইরি বলছিস ?'

অমিত চেয়ারে বসে মনীশের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল . 'দেরী করলে পাখী উড়ে যাবে। পাখীরা খুব ভীতু, ইডিয়ট।'

শৈবাল তাকিয়ে দেখতে পেল সামনেব টেবিলের তিনটে মেয়েই এইদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। সমস্ত মুখে রক্ত জমে গেল ওর। পা দুটো মাটির সঙ্গে যেন গেঁথে গেছে।

নেহাত পালিয়ে গেলে আরো লজ্জা বলেই শৈবাল সামনের টেবিলে গিয়ে বসেছিল। ও কোন কথা বলছিল না। অমিত আর মনীশ খুব গল্প করছিল। শৈবাল মুখ নীচু করে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল আর ওদের কথা শুনছিল। মাঝখানের মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল : 'একজন কিন্তু চুপ করে আছে।'

টেবিলের সবাই শৈবালের দিকে তাকিয়ে। মুখ তুলতে ভয় লাগছিল ওর। একবাব মনে হল উঠে একটা দৌড় লাগায়। অমিত পেছনে লাগল : 'ও ভাবুক, ভাবছে।'

মেয়েগুলো খিল খিল করে হেসে উঠল। শৈবালের বোধহয় জ্বর এসে গেছে গায়ে। অথচ উত্তর না দিলে ওরা আবার হাসবে। তাই, অনেক সাহস সঞ্চয় করে মুখ তুলল শৈবাল। মাঝখানের মেয়েটি একদৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে। মেয়েটার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাল শৈবাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল : 'অমি সত্যিই ভাবছিলাম।'

অমিত বলল : 'আমরা শুনতে পারি ?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মাঝখানের মেয়েটা কিন্তু এখনো

একদৃষ্টিতে শৈবালের দিকেই তাকিয়ে। শৈবাল ধীরে সুস্থে মেয়েটার দিকে তাকাল। তারপর মৃদু স্বরে বলল: 'খরগোস আর কচ্ছপের গল্প।'

মনীশ বললো: 'তার মানে?'

শৈবাল সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল: স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি অলওয়েজ উইন দ্য রেস।' মেয়েটি চোখ নামাল। আড়চোখে ব্লাউজটা দেখে নিল একবার। অকারণে কাপড়টা ঠিক করল কাঁধের কাছে।

অমিত টেবিল চাপড়ে বলল: মনীশ, দুটো মোগলাই।'

'দুটো কেন?' মনীশ অবাক।

'একটা আমার জন্য, একটা শৈবালের জন্য। শৈবাল হেভী দিয়েছে। দুরূহ কোণ থেকে এক লাথিতে গোল।'

অমিতের কথা বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠল। শুধু মাঝখানের মেয়েটি হাসল না। শৈবালের দিকে আবার তাকিয়ে চোখ নামাল। সেই সময়টা অন্য রকম ছিল। চোখে চোখে বিদ্যুত ঝলসাতো তখন। না বলে অনেক কিছু বলা হত।. না ছুঁয়ে ছোঁয়া যেত অনেক কিছু। প্রেমে পড়লে মেয়েরা সে সময় ছেলেদের চলন্ত ট্রামে লাফ দিয়ে উঠতে নিষেধ করত না। প্রথম চুমু খেয়েই বলত না, 'কথা দাও, বেশি সিগারেট খাবে না।'

প্রথম চুমু খাবার পর চন্দ্রাণী অন্য কথা বলেছিল। ঐ যে সেই মাঝখানের মেয়েটা—যার সঙ্গে অনেকখানি পথ একসঙ্গে হেঁটেছে শৈবাল। খুব সাধারণ দেখতে ছিল চন্দ্রাণীকে। খুঁটিয়ে দেখলে অনেক খুঁত চোখে পড়ে। নাকটা থ্যাবড়া। চোখ দুটো বড্ড কাছাকাছি। তবুও চন্দ্রাণীকে ভাল লাগত ওর। কাকে কেন ভাল লাগে—যুক্তি তর্ক দিয়ে অতশত বোঝানো যায় না। পরের জীবনে অনেকবার চন্দ্রাণীর কথা মনে পড়েছে। স্মৃতির নড়বড়ে সেলগুলো ঘেঁটেঘুঁটে টেনে বার করেছে ওকে। কি ছিল চন্দ্রাণীর? হয়ত কিছুই না। কিন্তু শৈবালের জীবনে চন্দ্রাণীই বোধহয় প্রথম মেয়ে যে শৈবালকে আর সকলের থেকে আলাদাভাবে জানতে চেয়েছিল। আরো অনেক সুন্দর মেয়ে ছিল, তারা চায়নি। তাই অন্য সকলের থেকে চন্দ্রাণীকে অনেক সুন্দর বলে মনে হত ওর। বাইরের চেহারাটা কখন যে অদৃশ্য হয়ে গেল মনে নেই ওর। শুধু মনে আছে ভেতরের মানুষটা অজস্র রঙীন টিউলিপের মতো শৈবালের হৃদয় জুড়ে বসে রইল।

একটা মেয়ের সঙ্গে একা লেকে যাওয়া সেই সময়ই প্রথম। আর সেই শেষ। সেই প্রথম জলের ধারে গায়ে গা ঘেঁষে বসা। সেই প্রথম চন্দ্রাণীর একটা হাত

শক্ত করে ধরে কোন কথা না বলে চুপ করে বসে থাকা। সেই প্রথম একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরা। সেই প্রথম ঠোঁঠে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খাওয়া। প্রথম চুমু অনেকটা প্রথম কোল্ড কফির মতো। থুতু, নোনতা, বিস্বাদ। অথচ সে এক অদ্ভুত নেশা। চন্দ্রাণীর শরীরটা কি নরম। অ্যাণ্ডারসন ক্লাবের এই পাশটা খুব নির্জন। গাছগুলোর কালচে ছায়া পড়েছিল জলে। এলোমেলো বাতাসে লেকের জলে ছোট ছোট ঢেউ। আর, সেই ঢেউ-এর মধ্যে শ্রাবণী বৌদির মুখ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল শৈবাল। চন্দ্রাণী কোন কথা বলছিল না—চুপ করে মুখ নীচু করে বসেছিল। ঘাসগুলো আঙুলে জড়িয়ে ছিঁড়ছিল।

'রাগ করেছ ?' কেন এ প্রশ্ন করেছিল আজ মনে পড়ে না শৈবালের। হয়ত সেই মুহূর্তে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিল।

'না।'

'তবে চুপ করে আছ কেন ?'

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখ তুলল চন্দ্রাণী। ছোট দুটো চোখ যেন সাগরের মত গভীর। অস্পষ্ট স্বরে চন্দ্রাণী বলল : 'তুমি কিছু চাইলে আমার দিতে ইচ্ছে করে'...একটু থেমে বলল—'কিন্তু... ' তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল ও।

'বলবে না ?'

'রাগ করবে না তো ?'

'না বললে আরো রাগ হবে।' শৈবাল অস্থির হয়ে উঠেছিল।

'বেশি চেও না। আমার ভয় লাগে।'

'ভয় ?' অবাক হয়েছিল শৈবাল।

'হ্যাঁ লাগে। আমার তো বেশি কিছু নেই। মনে হয় ফুরিয়ে যাব।' অন্ধকারে চন্দ্রাণীর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল না শৈবাল।

'ঠিক আছে, আর চাইব না।' সহজ সুরে বললেও শৈবালের কণ্ঠস্বরে অভিমানটা লুকোনো থাকেনি।

'তাহলে আরো ভয় লাগবে।'

'কেন ?'

'মনে হবে তুমি হারিয়ে যাচ্ছ।' শৈবালের ডান হাতটা দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরেছিল চন্দ্রাণী।

এদিকে কলকাতার আকাশ, বাতাস ভারী হয়ে আসছিল ক্রমশ। অনেকদিন ধরে বিরাট অজগর সাপের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কলকাতা নকশালবাড়ি

আন্দোলনের পর থেকেই এঁকেবেঁকে নড়তে শুরু করল। বহু বছর ধরে রাজনৈতিক দাবাখেলা সহ্য করে আসছিল মানুষ। দিনবদলের শপথ নিয়ে যাঁরা জোর গলায় চেঁচিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেক নেতাই ক্ষমতার লোভ সামলাতে পারলেন না। ক্ষমতাকে চূর্ণ করার জন্য পাল্টা ক্ষমতা চাই। আর সেই পাল্টা ক্ষমতার অংশীদার হতে গিয়ে প্রগতিবাদী অনেক নেতা সোজা পথ বাতলে দিলেন পার্টিকে। যে রাস্তা ধরে ওরা ক্ষমতা পেয়েছে—সেই রাস্তা ধরেই ক্ষমতা পেতে হবে আমাদের। সাধারণ মানুষকে সহ্য করতে হবে আরো কিছুদিন। পার্টি বড় করতে হবে। তার জন্য প্রচার প্রয়োজন। প্রচারের সব চেয়ে ভাল মাধ্যম হল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অনেকদিন থেকেই পাল্টা ছাত্র ইউনিয়ন চালু হয়েছিল এইসব কলেজগুলোতে। মানুষকে তারা বহুদিন ধরে বোঝাতে চেয়েছিলেন সব কিছু বদলে যাবে একদিন। কিন্তু কবে, কি করে সেটা কেউ ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন না। শুধু, লঙ্কায় গিয়ে গদীটা পাবার পর তাঁরা ঠিক রাম হয়ে যাবেন এরকম কথাবার্তা বলতেন। কাজেই কংগ্রেস সরকার যে যে পদ্ধতিতে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করতেন, বামপন্থী বিরোধী দলও প্রায় সেই সেই পদ্ধতিতেই পাল্টা ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা চালাতে লাগল—যদিও সুরটা ছিল অন্যরকম। নকশালবাড়ি আন্দোলন এই সময় মধ্যবিত্ত মানুষের ভাবনা-চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নকশালবাড়ি পুরোপুরি সার্থক আন্দোলন না হলেও তদানীন্তন বামপন্থী দলগুলোর ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পেরেছিল। এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়েছিল কলকাতা ও শহরতলীতে। পাল্টা ছাত্র য়্যুনিয়ন তৈরি হচ্ছিল। কিছু প্রকাশ্যে, কিছু গোপনে। কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে সেই চঞ্চলতা ধরা পড়ল। শুরু হল নতুন গ্রাফিতি। নকশালবাড়ি লাল সেলাম।

সন্তুর মধ্যে সেই অস্থিরতা দেখতে পেত শৈবাল। দিনের পর দিন সন্তু অন্যরকম হয়ে যেতে লাগল। শৈবালদের বাড়িতেও আসা কমে গেল অনেক। এরই মধ্যে একদিন চন্দ্রাণীকে নিয়ে যাদবপুর কফি হাউসে হানা দিল শৈবাল। ওখানে সন্তু ছিল না। যাদবপুর হস্টেলে ছিল। আনোয়ার'শা রোডের মোড়ে—ঠিক থানার পাশে। খবর পেয়ে হস্টেলে দেখা করতে গেল শৈবাল। চন্দ্রাণীকে বাইরে রেখে শৈবাল ভেতরে ঢুকল। দোতলায় অরূপের ঘরেই হানা দিল প্রথমে। ওখানেই ওকে পাওয়া যায় সাধারণত। ঘরে সন্তু ছিল না। শৈবাল চলে যাবার আগেই ছেলেটি প্রশ্ন করল: 'কাকে খুঁজছেন?'

'চন্দন আছে?' সন্তুর ভাল নাম ছিল চন্দন।

'আপনি ?' খুব উদাসীন গলায় প্রশ্ন করল ছেলেটি।

'আমি ওর খুড়তুতো ভাই। শৈবাল।'

'ও, আপনি শৈবালদা। আপনার কথা অনেক শুনেছি চন্দনদার কাছে। একটু বসুন, আমি ডেকে নিয়ে আসছি। বোধহয় তিনতলায় আছে।'

'চলুন, আমিও যাই।' শৈবাল এগোল।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ল—'না, আপনি একটু বসুন। আপনার যাওয়াটা ভাল হবে না।' একটু থেমে ফিসফিস করে বলল : 'চন্দনদা যে আছে এটাই জানার কথা নয় কারো।'

'কেন ?' শৈবাল অবাক হল।

'জানি না। আমি যেটুকু জানি, সেইটুকু বললাম।' শৈবালকে ঘরে বসিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটি।

ঘরে একা একা বসে একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগল শৈবাল। চন্দ্রাণীর জন্য। একা একা বাইরে কি করছে কে জানে। থানার সামনে বাস স্টপটায় দাঁড়াতে বলে এসেছে শৈবাল। কিন্তু রাস্তাঘাট নিরাপদ নয় মোটেই। কলকাতার যে কোন রাস্তা মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতো সে সময়।

একটু পরেই সন্তু ঘরে ঢুকল। অবাক হয়ে গেল শৈবাল। পরিষ্কার ফিটফাট চেহারা। চোখে একটা সুন্দর কালো ফ্রেমের চশমা। একটা চওড়া গোঁফ।

'কি রকম দেখাচ্ছে রে ?'

'জামাই-জামাই। কি ব্যাপার, কারো বিয়ে নাকি ?' শৈবাল হেসে ফেলল।

'ইমেজটা পাল্টাতে হল।'

'কেন ?'

'আজকাল দাড়ি-গোঁফ আর উসকোখুসকো চুল দেখলেই ধরছে। তোর খবর বল ? চা খাবি ?'

'না, তোকে একটু বেরোতে হবে। পারবি ?'

সন্তু অন্য ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটি বলল : 'আপনি যান-না চন্দনদা। এখন তো সব চুপচাপ। আজ আর কোন গোলমাল হবে বলে মনে হয় না আমার।'

'ঘুরে আসব, বলছিস ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ যান।'

সন্তু শৈবালকে বলল : 'পাঁচিল টপকাতে পারিস ?'

'কেন ?'

'তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারিস পেছন দিয়ে।' সন্তু এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

একটু ইতস্তত করে শৈবাল বলল : 'চন্দ্রানী পারবে না।'

চমকে পেছনে তাকাল সন্তু : 'ওকে নিয়ে এসেছিস। তোর কি মাথা খারাপ ?'

'আমি আনতে চাইনি। জোর করে এল।'

একটু চিন্তিত মনে হল সন্তুকে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বলল : 'ও কোথায় ?'

'বাস স্টপে।'

'পয়সা আছে পকেটে ?'

'আছে কিছু।'

'তবে আমার সঙ্গে আয়। একটা ট্যাক্সী নিয়ে তুলে নেব ওকে।'

করিডর দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে একবার পেছনে ফিরে তাকাল সন্তু। ঘরের ভেতরে ঢুকে গেছে ছেলেটি। একটু গলা তুলে সন্তু ডাকল : 'পার্থ।'

ছেলেটি মুহূর্তের মধ্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। সন্তু বলল : 'আমার ঘরেই থাকিস। কমল আসতে পারে। আমাকে না পেলে ও ফিরে যাবে।'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল · 'আপনি কখন ফিরবেন ?'

সন্তু হাসল : 'আমি এদের হাতে। তবে তাড়াতাড়িই ফিরব।'

অনভ্যাসে শৈবালের হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেল পাঁচিল টপকাতে গিয়ে। বস্তির মধ্যে দিয়ে গিয়ে যে জায়গাটায় ওরা বেরোল সে জায়গাটা শৈবালের পরিচিত নয় মোটেই। ছোট-মতো একটু খুপরি চায়ের দোকানের সামনে এসে সন্তু দাঁড়াল। মাথায় টাকওয়ালা একটা লোক আপন মনে কাজ করছিল দোকানে। সন্তু ওর দিকে না তাকিয়েই বলল : 'বংকা আছে ?'

লোকটি মুখ না তুলেই বলল : 'হ্যাঁ। ল্যাজে।' ল্যাজ কথাটা শুনে শৈবালের হাসি পেল। কিন্তু না হেসে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল শৈবাল। বেশ চিন্তা হচ্ছিল চন্দ্রানীর জন্য।

'একটা ট্যাক্সী লাগবে।' কথাটা বলে খুপরির ভেতরে ঢুকে দাঁড়াল সন্তু। তারপর আর কোন কথা নেই। লোকটা আপনমনে কাজ করে যেতে লাগল। সন্তু সিগারেট ধরাল একটা। শৈবালকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল : 'খাবি ?'

একটু পরে ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল গলি পেরিয়ে রাস্তায়। শৈবাল আর সন্তু ভেতরে ঢুকতেই ড্রাইভারের পাশের লোকটি নেমে পড়ল। তারপর, এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। ট্যাক্সীটা ছেড়ে দিতেই দুম্ করে

শৈবালের কোলের ওপর জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ল সন্তু। শৈবাল কিছু বলার আগেই বলল : 'চন্দ্রানীকে তুলে নিয়ে চুপচাপ সোজা যাবি। গোলপার্ক এসে গেলে বলিস।'

চন্দ্রানী বাস স্টপেই দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সীর ভেতুর থেকেই হাত নাড়ল শৈবাল। দরজার কাছে আসতেই শৈবাল বলল : 'উঠে পড়। কোন প্রশ্ন কোর না।' দরজা খুলে চন্দ্রানী ঢুকে শৈবালের পাশে বসে পড়ল।

'নমস্কার, আমি চন্দন।' শুয়ে শুয়েই কথা বলল সন্তু।

বাইরের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রানী হাসল : 'আমি শুনেছিলাম সন্তু।'

'এরকম বিট্রে আমার ভাই ছাড়া আর কে করবে। বিচ্ছিরি নামটা ঠিক শুনিয়ে দিয়েছে।'

'আমারও একটা বিচ্ছিরি নাম আছে। অনেকেরই থাকে। আমার ডাকনাম যেমন গুবলু। সন্তুর থেকে খারাপ।'

'না, শবুর হবে।'

শৈবাল হাসল—'কেন, আমি কি করলাম আবার!'

ওর কথার উত্তর না দিয়ে সন্তু চন্দ্রানীকে বলল : 'গুবলু, তুমি গান গাইতে পার ?' তুমি বলছি কিন্তু।'

'গুণগুণ করতে পারি। শোনাবার মতন নয়।'

'তাও একটা শোনাও। আমি তো আর অডিশন নিচ্ছি না।'

'তবে আগে ঠিক কর, কোথায় যাবি।' গোলপার্ক এসে গেছে। দামড়া ছেলে কোলে শুয়ে থাকলে মানায় না।' সন্তু উঠে বসল। গড়িয়াহাটার মোড় পেরিয়ে ট্যাক্সী বালীগঞ্জ প্লেস ধরে ফাঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল। সন্তু অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল চারপাশে। অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ।

'কোথায় যাবেন ?' আয়নাতে ট্যাক্সীওয়ালার মুখটা দেখতে পেল শৈবাল।

'সত্যিই তো কোথায় যাচ্ছি আমরা!' শৈবাল প্রশ্ন করল—'কোন রেস্টুরেন্টে যাবে ?' চন্দ্রানীর দিকে তাকাল শৈবাল। চন্দ্রানী কিছু বলার আগে সন্তু বলল : 'তোদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তোদেরকে একজনের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমার কোন আপত্তি নেই। তবে দু'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।' চন্দ্রানীর চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছিল।

ঘড়ি দেখে শৈবাল বলল : 'এখনো ঘণ্টা আড়াই সময় আছে—কতদূর ?'

'কাছেই, পণ্ডিতিয়া প্লেসে। ঘুরিয়ে নে ট্যাক্সী। সত্যি, তোদের কোন আপত্তি

নেই তো ?' সন্তু প্রশ্ন করল।

'আপত্তি কীসের ?' ট্যাক্সীর থেকে বেটার।' চন্দ্রানী সন্তুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

শৈবাল অন্য কথা ভাবছিল। বড়মাকে কথা দিয়ে এসেছিল ওকে ধরে নিয়ে আসবে আজ। কথাটা পাড়তেই ভয় লাগছে ওর। মুখের ওপর না করে দেবে হয়ত। সন্তুর মুডটা এখন অবশ্য খুব ভাল। কিন্তু বাইরেটা দেখে ভেতরটা বোঝা যায় না ওর। ভেতরে তোলপাড় হলেও মুখে কোনরকম ছাপ পড়ে না সন্তুর। চন্দ্রানীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সন্তুকে একবার অনুরোধ করে দেখবে শৈবাল।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের কাছে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। সোজা চলে গেলে রাস্তাটা একজায়গায় সরু হয়ে মনে হবে শেষ। ওখানেই ট্যাক্সীটা ছেড়ে দিল ওরা। রাস্তাটা কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। হেঁটে একটুখানি এগোলেই একটা সরু গলি বাঁদিকে বেঁকেছে। সেই গলিটাতে বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। বাড়িটার রং আগে কিরকম ছিল এখন বোঝা যায় না। সারা গায়ে এখন একটা কালচে ছোপ। প্লাস্টার বেরিয়ে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। পাশের গলি দিয়ে ঢুকে একটা ছোট দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়ল সন্তু।

'কে ?' মেয়েলি কণ্ঠে আওয়াজ এল ভেতর থেকে।

'চন্দন।'

দরজা খোলার আওয়াজ। ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই সন্তু বলল : 'অতিথি এনেছি।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন। শৈবাল আর চন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'আসুন।'

'আবার আসুন ! এসো বল। শৈবাল আমার থেকে পাক্কা আট দিনের ছোট। আর, এ হল চন্দ্রানী। ডাকনাম গুবলু।'

'ভাল হচ্ছে না কিন্তু'—চোখ পাকাল চন্দ্রানী।

'তাতে কি হয়েছে। সকলেরই ডাকনাম থাকে। আমার যেমন সন্তু।'

ভদ্রমহিলা চন্দ্রানীর দিকে ফিরে বললেন—'আজকে তোমার পেছনে পড়েছে বুঝি ?'

খুব ছোট দুখানা ঘর। এক ফালি বারান্দা। বারান্দার কোণে অড়াল দিয়ে রান্নাঘর। ওরা ঘরে ঢুকে বসল। এতক্ষণে ভদ্রমহিলার দিকে ভাল করে তাকাল

শৈবাল। ওদের থেকে বয়সে অনেক বড় মনে হল। সারা মুখে বসন্তের দাগ। রংটা অবশ্য বেশ ফর্সা। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। ওদেরকে বসিয়েই ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেলেন। সন্তু পেছন থেকে বলল—'চায়ের জলটা চড়িয়ে দেব ?'

ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে হাসলেন : 'না থাক। তোমার কাজের ছিরি আমি জানি। এখুনি সব তোলগোল করবে।'

অন্য দিকে তাকিয়ে চন্দ্রানী ফিসফিস করে বলল—'ঠিক হয়েছে।'

সন্তু ঠোঁট ওল্টালো। চন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে বলল : 'বাড়িতে ছেলেদের অকেজো হয়ে যাবার একমাত্র কারণ মেয়েরা। পাছে ছেলেরা ভাল করে ফেলে এটাই মেয়েদের ভয়। সেই ভয়ে মেয়েরা বাড়ির কোনকিছু ছুঁতে দেয় না ছেলেদের।'

'তাই ?' ভদ্রমহিলা হাসলেন।

'তাই না তো কি ?' সন্তু জোর গলায় বলল।

চন্দ্রানী বলল : 'ঠিক তার উল্টো। ছেলেরা করে না--জানে মেয়েরা না বলতেই করবে।'

'তুমি মান কথাটা ?' সন্তু ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বলল।

'হ্যাঁ মানি। কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্কে পারব না। দয়া করে একটু থাম। নতুন মানুষ এল বাড়িতে। আলাপই করতে দিচ্ছ না ভাল করে। চন্দ্রানী চল তো আমরা পালাই। ওর মুখটা বন্ধ হবে একটু। ভদ্রমহিলা হাসলেন। চন্দ্রানী উঠে মহিলার সঙ্গে চলে গেল বারান্দায়।

শৈবাল আর সন্তু চুপচাপ বসেছিল। নিস্তব্ধতা ভেঙে সন্তু হঠাৎ বলল : 'কি ব্যাপার বল তো। হঠাৎ এলি যে আজ ? মা পাঠিয়েছে ?'

চমকে উঠল শৈবাল। সন্তু কি করে জানল। সহজ হবার চেষ্টা করে শৈবাল বলল : 'বড়মা তো রোজই বলে। সে আর নতুন কি। চন্দ্রানীও দেখতে চেয়েছিল তোকে। তুই তো আর আসবি না। তাই আমরা এলাম।'

'তুই আমাকে বিশ্বাস করিস ?'

'হঠাৎ এ সব কথা কেন বলছিস ?' শৈবাল ক্ষুণ্ণ হল একটু।

'বিশ্বাস কর। আমারও ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় বাড়িতে যাই, তোদের সঙ্গে অনেকদিন আগেকার মতো কফি হাউসে বসে জমজমাট আড্ডা মারি। সব কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে।'

'একটা কথা রাখবি ?'

'রাখব কিনা জানি না, কিন্তু তুই বল।'

'পবীক্ষাটা দিয়ে দে। বডদা জ্যাঠা বলছিলেন তুই নাকি—বসবি না বলেছিস। তোদেব অনেকেই তো দিচ্ছে।'

বাধা দিযে সন্তু বলল 'বেশি বলিস না প্লীজ। আমাব খাবাপ লাগবে। যাবা দিচ্ছে তাবা দিক। বাবা অনেক কবে বুঝিযেছিল। বাবা বলেছিল—লেখাপডা শেখ তবে তো দেশেব উপকাব কববে।' একটু থেমে সন্তু ম্লান হাসল 'আমি ওসবে আব বিশ্বাস কবি না জানিস। এব পবেব যুক্তিগুলোও আমাব জানা। ভাল কবে পাস কবেছ এবাব একটা ভাল চাকবি নাও। হাতে টাকা না থাকলে দেশেব উপকাব হবে কি কবে। আমি পুবো এই সিস্টেমেব খপ্পব থেকে বেবিযে যেতে চাই।'

'ঠিক আছে, বাডি যেতে না পাবিস, একদিন ঠিক কব। বডমাকে একদিন এখানে নিযে আসি। বড্ড আকুলিবিকুলি কবছে বডমা।'

একটু চুপ কবে বইল সন্তু। একটু অন্যমনস্ক দেখাল ওকে। তাবপব অন্য দিকে তাকিযে বলল—'তা হয না বে। কোন জাযগাই নিবাপদ নয আজকাল। মাকে বলিস আমি ভাল আছি। খুব চেষ্টা কবব ভাল থাকতে। থাকগে, বাদ দে ওসব কথা। চন্দ্রানী কিন্তু দাকণ।'

'কি কবে বুঝলি ? তোব সঙ্গে তো ভাল কবে আলাপই হযনি।' ম্লান হাসল শৈবাল।

'খুব সোজা সোজা কথা বলে। ন্যাকামি নেই একদম।'

'ইনি কে ?' শৈবাল এই মহিলাব কথা জানতে চাইল সন্তুর কাছে।

'প্রতিমা দত্ত।' সন্তু আবো কিছু বলতে গিযে থেমে গেল। বাবান্দায ওদেব পাযেব আওযাজ পাওযা যাচ্ছে। সন্তু তাবপব বলল—'আবেকদিন বলব।'

প্রতিমা আব চন্দ্রানী ঘবে ঢুকল। দুজনেব দু'হাতে চাবটে কাপ। সন্তু উঠবাব ভঙ্গী কবে বলল 'কোন হেল্প লাগবে ?'

চন্দ্রানী হেসে ফেলে বলল 'প্লীজ একটু হেল্প ককন। চা'টা খেযে একটু উদ্ধাব ককন।'

শৈবাল হো হো কবে হেসে উঠল। প্রতিমা বললেন 'চন্দ্রানীব কাছে একদম জব্দ চন্দন।'

চাযে চুমুক দিযে সন্তু বলল—'জব্দ না ছাই। নেহাত গুবলু বলে কথা। না হলে এতক্ষণ একচোট যুদ্ধ হয়ে যেত।'

এত অনিশ্চযতা, এত দুঃখ, এত হাহাকারেব মধ্যেও মানুষেব জীবনে

ভালোলাগার মতো কত মুহূর্ত থাকে। শুধু সেই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে মনে রেখে বাকি সব যদি মানুষ ভুলে যেত। তা হয় না। বেদনার স্মৃতিগুলোও পাশাপাশি ছবির মতো ভাসতে থাকে। শুধু ওপরের ঘটনাটুকুর পর বাকিটা না থাকলে কত উজ্জ্বল হত এই জীবন। তারপর আর শৈবাল মনে করতে চায় না। মনে করতে চায় না যে সেদিন রাত্তিরে যাদবপুর মেন হোস্টেল রেড হয়েছিল। সন্তুকে না পেয়ে সন্তুর বিছানায় ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে পার্থ সেনকে কুপিয়ে মেরেছিল ওরা। মনে করতে চায় না যে সন্তু পরীক্ষা না দিয়ে গা ঢাকা দিল কলকাতায়, যেবার থার্ড ইয়ারে উঠল শৈবাল। মনে করতে চায় না যে চন্দ্রানী মুছে গেল, ওর বাড়ি থেকে জোরজার করে বিয়ে দিয়ে দিল চন্দ্রানীর। কেন হল ? কী করে হল ? বাস্তব জীবনে অনেক কিছু হয়—যা সিনেমায় হয় না। চন্দ্রানীকে আটকে দিয়েছিল বাড়িতে। শৈবাল দেখা করতে গিয়ে ফিরে এসেছিল। চন্দ্রানীর খবর পাঠিয়েছিল কিন্তু শৈবাল পায়নি। পেলেই বা শৈবাল কি করত। পাস করতে এখনো পুরোপুরি এক বছর বাকি। মনে মনে শৈবাল জানত ওর সাহস ছিল না। আর চন্দ্রানী কেন পালাল না ? শৈবাল মনে মন ভয় পেল। সত্যিই যদি চন্দ্রানী এসে শৈবালকে বলত—'আমি পালিয়ে এসেছি'—কি বলত শৈবাল। শৈবাল কি সাহস করে বলত পারত—'বেশ করেছ। আমি তোমার সঙ্গে আছি।' না, বলতে পারত না শৈবাল। তার মানে এই নয় যে শৈবাল-চন্দ্রানীর ভালবাসাটা মিথ্যে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত সত্যি। হ্যাপি এনডিং নাই বা হল। তাই বলে ভালবাসাটা মিথ্যে হয়ে যায়নি। সন্তু চলে গেল ঠিক। সবাইকে কষ্ট দিয়ে গেল এটাও ঠিক। তাই বলে সন্তুর বিশ্বাসটা মিথ্যে হয়ে যায়নি। সারাটা জীবন অবিশ্বাসের বোঝা নিয়ে না বেঁচে বুক ভর্তি যে বিশ্বাস নিয়ে ও চলে গেল সেই বিশ্বাসই একমাত্র সত্য। প্রতিমা দত্তর সঙ্গে একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল ওর। অথচ প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কথা দিব্যি মনে আছে ওর। মুখ ভর্তি বসন্তের ফুটি ফুটি দাগ, কপালে সিঁদুর, সেই উজ্জ্বল হাসি স্পষ্ট মনে আছে ওর। মুহূর্তগুলো হারিয়ে যায়নি, অক্ষয় হয়ে আছে হৃদয়ে।

ধাক্কায় মাথাটা জানালার সঙ্গে ঠুকে গেল ওর। দমদম এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল প্লেন। বম্বেতে পৌঁছতে দেরী হয়েছিল ঘণ্টাখানেক। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে কোনমতে কলকাতার ফ্লাইটা ধরতে পেরেছিল ওরা। খুবই ভাগ্যের কথা। অনেকেই কানেকটিং ফ্লাইটটা মিস করে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় শিউরে উঠল শৈবাল। সেই কলকাতা।

প্লেন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই দূরে বিমানবন্দরের বাড়িটা চোখে পড়ল ওর। রোদ্দুর ঝিকমিক করছে চারপাশে। নীচে গোটা দুয়েক বাস দাঁড়িয়ে। শৈবাল পৌঁছনোর আগেই প্রথম বাসটা ভর্তি হয়ে গেছে। শৈবাল একটু পাশে সরে দাঁড়াল। পরক্ষণেই লজ্জা পেল ও। কলকাতার ডবল ডেকারে এক পায়ে ঝুলতে ঝুলতে যেত মাত্র কয়েক বছর আগেও। কি অমানুষ হয়ে গেছে ও। বাসটা ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে। একছুটে বাসটার পাশে পৌঁছে গেল শৈবাল। বাসটার পাশে পাশে ছুটতে সুরু করল ও। বাসের মধ্যে সবাই হাঁ করে শৈবালের দিকে তাকিয়ে। বেশ কয়েকগজ ছুটে গেল শৈবাল। কিন্তু উঠতে পারল না কিছুতেই। বাসটা ওকে পেরিয়ে চলে গেল। সাহস পেল না বলে নয়, লাফ দিয়ে বাসে ওঠাই ভুলে গেছে শৈবাল।

পেছনের দিকে তাকাতে লজ্জা করল ওর। পেছনের সবাই হয়ত ওর দিকেই তাকিয়ে। কি ভাবল ওরা! হয়ত ওরা মুচকি মুচকি হাসছে। চলন্ত বাসে উঠতে জানো না তো ছোটা কেন? ওর নিজেরই অদ্ভুত লাগল ব্যাপারটা। পা দুটো কিরকম যেন অকেজো হয়ে গেছে। অথচ ক্লাস টেনে পড়তে ওর আর সন্তুর এটা একটা খেলা ছিল। বাস স্পীড নিলে সামনের দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে নামত। তারপর বেশ খানিকটা বাসের সঙ্গে ছুটে পেছনের দরজায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ত। বাসের লোকেরা সব ভয়ে হা হা করে উঠত। সেই ভয়টাতেই ওদের মজা লাগত। আজ ভয় পেয়ে গেল ও নিজেই।

বিল্ডিংটা বেশ খানিকটা দূর। হেঁটে যেতে অনেকটা সময় লাগল। বিল্ডিং-এর ছাদে অনেক লোক। সবাই রিসিভ করতে এসেছে বোধহয়। ওপরের দিকে তাকিয়ে শৈবাল ভীড়ের মধ্যে চেনা মুখ খুঁজতে লাগল। চোখে রোদ্দুর পড়ছে, ভাল করে দেখ যায় না। এত দূর থেকে কাউকেই চেনা যায় না। বিল্ডিং-এর কাছাকাছি যেতেই অনেক দূর থেকে কে যেন চীৎকাব করে ডাকল—'শবু!' চমকে ওপরে তাকাল শৈবাল। সবাই হাত নাড়ছে। সবাই চ্যাঁচাচ্ছে। কাউকে আলাদা করে বোঝা যায় না। কার গলা ছিল ওটা? বাবা? বড়দা জ্যাঠা? শংকরদার? অনেক চেষ্টা করেও ওটা কে ধরতে পারল না শৈবাল।

ভেতরে বেশ ভীড়। শৈবাল লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সুটকেসটা মাটিতে নামিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চারিদিকে চোখ বোলাল শৈবাল। একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় ভেতরটা কাঁপছে। অবাক হয়ে প্রতিটি কোণ, প্রতিটি মানুষকে লক্ষ করতে লাগল শৈবাল। একটা অপরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ল প্রথমেই।

দেয়ালগুলো কতদিন রং হয়নি ! এখানে ওখানে পানের পিক। কাউন্টারের ওপাশের লোকগুলোর মুখে কিরকম একটা বিরক্তির ভাব। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা না এলেই যেন ভাল হত। কথায় কথায় কিরকম খিঁচিয়ে উঠছে যেন লোকগুলো।

'কতদিন পরে এলেন ?' চমকে পাশ ফিরে তাকাল শৈবাল। প্লেনের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিটিমিটি হাসছেন।

'বছর দুয়েক।' শৈবাল মৃদু হাসল।

'দেখেই বুঝেছি।' গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোক বললেন।

'কেন ?'

'যে রকম এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, দেখেই যে কেউ মনে করবে আপনি নতুন এলেন।'

'নতুন ?' অবাক হল শৈবাল : 'নতুন কেন বলছেন ? এখানেই আমার জন্ম। এই মাটিতেই আমি বড় হয়েছি। এখানেই আমার সব। ভাল লাগা, খারাপ লাগা সব।' শৈবাল খুব জোর দিয়ে বলল। নিজের কানেই কণ্ঠস্বরটা অচেনা লাগল ওর।

'কিছু মনে করবেন না।' একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন ভদ্রলোক : 'আমার মনে হল তাই বললাম।'

শৈবাল হাসল : 'না, মনে করব কেন ? আপনি হয়ত খানিকটা ঠিক। অনেকদিন পরে এসেছি—তাই হয়ত একটু নতুন নতুন লাগছে। অন্যরকম লাগছে, ভাল লাগছে।'

'ভাল লাগছে ?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভদ্রলোকের মুখ। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই ম্লান হয়ে গেল মুখটা। অন্যদিকে তাকালেন। মুখ নীচু করে ফিসফিস করে বললেন : 'কিন্তু ওদের লাগে না।'

'এই যে, এদিকে এস। পাশপোর্ট চাইছে', দূর থেকে বৃদ্ধা ডাকলেন।

বৃদ্ধ এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : 'আপনি কিছু মনে করেননি তো ?'

'আরে না, না। আপনি এতবার বলছেন, আমার লজ্জা লাগছে।'

ভদ্রমহিলা আবার ডাকলেন : 'আঃ কি করছ কি, এস-না।'

বৃদ্ধ সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'কিছু বলবেন ?' শৈবাল হঠাৎ প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক শৈবালের দিকে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে

বললেন : 'আপনার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না কোনদিন।'

শৈবাল বিস্মিত হল : 'কি বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। আপনি যে সম্মান দিয়েছিলেন আমাকে, আমি সেটা গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু মনে রাখব চিরদিন।'

শৈবাল অবাক হয়ে গেল : 'কে বলল আপনাকে?'

'ঐ আমেরিকান মেয়েটা।'

'ওটা কিছু করাই নয়। আমার ওরকম হলে আপনিও করতেন।'

'জানি না। চারিদিকে সর্বত্রই তো কত লোক অপমান হচ্ছে। কার কি যায় আসে। পরে কোনদিন আর দেখা হবে না হয়ত। তাই, আপনাকে বলে ফেললাম। চলি।' হন হন করে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে সামনে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল শৈবাল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সব কিছু ভুলে গেল ও। অপরিচ্ছন্ন দেয়াল, মেঝেতে পানের পিক, এই ভীড়, এই লোকজন, সব। লাইন একটু একটু করে এগোতে লাগল।

মালপত্র চিনে বের করতেও সময় লাগল অনেক। বেশ কিছু দামী জিনিস ছিল ওর সঙ্গে। তাই রেড চ্যানেলটাই বেছে নিল শৈবাল। অনেক লোকজনকে দেখা যাচ্ছে কাঁচের ওপারে। এতদূর থেকে কাউকে চেনা যাচ্ছে না। একটা হাফপ্যান্ট পরা লোক অনেকক্ষণ থেকেই শৈবালকে লক্ষ্য করছিল। শৈবাল লাইনে দাঁড়াতেই লোকটা এসে প্রায় শৈবালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'কি আছে আপনার সঙ্গে?'

লোকটার হাবভাব দেখে অবাক হল শৈবাল : 'আপনি কে?'

লোকটা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বলল : 'আড়াইশ।'

শৈবাল তাজ্জব। লোকটা বাংলাই বলছে। কিন্তু কিছু মাথায় ঢুকছে না ওর। শৈবাল বলল : 'আড়াইশ কি?'

লোকটা এদিক ওদিক তাকাল। তারপর উদাসীন ভঙ্গীতে বলল—'বেরিয়ে যাবেন।'

'মানে?'

'আড়াইশ ব্যস। ক্লীন বেরিয়ে যাবেন। আর ডিউটি দিতে হবে না।' লোকটা এতক্ষণে কিন্তু একবারও শৈবালের দিকে তাকায়নি। দূর থেকে কেউ দেখলে মনে হবে লোকটা আকাশের সঙ্গে কথা বলছে।

শৈবালের মজা লাগল। ও অন্যদিকে তাকিয়ে বলল : 'পাঁচ।'

লোকটা চুপ করে রইল। তারপর আবার বলল : 'কি বললেন ?'

শৈবাল হেসে বলল : 'পাঁচ টাকা দেব যদি আমাকে ছেড়ে দ্যান।'

লোকটা অস্বস্তি বোধ করল একটু। একটু চুপ করে থেকে বলল : 'এমনি নিই না।'

অসম্ভব হাসি পাচ্ছে শৈবালের। এমনি নেয় না। কাজ করে তবে নেয়। কোন কথা না বলে চুপ করে গেল শৈবাল।

লোকটা দাঁড়িয়েই আছে এখনো। একটু পরে ফিসফিস করে বলল : 'সবুজ আছে ?'

বাংলা ভাষা যেন ভুলে গেছে শৈবাল। অবাক হয়ে বলল : 'সবুজ কি ?'

'ডলার।'

'আছে। চাই ?' শৈবাল গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল।

'বড় না ছোট ?' লোকটা ঘাড় চুলকালো একবার।

'বড়, মাঝারি, ছোট, পুঁচকে সবরকম। কিরকম চাই ?' শৈবাল গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল।

'বড় হলে এগার যাট। কত আছে ?'

'ছোট হলে ?'

'দশ আশি।'

'এত কম কেন ? শৈবাল অবাক হবার ভঙ্গী করল।

'এটাই রেট।'

শৈবাল হাসি চেপে বলল : 'ছোটদের দোষ ?'

'বিক্রী হয় না।' একটু চুপ করে থেকে লোকটি আবার বলল : 'দেবেন ?'

এইবার মুশকিলে পড়ল শৈবাল। এবার তো একটা কিছু বলতে হবে ওকে। এক মুহূর্ত ভেবে শৈবাল বলল : 'আপনার সঙ্গে আলাপ হোক আগে। আমি শৈবাল বাগচি। আপনার নাম ?'

এতক্ষণে উসখুস করতে লাগল লোকটি। শৈবাল আবার বলল : 'বারে,আমি যে নাম বললাম, আপনি বলবেন না ? এ কি রকম ভদ্রতা ?'

লোকটা ঘাড় চুলকালো আবার। তারপর হঠাৎ হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। শৈবাল পেছন থেকে ডাকল : 'এই যে দাদা। বড্ড দুঃখ দিলেন কিন্তু।'

লোকটা পেছন ফিরে তাকাল না একবারও। উদাসীন ভঙ্গীতে হেঁটে মিশে গেল ভীড়ের মধ্যে।

কাস্টমস কাউন্টারে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেল। সব কিছুই যেন

স্লো-মোশান। কাস্টমসের লোকগুলো আরাম করে গল্প করছে, একটা একটা করে সুটকেস খুলছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণ পর পর কাউন্টার ছেড়ে উধাও। শৈবাল অস্থির হয়ে উঠছিল ক্রমশ। ওদের কাউন্টারের ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ শান্তশিষ্ট। অবশ্য শান্ত না হয়ে উপায় নেই। জয়ঢাকের মতো একটা ভুঁড়ি বুশ শার্টের বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। খুব কষে তেল মেখে পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। শৈবালের সামনের পরিবারটি রওনা হতেই ভদ্রলোক শৈবালের দিকে একবার তাকিয়ে টুলের ওপর থেবড়িয়ে বসে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প জুড়লেন। এতগুলো লোক যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শৈবাল বলল : 'শুনছেন?'

কোন উত্তর নেই। খুব মজার কিছু গল্প হচ্ছিল নিশ্চয়। কথা শোনা যাচ্ছিল না—তবে ভদ্রলোকের হাসি আর ভুঁড়ির নাচ দেখে শৈবাল আন্দাজ করতে পারছিল। শৈবাল আবার বলল : 'শুনছেন?'

ভদ্রলোক এবার খুব বিস্মিত হয়ে শৈবালের দিকে তাকালেন। চোখমুখের ভঙ্গী দেখে মনে হল শৈবালের আস্পর্ধা দেখে উনি বেশ অবাক হয়েছেন। শৈবাল তা সত্ত্বেও অনুনয়ের সুরেই বলল : 'একটু যদি দেখে দেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।'

ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে শৈবালের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন : 'সময় হলেই দেখব।' কথাটা বলে ভদ্রলোক আবার পাশের লোকটির সঙ্গে গল্প জুড়লেন।

শৈবালের যে খুব ক্লান্ত লাগছিল তা নয়। সময়ের জন্যও চিন্তা নেই। এখনো পুরো ছুটিটাই শৈবালের হাতে। কিন্তু ভদ্রলোক যেভাবে কথা বললেন তাতে শৈবালের মনে হল কাস্টমস-এর লোকগুলোই বোধহয় মানুষ—বাকি সব বোধহয় প্রাণী। পেছনের ভদ্রলোক এতক্ষণ ঘটনাটা লক্ষ্য করছিলেন। একটু এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললেন : 'মেজাজ দেখেছেন?'

'দেখছি।'

'অথচ কিছু বলতে যান, বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে?'

'কিসের বারোটা?' শৈবাল অবাক হল।

'উরি বাপরে। ডিউটির চোটে অন্ধকার করে দেবে।'

শৈবালের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলল : 'ডিউটি রাগলে একরকম, না রাগলে আরেক রকম বুঝি?'

'কি বলবেন বলুন।'

শৈবাল কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই পাশের ভদ্রলোক বললেন—'ডাকছে আপনাকে।'

শৈবাল কাউন্টারের ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকাল। আঙ্গুল দিয়ে শৈবালকে মালপত্র টেবিলে রাখতে ইঙ্গিত করলেন ভদ্রলোক। কোন কথা না বলে শৈবাল সুটকেস দুটো তুলে রাখল। ভদ্রলোক বললেন—'ছোটটাও।'

হাতের এ্যাটাচিটাও শৈবাল তুলে দিল টেবিলের ওপর।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন : 'কি কি আছে ?'

শৈবাল বলল : 'সব বলব ?'

'ক্যামেরা, ইলেক্‌ট্রনিক গুডস, সুট লেংথ কিছু আছে ?'

'না।'

'কিছু নেই ?' বিস্ময়ের থেকেও ভদ্রলোকের গলায় একটা হাহাকার।

'হ্যাঁ, অনেক কিছু আছে। তবে আপনি যেগুলো বললেন সেগুলো নেই। তবে দু' সুটকেস ভর্তি জিনিস আছে। শৈবাল স্থির কণ্ঠে বলল।

'খুলুন।'

কম্বিনেশন ঘুরিয়ে শৈবাল দুটো সুটকেসই খুলে দিল। দু'হাত দিয়ে সুটকেস হাতড়াতে লাগলেন ভদ্রলোক। ওঁর ব্যস্ততা দেখে শৈবালের হাসি পেল। শৈবাল মৃদু স্বরে বলল : 'কিছু খুঁজছেন ? অনেক জিনিস এদিক ওদিক লুকোনো আছে কিন্তু। ভাল করে দেখবেন। কোথায় কি আছে আমিও ভাল জানি না।'

ভদ্রলোক কটমট করে তাকালেন শৈবালের দিকে। কিছু না বলে আবার মুখ ও হাত ডোবালেন সুটকেসে।

'এতগুলো শাড়ী কার ?'

'নাম বলতে হবে ?'

ভদ্রলোক সেকথার উত্তর না দিয়ে বললেন : 'নাম না বললেও চলবে। ডিউটি দিয়ে দেবেন। এ শাড়ীটা বেশ না ?' একটা শাড়ী পাশে সরিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক।

শৈবালের খটকা লাগল। ও প্রশ্ন করল : একটা পড়ে রইল ওপাশে।

ভদ্রলোক সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে অন্যান্য জিনিসপত্রর টেনে বের করতে লাগলেন। শৈবাল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ভদ্রলোক কিছু কিছু জিনিস একপাশে সরিয়ে রাখলেন। শৈবাল কথা না বলে চুপ করে রইল।

বেশ খানিকক্ষণ পর অন্বেষণ শেষ হল। ভদ্রলোক সুটকেস দুটো ঠেলে দিয়ে

বললেন—'নিন, পুরে ফেলুন।'

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল শৈবালের। ও স্থির কণ্ঠে বলল : 'আপনি খুলবেন, আর আমি পুরে দেবো—আমি কি আপনার চাকর?'

একটু থতমত খেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এরকম কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বোধহয়। মুহূর্তের জন্য নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ বুজে সুটকেস দুটো গুছিয়ে ফেললেন তাড়াতাড়ি। ডালা দুটো বন্ধ করে কটমট করে শৈবালের দিকে তাকিয়ে বললেন—'যান।'

'ওগুলো কি হল?' যেগুলো পাশে সরানো ছিল সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল শৈবাল। গোছানোর সময় টুকটাক করে অনেক কিছু পাশে সরিয়ে রাখছিলেন সেটা খেয়াল করেছিল শৈবাল।

ভদ্রলোক পাশে রাখা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে শৈবালের দিকে মুখ ফেরালেন। তারপর খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বললেন : 'অনেক ডিউটি পড়ে যাবে।'

লাইনে দাঁড়ানো সেই ভদ্রলোকের উপদেশ বাক্য মনে পড়ল শৈবালের, তবু জেদ চেপে গেল ওর। ও খুব শান্ত স্বরে বলল : 'কিন্তু ওগুলো আপনার জন্য আনিনি আমি।'

ভদ্রলোক মুখ তুলে হাসলেন। তারপর বললেন : 'ডিউটি দেবেন?'

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল ওর। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল এতক্ষণ। এই সেই কলকাতা। যে কলকাতায় আসার জন্য প্রত্যেক মুহূর্তে কষ্ট পেয়েছে শৈবাল। কুইন্‌সবোরো ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে নিউইয়র্ক স্কাইলাইনের দিকে তাকিয়ে অযুত আলোর ঝলকানির মধ্যেও যে কলকাতার স্বপ্ন দেখেছিল—এই কি সেই কলকাতা। শৈবালের বিশ্বাস হল না। ও আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল—'না।'

'না, মানে?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

শৈবালের চমক ভাঙ্গল। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলল : 'জিনিসগুলো দিন।'

'ভয় দেখাচ্ছেন নাকি।'

'না, আমি নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি। অনেকদিন পর দেশে ফিরলাম কিনা, নিজেকে কিরকম বোকা বোকা লাগছে। দেখি এদিকে আনুন। আর, কত ডিউটি হয়েছে বলুন। খামাখা না বলে-কয়ে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে নিচ্ছেন—এটাই কি রেগুলেশন নাকি আপনাদের?'

'আপনি কি আমায় রেগুলেশন শেখাচ্ছেন?'

'না, না ছিঃ।' জিভ কাটল শৈবাল—'এসব রেগুলেশন আমার নিজের এখনো ভালমত জানা নেই, আপনাকে শেখাব কি ? আপনি হলেন দেশের গর্ব। কিন্তু, ভুল লোককে ধরেছেন।'

'ধরেছি মানে ? আপনি আমায় ইনসাল্ট করছেন।' ভদ্রলোক চোখ পাকালেন।

শৈবাল হেসে ফেলল : 'আপনি খুব ভালভাবেই জানেন, আমি করিনি। আর অকারণে কিছু করলে আপনি এতক্ষণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তেন।'

পেছন থেকে এক ভদ্রলোক কাউন্টারের এই ভদ্রলোককে ডাকলেন। দুজনের মধ্যে ফিসফিস করে কিছু কথা হল। শৈবাল দূর থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক ফিরে এলেন কাউন্টারে। কোন কথা না বলে খসখস করে একটা ফর্মের ওপর কিছু লিখলেন। তারপর ফর্মটা শৈবালের হাতে দিয়ে বললেন—'এটা পে করে রিসিট নিয়ে আসুন।' শৈবাল কাউন্টার ছাড়ার আগে ডেস্ক থেকে জিনিসগুলো নিয়ে সুটকেসে পুরে রাখল।

বাইরে বেরোতেই ভীড়ের মধ্যে বাবাকে দেখতে পেল শৈবাল। বাবাকে অন্যরকম দেখতে লাগছে এখন। মুখ ঘুরিয়েই মা। শৈবাল চমকে উঠল। মা কিরকম বুড়ী হয়ে গেছে। চামড়া কুঁচকে গেছে। এই ক' বছরে মার চুলগুলো প্রায় সব পেকে গেছে। পূরবীদি, শংকরদা, মঞ্জু, পল্টু ওরাও এসেছে। এগিয়ে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করল শৈবাল। মাকে প্রণাম করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। এক দৃষ্টিতে শর্বাণী তাকিয়েছিলেন শৈবালের দিকে। শৈবাল পা ছুঁয়ে দাঁড়াতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন শর্বাণী। শৈবাল বলল : 'কাঁদছ কেন মা ?'

শর্বাণী বেশ কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে ফিসফিস করে বললেন : 'মনে হত, তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

'কেন ?' অবাক হল শৈবাল।

শৈবালের বুকে হাত রেখে শর্বাণী বললেন : 'কেউ তো ফিরতে চায় না।'

'আমি চাই, তুমি তো জানো মা।'

'বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই।'

শংকরদা হেসে উঠল—'না, কাকিমা। শবু রোগা হয়নি মোটেই। দাড়িটার জন্য রোগা দেখাচ্ছে বোধহয়।'

শৈবালের কিন্তু সত্যি খুব অবাক লাগছিল। প্রত্যেককেই বড্ড রোগা, শুকনো আর ময়লা মনে হচ্ছিল ওর। শৈবাল বলে ফেললো : 'ঠিক তার উল্টো।

আমাবই মনে হচ্ছে তোমরা সবাই কিরকম রোগা আর বুড়ো হয়ে গেছ।'

শংকরদা হাসল : 'সেটা আর আশ্চর্য কি ! এখনো যে বেঁচে আছে এদেশের মানুষ এটাই একটা বিরাট বিস্ময়।'

'খুব রেগে আছ মনে হচ্ছে।'

'মোটেই না। কিছুদিন যাক, তুইও বুঝতে পারবি। চল, ট্যাক্সী ধরতে হবে।' শংকরদা কোণের দরজাটা খুলে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোল।

রাস্তায় এসে আরো অবাক হয়ে গেল শৈবাল। গাড়ি আর ট্যাক্সীগুলো কিরকম অদ্ভুত—অনেকটা দেশলাই-এর বাক্সের মতো। চারিদিকে হর্ণের প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজে কানে তালা ধরার জোগাড়। রাস্তা ভর্তি আবর্জনা। ডাবের খোল, খালি বোতল, হাবিজাবি। অজস্র মানুষের ভীড়ে হাড় বের করা বেশ কয়েকটা গরু অলস ভঙ্গীতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক শীর্ণ বৃদ্ধের হাত ধরে একটা অন্ধ চাষা মেয়ে শংকরদার পাশে এসে দাঁড়াল ' পাঁচালীর মতো সুর করে মেয়েটা বলতে লাগল—'বাবা। সাতদিন খেতে পাই না, বাবা। বাবা, দুটো পয়সা দাও বাবা। মা দুটো পয়সা দাও মা।'

শৈবাল পকেটে হাত ঢোকাতেই শংকরদা বলল : 'কত লোককে দিবি ?'

খুব লজ্জা পেল শৈবাল। ও কি বদলে গেছে। আগে কখনো ভিখিরীকে পয়সা দিত না ও ; লজ্জা করত। মনে হত ভিখিরীকে পয়সা দেয়া, দয়া দেখানোর অহংকার ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ, আজকে নিজের অজান্তেই পকেটে হাত চলে গিয়েছিল ওর।

মেয়েটা চলে যেতে শংকর বলল : 'সুস্থ সবল শিশুদের চেয়ে ভিখিরীদের মধ্যে কানা, খোঁড়া ছেলেমেয়েদের বিরাট ডিমাণ্ড জানিস তো ?'

'মানে ?' শৈবাল অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখছিল।

'খুব সিম্পল। কানা, খোঁড়া হলে ভিক্ষে করে একটা ফিক্সড ইনকাম আছে। সুস্ত সবল ছেলেদের কে পয়সা দেবে বল। তাছাড়া, ভিক্ষে করাতে ঝুটঝামেলা কম। চুরি-চামারিতে রিস্ক বেশী। তাই, আজকাল অনেক সুস্থসবল ভিখিরীর ছেলেমেয়েরা কানা-খোঁড়া হয়ে যাচ্ছে পটাপট। বোধহয় নিজেরাই করে নিচ্ছে। এক একটা পঙ্গু ছেলেমেয়ে—এক একটা ফ্যামিলির পার্মানেন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট।'

শৈবাল বিশ্বাস করতে পারছিল না কিছু। ও তো একেবারেই ছেলে। অথচ সব কিছু অন্যরকম লাগছে। স্বপ্নের দেশটাকে বারবার চিনে নিতে চাইছে শৈবাল। কিন্তু রোগা, ময়লা, উলঙ্গ মানুষগুলোকে কিছুতেই চিনতে পারছে না

ও। হয় এরা বদলে গেছে কিংবা শৈবালের চোখ অন্যরকম হয়ে গেছে। কেন বারবার শৈবালের মনে হচ্ছে এই দেশটাকে ও কোনদিন দেখেনি। কেন মনে হচ্ছে এরা সবাই কোন অচিন দেশের অপরিচিত নাগরিক। বারে বারেই সহজ হতে চেষ্টা করছে শৈবাল কিন্তু কিরকম যেন নিজেকে বড্ড আলাদা বলে মনে হচ্ছে ওর। একটা অদ্ভুত লজ্জায় শরীর-মন অবশ হয়ে আসছে। এ কথাগুলো কাকে বলবে শৈবাল? কাকে বলবে যে এত ধরে ধরে যে মাটিতে ফিরে আসার জন্য ছটফট করছিল ও, সে মাটিতে পা দিয়ে ওর ভয় লাগছে। একটা অপরাধবোধ বুকের মধ্যে পাহাড় হয়ে বসে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে কিছুতেই সরাতে পারছে না শৈবাল।

একটা ট্যাক্সীতে সবাইকে ধরল না। শংকরদা বাবাকে বলল : 'মেসোমশাই, আপনারা চলে যান। আমি আর পল্টু বাসে চলে আসছি।'

শৈবাল আপত্তি করল : 'কি দরকার, আর একটা ট্যাক্সী নিয়ে নাও না শংকরদা।'

শংকরদা বলল : 'দূর দূর। শুধু শুধু আবার একগাদা টাকা খরচা। তাছাড়া এখন তো বাস সব ফাঁকা।'

শৈবাল বলতে যাচ্ছিল—'কি এমন টাকা।' কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল শৈবাল। টাকার কথাটা বলা উচিত হবে না। ও শুধু বলল : 'একটা তো দিন। আমি তো আর রোজ রোজ আসছি না।'

পল্টু বলল : 'শবুদা, আমরা এক্ষুনি পৌঁছে যাব।'

শৈবাল চুপ করে গেল। ট্যাক্সীওয়ালার পাশে অঞ্জু আর বাবা। পেছনের সীটে ও মাঝখানে। একপাশে মা, অন্যপাশে পূরবীদি। এতক্ষণে পূরবীদির মুখটা ভাল করে দেখতে পেল শৈবাল। পূরবীদির সেই সোনার মত রং ঝলসে গেছে কিরকম। একটা কালচে ছোপ লেগেছে সারা শরীরে।

'তুমি বড্ড কালো হয়ে গেছ।'

পূরবীদি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল : 'তোর কি সুন্দর চেহারা হয়েছে রে!'

'কেন আগে কি খারাপ ছিলাম?'

পূরবীদি হেসে ফেলল : 'না, তা নয়। তবে এখন আরো সুন্দর।'

'আর কিছু হবে না জানো তো?' শৈবাল মুচকি হাসল।

'কেন?'

'মনে নেই সন্তু বলতো—সুলেখা ব্ল্যাক। যতই ঝাড়াপোঁছা কর ভদ্রলোকের এক কথা।' কথাটা বলেই শৈবালের মনে হল ও ভুল করেছে। দুম করে সন্তুর

কথাটা তোলা ওর উচিত হয়নি। পূরবীদি ম্লান হেসে মুখ নীচু করলেন।

'কতদিন থাকবে শবুদা ?' সামনে থেকে প্রশ্ন করল পণ্টু।

'বেশ কিছুদিন আছি। মাসখানেক তো বটেই। তারপর দেখা যাক।'

এঁকেবেঁকে কলকাতা শহরের ওপর দিয়ে ট্যাক্সীটা যাচ্ছিল। অবাক হয়ে শহরটাকে মনে করতে চেষ্টা করছিল ও। কলকাতা থেকে পাবনা যাওয়ার পথে অনেক ছোটবেলায় শৈবাল যেমন বারবার পথগুলোকে চিনতে চেষ্টা করত, শৈবাল সেইরকম ভাবে ওর এই প্রিয় শহবটাকে চিনে নিতে চাইছিল।

'আমেরিকাতে রাস্তাঘাট অনেক সুন্দর, না ?' পূরবীদি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ অনেক চওড়া।'

পণ্টু বলল. 'ওখানে তো সকলেরই গাড়ি আছে, না ?'

শৈবাল হাসল: 'সকলের না হলেও বেশির ভাগ লোকেরই আছে।'

'তুমি সব সময় গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াও ?'

পণ্টুর প্রশ্নে শৈবাল হেসে ফেলল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল: 'মাথা খারাপ। আমার হয়ে চাকরীটা কে করে দেবে বল ? বাস বা ট্রেনের থেকে আমার অফিসে গাড়ি চড়ে যাওয়া সোজা। তাই গাড়ি কিনেছি একটা। যারা ম্যানহাটানে কাজ করে তারা ট্রেনে-বাসে যায়। কারণ গাড়ি পার্কিং করা যায় না। গ্যারেজে রাখতে গেলে প্রচুর খরচা।'

'ওখানকার ট্রেন-বাসের সঙ্গে এখানকার তুলনাই হয় না।'

'কে বলল। ওখানেও প্রচণ্ড ভীড়, ধাক্কাধাক্কি।'

'ভ্যাট। হতেই পারে না। এখনো ওঠনি তাই। পাবলিক বাসে তো উঠতেই পারবে না। আর মিনি বাসে চড়লে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুদিনে স্পণ্ডেলাইটিস হয়ে যাবে তোমার।'

'অ্যাই, তুই বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস ?' শৈবাল হেসে ফেলে বলল: 'আমিও কলকাতার ছেলে।'

'তুমি আমেরিকায় গেছ কত বছর ?'

শৈবাল কিছু বলাব আগেই শর্বাণী বললেন—'প্রায় ছ' বছর।'

'ও' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করল পণ্টু: 'তবে তুমি আনফিট হয়ে গেছ একদম। সঙ্গে এসকর্ট নিয়ে বেরোতে হবে তোমায়। রাস্তাঘাট চিনতেই পারবে না।'

কথাটার ভেতরে অনেকখানি সত্যি। কলকাতার রাস্তাঘাট স্পষ্ট চিনতে পারছিল না শৈবাল। গরমটাও যেন বড্ড বেশি লাগছে। মুখ চোখ জ্বালা করছে কিরকম। ট্যাক্সীতে অসম্ভব ঝাঁকুনি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত

হাড়গোড় তালগোল পাকিয়ে যাবে। পেটে একটা চিনচিনে ব্যথা। শৈবালের গলা শুকিয়ে আসছে।

'কোক পাওয়া যাবে কোথাও ?'

'কি ?' পূরবীদি তাকালো। তারপরই পল্টু আর পূরবীদি একসঙ্গে হেসে উঠল। পূরবীদি বলল : 'কোক পাওয়া যায় না। ক্যাম্পা-কোলা অথবা লিমকা।'

পল্টু হাসল : 'ক্যাম্পা-কোলা খেও না শবুদা—এক্কেবারে অ্যালোপ্যাথি মিক্‌শ্চারের মতো খেতে, বরঞ্চ লিমকা বেটার।'

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ পর কথা বললেন। অল্প হেসে পল্টুকে বললেন : 'তোরা বড্ড লেগেছিস ছেলেটার পেছনে। একটা দোকানের সামনে দাঁড় করা। লিমকা কেন ?'

চন্দ্রনাথ খুবই অল্প কথা বলেন চিরকাল। কিন্তু বাবার গলা শুনে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছিল শৈবালের।

ট্যাক্সী দাঁড়াতেই শৈবাল, পল্টু আর পূরবী নেমে পড়ল। পল্টু ইয়ার্কি মারল আবার—'এটা কি জায়গা বল তো ?'

শৈবাল সামনের দিকে তাকিয়ে বলল : 'এটা জমল না। ওই তো গড়িয়াহাট মোড়।' শৈবাল চিনতে পারল বটে কিন্তু না চেনাও আশ্চর্য ছিল না কিছু। ফুটপাথের ওপর সারি সারি অসংখ্য ছোট ছোট দোকানে গড়িয়াহাট মোড়ের চারটে কোণ ছেয়ে গেছে। লোকজনও যেন অসম্ভব বেড়েছে। চারিদিকে শুধু মাথা আর মাথা।

ফিরে এসে শর্বাণীকে প্রশ্ন করল শৈবাল : 'তুমি লিমকা খাবে মা ?'

শর্বাণী মাথা নাড়লেন : 'না, বাবা। ঢেঁকুর উঠবে খালি। আমার ভাল লাগে না।'

চন্দ্রনাথ বললেন : 'আমার জন্য একটা আইসক্রীম সোডা আনিস। আমার লিমকা-টিমকা ভাল লাগে না।'

শৈবাল পয়সা দিতে যেতেই পূরবীদি ধমকে উঠল—'অ্যাই, খবরদার। ছোট একটা ব্যাগ থেকে টাকা বের করল পূরবীদি।

'আমাকে দিতে দাও না, বাবা।' শৈবাল অনুনয়ের সুরে বলল।

পূরবীদি চোখ পাকিয়ে বলল : 'আমি কত বছরের বড় খেয়াল আছে ?'

শৈবাল হাসল : 'তিন বছরও পুরো নয়।'

'আগে প্রণাম করতিস বিজয়ার সময়, মনে পড়ে ?'

'হ্যাঁ পড়ে। না করলে তুমি চোখ পাকাতে তাই।'

'লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিলি মনে আছে? হাতে-পায়ে ধরে কেঁদেছিলি মনে আছে? কি বলেছিলি মনে আছে?'

'মনে আছে। বলেছিলাম—তুমি ন'দি বড়দা জ্যাঠাকে না বলে দাও—প্রত্যেক বিজয়ায় তোমায় প্রণাম করব।' শৈবাল যেন ছোটবেলাকার স্বপ্ন দেখছে।

'কতদিন প্রণাম করিসনি, জানিস?' পূরবীদির গলাটা বদলে গেল হঠাৎ।

একটা দলার মতো কি যেন আটকে গেল শৈবালের গলায়। শৈবাল প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে বলল: 'আমি কিছু ভুলিনি। দিনের পর দিন তোমাদের সকলের কথা ভেবে কাটিয়েছি, বিশ্বাস কর।'

পূরবীদি হাসল। মার্চের শেষে নিউইয়র্কের অসংখ্য টিউলিপ হয়ে গেল মুখটা। একদৃষ্টিতে শৈবালের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: 'খুব ভয় লাগছিল।'

'কেন?'

'কেন আবার কি?' পাশ থেকে পল্টু বলল: 'একমাস ধরে পূববীদি ক্রমাগত বলে চলেছে—হ্যাঁরে পল্টু, শবু সাহেব হয়ে যায়নি তো?'

শৈবাল ম্লান হাসল: 'সাহেব হতে আর দিলে কই তোমরা? একটা অদৃশ্য সুতো নিয়ে সবাই মিলে এমন বেঁধে রেখেছ আমাকে।'

পূরবীদি মিটিমিটি হাসছিল: 'আমি কি ঠিক করেছিলাম জানিস তো?'

'কি?'

'ঠিক করেছিলাম তুই যদি বদলে যাস তাহলে তোর সঙ্গে আর কথাই বলব না।'

'কি মনে হচ্ছে এখন?'

'চলবে।'

'চলবে মানে?'

'মানে মেজে ঘষে নিলে তুই আবার আগেকার শবু দাঁড়িয়ে যাবি।'

শৈবালের বুক ভর্তি যেন সূর্য। ধুলো, ময়লা, অজস্র মানুষের ভীড় সব কিছু পেরিয়ে অসংখ্য আলোকবিন্দু শৈবালের অন্ধকার মনে বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল। জরাজীর্ণ শহর, উলঙ্গ ভিখিরীর দল, উপচে পড়া আবর্জনা, এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে শৈবাল সেই আশ্চর্য প্রদীপটা খুঁজে পেল হঠাৎ।

নিউইয়র্কের বাড়ি, গাড়ি, স্কাইস্ক্র্যাপার, হাজার ঐশ্বর্যের মধ্যে নির্বাসনের যে গ্লানিটা প্রত্যেক মুহূর্তে বয়ে বেড়াত শৈবাল, সেটা আর নেই। পূরবীদির ছোট্ট ব্যাগ থেকে বের করা পাঁচটা টাকার জন্য রকফেলারকেও এখন উপেক্ষা করতে পারে ও। লিমকাতে চুমুক দিল শৈবাল।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল পাঁচটা। বাড়ি ভর্তি এখন অনেক লোক। সবাইকে চিনতে পারল না শৈবাল। শৈবাল ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিল। অনেকদিন আগেকার তোলা দাদু-দিদির ছবিটা দেয়ালে ঝুলছে। ছবিতে পরানো মালাটা শুকিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। শৈবালের মনে হল দাদি যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। অনেকদিন আগেকাব ভোররাত্তিরে পাবনার সেই উঠোনের কথা মনে পড়ছিল ওর। দোতলায় সেনকুঠুরির দরজা খুলে দাদি লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াত। চন্দ্রনাথ চীৎকার করে বলতেন—'মা আবার।' দাদির কালো মুখটা লণ্ঠনের আলোয় চকচক করত। ভীড় জমে যেত উঠোনে। ইঁদারার পাড়ে কালোজাম গাছটা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেবোত। কালোজাম গাছের পেছনের পাঁচিল পেরিয়ে বাণী সিনেমা হলের দোতলার সিঁড়িগুলো স্পষ্ট দেখতে পেত শৈবাল। ভীড় জমে যেত উঠোনে। চন্নাদা, হোঁদল, পূরবীদি ঘুমচোখে উঠোনে এসে দাঁড়াত। প্রায় শৈবালের ঘা ঘেঁষে। শিরিসের আঠা দিয়ে ঘুড়ির মাঞ্জা। ছোটকুঠুরির ঘরে চোর চোর খেলা। ঢিল দিয়ে পাড়া মধুমাখা আম পেড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়া। ইছামতীর জলে হাপুস হুপুস। এত বছর পরে কলকাতার বাড়ির এই ছোট্ট ঘরে দাঁড়িয়ে শৈবালেব মনে হল অনেকদিন পব গরমের ছুটিতে ও আবার পাবনা বেড়াতে এসেছে।

'শবু, তোর মুখটা একটু দেখি ভাই।'

মুখ ঘুরিয়ে শ্রাবণী বৌদিকে দেখতে পেল শৈবাল। কত রোগা হয়ে গেছে শ্রাবণী বৌদি। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে শৈবালের দিকে তাকিয়ে রইলেন শ্রাবণী বৌদি।

'চেনা যায়?' শৈবাল মিটিমিটি হাসল।

'ও মাসীমা, কি সুন্দর চেহারা হয়েছে শবুর। আপনি যে বললেন রোগা হয়ে গেছে। রংটাও ফর্সা হয়েছে কত। হবে না? ইংল্যাণ্ড, আমেরিকায় গেলে সকলের রং ফর্সা হয়ে যায়। হ্যাঁরে, আমাকে চিনতে পারছিস?'

আজকে শ্রাবণী বৌদির মুখেব দিকে তাকাতে একটুও লজ্জা পেল না শৈবাল। অল্প হেসে বলল: 'তোমাদেরকেই তো শুধু চিনি।'

ঠোঁট উল্টোলো শ্রাবণী বৌদি: 'ও মাসীমা, ছেলের এবার একটা বিয়ে দিন।

অবশ্য ওর তো এখন মেমসাহেব দেখা চোখ। এখানকার মেয়েদের কি ওব পছন্দ হবে ?'

কথাটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল শৈবাল। শবর্ণী হাসতে হাসতে বললেন—'সে আর বলতে। ওর এই ছন্নছাড়ার মতো একা একা ঘুরে বেড়ানো বার করছি আমি। এবার বিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। মেয়ে আমি দেখে রেখেছি।'

চমকে উঠল শৈবাল। কথাটাকে ঘোরানোর জন্য বলল : 'ক্ষিধে পেয়েছে মা।'

শবর্ণী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন : 'কি খাবি ? অবেলায় ভাত খাবি, না কি গরম গরম লুচি ভেজে দেব ?'

শৈবাল বলল : 'ভাত মা ভাত। অবেলা আবার কি ? ওখানে থেকে থেকে এমন পেটুক হয়েছি, তুমি ভাবতেও পারবে না ?'

শবর্ণী চীৎকার করে ডাকলেন : 'ও পুষ্প। তাড়াতাড়ি এদিকে এস। খাবারগুলো গরম কর একটু। আর ভাত চড়াও।'

ঘোমটা দেয়া একটা মাঝবয়সী মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। শবর্ণী বললেন 'ঐ যে আমার ছেলে।'

' পুষ্প বোধহয় লজ্জা পেল। ঘোমটাটা আরো খানিকটা টেনে ও শৈবালেব দিকে ফিবে দাঁড়াল।

কড়িডোরটা পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল শৈবাল। উঠোনটা সিমেন্ট করা। ঝকঝকে পরিষ্কার ন্যাড়া। শৈবাল : 'শতদলি জবা গাছটা কই মা ?'

'ওটা কেটে ফেলা হয়েছে গত বছর। উঠোনটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বড্ড বড হয়ে গিয়েছিল গাছটা। ওখানে এখন গাড়ি থাকে।' শবর্ণী কাজ করতে কবতে গল্প করছিলেন।

অবাক হয়ে গেল শৈবাল : 'কার গাড়ি ?'

'পালবাবুর। মাসে দেড়শ করে ভাড়া দেন।'

শৈবাল চুপ করে গেল। শবর্ণী কিছুক্ষণ পরে বললেন : 'তোর শোবার ঘরের বাইরে মাধবীলতা গাছটাও ছেঁটে দিতে হল।'

'কেন ?' আর্তনাদ করে উঠল শৈবাল।

'সে এক বিরাট হ্যাঙ্গাম। লতা পাতা ছড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। আর, ঘর ভর্তি শুঁয়োপোকা। ছোট করে দেওয়া হয়েছে। ওটা আবার বাড়ছে।'

শৈবাল কোন উত্তর না দিয়ে শোবার ঘরে গেল। জানালাটা ফাঁকা। পাঁচিল

পেরিয়ে সামনের পুকুরটাকে দেখতে পেল না শৈবাল। তার বদলে দৈত্যের মতো মুখ বার করে ইঁট-কাঠ-সিমেন্টের পাহাড়। তবে ফাঁক দিয়ে আকাশটা দেখা যায় না। পেছনের শিব-মন্দির তো নয়ই। অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশ। পাশে শিবুদের বাড়ির তিনতলা উঠছে।

পূরবীদির গলার আওয়াজ পেল শৈবাল : 'বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি হচ্ছে। এক একটা ফ্ল্যাট দেড় লাখ টাকায় বিক্রী হচ্ছে শুনছি।'

'বড়দা জ্যাঠা, বড়মা কেমন আছে পূরবীদি ?'

'মা শুয়ে পড়েছে। থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি। বাবাকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। টানতে ইচ্ছে নেই, তবু জোর করে নিঃশ্বাস টেনে যাচ্ছেন।'

'তুমি ?'

পূরবী এ কথার কোন উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বলল : 'কাল একবার আসিস। বাবা খুব. তোর কথা বলছিল ক'দিন।'

'হ্যাঁ যাব। একবার নয়, অনেকবার। ইন্টারভিউ নিয়ে এসেছি, ভালো মত একটা চাকরী পেলে থেকেও যেতে পারি। আমেরিকা আমার ভাল লাগে না।'

পূরবীদি অবাক হল : 'সত্যি ?'

'তোমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলতে ভালো লাগে না।'

পূরবীদি লজ্জা পেল বোধহয়। একটু চুপ করে থেকে বলল : 'খবরদার।'

'মানে ?'

'খবরদাব, থাকার চেষ্টা করিস না এখানে।'

শৈবালের মনে হল ও ভুল শুনছে। তাই ও আবার বলল : 'কেন বল ত ?'

'আর কে কি বলবে জানি না। তবে আমি বলছি তুই থাকিস না। এসেছিস, বেশ কিছুদিন থাক। আনন্দ কর। কিন্তু থাকবার কথা মাথাতেও আনবি না।' পূরবীদিকে চিনতে পারছে না শৈবাল। অন্ধকারে পূরবীদির মুখটাও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে।

'তুমি কেন বলছ ?' শৈবাল তবু জানতে চাইল।

'ঠিকই বলছি। আমরা আছি, আমরা জানি।'

'কি জানো ? আমেরিকা আমার দেশ নয়। প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হয় আমি ফালতু ; আমার কোন পরিচয় নেই, কেউ আমাকে পোঁছে না। একটা অসহ্য যন্ত্রণা। তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।'

'আমাদের কোন পরিচয় আছে ? কে পোঁছে আমাদের ? এখানে আমরাও ফালতু।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আজ না হয় কাল করবি। একবার ভেবে দ্যাখ সন্তু যদি বেঁচে থাকত, যদি তোর মত পাশ করত, চাকরি করত—তাহলে ওর পাশাপাশি আরো তিনটে মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারত। স্বার্থপরের মতো ও চলে গেল, আমরাও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।'

'সন্তু একটা আদর্শ নিয়ে গেছে।' শৈবাল জোর গলায় বলল। অন্ধকার ঘরে নিজের গলাটা কিরকম অদ্ভুত শোনাল।

'কলকাতা ঘুবে আদর্শটা দেখে আয়। পচে গন্ধ বেরোচ্ছে কিরকম ? মাব মুখের দিকে তাকিয়ে দেখিস আদর্শের ছবিটা। আদর্শ ভাঙ্গিয়ে বত্রিশ টাকা কিলো মাছ কেনা যায় না। অবশ্য তুই এসব কথা বুঝবি না।' পূরবীদি চুপ করে গেল হঠাৎ।

বুকে যেন ধাক্কা দিল কেউ। শৈবাল বলল : 'কেন ?'

'তোর পকেটে অনেক টাকা। তোরা ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝতে পারবি না।'

আহত বোধ করল শৈবাল। একটা ব্লেড দিয়ে নিঃশব্দে কেউ যেন হৃৎপিণ্ডে আঁচড় কাটল। শৈবাল কি উত্তর দেবে ? উত্তর দেবার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও এই মুহূর্তে। এই ঘরে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সাঁড়াশি দিয়ে গলাটা টিপে ধরে রাখলে যেমন হয। জানালার বাইরে আকাশ দেখতে পেল না শৈবাল। মুখ ঘুরিয়ে পূরবীদির দিকে তাকাতে পারছিল না ও। একটা অসম্ভব লজ্জা ওকে ঘিরে ফেলছে ক্রমশ।

'অ্যাই ভোঁদড।' পূরবীদি ডাকল।

শৈবাল কোন উত্তর দিল না।

'আমাব দিকে তাকাবি না ?'

অনেক চেষ্টা। করে শৈবাল মুখ ফেবাল। পূরবীদি বোধহয় হাসছিল।

'একবারটি মুখ তোল্।'

শৈবাল তাকাল।

পূরবীদি বলল : 'আমবা সবাই তোকে ভালবাসি জানিস ?'

শৈবাল কোন উত্তর দিল না।

'আমরা সবাই একদিন সন্তুকে বাড়ি ফিরতে বলেছিলাম, মনে পড়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা, মা, ন'কাকা, কাকিমা, আমি, তুই, সবাই।'

'হ্যাঁ।'

'আজ আমি বলছি তুই আসিস না। তুই যেখানে আছিস, ভাল থাকিস। আমাদের প্রত্যেকের সারা জীবনের টুকরো টুকরো স্বপ্নগুলো জুড়ে তুই। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসিস।' শব্দগুলো সারা ঘবে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

কখন নিঃশব্দে পল্টু ঘরে ঢুকেছে ওরা টেন পায়নি কেউ। পল্টু বলল 'শবুদা, গন্ধ পাচ্ছ ?'

'কিসের ?' শৈবাল অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করল।

'রজনীগন্ধা। তোমার পড়ার টেবিলের ওপর। তুমি ভালবাসতে বলে পূরবীদি আজ সকালে নিয়ে এসেছে।'

সত্যিই একটা মৃদু সৌরভ ছড়িযে পড়েছে ঘরে। অন্ধকারে ফুলগুলো দেখা যায় না। শৈবাল ছটফট করছিল। মৃদু গলায পল্টুকে বলল 'বড্ড অন্ধকাব। তোদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আলোটা জ্বাল।'

'আলো আমাদের কথা শুনবে না।' সবাই কিরকম যেন অদ্ভুত ভাষায কথা বলছে।'

'মানে ?'

'লোডশেডিং চলছে। একটা লণ্ঠন নিয়ে আসি দাঁড়াও।' বেবিযে গেল পল্টু।

ঘরে বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। শৈবালের মনে হচ্ছিল নতুন দেশ। কলকাতা থেকে পাবনা গিয়ে যেরকম মনে হত অনেকটা সেইরকম। বাড়ি ভর্তি মানুষ। পূরবীদির শাড়ীর খস খস আওয়াজ পাচ্ছে শৈবাল। বারান্দায় শবণীর গলার আওয়াজ পেল শৈবাল : 'এতদিন পর ছেলেটা এল। আজকেই লোডশেডিং।'

'কেরোসিন নেই।' অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এল। বোধহয় পুষ্প।

শবণী রেগে উঠলেন : 'এনে রাখিসনি কেন ? গিলছিস কুটছিস কাজের বেলা তোদের কোন মন নেই।'

'এক ছুটে মাধবের দোকান থেকে নিয়ে আসি মা।'

'তাই যাও। কি আর কববে। দয়া করে উদ্ধার করো আমাকে।'

সদর দরজায় খিল খোলার আওয়াজ। পুষ্প কেরোসিন আনতে গেল বোধহয়। রজনীগন্ধার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কাঁসর ঘণ্টার মৃদু আওয়াজ পেল শৈবাল। চমকে বাইরের দিকে তাকাল। ইঁট, কাঠ, পাথরের ফোকর দিয়ে শিব মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা শৈবাল কান পেতে শুনল। একটা দমকা হাওয়ায় জানালার পর্দাগুলো উড়ল। আলো জ্বলতে বোধহয় অনেক দেরী। শৈবাল মনে মনে বলল—ততক্ষণ আমি অন্ধকারে অপেক্ষা করব।...

ঘরময় ছড়ানো ছোট, বড়, মাঝারি প্যাকিং বাক্সগুলোর মধ্যিখানে ছোট্ট একটুকরো জায়গায় থেবড়িয়ে বসে প্রলয় ঘোষ হাঁপাচ্ছিলেন। রোদ্দুরে পুড়ে সারা মুখে এখন একটা তামাটে ছোপ। আশেপাশের চুলগুলোকে এপাশ ওপাশ থেকে টেনে মাথাব মাঝখানে চকচকে গোল যে টাকটাকে সাধাবণত লোকচক্ষুব অন্তরালে রাখতে চেষ্টা কবেন—এই মুহূর্তে তার খানিকটা বাঁকা চাঁদের মতো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চুল বড একটা কাটেন না প্রলয় ঘোষ—টাকের ভয়ে ট্রিম করেন একটু-আধটু। হাওযা আর বৃষ্টি হলে চুলগুলো এই অ্যারেঞ্জমেন্ট না মেনে নিজেদের জাযগায় ফিরে যায়। এ ব্যাপারে উনি বেশ সচেতন। তাই হাওয়া দিলেই ওঁর একটা হাত মাথায় চলে যায়। ডান হাত দিযে চুলগুলোকে শুইয়ে রাখেন। মাঝে মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে খেয়াল থাকে না। এইরকম একটা মুহূর্তে কলকাতায় একবার বেশ অপ্রস্তুত হয়েছিলেন উনি। পাদানীতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন গড়িয়াহাটে। ট্রামেব ভেতবে ভ্যাপসা গরমেব মধ্যে না গিয়ে পা'দানীতে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি আর হাওযাব ডুযেট উপভোগ কবছিলেন উনি। ওপর থেকে ঢ্যাঙা মতন একটা কমবযসী ছেলে কাঁধে আলতো হাত রেখে খুব গম্ভীরভাবে বলেছিল—'দাদা, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

প্রলয় ঘোষ চমকে তাকিয়েছিলেন. 'কেন?'

ছেলেটিব মুখে মুচকি হাসি. 'মাথার মাঝখানে যে লেক।'

ছেলেটির কথায় আশেপাশের অনেক লোক হো হো করে হেসে উঠেছিল। কানের দুপাশ গরম হয়ে উঠেছিল ওঁর। লজ্জায়, অপমানে পরের স্টপেজে নেমে গিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। টাকটা প্রলয ঘোষের একটা দুর্বল জায়গা। আমেরিকায় এসে কতবার ভেবেছেন চুল পুঁতে নিলেই হয়। দু'একটা দোকানে জিজ্ঞাসাও করেছেন। সামান্য কয়েক হাজার চুলের জন্য কয়েক হাজার ডলার খরচা করতে মায়া লেগেছে। তাছাড়া ক্যান্সারও নাকি হচ্ছে এসবে। পরচুলার কথাও যে ভাবেননি তা নয় কিন্তু পরচুলাতে সব সময় একটা অস্বস্তি। শেষকালে যদি রমেন তালুকদারের মতো হয়। মাথা-টাথা মাপিয়ে ম্যানহাটানের নামী দোকান থেকে পরচুলা কিনেছিলেন রমেন। ওঠা-বসা—এমন কী শোওয়ার সময়ও পরচুলা মাথাতেই থাকত। অভ্যেসও হয়ে গিয়েছিল একরকম। ঘুমের ঘোরে আবেগ-টাবেগের সময় ভারতী পরচুলাতেই হাত বুলিয়ে দিত। একদিন বেকায়দায় শোয়ার জন্যই হোক বা অন্য কিছু ভাবে পরচুলা মাথা থেকে সরে গেছে। আদিম, অকৃত্রিম কেশহীন মাথা বেরিয়েছিল বিপজ্জনকভাবে। এই রকম একটা দুর্বল মুহূর্তে বোধহয় আবেগ এসেছিল।

অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে টাকে হাত দিয়ে চমকে উঠেছিল ভারতী। বোধহয় ভেবেছিল রমেন নয় অন্য কেউ। স্থান, কাল, পাত্র ভুলে ভারতী লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিল বিছানায়। কেউ কিছু বোঝার আগেই অন্ধকারে হাতের কাছে যা ছিল তারই এক ঘা কষিয়ে দিয়েছিল টাকে। ভাগ্য ভাল সেরকম জোরে লাগেনি। মাথায় শুধু এক টুকরো আলুর ওপর দিয়ে সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল রমেন। অবশ্য, রত্না অতটা ভায়োলেন্ট নয়। তাছাড়া আবেগটাও রত্নার একটু কম চিরকালই। এখন তো বয়স হয়ে গেছে—এখনকার কথা নয়। জোয়ান বয়সেও জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে অনেক লাফ-ঝাঁপ দিয়ে অনেকবার 'আমি তোমাকে ভালবাসি' বলার পর প্রায় বাধ্য হয়ে রত্না একবার বলতেন—'আমিও', তাও এতো আস্তে যে মুখে কান না লাগালে শোনা যেত না। আসলে, ভারতীয় মেয়েদের আওয়াজটা চিরকালই কম। বিদেশে আওয়াজটাই আসল। আমেরিকায় এসে প্রথম প্রথম অসভ্য ছবি দেখতে গিয়ে কানে তালা ধরে গিয়েছিল ওর। অন্ধকারে অত বড় হলে ছবি যা হচ্ছে তো হচ্ছেই, শান্তিমতন সে সব দেখার উপায় নেই। শুধু আওয়াজে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। কুং ফু আর ওয়েস্টার্ন ছবিতে 'ডুম, ঠুস, টিচু, ঝন্‌ঝন্' আর এই সব ছবিতে সারা ঘরময় শুধু 'আঁ', 'ইঁ', আর 'উঁ' আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে। আওয়াজ না প্রেম কোনটা আসল বোঝবার উপায় নেই।

আওয়াজের ধরন থেকেই মানুষের চরিত্র অনেকখানি আন্দাজ করতে পারেন প্রলয় ঘোষ। আমেরিকান মানুষদের আবেগের প্রকাশ বহির্মুখী। আর, ভারতীয়দের অন্তর্মুখী। হাজার চড় মারো বা চুমু খাও 'রা' বেরোবে না। আমেরিকানদের চড় মেড়ে দেখ, কিরকম খ্যাঁক করে ওঠে আর চুমু খেলে তো কথাই নেই, নানারকম মিউজিক বেরোতে থাকবে। তবে মিউজিক বাদ দিলে, ফিগার-টিগার ফাটাফাটি বিদেশী মেয়েদের। মা, মেয়ে বোঝার উপায় নেই। এদের প্রেমের বয়সও অনেকদিন। এই তো ওদেরই অফিসের মিসেস গিলিস তৃতীয়বার বিয়ে করলেন আটান্ন বছর বয়সে। ওঁরই নাতনির বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পরে। মুখটা বাদ দিলে এখনো বত্রিশ বছরের বডি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। মুখটা অবশ্য পৃথিবীর ম্যাপ। মাঝে মাঝে মনে হয় আমেরিকান মেয়েদের বয়স হয় মুখে—শরীরের অন্য কোথাও আঁচড় নেই যেন। অথচ মিসেস গিলিসের চেয়ে অনেক কম বয়সে ভারতীয় পুরুষ মহিলারা সার্বজনীন দাদু-দিদিমা বনে যান ভারতবর্ষে। গোটা দেশটাই যেন অথর্ব বনে যাবার জন্য অস্থির। রত্নাকে দেখে ভারতীয় পুরুষদের দুঃখটা বেশ অনুভব করতে পারেন

প্রলয় ঘোষ। প্রথমত অবিবাহিত জীবনে প্রেম-ট্রেম করা অনেক হাঙ্গামা আমাদের দেশে। ছেলেদের ভয়, মেয়েদের লজ্জা তো আছেই। তাছাড়া, নিরিবিলি জায়গা পাওয়া মুশকিল। কলকাতা শহরে তবু লেক, ভিক্টোরিয়া, হেদো, ময়দান, কিংবা কিছু কিছু রেস্টুরেন্টে পুরুষ-মহিলার প্রেমের খানিকটা সুবন্দোবস্ত আছে। আরে বাবা, বিয়ের আগে প্রেম করতে গেলে মুণ্ডু খরচ করতে হয়। কখন কোন কথাটা বলতে হবে, কখন সিগারেট ধরানো দরকার, হাত ধরবার মাহেন্দ্রক্ষণটা কখন, কোন মুহূর্তে কাঁধের ওপর একটা আলতো চাপ, মেয়েটার নিঃশ্বাসের আওয়াজ ভারী হলো কি হলো না—এইসব ব্যাপার এতো সোজা নয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, দৃষ্টি সতর্ক হওয়া চাই। তার জন্য নিরিবিলি পরিবেশ প্রয়োজন। এসব ডেভলপ করার জিনিস—গড়িয়াহাট বাজারে বা চৌরঙ্গীর বাস স্টপে দাঁড়িয়ে কি প্রেমের মতো একটা সৃষ্টিশীল জিনিস ডেভলপ করানো যায়! ঝাড়গ্রামের মতো অজ পাঁড়াগায়ে তো প্রশ্নই ওঠে না। জঙ্গল, মাঠ, নদী, নালা যে নেই তা নয়—তবে ওখানে আরেক রকমের বিপদ। সাপখোপ, বিছে, পিঁপড়ের উৎপাত। তাছাড়া ঐটুকু শহরে সবাই প্রায় সবাইকে চেনে। কেউ দেখে ফেললেই মুশকিল। কানে কানে সেটা শহরময় রটে যাবে পরের দিন সকালে। তিল থেকে তাল হবে। একটা ছেলে, একটা মেয়ের হাত একসঙ্গে দেখলেই এমনভাবে গুজব রটবে যে মনে হবে কেউ যেন স্বচক্ষে বাচ্চা হতে দেখেছে। তবু, কলকাতা বড় শহর। কেবিনে পর্দা ঢেকে দুদণ্ড লুকিয়ে থাকা যায়। অন্তত প্রলয় ঘোষের যখন প্রেম করার বয়স ছিল তখন যেত। তাছাড়া, প্রেম সব সময়ই হিজ হিজ হুজ হুজ। কেউ কাউকে ফর্মুলা বাতলে দিতে পারে না। প্রত্যেকটা অঙ্কের আলাদা উত্তর। অন্য কারো ফর্মুলা মুখস্থ করলেই বিপদের সম্ভাবনা। ঝাড়গ্রাম কলেজে ওঁরই সঙ্গে পড়ত সুরজিত। ঢ্যাঙা, লম্বা কুঁজো মতন। সারা মুখ ভর্তি ব্রণ। প্রলয়ের চিরকাল মনে হতো সুরজিত বেশ কুচ্ছিত। অথচ, পটাপট মেয়েরা ওর প্রেমে পড়ত। অথচ, একই ক্লাসে হিমাদ্রি কত সুন্দর দেখতে ছিল কিন্তু ফ্যা-ফ্যা করে দিন কাটতো। সবই হলো আওয়াজের মাহাত্ম্য। কি বলছ, কখন বলছ, এবং কিরকমভাবে বলছ সেটা খুব জরুরী—বাকিটা ভগবানের হাত। এই হিমাদ্রির মতো সুন্দর দেখতে ছেলেটা সুরজিতের ফর্মুলা চালাতে গিয়ে বিরাট ঝামেলায় পড়েছিল। সুরজিত বলত: 'মেয়েদেরকে জড়িয়ে ধরার বেস্ট সময় কখন জানিস?'

হিমাদ্রি আর প্রলয় অবাক হয়ে সুরজিতের জ্বলজ্বলে অভিজ্ঞ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত: 'কখন?' হিমাদ্রির গলাটা বুজে আসত আবেগে। মুখে লালচে

ছোপ ধরত। যেন একটু পরেই সূর্যোদয় হবে।

সুরজিত মৃদু হাসত। ধোঁয়া দিয়ে রিং ছাড়তো। তারপর আলতো করে বলত : 'দুটো সময়ই গুড। মেয়েরা যখন কাঁদে, আর যখন ভয় পায়। দিনদুপুরে যদি ভয় ব্যাপারটাকে না আনা যায়—তবে কোন দুঃখের মুড আনা চাই।'

'কি রকম ?' ঢোঁক গিলত হিমাদ্রি।

হিমাদ্রির পয়সায় আনারকলিতে ঢাকাই পরোটা আর মাটন চপ অর্ডার দিতো সুরজিত। তারপর মৃদু গলায় ফিস ফিস করে কথা বলত যেন পেন্টাগনের কোন গুপ্ত তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে ও : 'আঃ, কিছু একটা।'

'কিরকম', মাছের মতো গোলগোল চোখ করে হিমাদ্রি তাকাত।

'তোর জ্যাঠামশাই আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'থাকলে হবে না।' ঢাকাই আর মাটন কাটলেট মুখে পুরে সুরজিত বেশ খানিকক্ষণ ভেবে হয়ত বলত : 'মামাতো বোন ?' হিমাদ্রি ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ না।

'ব্যস্'—সুরজিত নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়ায় মন দিতো—যেন 'ব্যস্' কথাটাই জপমন্ত্র।

'ব্যস্, কি ?'

'মেরে দে।'

'মানে ?' প্রলয় ও হিমাদ্রি রীতিমত অবাক।

'মানে আবার কি ? ধর তোর মামাতো বোন চন্দ্রিমা। নামটা ভাল হওয়া চাই। ওটাই ফিফটি পারসেন্ট। আলতু ফালতু নাম বললে মুড আসবে না। বুঁচকি মারা গেলে দুঃখ হয় কিন্তু চন্দ্রিমা মারা গেলে চোখে জল আসে। এবার সিচ্যুয়েশন তৈরি কর।'

'কি রকম ?'

'কীভাবে মরবে সেটা বাকি ফিফটি। যেমন ধর ম্যালেরিয়া, কলেরা, কিংবা বসন্ত বাজে অসুখ। এসব অসুখের কোন আভিজাত্য নেই। নাম শুনলেই গা ঘিন ঘিন করে, টি বি আগেকার দিনে চলত। এখন ওটাতে একটা এ্যালার্জী এসে গেছে অনেকের। খুকখুকে কাশি, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে—এ ব্যাপারটা সিনেমায়, গল্পে একেবারে পচিয়ে দিয়েছে।'

'কেরোসিন তেল ঢেলে যদি আগুন ধরানো যায় কিংবা ট্রেনে গলা দিলে ?'

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ত হিমাদ্রির।

'খবরদার!'

'কেন?'

'কেন আবার কি? ওতে চরিত্রের প্রশ্ন উঠবে। অবৈধভাবে ইয়ে-টিয়ে হযে গেলে মেয়েরা ঐসব করে।'

'তবে?' প্রায় হাল ছেড়ে দিল হিমাদ্রি।

'আরেকটা ঢাকাই বলবি নাকি?' নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারে পা তুলে বসত সুরজিত। তারপর নতুন ঢাকাই প্লেটে পড়লে বলত যুগের আগে আগে চলতে হবে বুঝলি? একটা ফাটাফাটি রোমান্টিক অসুখ বাজারে চলছে ইদানীং। নীট অ্যান্ড ক্লিন। নামটাও প্রায় কবিতার মতো।'

'কি?'

'লিউকেমিয়া।' মুচকি হেসে পা নাচাত সুরজিত 'নাম শুনেছিস?'

'না', ঘাড় নেড়েছিল হিমাদ্রি। সত্যিই, প্রলয় ঘোষরা যে সময় কলেজে পড়ছিলেন লিউকেমিয়ার নাম খুব বেশি চলতি ছিল না।

'ফুলের মধ্যে যেমন গোলাপ, অসুখের মধ্যে সেরকম লিউকেমিয়া।'

'ও', এতক্ষণে হাসি ফুটলো হিমাদ্রির মুখে।

সুরজিত ধমকে উঠত · 'হাসছিস যে। সিম্পটম জানিস?'

'না।'

'ভারী সুন্দর। হায়েনার মতো নিঃশব্দে এই রোগ মানুষের শরীরে লুকিয়ে থাকে। তারপর কুরে কুরে খায়। ভেবে দ্যাখ, গোলাপের মতো মেয়ে চন্দ্রিমা। পাপড়িগুলো একটা একটা করে ঝরে গেল। কান্নার বেস্ট ফর্মুলা। তারপর তোর এলেম।'

রুদ্ধশ্বাসে এইসব গল্প শুনতেন প্রলয় ঘোষ। সুরজিত বড়লোকের ছেলে। কলকাতায় বেড়াতে যেত প্রায়ই। প্রত্যেকবার নতুন নতুন গল্প নিয়ে ফিরে আসত। এক ফর্মুলা অবশ্য সকলের কাজে লাগে না। যেমন হিমাদ্রির লাগেনি। বিনীতা রায়ের সঙ্গে অনেক কষ্টে নিরিবিলি জোগাড় করেছিল ও। চন্দ্রিমার লিউকেমিয়া হলো। পাপড়িও ঝরল। বিনীতার চোখও ছলছল করেছিল ঠিকই। কিন্তু জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বিপদ হলো।

'ছোটলোক'—গর্জে উঠেছিল বিনীতা। এক ঝাটকায় ছাড়িয়ে নিয়েছিল নিজেকে।

'কেন?' অবাক হয়েছিল হিমাদ্রি। চোখমুখ লাল।

'গায়ে হাত দিলেন যে।'

'আমি ভাবছিলাম আপনার কষ্ট হচ্ছে।' কোনও রকমে উত্তর দিয়েছিল হিমাদ্রি। অশ্বত্থামার মতো ব্যূহের মধ্যে ঢোকার মন্ত্রটা মুখস্থ করেছিল হিমাদ্রি। বেরিয়ে আসার ফর্মুলা জানা ছিল না। তবু যতরকম বুদ্ধিতে কুলোয় চেষ্টা করেছিল হিমাদ্রি। আরো বলেছিল : 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।'

তাও বিনীতা গট গট করে উঠে চলে গিয়েছিল। হিমাদ্রির পিসতুতো বোন মিথ্যে ছিল। কিন্তু বিনীতার এক মাসতুতো ভাই ছিল একথা সত্যি। সেই দুর্বিনীত মাসতুতো ভাই দিন তিনেক পরে নতুন বাজারের কাছে হিমাদ্রিকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল। হিমাদ্রির সেই করুণ চেহারাটা এখনো মনে আছে প্রলয়ের। সুরজিত সব কিছু শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিল : 'রিস্ক সব সময়ই আছে। তাছাড়া, সেম ঢিলে দুটো ডিফারেন্ট জাতের পাখী সব সময় নাও মরতে পারে। তবে, তোর অভিজ্ঞতা যে হলো এটা অস্বীকার করতে পারিস না। সেই জন্যই বলে 'এক্সপিরিয়েন্স ইজ দ্য নেম উই গিভ টু আওয়ার মিসটেকস্।'

গত সপ্তাহে সুরজিতের একটা চিঠি এসেছে বলেই হয়তো পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ছিল ওঁর। সুরজিত বেড়াতে আসছে সামনের মাসে। লিখেছে—ব্যবসার কাজে আসছে। ওর আবার কাজ। বড়লোক বাবা, বড়লোক শ্বশুর ওর তো লাইফ সেট। আর, ফাটা নাকের বিনিময়ে হিমাদ্রি কতখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল বলা শক্ত। সেই অভিজ্ঞতার ফসল স্বরূপ পরে কোন ভালবাসা জন্ম নিয়েছিল কিনা তাও জানা নেই। প্রলয় ঘোষের জীবনে অবশ্য এরকম রোমাঞ্চকর কিছু ঘটেনি। পেটের তাগিদেই নীলরতন আঢ্যির মেয়ে রত্নাকে পড়াতে শুরু করেছিলেন সেই সময়। প্রেমও হলো কিন্তু রোমাঞ্চকর কিছু নয়। যেন হতে হয় তাই হলো। সেই সময়কার অনেক মেয়েদের মতোই রত্নাও ভয় আর লজ্জার পারফেক্ট সিম্বল। বিয়ের আগে হাত ধরলে ঝটপট ছাড়িয়ে নিতেন রত্না। বলতেন—'কেউ দেখে ফেলবে।' বিয়ের পর জড়িয়ে ধরতে গেলে বলতেন : 'আস্তে। পাশের ঘরে মা আছেন।' কিছুদিন পরে বলতে শুরু করলেন—'আঃ কি হচ্ছে কি ! মেয়েরা বড় হচ্ছে না ?' তার পরের স্টেজ খুব সিম্পল : 'লজ্জা করে না ! মেয়েরা বড় হয়ে গেছে যে।' আর এখন তো কথাই নেই। গায়ে একটু হাত দিলেই বলেন : 'বয়স হয়ে গেছে। আর ভাল লাগে না।' প্রলয় ঘোষ অথচ মনে মনে যুবকই আছেন এখনো। যে প্রেমের জন্য হিমাদ্রির নাক ফাটল সেই প্রেম এখানে কি রকম ডালভাত। অবশ্য

রোমাঞ্চও সেজন্য কম। বাথরুম পাবার মতো এদেশের ছেলেমেয়েদের প্রেম পায়। আগেরকার দিনের মত অত কাঠ খড় পোড়ানোর বালাই নেই। প্রেম পাওয়া ছেলেমেয়ে একসঙ্গে হলেই হলো। নিরিবিলি জায়গা দেখে গাড়ি পার্ক কর। সিচ্যুয়েশন তৈরি করার বালাই নেই, সুরজিতের ঢাকাই, মাটন চপ খাওয়াতে হবে না, দু'একটা কথা হলো কি হলো না—তারপরই প্রাকৃতিক পরিবেশ, আওয়াজ, দে দোল দে দোল গাড়ি সব মিলেমিশে একাকার। প্রলয় ঘোষের মাঝে মাঝে মনে হয় আজকের যুগটা যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লেগেছে। শুধু প্রেম কেন, জীবনের সব কিছুই অনেক সহজলভ্য। সবই যেন প্যাকেজ আর সেলের খেলা। আর কিছুদিন পর প্রেমও হয়ত বিভিন্ন প্যাকেজে সুপার মার্কেটে পাওয়া যাবে। মডেল ছেলেমেয়েদের গ্লাস বুথ থাকবে হয়ত। নানারকম প্যাকেজ সেল থাকবে ওখানে । দেখলে নিকেল, হাত ধরতে গেলে ডাইম, চুমু খেতে কোয়ার্টার এই রকমভাবে বাড়তে থাকবে। কথা বলা হয়ত সব চেয়ে দামী হবে এই প্যাকেজে। এখনই নাকি নানারকম প্রেম টেলিফোন প্যাকেজে বিক্রি হচ্ছে। অফিসের ছেলেদের কাছে এই খবরটা শুনেছেন প্রলয় ঘোষ। টেলিফোন করলেই অপর প্রান্তে মেয়ে ধরবে একটা। শুধু ক্রেডিট কার্ডের নম্বরটা দিয়ে দাও মেয়েটাকে। তারপব যত খুশি কথা বল। তুমি যত অশ্লীল কথা বলবে মেয়েটা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল কথা বলবে। যতক্ষণ চাও চালাও, শুধু ক্রেডিট কার্ডে বিলটা চলতে থাকবে। আর কিছুদিন পরে অপর প্রান্তে মেয়ে থাকারও হয়ত প্রয়োজন হবে না। কম্পিউটারই হয়ত মেয়েদের গলা করে কথা বলবে। এই তো কিছুদিন আগেই একটা মজার ঘটনা ঘটল। প্রলয় ঘোষ সবে অফিস থেকে ফিরে চায়ের জল চাপিয়েছেন। পিংকি বেরিয়েছিল কোথাও, রত্না ফেরেননি তখনো। হঠাৎ টেলিফোন এল। ফোন করছিল একটা কম্পিউটার। সুস্থ সবল একটা মানুষের গলায়। যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গা ছম ছম করছিল। মাঝপথে ফোনটা নামিয়ে রেখে বাড়ির সব কটা আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। সন্ধ্যেবেলা এইসব ইয়ার্কির কোন মানে হয়। মাঝে মঝে মনে হয় শান্তি যেন কোথাও নেই পৃথিবীতে। দেশে থাকতে মনে হতো মানুষের জীবনের প্রতি এত অবজ্ঞা যে দেশে সেখানে মানুষ বাঁচবে কি করে। বেঁচে থাকার সাধারণ উপকরণগুলো নড়বড়ে। পয়সা নেই, যা পয়সা ছিল তাতে ভাল করে খাওয়া পরা জুটত না। বিলাস তো দূরের কথা, বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা ছিল সেখানে। আর, আমেরিকার মতো দেশে বেঁচে থাকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। তাই, শুধু বেঁচে থেকে

সুখী নয় কেউই। তাই, ভোগবিলাসের ছড়াছড়ি। সবাই যেন সব সময় হাতড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিক—আরো, আরো, আরো। ডলার মানেই ক্ষমতা আর ক্ষমতা মানেই অধিকার। এই ক্ষমতার বাহার প্রলয় ঘোষ নিজের চোখে দেখেছেন। দেখেছেন দেশে গেলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আজকাল কিরকম সমীহ করে কথা বলে। অথচ এরাই একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা প্রলয় ঘোষকে দেখে মুচকি হাসত। আর এরা সবাই হাড়ে হাড়ে জানে যে ডলার দিয়ে সব কিছুর গলা টিপে রাখা যায়। প্রলয় ঘোষ বুঝতে পারছেন যে নেশা লেগেছে ওঁরও। কিন্তু কি করে কাটানো যায় জানা নেই ওঁর। টলতে টলতে অন্ধ মাতালের মতো প্রলয় ঘোষও এগিয়ে চলেছেন সামনে। কিছু না থাকার একটা কষ্ট আছে, প্রত্যেকটা মুহূর্ত সেখানে যন্ত্রণার। আজ রাত্তিরে শুয়ে কাল সকালের অনিশ্চয়তা। আর এখন, আরো পাবার অস্থিরতায় মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে। যা যা আশা করেছিলেন সব কিছুই প্রলয় ঘোষ পেয়েছেন। তবু, হাঁপিয়ে উঠছেন মনের ভেতরে। কোথাও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। স্বপ্নের ঘোরে কখনো কখনো পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। কিছু না থাকা, ঐশ্বর্যহীন সেই সব দিনগুলো হঠাৎ হঠাৎ সুন্দর স্মৃতি হয়ে মনের আয়নায় ছায়া ফেলছে। কেন এরকম হয়। কেন সব কিছু পেয়েও মানুষের দমবন্ধ হয়ে আসে মাঝে মাঝে। কেন মনে হয়—এ আর এমন কি। বড় মেয়ে মাটি কিছু না পেয়ে চলে গেল। ছুটকি তো সব কিছু পেয়েছে। তবু, কেন দেয়াল তৈরি হয়ে গেল।

'ও, তুমি এখানে ? আমি সারা বাড়ি খুঁজে মরছি।' প্যাকিং বাক্সের মাঝে রত্না স্বামীকে আবিষ্কার করলেন।

'কেন ?' প্রলয় ঘোষ চমকে উঠলেন।

'না, ভাবছি। মনে হলো ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। অথচ খুঁজে পাচ্ছি না, তাই।'

'একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম।'

'কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে ?'

'একই রকম। ভদ্রলোকের এক কথা। লোকগুলো কোথায় ?'

'ওরা লিভিং রুমের ফার্ণিচারগুলো বের করছে বাক্স থেকে।'

প্রলয় ঘোষ ছটফট করে উঠলেন : 'চল নীচে যাই। এদেরকে বিশ্বাস নেই। কোন মায়ামমতা নেই এদের। বের করতে গিয়ে সব ভেঙ্গেচুরে ফেলবে। এদের আর কি। যাবে আমার যাবে।'

'না, না ওরা সাবধানেই করছে। তুমি একটু বোস-না। এত ওপর নীচ করলে

ব্যথাটা আরো বাড়বে। একটু বিশ্রাম নাও। আমি বরঞ্চ নীচে যাচ্ছি।'

রত্না চলে যাবার আগেই প্রলয় ঘোষ ডাকলেন : 'শোন।'

রত্না ঘুরে তাকালেন।

প্রলয় ঘোষ একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন স্ত্রীর দিকে। তারপর বললেন : 'এত গম্ভীর কেন ?'

'কই ?' রত্না একটু অবাক হলেন যেন।

'তোমার আনন্দ হচ্ছে না ?'

রত্না চুপ করে রইলেন একটু। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললেন : 'হচ্ছে।' কথাটা এত আস্তে বললেন রত্না যে প্রলয় ঘোষ ভাল করে রত্নার গলা শুনতে পেলেন না।

মনটা ছটফটিয়ে উঠলো। অধৈর্য হয়ে বললেন 'নতুন বাড়ি তোমার পছন্দ হয়নি ?'

'না, তা নয়। এ বাড়ি তো বিরাট বড। এত বড় বাড়িতে থাকব স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন।' রত্না অন্যমনস্কভাবে বললেন।

'তবে কি ?'

'কি আবার ?'

'What is it? কোথাও কোন গণ্ডগোল লাগছে তোমাব। বল-না, কি ভাবছ ?'

'কি আবাব ভাবছি !'

'তুমি ভাবছ।' প্রলয় ঘোষ ধমকের সুরে বললেন . 'আগে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল। তিরিশ বছব একসঙ্গে কাটানোর পর ফাঁকি দেওয়া শক্ত। তোমার চোখের প্রত্যেকটি পাতা, কপালের প্রত্যেকটি রেখা কখন কোন্‌টা কীভাবে মুখের ওপর দাগ কাটে আমি জানি। We stayed together too long to deceive one another !'

'তাহলে তুমিই বল। তুমি তো সব কিছু বুঝতে পার।' মৃদু হাসার চেষ্টা করলেন রত্না।

'কেন ?'

'কি কেন ?'

'কেন গোমড়া মুখ ?'

রত্না অবাক হয়ে স্বামীব মুখের দিকে তাকালেন। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না উনি। প্রশ্নটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল : 'কি বললে ?'

'কেন গোমড়া মুখ ?'

অবিকল সেই গলা। সেই পুরোনো কণ্ঠস্বর। এক মুহূর্তের জন্য রত্নার মনে হলো সেই কালো রোগা প্রলয়দা কথা বলছে। কোনদিন ছাত্রী গম্ভীর থাকলে সেই রোগা মানুষটা ঠিক এইরকমভাবে ছটফটিয়ে উঠত। আরো কালো হয়ে যেত মানুষটা। এই শুকনো মুখটা দেখার জন্য কতদিন পনের বছরের রত্না আঢ্যি দুষ্টুমি করে গম্ভীর হয়ে থেকেছে। আর, ওর গম্ভীর মুখটা দেখলেই রোগা মাস্টারমশাই ভয় পেয়ে যেত। খালি খালি প্রশ্ন করত : 'কি ব্যাপার ?' সতের বছরের মেয়েটা ঠোঁট উল্টে বলতো : 'কি আবার ব্যাপার।' এদিক ওদিক তাকিয়ে মাস্টারমশাই বলত : 'কেন গোমড়া মুখ ?' সেই উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রত্নার বুকটা যেন একরাশ শিউলিতে ভরে যেত। রত্না অন্যদিকে তাকিয়ে বলত : 'কাল আসা হয়নি কেন ?' মুখ থেকে ছায়া সরে যেত। কালো মুখে আলো ফুটতো। সেই মুহূর্তে এই মুখটা হাজার শিউলির মতো রত্নার বুক জুড়ে বসে থাকত। ছেলেটা হয়ত বলত : 'আমি না এলে তোমার খারাপ লাগে ?' কখনো-সখনো দস্যুর মতো চেপে ধরত হাতটা। পনের বছরের মেয়েটা ভয় পেত। তাড়তাড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলত : 'কি হচ্ছে কি ? কেউ দেখে ফেলবে।' অথচ, সেই ছোঁয়াটা লেগে থাকত। বুকের শিউলিরা মালা হয়ে মনটাকে ঘিরে রাখত। আজ, এতদিন পর সামান্য এই কটা কথা হঠাৎ যেন দলা পাকিয়ে গলার মধ্যে আটকে গেল। মাঝখানে তিরিশটা বছরের ব্যবধান। বলতে গেলে বাইরের পৃথিবীর ভোল পাল্টে গেছে এতদিন। ভেতরের পৃথিবীও পাল্টে গেছে অনেকদিন আগেই। এখন আর শিউলিরা বুকের মধ্যে ঝরে না। তবুও. রত্নার চোখে জল এল। এক মুহূর্তের জন্যেও যেন সেই তেইশ বছরের রোগা কালো ছেলেটা পনের বছরের মেয়েটার কাছে ফিরে গেল। তিরিশ বছর আগের সেই মানুষ দুটো হারিয়ে গেছে কবে—শুধু তাদেব ছায়াটা দুলছে রত্নার হৃদয়ে।

'কি ভাবছ ?'

রত্না মুখটা আড়াল করলেন স্বামীর কাছ থেকে। কি ভাবছেন আজকে আর বলে কি লাভ। তবু উত্তর না দিলে মানুষটা দুঃখ পাবে ভেবে রত্না বললেন : 'ভাবছি এত বড় বাড়ি নিয়ে আমরা কি করব ? তিনটে তো প্রাণী ?'

হা হা করে হেসে উঠলেন প্রলয় ঘোষ : 'প্রাণী বলে প্রাণী। বাঘ, হরিণ, ছাগল অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর থেকে আলাদা। বাঘকে তিনতলা ফ্ল্যাটে দিয়ে দেখ সে অনায়াসে পেছনে ফেলে চলে যাবে জঙ্গলে। পাখীকে সোনার খাঁচা দাও তবু

সুযোগ পেলে সে দিব্যি উড়ে যাবে আকাশে। আর সভ্যতার শিখরে পৌঁছে আমরা শুধু একটা খাঁচা থেকে আরেকটা খাঁচায় মুভ করে চলেছি।'

প্রলয ঘোষের কথা বলার ভঙ্গীতে রত্না হেসে ফেললেন : 'কেন?'

'প্রাণী হিসেবে আমরা বোধহয় দুর্বল, তাই। সব সময় সিকিউরিটি খুঁজে বেড়াচ্ছি। খাঁচা আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এ দুটো আমাদের সিকিউরিটি। আগেকার দিনে ছেলে হলে দেশের যে কোন বাড়িতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত, তার মূলেও ছিল সিকিউরিটি। ছেলে হলো ফ্যামিলি সেভিংস অ্যাকাউন্ট। তার মানে আশা আছে—খাঁচা একদিন মজবুত হবে। ভবিষ্যৎ সিকিউরিটির জন্য আজকের ইনভেস্টমেন্ট। এই ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে যন্ত্রণার চেয়ে আনন্দ বেশি,আমাদের দেশে সেই জন্যেই বোধহয় ছেলে হলে বলত টুক্ করে ছেলে হয়েছে আর মেয়ে হলে বলত ধড়াস করে মেয়ে হয়েছে একটা। আসলে কি আর ধড়াস করে হয়। তা নয় তবে মেয়ে হলে বুকটা ধড়াস করে ওঠে।'

প্রলয ঘোষ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রত্না বাধা দিয়ে বলে উঠলেন . সে সব দিনকাল আর নেই। বিয়ের আগের পর্যন্ত ছেলে ফ্যামিলির, তারপর বউ-এর। আমাদের আর ধড়াস করার কিই বা আছে। একটা তো চলেই গেছে। অন্যটাও কি আর আমাদের মুখ চেয়ে বসে থাকবে।'

পাছে পুরোনো প্রসঙ্গ উঠে পড়ে তাই প্রলয় ঘোষ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : 'আহা, সে সব কথা কে বলছে। আমাদের কথা শুধু নয়—সিকিউরিটি সব সময়ই চাই। বিশেষ করে এই দেশে। কে যে কখন আছে কখন নেই কেউ বলতে পারে! ধর আমি যদি চলে যাই—অন্তত একটা বড় বাড়ি থাকলো, দুশো হাজার ডলার লাইফ ইনসিওরান্স থাকল।'

'চুপ কর'—প্রায় ধমকে উঠলেন রত্না—'যত সব অলুক্ষণে কথাবার্তা।'

'আহা, বললেই কি চলে যাচ্ছি। তা নয়, তবে এ একটা বিরাট স্বস্তি। এটাও তো ঠিক শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সময় বাসা বেঁধেছে। লাটাই গোটাতেই হবে। যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি পেলাম। কিন্তু বড্ড দেরী করে পেলাম। মনটা এখনো অনেক কিছু চায়—কিন্তু শরীর বেঁকে বসছে। কলকব্জাগুলো সব ঢিলে হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আচ্ছা, যমের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় না! আমেরিকায় তো কত কিছু ধারে দিচ্ছে। বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা সব কিছুই তো ধারে। যমরাজকে বলে-কয়ে জীবনের প্রথম তিরিশ বছর রাইট-অফ করে শেষে আর তিরিশটা বছর যদি ধার দেয়! সুদ যা লাগে দেব। না হয় দু'এক পারসেন্ট বেশিই দেব।' কথাটা বলতে বলতে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন

প্রলয় ঘোষ।

রত্না কিন্তু গম্ভীর হয়েই থাকলেন। মৃদু স্বরে বললেন : 'ভগবানের যদি ইচ্ছে থাকে এমনিতেই হয়ত তুমি আরো তিরিশ কেন, বেশিই বাঁচতে পার।'

প্রলয় ঘোষ আঁতকে উঠলেন : 'না, না, ওরকম ভাবে নয়। বুড়ো হয়ে নয়। চামড়া ঝুলে যাবে, দাঁতগুলো পড়ে যাবে, হাতে লাঠি নিয়ে ঠকঠক করে হাঁটব, কোমরে ব্যথা, ক্যাথিটার লাগিয়ে পেচ্ছাব, দিনরাত শুধু ভগবানকে ডাকা আর বলা—আর কতদিন এই বার্ধক্যের বোঝা বয়ে বেড়াব—এবারে নাও। না, না, ওরকম নয়। সব কিছু আজকের মতো থাকবে। জীবনটা শুধু কুড়ি থেকে শুরু করব একবার। একবার শুধু চাকাটা পেছনের দিকে ঘোরাও। একবার।' একটু থেমে প্রলয় ঘোষ রত্নার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন : 'তোমার ইচ্ছে করে না ?'

'না।'

'না ?' রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন প্রলয় ঘোষ : 'ইচ্ছে করে না আজকের বাড়ি, আজকের গাড়ি সব নিয়ে আরেকবার তিরিশ বছর আগে ফিরে যাই ? হাতের মুঠোয় অনেকখানি ক্ষমতা নিয়ে ঘড়িটাকে একবার পিছিয়ে দিই। এখন তো সব ভুলগুলো আমাদের জানা রত্না। এবার আর কোনো ভুল নয়। মনে হয় না আরেকবার সুযোগ পেলে সব কিছু অন্যরকমভাবে করতাম। তখন রক্তের জোর ছিল ক্ষমতা ছিল না। এখন ক্ষমতা আছে অথচ রক্তের জোর কমে যাচ্ছে।' অনেকক্ষণ একসঙ্গে কথা বলে প্রলয় ঘোষ হাঁপাচ্ছিলেন।

রত্না অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন স্বামীর দিকে। ওঁর মুখ থেকে এরকম কথা কোনদিন শোনেননি উনি। প্রলয়ের মুখ দিয়ে যেন একটা অচেনা মানুষ কথা বলছে। দু' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রত্না বললেন : 'আমার ইচ্ছে করে না। যা গেছে গেছে। ফিরিয়ে দিলেই যে সব কিছু ঠিক চলবে তার কিছু মানে নেই। পুরোনো ভুলগুলো হবে না কিন্তু আরো অনেক নতুন ভুল যে করবে না তারই বা কি আশ্বাস আছে ? যা গেছে গেছে, যেটুকু আছে তাই নিয়েই খুশী থাকতে হবে। আজ নয় কাল গোটাতেই হবে। তাই একটু আগে বলছিলাম কি দরকার এত বড় বাড়ির, তিনটে তো মাত্র প্রাণী। একবার ভেবেছিলাম বলব—কিনো না।'

'বলনি কেন ?'

'কি জানি কেন বলিনি। হয়ত ভেবেছিলাম তুমি রেগে যাবে। কিংবা ভেবেছিলাম তোমার ইচ্ছের জোর আমার থেকে অনেক বেশি। আমি বারণ করলেও হয়ত তুমি শুনবে না।'

'করে দেখলে না কেন ?'

'কোনদিন করিনি,আজ নতুন করে করতে ইচ্ছে করেনি বোধহয় !'

'তার মানে তোমাব ইচ্ছে ছিল না। আশ্চর্য...' প্রলয় ঘোষ অন্যমনস্ক হলেন একটু : 'অথচ, আমি কিন্তু তোমাদের কথা ভেবেই...'

'জানি। তাই বারণ করতে দ্বিধা হয়েছে। আমার কথা বাদ দাও।'

'কেন, বাদ দেব কেন ? তার মানে এটাও তো হতে পারে জীবনে অনেক কিছুই তোমাব ইচ্ছে ছিল না—তুমি আমার ইচ্ছেতে কবেছ।'

'হ্যাঁ, হয়ত তাই।'

'হয়ত কেন, নিশ্চয়ই তাই।' একটু থেমে প্রলয় ঘোষ পাইপ ধরালেন। লাইটাব দিযে পাইপ ধরালেন যত্ন কবে। তারপর একরাশ ধোঁযা ছেড়ে বললেন 'আই ফিল ফানি।'

'কেন ?'

'আই ফিল অ্যাবসলিউটলি স্টুপিড।'

'এখন ওসব কথা থাক। কাজ পড়ে আছে অনেক। তাছাডা, আমি তো কোনো অভিযোগ কবিনি।'

'সেটাই তো আরো সাংঘাতিক। অভিযোগ না থাকাটাই বোধহয় আমি ধরে নিয়েছি ইচ্ছে। তাব মানে, জীবনের এতটা সময় আমরা যেভাবে এসেছি তার অনেক কিছুতে হয়ত তোমার ইচ্ছে ছিল না। আমি একা টানতে টানতে এসেছি।'

'না, এরকম নয়। আমার ইচ্ছেটাকে আমি অত বড় করে দেখিনি। তোমার ওপর নির্ভর করেছি। তাই তোমার ইচ্ছেটাই মেনে নিয়েছি।'

প্রলয় ঘোষ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফিসফিস করে বললেন : 'বাট অল আই ওয়ান্টেড টু ডু ইজ এনজয় লাইফ। এখানকার লোকেদের দেখছ রত্না ? আমাদের অফিসের মিসেস গিলিস আটান্ন বছর বয়সে তৃতীয়বার বিয়ে করলেন। সত্তর বছর বয়সে লোকে গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে নাচতে যাচ্ছে। এরা যদি জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে, আমরা কেন পারব না ? কেন, তোমার ইচ্ছে করে না ?'

'সব কিছু শোধবোধ হয়ে যায় চিত্রগুপ্তের খাতায়'—রত্না মৃদু হাসলেন—'আমরা হয়ত এমন অনেক কিছু পেয়েছি যা হয়ত এরা পায়নি।'

'ইমপসিব্‌ল। এরা সব কিছু পেয়েছে। সাদা চামড়া পেয়েছে, টাকা পেয়েছে, সম্মান পেয়েছে, জীবনকে উপভোগ করার সমস্ত উপকরণ এদের হাতের মুঠোয়

ছিল চিরকাল। বরঞ্চ পাইনি আমরাই।'

'আমি বিশ্বাস করি না। আমরা ভালবাসতে পারি, ছোটবেলা থেকে ভালবাসা পেয়েছি বাবা মার কাছে, আমরা অনায়াসে একটা মানুষকে ভালবাসতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি সাবা জীবনের জন্য।'

'তুমি কি বলতে চাও, এরা ভালবাসতে পারে না, বিশ্বাস করতে পারে না।'

'মনে হয় না, পারে। না হলে এত ভড়ং কেন সব ব্যাপারে ? দিনের মধ্যে দশবার করে যারা বউকে বলে 'আই লাভ য়্যু হানি' তাদের মধ্যে বিশ্বাস কোথায়। স্বামী-স্ত্রী তো বাদই দাও। ছেলেমেয়েদের জন্যেও এরা কোনরকম ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী নয়। আমরা পারি না, খচখচ করে।'

'অন্য দিকটা ভেবে দেখ। এদের ছেলেমেয়েরা কত সহজেই সাবালক হয়ে যায়—কত তাড়াতাড়ি। আমরা যাকে ভালবাসা বলছি সেই ভালবাসার চাপে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক দেরী করে বড় হয়। প্রত্যেকটি পদে ভুল করে। আর সেই ভুলের মাশুল কিন্তু বাবা-মাদেরই দিতে হয়।' কথাগুলো কিন্তু অতশত ভেবে বলেননি প্রলয় ঘোষ—যেরকম মনে এসেছে সেরকমই বলেছেন। অথচ, শেষের কথাটা বলে নিজেই কেমন থমকে গেলেন।

রত্না অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন তাই স্বামীর ফ্যাকাশে মুখটা দেখতে পেলেন না। প্রলয়ের শেষ কথার খেই ধরে বললেন : 'আজ একটা কথা বলছি, রাগ কোরো না। এতদিন বলিনি। আজ কথা উঠল তাই বলছি। তোমার মনে আছে, এখানে এসে থার্ড গ্রেডে ছুটকি ভর্তি হবার পরের বছর থেকে আমি চাকরি নিলাম!'

'হ্যাঁ।'

'মনে আছে—ছুটকির নামে কমপ্লেন করত স্কুল থেকে ? মাঝে মাঝেই স্কুলে যেত না, হোমওয়ার্ক করতে চাইত না, অনেক সময় স্কুল থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে দেরী করে ফিরত ?'

'নতুন ভাষা, নতুন পরিবেশ—প্রথম প্রথম অসুবিধে বোধ করে সবাই। এটা তো স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ খানিকটা স্বাভাবিক। ভাষা, চালচলন, পরিবেশ এর জন্য খানিকটা দায়ী ছিল নিশ্চয়ই। আরও একটা কারণ ছিল। একদিন ছুটকিকে আমি অনেক আদর করে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'হ্যাঁরে, সত্যি করে বলতো তোর কি হয়েছে। স্কুল ভালো লাগে না ?'

প্রলয় ঘোষ বাধা দিয়ে বললেন : 'স্কুল কারই বা ভাল লাগে। ক'টা

ছেলে-মেয়েই আর পড়াশুনো করতে হবে বললে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে ? এটাই তো স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ খানিকটা স্বাভাবিক। ছুটকির ক্ষেত্রে সবটা নয়। ও একটা কথা বলেছিল যেটা এখনো আমি ভুলতে পারিনি। বলেছিল—মা, ঘুম থেকে উঠেই আমার মনে হয় তোমরা সবাই বেরিয়ে গেছ অফিসে। এই গোটা বাড়িটায় আমি একা। আমি চোখ বুজেই বুঝতে পারি দুধের প্যানটা উনুনের ওপর তুমি বসিয়ে রেখে গেছ সকালবেলা। পাশেই নীল মতো বাটিতে সিরিয়াল ঢালা রয়েছে। পাশেই চিনির কৌটো। সব কিছুই তুমি সাজিয়ে রেখে গেছ আমার জন্য। আমি জানি কাজে বেরোনোর আগে তুমি আমার কথা ভেবেছ—আমার বিছানার পাশে এসে আমার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলেছ—পনের মিনিটের মধ্যেই উঠে পড়িস ছুটকি। আমি শুনেছি। বাবা আর তুমি একসঙ্গে বেরিয়ে গেলে—দরজা বন্ধ হবার শব্দও শুনি রোজ। তারপর, কি যে হয়। কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করে না। ইট'স নট দ্যাট আই অ্যাম লেজি, মা। ইট্স এ ফানি ফিলিং। আই ক্যান্ট এক্সপ্লেন টু য়্যু মা। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবি, এখন যদি আমি না উঠি, যদি না খাই, যদি স্কুলেই না যাই—কেউ তো বলার নেই। একা একা টেবিলে বসে খেতে কি খারাপ লাগে। খড়্গপুরে তুমি রোজ আমার আর দিদিভাই-এর সামনে বসে থাকতে খাওয়ার সময়। ইটস সো ডিফারেন্ট, নাও। আর, যদি বা কোনরকমে স্কুলে গিয়ে পৌঁছই ফেরার সময় আই ফিল সো ব্যাড। আই ফিল অফুল কামিং ব্যাক টু অ্যান এম্পটি হাউস। তুমি অফিস থেকে ফোন করবে, আমাকে বাড়িতে না পেলে চিন্তা করবে—তাই বাড়িতে আসতেই হয়। মাঝে মাঝে শুধু জ্যানিসের বাড়িতে যাই—কিংবা ও আসে। একা লাগে না।' গল্পটা বলে রত্না একটু থামলেন।

'ও বলেছে বলেই এটাই ঠিক নয়। এসব পুরোপুরি অভ্যাসের ব্যাপার। সামনে বসে খাইয়ে খাইয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের অভ্যাস খরাপ হয়ে যায়। আমেরিকানদের দেখ। অধিকাংশ বাবা-মাই কাজ করে। তাই বলে এদের ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যাচ্ছে না ? না কি সকালবেলায় মা সামনে ঘ্যান ঘ্যান করে না বললে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে না ?' প্রলয় ঘোষ গজগজ করে উঠলেন।

'এদের বাবা-মা নিজেদের নিয়ে মত্ত। তাই বাধ্য হয়ে ছেলেমেয়েদের অভ্যেস করতে হয়। তার মানেই যে এটাই ভাল, তা নয়। যারা অন্ধ তাদের না দেখে হাঁটা অভ্যেস করতে হয়। কিন্তু চোখ যাদের আছে, তাদের না দেখে না হাঁটলেও চলবে।'

'তার মানে, তুমি কি বলতে চাও ?'

'নতুন কিছু নয় । ছেলেমেয়েদের বেশি ভালবাসলে তাদের অভ্যেস নষ্ট হয়ে যায় না । বরঞ্চ আমার মনে হয় তারাও ভালবাসতে শেখে । যতক্ষণ পেরেছি কেয়ার করেছি—কেয়ার না করলেও ওরা নিশ্চয়ই বড় হয়ে যেত ঠিকই । কিন্তু সে রিস্ক নিতে চাইনি কোনদিন । এখনও মাঝে মাঝে আমার খারাপ লাগে, চাকরি না করলে হয়ত আরেকটু বেশি কেয়ার নিতে পারতাম ।' যে রত্না সাধারণত কম কথা বলেন, আজ তাকে দেখে মনে হবে উনি থামতে প্রস্তুত নন ।

'তাহলে এবার একটা কথার জবাব দাও ।' প্রলয় ঘোষ অদ্ভুতভাবে রত্নাব দিকে তাকলেন : 'আমি না হয় কম ভালবেসেছি মেয়েদের—কিন্তু তুমি তো পুষিয়ে দিয়েছে আমার হয়ে । তবে আজ কেন এমন হলো । আমাদের মেয়েরা তো সব কিছুই পেয়েছিল—তুমি যাকে বলছ ভালবাসা সেটার তো অভাব ছিল না । তবে কোথায় ভুল হলো ? মাটির কথা বাদ দিলাম, আমাদের ভুলের কথা আর ওকে জিজ্ঞাসা করার কোন উপায় নেই । কিন্তু ছুটকি তো সব কিছুই পেয়েছিল । সব সময় চোখে চোখে রেখেছি, মাটিকে যেমন কিছুই দিতে পারিনি ছুটকিকে তো আমরা সব কিছু দিতে চেষ্টা করেছিলাম । পাছে কোন ভুল করে তাই একমুহূর্ত চোখের আড়াল করতে চাইনি—অথচ, ছুটকিও চোখের সামনে হাতের বাইরে বেরিয়ে গেল । আমি বেশি লেখাপড়া করতে পারিনি, কারণ আমার সংসার টানার দায়িত্ব ছিল । কি এমন বেশি চেয়েছি আমরা ? শুধু চেয়েছি ভাল করে পড়াশুনো করুক, মনে মনে খুব ইচ্ছে ছিল পি-এইচ ডি করবে । ও যে কলেজেই ভর্তি হবে না এ কথাটা তুমিও ভাবতে পেরেছিলে ?'

রত্না উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলেন । ছুটকি কলেজে ভর্তি হবে না এটা উনিও স্বপ্নে ভাবতে পারেননি । সপ্তাহ তিনেক আগে বাপে-মেয়েতে সম্মুখ সমর হয়ে গেল একদিন । প্রলয় ঘোষ বললেন : 'তোমার কোন ব্যাপারে আজকাল আমি কথা বলি না, কিন্তু আমার জানার অধিকার আছে তুমি কলেজে ভর্তি হবে না কেন ?'

পিংকি কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল । প্রলয় ঘোষ মেয়ের পেছন পেছন ঐ ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন । রত্না ভয় পেয়েছিলেন । বাপ-মেয়ে সামনাসামনি দাঁড়ালে আজকাল বুক ঢিপ ঢিপ করে ওঁর । গায়ের জ্যাকেটটা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে বাবার দিকে পেছন ফিরে ক্লোজেট খুলছিল পিংকি । প্রলয় ঘোষ আবার প্রশ্ন করেছিলেন : 'আমি একটা প্রশ্ন করেছি, সেটার উত্তর দেওয়া কি তুমি প্রয়োজন মনে কর না ?'

পিংকি এ কথারও কোন জবাব দেয়নি। বিপদ বুঝে রত্না মেয়েকে ধমকে বলেছেন : 'একি অসভ্যতা শিখছ দিনদিন ! বাবার কথার উত্তর দাও।'

পিংকি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বাবাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মা'র দিকে তাকিয়ে বলেছিল : 'আই উইশ আই নিউ, মা। আই ডোন্ট নো হোযাই। প্লীজ, ডোন্ট পুশ মি। আমি কিছুদিন কাজ করতে চাই। এখন পড়তে ভাল লাগছে না। মে বি আই উইল লাইক ইট সাম ডে।'

'সুপার মার্কেটে ক্যাশ রেজিস্টার টেপা কোন আহামরি কাজ নয়। পড়াশুনো না শিখলে এর চেয়ে ভাল কিছু জুটবে না কপালে। তাছাড়া কিসের অভাবটা হচ্ছে শুনি ? কোন জিনিসটা দিতে পারছি না আমরা ?' প্রলয় ঘোষ উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন।

পিংকি একটু হেসে চুপ করে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পর গম্ভীর হয়ে বলেছিল : 'আই নো, য়্যু ক্যান গিভ মি মোর দ্যান হোয়াট আই নীড, বাট আই উড লাইক টু টেক এ জব, দ্যাটস ইট।'

রত্না বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মেয়েকে : 'জেদ করছ কেন ছুটকি। সব কিছুরই তো একটা বয়স আছে। সারাটা জীবনই তো পড়ে আছে তোমার। কয়েকটা বছর পড়াশুনো করে নাও। চাকরি তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'সুপারমার্কেটে ক্যাশ রেজিস্টার টেপা হলে আমিও ছেড়ে দিতাম না। আই হ্যাভ গট এ বেটার ওয়ান। দে উইল পে ফর মাই এডুকেশন অলসো।'

'কেন, আমরা কি পে করতে পারছি না। নাকি আমরা নেই ?' প্রলয় ঘোষ এখনো ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিলেন না।

'দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন আর্নিং মাই ওন টিউশন।'

'মুখের ওপর কথা বলে বলে অভ্যেস হয়ে গেছে। আমেরিকানদের যত বদ দোষ সব কটা মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে বসে আছে।' প্রলয় ঘোষের গলার শিরা ফুলে উঠল। কণ্ঠস্বর মাত্রা ছাড়িয়ে চড়ে গেল : 'আমি যা বলছি তাই করবে। লেট হলেও কলেজে রেজিস্ট্রেশন করে আসবে কালকে।'

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত বাবার দিকে তাকালো পিংকি। তারপর শান্ত স্বরে বলল : 'অ্যান্ড, ইফ আই ডোন্ট ?'

এই প্রশ্নের জন্য প্রলয় ঘোষ প্রস্তুত ছিলেন না। একটু হকচকিয়ে গেলেও মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন : 'তর্ক কোরো না। আই সেট দি রুলস ইন দিস হাউস।'

'বাট, য়্যু ফরগট সামথিং।' পিংকি ফিসফিস করে বলল।

'কি ?'

'য়্যু মে সাজেস্ট থিংস। বাট য়্যু ক্যান্ট ফোর্স মি ইনটু, নাথিং নো মোর। নট এ থিং।' পিংকির কণ্ঠস্বরে এখন কোন উত্তেজনা নেই।

'তার মানে ?' গর্জে উঠলেন প্রলয় ঘোষ।

একটু চুপ করে থেকে পিংকি বলল : 'আই অ্যাম অ্যান অ্যাডাল্ট নাও। ফ্রম নাও অন, আই উইল সেট মাই ওন রুলস। ইটস মাই লাইফ। অ্যান্ড আই অ্যাম গোইং টু লিভ ইট দি ওয়ে আই ওয়ান্ট।'

পায়ের তলায় কার্পেটটা যেন দুলে উঠল হঠাৎ। চোখে মুখে অন্ধকার দেখলেন প্রলয় ঘোষ। শরীর আর মনের সমস্ত জোর যেন এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেছে। নীচের দিকে ঝুলে পড়ছে মাথাটা। অনেক চেষ্টা করেও মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না প্রলয় ঘোষ। রত্না মৃদু স্বরে মেয়েকে বকছিলেন। কোন কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না প্রলয় ঘোষ। শুধু কতকগুলো অসংলগ্ন শব্দ অন্ধকার ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। কপালের ডানদিকের রগটা দপ দপ করছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণা মাথা থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। কুলকুল করে ঘামতে শুরু করলেন প্রলয় ঘোষ। শরীরটা যেন শোলার মতো হালকা। আরেকটু ধাক্কা দিলেই যেন উনি ভেসে যাবেন আকাশে। কোনরকমে টলতে টলতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন প্রলয় ঘোষ।

প্রলয় ঘোষ বেরিয়ে যাবার পর রত্না মেয়েকে মৃদু ধমকের সুরে বললেন : 'তুই দিন দিন বড হচ্ছিস না আরো ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছিস ? বাবাব সঙ্গে কেউ এরকমভাবে কথা বলে ?'

পিংকি চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ফিসফিস করে বলল : 'য়্যু নেভার ওয়ান্ট টু লিসেন টু মি, মা। আমি যা করছি, যা করতে চাই সবই কেন তোমরা ভাবো ভুল ? আই নো, বাবা হেটস মি।'

অন্ধকার ঘরে পিংকির মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না রত্না। খাটের এক কোণায় বসে মেয়েকে বললেন : 'পাগলের মতো কথাবার্তা বলছিস কেন ? তোর কি হয়েছে বল তো ?'

'কি আবার হবে !'

'আমাদের কি তোর ভাল লাগে না ? আমবাই কি তোর সবচেয়ে বড শত্রু ?' থমথমে গলায় রত্না কথা বললেন।

'দ্যাটস নট টু। য়্যু নো দ্যাটস নট টু।'

'তবে ? সব বাবা-মাই তো চায় ছেলেমেয়ে পড়াশুনো করুক, মানুষ হোক,

পাঁচজন লোক ভালো বলুক। আমরাও সেটুকুই চাই। বিশ্বাস কর, এর চেয়ে একটুও বেশি নয়। সাধারণ মানুষ যতটুক লোভী আমরাও ততটুকুই। আমাদের জীবনে আমরা যতটুকু পেয়েছি, অনেক মানুষ সেটুকুও পায়নি। রোজ কাঁদি ঠাকুরের কাছে জানিস? কাঁদি আর বলি—'ঠাকুর, তুমি অনেক দিয়েছ আমাদের। ছোট্ট এইটুকুনি সংসার। শুধু শান্তি দাও।'

'হি নেভার লিসেন্‌স, মা।' অন্ধকার ঘরে অদ্ভুত শোনাল পিংকির গলা।

'ওরকম বলতে নেই। দয়াল সব কথা শুনতে পান।'

'আমি তো অনেক বছর ধরে দয়ালকে অনেক কথা বলেছি মা। সেই ছোটবেলা থেকে। বাট, হি নেভার রেসপণ্ডেড। কি করে বুঝি হি লিসেনস টু মি? হোয়াট হ্যাপেন্ড টু অল মাই প্রেয়ারস? অল মাই কোশ্চেনস? অল মাই উইশেস?' কথাগুলো বলতে বলতে ছায়ার মতো মার সামনে এসে দাঁড়াল পিংকি: 'দয়াল কি তোমার কথা শুনেছেন? ডিড হি? আর য়্যু হ্যাপি?'

পিংকির কথার কোন জবাব দিলেন না রত্না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে পিংকি আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ছায়ার মতো রত্না বসে রইলেন খাটে। মেয়েকে উত্তর দিতে পারেননি। কয়েক মুহূর্ত পর একা একা বললেন অন্ধকার ঘরে—'আর কত পরীক্ষা করবে ঠাকুর? সব কিছু দিয়েও তুমি কেন সব কিছু কেড়ে নাও? যাদের কিছু নেই, তাদের একরকম দুঃখ। আমি তো সব পেয়েছিলাম দয়াল। স্বামী, সন্তান, লক্ষ্মীর সংসার। তবু মন কিছুতেই মানে না। সব কিছু থেকেও এত কষ্ট কি সবাই পায়?' ঘরের মুখ হাঁ করা অন্ধকার রত্নার কথাগুলো গিলে ফেলল। শুধু একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস শূন্যে ভেসে রইল কয়েক মুহূর্ত। আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন রত্না। বুকের ভেতরের ঠাকুর কোন কথা বলে না। শুধু হৃৎপিণ্ডের একটানা বিরক্তিকর ধক ধক ধক। বিরামহীন একঘেয়ে পথ চলা।

লাইট জ্বালল পিংকি। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রত্নার। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন উনি। পিংকি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীম মাখতে লাগল মুখে। একটু পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে মার কাছে এল পায়ে পায়ে। রত্না এখন অন্য দিকে তাকিয়ে। পিংকি বলল. 'মুখটা ফেরাও।'

মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। সেই ছুটকি। কত বড় হয়ে গেল দেখতে দেখতে। অথচ মুখের দিকে তাকিয়ে সেই ফোকলা দাঁত মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখতে পান রত্না। পিংকি দু'হাতে ক্রীম ঘষে মার গালে লাগাল। রত্না বলে উঠলেন: 'কি করছিস!'

'এই ক্রীমটা খুব ভাল জানো মা। এটা রোজ মাখলে তোমার স্কিনে কোন রিংক্‌ল পড়বে না।' পিংকি নরম অঙ্গুলগুলো দিয়ে রত্নার গালে কপালে ক্রীম ঘষতে লাগল। বিড়বিড় করে আপন মনে বলল :'দিন দিন খালি বুড়ি হয়ে যাচ্ছ।'

রত্না মেয়ের গম্ভীর মুখ দেখে হেসে ফেললেন : ওমা বুড়ি হবো না তো কি ? সবাই তো একদিন বুড়ি হয়ে যায়।'

পিংকি গম্ভীর হয়ে বলল : 'যে হয় সে হয়, তুমি হবে না। উল্টো করে ক্রীম ঘষে ঘষে গালটাকে ঝুলিয়ে ফেলেছ।'

'গালের আবার সোজা উল্টো আছে নাকি ?' রত্না মেয়ের কথায় অবাক।

'গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাকে বলে জানো ?'

'নিউটন আর আপেল ফলটুকু মনে আছে। সেই কবে পরীক্ষা হয়ে গেছে, এতদিন পরে জিজ্ঞেস করলে কখনো বলতে পারি ?' রত্না মুচকি হাসলেন। পিংকি হেসে ফেলল : 'ঠাট্টা নয়। এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্যেই চামড়ার একটা টেনডেন্সি থাকে নীচের দিকে ঝুলবার। তার ওপর যদি তুমি ওপর থেকে নীচের দিকে ঘষ তোমার চামড়া আরো তাড়াতাড়ি ঝুলবে। সেইজন্য কসমেটোলজিস্টরা বলে ক্রীম সব সময় নীচ থেকে ওপরের দিকে ঘষবে। য়্যু আর নট ওল্ড মা। য়্যু জাস্ট চুজ টু সাউণ্ড ওল্ড। বুঝলে মশাই ?'

'আর ভেতরের চামড়া ?'

'মানে ?' পিংকি অবাক হয়ে তাকাল।

'আমাদের মনের ভেতরে একটা চামড়া আছে, জানিস ? যে চামড়ায় কোন ক্রীম লাগানো যায় না, নীচ থেকে ওপরে ঘষা যায় না—প্রত্যেক মুহূর্তে যে চামড়ায় দাগ পড়ে। কি করি বল তো সেই চামড়াটা নিয়ে। যতই বাইরের চামড়ায় ক্রীম লাগাই, ভেতরকার চামড়া কুঁচকে যেতে থাকে আপন মনে। এইটাকে নিয়েই তো আমার যত ঝামেলা।'

'তোমাকে একটা কথা বলব, মা ?'

'বল'।

'আমার কথা শুনবে বল ?'

'আগে বল।'

'আমার জন্য এত ভেব না। আমি ঠিক থাকব। ভাল থাকব।' পিংকি মৃদু স্বরে বলল।

'তবু ভয় হয়। তুই যখন আমার মত হবি, তোরও হবে।' পিংকির কপালে

নুয়ে পড়া চুলগুলোকে হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিলেন রত্না।

'অনেক সময় আমি হয়ত এমন কিছু করব—যেটা তোমরা হয়ত পছন্দ করবে না। কিন্তু, বিশ্বাস করো, তোমরা পছন্দ করবে না ভেবে ইচ্ছে করে আমি কিছু করি না।'

সেটা, তুই না বললেও জানতাম।'

'আজকে পড়াশুনো করতে ভাল লাগছে না মানে এমন নয় যে কোনদিন করব না। ধর, আমি কিছুদিনের জন্য ভেকেশন চাই। আই ওয়ান্ট টু নো মাইসেল্ফ। আই উড লাইক টু ডিসকভার অল মাই ফেসেস।'

'এতগুলো মুখ কিসের?' রত্না অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন মেয়েকে।

'ধর একটা ফেস হচ্ছে ছুটকি। রত্না আর প্রলয় ঘোষের মেয়ে। আর একটা ফেস হচ্ছে মণিকা ঘোষ—হু হ্যাজ জাস্ট বিকাম অ্যান অ্যাডাল্ট। হু ইজ দিস গার্ল? হোয়াট ডাজ শি লাইক? হোয়াট ডাজন্ট শি লাইক? হাউ ডাজ শি ফিট ইন দিস ওয়ার্লড? নট অ্যাজ সামবডি'স ডটার—বাট অ্যাজ অ্যান ইনডিভিজুয়াল? দিস নিউ মণিকা ঘোষ ইজ গিভিং হার্ড টাইম টু দি গুড ওল্ড পিংকি। আই গট লিসেন টু বোথ অফ দেম।' অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে পিংকি একটু থামল।

রত্না স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কবে যে এতটা সময় পেরিয়ে গেছে, কবে যে সেই ফোকলা দাঁত ছুটকির মধ্যে একটা সম্পূর্ণ মানুষ ঢুকে বসে আছে রত্না খেয়াল করেননি। সারা মুখ ভর্তি এখনো সেই শিশু, এখনো সেই চঞ্চলতা, অভিমান অথচ তার ভেতরের বয়স্কা নারী মণিকা ঘোষ কি রকম অচঞ্চল, প্রত্যয়ে স্থির। দুজনেই তো ওঁর রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া। নতুন মানুষ মণিকা ঘোষের দিকে তাকিয়ে রত্না বললেন : মণিকাও আমার, ছুটকিও আমার, পিংকিও আমার। এদের সকলের ওপরেই আমার সমান অধিকার। মণিকা কি সেটা বুঝতে পারে?'

ছুটকি উঠে দাঁড়াল। মার দিকে পেছন ফিরে সামনে আয়নার দিকে তাকাল। আয়নার ভেতরে মার দিকে তাকিয়ে বলল : 'শি ডাজ। বাট দিস গার্ল হ্যাজ টু ফাইট ছুটকি ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল। আমারই ভেতরের ছুটকি ইজ প্রবেবলি স্টিল এ চাইল্ড। সামটাইমস এ চাইল্ড নেভার ওয়ান্টস টু গো। য়্যু হ্যাভ টু সেণ্ড হার অ্যাওয়ে। রাইট, মা?'

'কোন রাইটটা রং আর কোন রংটা রাইট আজও বুঝি না।' খাট থেকে উঠে পড়লেন রত্না : 'আমি খাবারগুলো ওভেনে দিই ততক্ষণ। জামাকাপড় ছেড়ে

খেতে আয়।'

রত্না দরজার দিকে এগোতেই পিংকি পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল ওঁর। তারপর আস্তে আস্তে বলল : 'তুমি যখন আমার মতো ছিলে এরকম কথা তোমার কখনো মনে হয়নি ?'

রত্না ম্লান হাসলেন। ঘাড় নেড়ে বললেন—'না।'

'কিছু মনে হয়নি ? সব কিছু একরকম ছিল চিরকাল!'

'আমাদের স্থান, কাল অন্যরকম ছিল। আমি ভেবে বড হইনি। তোমার বয়সে আমার বড় মেয়ের বয়স ছিল দু' বছর। তখনকাব দিনে বিশেষ করে আমাদের দেশে এত ভেবেচিন্তে কেউ বড় হতো না। ইংরিজী কেন বাংলা কথাও তোমাদের মতো এত গুছিয়ে বলতে পারতাম না আমবা।'

'বল না বল, কিছু তো ভাবতে ?'

'কি জানি, মনে নেই সেইরকম। কখনো ভালো লাগত, কখনো খারাপ লাগত। অনেকটা কিরকম জানিস ? জীবনের একেকটা সময এককেটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। কোন ট্রেন এলে উঠে পড়েছি। ট্রেনটা কোথায় যাবে ভেবে দেখার সময় ছিল না—সময় থাকলেও ভাবতাম কিনা সন্দেহ। ট্রেন যেখানে গেছে গেছি। তারপর যে স্টেশনে থেমে গেছে ট্রেন সেই স্টেশনে নেমে পড়েছি। আবার অন্য ট্রেন এসেছে আরেকদিন, তাতে উঠে পড়েছি। কোন স্টেশনে ছোট ছিলাম, কোন ট্রেনে বড় হয়েছি ভাববার কথা মনেই হয়নি কোনদিন।'

'ডিড য়্যু নো, হোয়ার য়্যু ওয়ান্টেড টু গো ?'

'ঝাড়গ্রামে নতুন বাজার মনে আছে তোর ?'

'না।'

'মনে থাকার কথাও নয়। কবারই বা গেছিস মামার বাড়িতে ? নতুন বাজারের পেছনে একটা বিরাট মাঠ পেরিয়ে একটা রেললাইন ছিল। ছোটবেলায় আমরা খেলা করতে করতে কখনো-সখনো রেল লাইনেব ধারে চলে যেতাম। রোজ বিকেলবেলায় একটা ট্রেন যেত ওখান দিয়ে। অনেকবাব দেখেছি। ভেতরের লোকেরা অনেক সময় আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। আমরা হাত নাড়তাম।'

'কোথায় যেত ট্রেনটা ?'

'জানি না।'

'কাউকে জিজ্ঞাসা করনি কোনদিন ?'

'না।'

'কেন মা ?'

'কি লাভ জানতে চেয়ে ?'

'কেন ?'

'ওখানে কোন স্টেশন ছিল না। জানতাম ট্রেনটা আসবে না কোনদিন।' রত্না পিংকির হাতটা মুঠো করে ধরে হাসতে হাসতে বললেন : 'অনেক বকবক হয়েছে—এবার তোর মণিকা ঘোষকে বল, ছুটকিকে বলে ওব হাতটা আমার গলা থেকে সরিয়ে নিতে। অনেক রাত্তির হয়ে গেল।' পিংকি হাতটা সরিয়ে নিতে রত্না রান্নাঘরে চলে গেলেন। পিংকি অবাক হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। মাব গল্পগুলো শুনতে ওব এত অদ্ভুত লাগে। সেই সময়, সেই দেশ, তখনকার মানুষজনের কথা পিংকিব কাছে এখনো রূপকথার গল্পের মতো। পিংকি মনে মনে ভাবল টাকা সেভ করে ও ঝাড়গ্রামে গিয়ে অনেকদিন থাকবে। নতুন বাজারের পেছনের মাঠটা পেরিয়ে রেললাইন দিয়ে যে ট্রেনটা যায় ঠিক সেইখানটায় গিয়ে দাঁড়াবে। সবাইকে জিজ্ঞাসা করবে ট্রেনটা কোথায় যায় ? এতদিনে নিশ্চয়ই স্টেশন হয়ে গেছে ওখানে। হিজলি স্টেশনের ওপর দিয়ে যে মালগাড়িগুলো যেত সেগুলো এখনো অস্পষ্ট মনে পড়ে ওর। মাটির পেছনে পেছনে পিংকিও দৌড়োত। মালগাড়িগুলো ওদের ফেলে অনেক দূরে চলে যেত। স্টেশন পেরিয়ে মাঠ পর্যন্ত গিয়ে ওরা থামত। মাটি পেছন ফিরত। দুটো আঙ্গুলের মাঝখানে ঠোঁটটাকে রেখে দিদিভাই ঠিক ট্রেনের মতো আওয়াজ করত। মাটির ফ্রকটা ধরে পেছন পেছন পিংকিও ছুটত। পুঁ ঝিক ঝিক ঝিক—পুঁ ঝিক ঝিক ঝিক। পিংকি মনে মনে ভাবল—ওয়ান্স আপন এ টাইম, ইন দি কান্ট্রি অফ ক্লাউডস আপন দি ডিসট্যান্স মাউন্টেনস—দিদিভাই, য়্যু আর দি ফরগটন প্রিন্সেস।'

রাত্তিবে শুয়ে রত্না স্বামীকে বললেন—'আমার একটা কথা রাখবে ?'

বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিলেন প্রলয় ঘোষ। ঘুম নেই চোখে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি !'

'ছুটকিকে আর বকো না।'

'ও কি ঠিক করেছে আমাদের কোন কথাই শুনবে না ?'

'ঠিক শুনবে দেখো।'

'আমরা তো এইরকম ছিলাম না ওর বয়সে।'

'আমরা আমেরিকায় মানুষ হইনি।'

'তবে আর কি। আমেরিকায় বড় হলেই বাঁদর তৈরি হতে হবে তাব কোন মানে নেই।' খিচিয়ে উঠলেন প্রলয় ঘোষ।

'আমাদের ভালবাসার যদি জোর থাকে, ও কখনো খারাপ হবে না। হতে পারে না। আর, যদি হয ভাবব আমাদের কপাল।'

'কপালের ওপর সব কিছু সঁপে দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি তাহলে?'

'কি করতে চাও?' শান্ত গলায প্রশ্ন করলেন রত্না।

'জানি না। তবে এটুকু জানি বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা দরকার। জোর করা দরকার। কমবয়সী ছেলেমেয়েদেব অনেকরকম উদ্ভট উদ্ভট ইচ্ছে হয়। তার মানেই যে মেনে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। ভাল কথায় যদি না করে ধাক্কা দিয়ে করাতে হবে। বড় হলে বুঝবে কেন ধাক্কা খেয়েছিল।'

'না'—রত্নার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় প্রলয় ঘোষ বিস্মিত হলেন। স্বামীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোবালেন রত্না। তারপর মৃদু স্বরে বললেন: 'আজকে ও একটা পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে। কোন ধাক্কা নয়। আমাদেব দরজা খোলা রাখতে হবে। ধাক্কা দিয়ে সব সময় ফেরানো যায় না।'

'তাব মানে ও যা করতে চাইছে তাই করতে দিতে হবে? নিজের হাতে মেয়েকে নষ্ট করতে চাও কর। পরে কপাল চাপড়িও না।' প্রলয় ঘোষ পাশ ফিরে শুলেন।

রত্না চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফিস ফিস করে বললেন 'তবু ধাক্কা নয়। কপাল চাপড়াবার সময এখনো আসেনি। মানুষেব জীবনে একটা বছব পড়াশুনো না করলে কিছু এসে যায় না। কোনদিন ভাল লাগলে ঠিক করবে।'

'বেশ তো, পড়াশুনো করতে না চায়, দেশে নিয়ে গিয়ে একটা ভালো ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দাও। তারপর পড়াশুনো করতে হয় করবে, না করতে হয় না করবে। আমরা আর বলতে যাব না।'

'আমার মনে হয়, তাতে ও আরো বেঁকে বসবে।'

'ওরকম সবাই বেঁকে বসে। জোরজার করে একবার বিয়ে দিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি মেনে নিতে পারে।'

'আমরা পারতাম। আমাদের দেশে এখনো অনেকে মেনে নেয়, তবে ইচ্ছেয় নয়। ছুটকি মানবে না।'

'বেশ তো তাহলে কপালের জন্য ওয়েট কর। কোনদিন দেখবে ঐ কালো

ছেলেটার হাত ধরেই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। আমাদের দেখিয়ে বলবে—এই যে ড্যাডি, মাম। জামাইকে আদর করে ঘরে তুলবে পারবে ? সঙ্গে করে সমাজে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে ? সবাই নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে, আর বলবে ঐ তো প্রলয় ঘোষের মেয়ে নিগ্রো ধরে এনেছে।'

'সমাজের থেকে আমার মেয়ে বড়। আর, আড়ালে হাসাহাসি করা আর কুৎসা রটানোব জন্য এক ধবনেব লোক প্রত্যেক সমাজেই থাকে। পাখীদের মধ্যে শকুনরা ভাগাড় খুঁজে বেড়ায়। তাই বলে সব পাখীই কি শকুন ? এদের কথা ভেবে নিজেদের মধ্যে অশান্তি করার কোন মানে হয় না।'

'কিন্তু এই সমাজেই তো থাকতে হবে আমাদের, নাকি ? এই পৃথিবীটা এমন কিছু বড় নয়—পালাতে পারবে কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারবে না বেশিদিন। পালাবার জায়গাও ফুরিয়ে যাবে একসময়।'

'পালাব কেন ? আগে নিজেদের জীবন, তারপরে সমাজ। আর, যে সমাজকে প্রত্যেক মুহূর্তে ভয় পেতে হবে সেটা আবার কিরকম সমাজ। তাছাডা এখনকার মতো এইটা তো একটা উদ্বাস্তু সমাজ। এই তো সবে শুরু। এখনো কত ভাঙ্গবে, বদলাবে। তাছাড়া বিদেশের মাটিতে শিকড় গেঁথে আমরা সব সময় যদি ভাবতে থাকি আমাদের ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি আমাদের পছন্দমত হবে—আমরা বোধহয় নিজেদেরই ঠকাচ্ছি, তাই না ?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রত্না আবার আপন মনে বলতে শুরু করলেন : 'এদেশে আসার আগে এসব কথা আমাদের ভাবা উচিত ছিল। আমরা ভাবিনি। হয়ত কেউ অতখানি ভাবে না। আমরা শুধু নিজেদেব কথা ভেবেছিলাম। তখন তুমিই অন্যরকম কথা বলতে। তুমিই এক সময় প্রত্যেক কথায় বলতে—এসব দেশ অন্য জিনিস বুঝেছ। এদেশের সব কিছুই তোমার ভাল লাগত। সত্যি করে ভেবে দেখ একবার—তখনো পর্যন্ত ভাললাগা খারাপ লাগা সব কিছুই আমাদের চোখ দিয়ে দেখা। সে সময় আমরা বোধহয় কেউই ভাবিনি আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে চিন্তা করার কোন কারণও ছিল না হযত. তারা ভাল খাবার-দাবার আশ্রয় পাচ্ছে, সুন্দর স্কুলে যাচ্ছে, ছোট্ট মেয়ে অনায়াসে আমেরিকানদের মতো ইংরিজী বলছে—গর্বে বুক ভরে গেছে আমাদেব। তুমিই তো কত খুশি হতে তখন। ছুটকি যখন বাড়িতে খালি ইংরাজি বলত—আমি খুব বকতাম, মনে আছে তোমার ? উল্টে তুমিই তখন আমাকে বকেছ। বলেছ—'বেশি বাংলা বলার কি আছে। শুনেছি বেশি বাংলা বললে ইংরিজীতে অ্যাকসেন্ট এসে যায়।' আজ তবে রাগ করছ কেন ? আজ কেন দেশে নিয়ে

গিয়ে বিয়ে দিতে চাইছ ? এখন ওকে বকাবকি করে ফেরানো যাবে না । ওকে বুঝতে হবে । ভালবেসে ওর কাছে পৌঁছতে হবে । নিজেদেরকে বদলাতে হবে আমাদের । আর, তাছাড়া…' কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন রত্না । প্রলয় ঘোষ নাক ডাকছেন । মুখটা হাঁ করা । চোখটা অল্প খোলা । একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রত্না পাশ ফিরে শুলেন ।

'হোয়ার উড দি সেকেন্ড ফ্রিজ গো, পিটার ?' পায়ে পায়ে একজন মুভার উঠে এসেছে ওপরে । চমকে পাশ ফিরে তাকালেন প্রলয় ঘোষ । বিশাল চেহারা এই লোকটার । যেমন কালো, তেমনি মোটা, তেমনি লম্বা । গলার আওয়াজখানা কি ! একটা কথায় পুরো এ্যাটিকখানা যেন কেঁপে গেল । ধড়মড করে পিটার অর্থাৎ প্রলয় ঘোষ উঠে পড়লেন । নীচে নামতে নামতে লোকটিকে বললেন—'ব্রিং ইট ডাউন টু দি বেসমেন্ট ।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লোকটি বলল : 'চেক আউট এভরিথিং ।'

'হোয়াট ডু য়্যু মিন ?'

'আই অ্যাম স্পিকিং ইংলিশ, আরন্ট আই ?' লোকটার কথা বলার ধরনে বাকি লোকগুলো হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল । লোকটা আবার বলল : 'আই সেড চেক এম আউট । ইফ এনিথিং ব্রোক, য়্যু হ্যাভ টু টেল নাও ।'

লোকটার কথা বলার ভঙ্গীতে প্রলয় ঘোষের মাথা গরম হয়ে গেল । এদের ঔদ্ধত্য দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে । কোন কারণেই কালো লোকদের সহ্য করতে পারেন না প্রলয় ঘোষ । তাই,একটু রাগত স্বরেই বললেন : 'দেয়ার ইজ নাথিং রং টু বি নাইস টু পিপল ।'

প্রলয় ঘোষের কথায় বিশাল চেহারার লোকটা ফিরে তাকাল । তারপর মুচকি হেসে পাশের লোকগুলোকে বলল : 'হোয়াট ইজ হি টকিং অ্যাবাউট ?'

সঙ্গের আর একটা ছোঁড়া হেসে উঠল । ঘাড় দুলিয়ে বলল : 'হু নোজ ।'

লোকটা মৃদু স্বরে পাশের ছেলেটিকে বলল : 'মে বি আই শুড হ্যাভ হ্যাগ্‌ড হিম, অ্যাণ্ড কিস্‌ড হিম ইন দি মাউথ ।' নিজের রসিকতায় নিজেই ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল লোকটা । আস্তে বললেও কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ । অপমানে কানের দুপাশ গরম হয়ে উঠল ওর । তবু কথা বাড়াতে ভরসা পেলেন না উনি । নিঃশব্দে কথাগুলো হজম করে মালপত্তর একটা একটা করে চেক করতে শুরু করলেন প্রলয় ঘোষ ।

'চা খাবে ?' সিঁড়ির ওপর থেকেই প্রশ্ন করলেন রত্না ।

'কবছ ?' কিন্তু জল গরম করবে কি করে ? গ্যাস দেয়নি তো এখনো ?'

'সেই হিটারটা পেয়েছি, জান ?'

'কোন হিটার ?'

'মনে আছে, আসার বছর দুয়েক পর আমরা যখন নতুন অ্যাপার্টমেন্টে মুভ করলাম, সেখানেও গ্যাস ছিল না সেদিন। বেরিয়ে গিয়ে আমরা একটা ছোট্ট হিটার কিনেছিলাম।'

অবাক হলেন প্রলয় ঘোষ : 'তাই নাকি, আমার মনে নেই।'

'কি করে মনে থাকবে ? একদিনই তো রান্না হয়েছিল এতে। কার্টন খুলতে গিয়ে চোখে পড়ল এক্ষুনি। তাই মনে হলো একটু চা খাই। এ লোকগুলো আর কতক্ষণ থাকবে গো ? দামড়া দামড়া অচেনা লোক সব ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে অস্বস্তি হয় খুব।'

'কি কবব বল। এই সব ভারী ভারী জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূবের কথা, নড়াতেই পারব না আমবা। মোটামুটি বসিয়ে দিয়ে যাক—তারপব সাজানো গোছানো পরে করা যাবে। খালি দেখছি আর ভাবছি, এত জিনিস কিনেছিলাম কখন ?'

'শুধু কেনা। বাড়িতে যে জিনিস একবার ঢুকেছে তা আর বেরোয়নি। এমন কত জিনিস আছে মাত্র একদিন আধদিন ব্যবহার হয়েছে—তারপর তুলে রাখা হয়েছে। এবার কার্টনগুলো একটা একটা করে খুলে আমি সেই সব বিদেয় করব।'

'তা ঠিক। প্রলয় ঘোষ হেসে বললেন : 'আমাদের হাঙ্গামাও আছে তাই না ? দু'দুটো গেরস্থালি সামলানো কি সোজা কথা। একদিকে মাইক্রো ওয়েভ ওভেন, টোস্টার, ব্লেণ্ডার, ইলেকট্রিক নাইফ—অন্য দিকে শিলনোড়া, জিলিপী ভাজাব ছাঁকনী।'

রত্না হেসে ফেললেন : 'তা ঠিক। গরম-মশলা গুঁড়ো করতে গেলে এখনো শিলনোড়াটা ছাড়া হয় না।'

'শুধু রান্নাঘর কেন ? সব ব্যাপারেই তাই। একদিকে গাদা গাদা সুট, পাশাপাশি পাঞ্জাবী চাদর। গাদা গাদা জুতোর পাশাপাশি গাদাগাদি চটি। পরি না পরি থাকা চাই, না থাকলে মন কেমন করে। একটা বাড়ির মধ্যে দুটো দেশ। কোনটাই ছাড়তে পারি না, রত্না। কোনটাই ছাড়তে ইচ্ছে করে না। দুটো নৌকোয় দুটো পা শক্ত করে কে যেন বেঁধে দিয়েছে। কোন পাটা তুলব বুঝতে পারি না। যে পাটাই তুলি কষ্ট হবে।'

রত্না অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন—'কাকে দোষ দেব ?'

'কাউকে না। দুটোই চাই। দিস কমফর্ট অ্যাণ্ড দ্যাট ওয়ে অফ লাইফ।'

নীচে ঝনঝন করে আওয়াজ হলো একটা। হুড়মুড় করে প্রলয় ঘোষ ছুটলেন বেসমেন্টে। বিশাল চেহারার সেই লোকটা আর একটা অল্পবয়সী ছোকরাকে চীৎকার করে কি সব বলছিল। কথাগুলো সব শুনতে পাননি প্রলয় ঘোষ। নীচে যেতে যেতে শুধু শুনলেন কে একজন বলছে—'সরি ম্যান, ইট স্লিপড আউট অফ মাই হ্যাণ্ডস।'

'হোয়াট হ্যাপেনড ?' প্রলয় ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন। পেছন পেছন রত্নাও এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিশাল চেহারার লোকটা কোমরে হাত রেখে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—'শিট।'

'চায়না প্লেটগুলো গেল। ঐ দেখ না।' রত্না বললেন।

বাঁদিকে তাকিয়ে প্রলয় ঘোষ দেখলেন বেশ কয়েকটা চায়না প্লেট মাটিতে পড়ে ভাঙচুর হয়ে গেছে। গত বছর মেসিস থেকে অনেক দাম দিয়ে এগুলো কিনেছিলেন উনি। কয়েক মুহূর্ত ঐ ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে প্রলয় ঘোষ বলে উঠলেন : 'মাই গড, হাই ডিড ইট হ্যাপেন ?'

'এখন আর জেনে কি লাভ। যা গেছে তা গেছে।' অস্ফুট স্বরে রত্না বললেন।

বিশাল চেহারার লোকটা খুঁজেপেতে একটা ফর্ম এনে হাজির করল। ফর্মটি প্রলয় ঘোষকে এগিয়ে দিয়ে বলল : 'হাউ মাচ ওয়াজ ইট ?'

দাম কি আর মনে আছে এতদিনে ? একটু ভাববার চেষ্টা করে প্রলয় ঘোষ বললেন : 'আই ডোন্ট নো, মে বি অ্যাবাউট কাপল অফ হান্ড্রেড ডলারস।'

'ডু য়্যু হ্যাভ এ রিসিট ?'

'রিসিট ?' আশ্চর্য হলেন প্রলয় ঘোষ : 'হু কিপ্‌স এ রিসিট অফ ডিনার প্লেটস ?'

'গুড ফর য়্যু। লেট'স রাইট থ্রী সেভেনটি ফাইভ।' খসখস করে ফর্মের ওপর কি সব লিখতে লাগল লোকটা।

প্রলয় ঘোষ তাজ্জব। মুখ ফসকে বলে ফেললেন : 'হোয়াই সো মাচ ?'

মুখ তুলে মুচকি হাসল লোকটা। ফর্মটা ভর্তি করতে করতে বলল : 'দ্যাটস দিস কান্ট্রি ম্যান। ইফ য়্যু ওয়ান্ট টু সে সামথিং য়্যু ক্লিম ফর ফোর হান্ড্রেড মে

বি দে উইল পে টু হাড্রেড। ইফ য়্যু আস্ক ফর টু—য়্যু উইল গেট ওয়ান। ডিড য়্যু চেক এভরিথিং ?'

'হোয়াট ?' লোকটা কি বলতে চাইছে বুঝতে পারলেন না প্রলয় ঘোষ।

'নো আদার কমপ্লেন্টস, রাইট ?'

না, আর কিছু মনে পড়ছে না। সবই মোটামুটি দেখে নিয়েছেন ওপরে। লোকটার কথার উত্তরে ঘাড় নাড়লেন প্রলয় ঘোষ : 'এভরিথিং সিমস টু বি ওকে।'

'সাইন হিয়ার দেন'—ফর্মটা এগিয়ে দিল লোকটা।

একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে খস খস করে কাগজে সই করলেন প্রলয় ঘোষ। একটা কপি নিজে রেখে অন্যটা প্রলয় ঘোষকে দিয়ে লোকটা বলল : 'কল দি অফিস নেকসট উইক। ফলো আপ ফর দি মানি।'

প্রলয় ঘোষ হেসে বললেন : 'রাইট। আই উইল স্ক্রিম।'

লোকটা হা হা করে হেসে উঠল : 'য়্যু গট ইট ম্যান। স্ক্রিম। য়্যু ডোণ্ট রিকোয়েস্ট নাথিং। য়্যু স্ক্রি। দ্যাটস দি নেম অফ দি গেম।'

.কি আশ্চর্য মিল। কিছুক্ষণ আগেই সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে উনি একই কথা ভেবেছিলেন। আওয়াজ, চীৎকার, চেঁচামেচি। আমেরিকা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। নিজেকে জাহির করতে হবে—নাহলে কেউ তোমাকে দেখবে না। চেঁচামেচি না করলে কেউ শুনবে না। প্রলয় ঘোষ মনে মনে ভাবলেন—তবু আমেরিকা ভাল। চেঁচামেচি করলে তবু শুনবে আশা আছে। আমাদের দেশে তো চেঁচামেচি করতে করতে নেতিয়ে গেছে মানুষ। বলতে গেলে মেনে নিয়েছে সব কিছু। জানে লাভ নেই। একেক দেশে একেক রকম। এখানে যেমন আওয়াজ, আমাদের দেশে তেমনি ক্যাচ। ক্যাচের এমনই মহিমা যে আওয়াজ না করলেও চলে—নিঃশব্দে কাজ হয় তখন। এম· এ· পাশ করে পনেরটা বছর কলম পিষলেন প্রলয় ঘোষ। আর সুরজিত ! একে বাবা ক্যাচ, তার ওপর শ্বশুর ক্যাচ। কলকাতায় নাকি তিন তিনখানা মিনিবাস। শ্বশুর লাইসেন্স করে দিয়েছে। বিরাট বাবা ছিল, তাই বিরাট শ্বশুরও পেল। রাজকন্যা, তিনখানা মিনিবাস, কলকাতায় নাকি দু' দুখানা ফ্ল্যাট। বি· এ· পাশ করেনি তো কি এসে যায়। বড়লোকদের কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি পাশ ? যাদের কিছু হলো না, তাদেরকেই ক্রমাগত ঘ্যানব ঘ্যানর করতে হয় আমি এই পাস, আমি ঐ পাস। ক্যাচ থাকলে হলো, না হলে ঘানি ঠেলো। প্রলয় ঘোষের ক্যাচও ছিল না, উনি অসাধারণও নন। কাজেই চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘানি ঠেলতে

হলো ওঁকে। তার চেয়ে এই দেশ হাজার গুণে ভাল। সুরজিতকে খানিকটা ইচ্ছে করেই প্রলয় ঘোষ এখানে এসে উঠতে লিখেছেন। একবার আসুক। দশ লাখ রুপেয়ার বাড়িখানা একবার দেখে যাক। সেবকম বাবা, শ্বশুর যাদের নেই তাদের সব চেয়ে বড় ক্যাচ হলো গ্রীণ কার্ড। গ্রীণ কার্ডের মাহাত্ম্য দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে ওর।

'দ্যাটস ইট দেন। ডু য়্যু নিড এনিথিং এলস্?' বিশাল চেহারার লোকটা জানতে চাইল।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে প্রলয় ঘোষ বললেন · 'আই ডোন্ট থিংক সো।'

'ওকে দেন। লেট'স গো, গাইজ।' সিঁড়ি দিয়ে ওপবে উঠতে লাগল লোকটা।

লোকগুলোর পেছন পেছন বাইরে বেবিয়ে এলেন প্রলয় ঘোষ। বাইরে বেবিয়ে এসে লোকটা একবাব ঘুবে দাঁড়াল। পুরো বাড়িটা দেখল একবাব। তাব পর হেসে বলল: 'য়্যু গট এ নাইস হাউস। এনজয় ইট।'

আনন্দে বুকটা ভরে গেল প্রলয় ঘোষেব। অস্ফুট স্ববে উনি বললেন—'থ্যাঙ্ক য়্যু। আই উইল।'

এই মুহূর্তে লোকটাকে ভালই লাগল ওঁর। কিছুক্ষণ আগে মনে মনে লোকটার ওপর যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন উনি। অথচ এই লোকটাই দুশো ডলারের জিনিস তিনশো পঁচাত্তর দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে গেল। চায়না প্লেটগুলো না ভাঙ্গলে মনে মনে এই লোকটার ওপর একটা বিদ্বেষ থেকে যেত ওঁর। মনটা খুব খুশি লাগছে এখন। হঠাৎ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা কুড়ি ডলারের নোট লোকটাব দিকে এগিয়ে দিলেন প্রলয় ঘোষ।

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে লোকটা বলল: 'থ্যাঙ্কু য়্যু।'

'য়্যু আর ওয়েলকাম। য়্যু ফিল টায়ার্ড, রাইট? আই নো, আই ফিল টাযার্ড।' সত্যিই ক্লান্তি অনুভব করছিলেন উনি। 'টায়ার্ড ইজ রাইট। উই আর গোইং টু গেট ড্রাংক নাও, রাইট গাইজ।' লোকটা চীৎকার করে বলল ওব সঙ্গীদের।

হল্লা করে উঠল ছেলেগুলো—'রাইট অন।'

লোকটা গিয়ে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসল। অল্পবয়সী সেই ছেলেটা ভ্যান স্টার্ট করল। আর দুটো লোক ভ্যানের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিযেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বিরাট ভ্যানটা অদৃশ্য হয়ে গেল। দুপাশের লনের মাঝখানের সরু রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে প্রলয় ঘোষ চারিদিকে তাকালেন।

পাড়াটা এখন খুব জমজমাট। অনেকেই বাড়ির বাইরে বসে আছে এখন। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলা করছে ফুটপাতে। বেলা পড়ে এসেছে। দু'চারটে হলুদ রোদ্দুরের টুকরো ইতস্তত লনে ছড়িয়ে রয়েছে। পাশের বাড়ির লোকটা লন ট্রিম করছে। ওর মাথার চুল সব সাদা। বেশ বয়স হয়েছে মনে হয়। হাঁটতে হাঁটতে প্রলয় ঘোষ লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

লোকটি মুখ তুলে তাকাতেই প্রলয় ঘোষ বললেন : 'হায়! মাই নেম ইজ মিঃ ঘোষ।'

ট্রিমারটা নামিয়ে হাতটা প্যান্টে মুছে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা—'হায়। আই অ্যাম হ্যারি। ওয়েলকাম টু দি নেবারহুড।'

'নাইস প্লেস, ইজন্ট ইট?' আলাপ জমানোর চেষ্টা করলেন প্রলয় ঘোষ।

'ও ইয়া। আই লাইক ইট।'

'হাউ লং হ্যাভ য়্যু বিন হিয়াব?'

'ও, আই ডোন্ট নো। টোয়েন্টি ফাইভ ইযাবস। মে বি এ লিটল মোর। লং এনাফ, রাইট', হ্যারি হেসে বলল। কোলে কযেকমাসের একটা নাদুসনুদুস ন্যাড়া মাথা লাল টুকটুকে একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন হ্যারিব কাছে। হ্যারি তাকাতেই মহিলা বলে উঠলেন 'মাম ইজ লুকিং ফর য়্যু ড্যাড।'

নাতিকে দেখিয়ে হ্যারি বলল . 'মাই গ্রান্ডসন বিলি। দিস ইজ মাই ডটার সিন্থিয়া। দিস ইজ..' এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত বোধ করে বললেন—'আই অ্যাম সরি, হোয়াট ডিড য়্যু সে ইয়োর নেম ওয়াজ?'

'ঘোষ। প্রলয় ঘোষ। য়্যু কান কল মি পিটার।'

'গোস, ইজ ইট? পিটার গোস। হি ইজ নাও আওয়ার নেক্সট-ডোব নেবার।' হ্যারি আলাপ করিয়ে দিল। সিন্থিয়া মৃদু হেসে মাথা নোয়াল একটু।

প্রলয় ঘোষ একটুখানি এগিয়ে বাচ্চাটাব দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হায বিলি।'

বিলি কিছুক্ষণ প্রলয় ঘোষের মুখেব দিকে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। সিন্থিয়া বেশ অপ্রস্তুত। তাডাতাড়ি খানিকটা কৈফিযতের সুরে বলল—'হি ইজ নট ইন এ গুড মুড টুডে। কাম অন বিলি, সে হ্যালো টু হিম। হি ইজ আওয়াব নেক্সট-ডোর নেবার। কাম অন। বি এ নাইস বয়।' অনেক বোঝানো সত্ত্বেও বিলি মুখ তুলল না কিছুতেই।

প্রলয় ঘোষ হেসে ফেললেন। তাড়াতাড়ি পরিস্থিতিটা হাল্কা করতে চেষ্টা করলেন : 'লিভ হিম এলোন। উই উইল মেক ফ্রেণ্ডস লেটার।'

সিন্থিয়া একটু হেসে আবার বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

প্রলয় ঘোষ হেসে বললেন—'য়্যু আর এ প্রাউড গ্র্যাণ্ড ফাদার। ইজ সিন্থিয়া ইয়োর ওনলি চাইল্ড ?'

হ্যারি প্রলয় ঘোষের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। ট্রিমারটা দিয়ে লনের ধারটা কাটতে কাটতে খানিকটা অন্যমনস্ক সুরে বলল : 'ইয়েস অ্যাণ্ড নো।'

প্রলয় ঘোষ কি বলবেন ঠিক বুঝে পেলেন না। কয়েক মুহূর্ত পর হ্যারিই মুখ তুলে বলল : 'আই হ্যাভ এ সন, হি ডায়েড ইন ভিয়েতনাম টেন ইয়ারস এগো।'

প্রলয় ঘোষ থতমত খেয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন : 'আই অ্যাম সরি।'

'ইটস অলরাইট। য়্যু হ্যাভ গুড থিংস অ্যাণ্ড য়্যু হ্যাভ ব্যাড থিংস ইন লাইফ। ইট ইভেনস আউট অ্যাট দি এণ্ড। আই ক্যান্ট কমপ্লেন। য়্যু হ্যাড চিলড্রেন ?'

প্রলয় ঘোষ চমকে উঠলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন : 'ইয়েস। এ ডটার। শি জাস্ট গ্রাজুয়েটেড ফ্রম হাইস্কুল দিস ইয়ার।' কি জানি কেন, মাটির কথা বলতে ভাল লাগল না ওঁর।

'ড্যাড', দূর থেকে সিন্থিয়ার গলা ভেসে এল।

'এক্সকিউজ মি।' হ্যারি একটু হাসল।

'ইটস ওকে। আই হ্যাভ টু গো হোম টু।' প্রলয় ঘোষ পা বাড়ালেন।

'লেট আস নো, ইফ য়্যু নিড সামথিং। এনিথিং অ্যাট অল।'

'থ্যাঙ্ক য়্যু।' মৃদু হেসে প্রলয় ঘোষ এগোতে লাগলেন বাড়ির দিকে। কত সহজেই এরা সব কিছু মেনে নেয়। থাকা, না থাকা সব কিছুই পার্ট অফ লাইফ। জীবন কারো জন্য থমকে দাঁড়ায় না—কারও জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই। কোটি কোটি অসংখ্য প্রাণবিন্দুর সমষ্টি মাত্র নয়, সূর্য, চন্দ্র, তারা, পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ, বাতাস সব কিছু মিলিয়ে এই বিশাল সৃষ্টির কারখানায় কত বিন্দু জ্বলে, নেভে প্রত্যহ। কে কার হিসেব রাখছে। সেকেণ্ডে আঠার মাইল বেগে এই দুরন্ত পৃথিবী পাক খাচ্ছে— তারই মধ্যে মানুষ যে নিশ্চিন্তে মাটিতে পা ফেলে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে এটাই তো পরম বিস্ময়—তার মধ্যে এক একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মানুষ—তার জন্ম, বেঁচে থাকা, মৃত্যু সব কিছুই জিরো থেকে ইনফিনিটির হিসেবে নাথিং—স্রেফ নাথিং। কোটি কোটি বছরের হিসেবে ষাট-সত্তর বছরের মামলা। সত্যি কথা বলতে কি এই একেকটা ষাট-সত্তর বছরের মামলা বিরাট

জীবনেব হাইকোর্টে উঠবে না কোনদিন। কি হবে ফিবে তাকিযে। হ্যাবিই ঠিক। যে চলে গেছে, সে গেছে। কি হবে যন্ত্রণা পেযে। কি হবে বিচাব কবে কে ভুল কে ঠিক। প্রলয ঘোষ মনে মনে ভাবলেন—একটা সমযেব ভুল আবেকটা সমযে ঠিক কবা যায না। যতটা পাবলাম, কবলাম। যা পাবিনি, পাবিনি। অনেক হাবিযেছি, অনেক পেযেছি। এগিযে যেতেই হবে। সামনে দাঁডিযে নিজেব বাডিটাব দিকে ভাল কবে তাকালেন প্রলয ঘোষ। খড়্গাপুবেব কোযার্টাব থেকে নিউইযর্কেব ভাল পাডায একটা ছিমছাম সুন্দব বাডি। একটা বড গাডি, কিছু স্টক, ব্যাঙ্কে কযেক হাজাব ক্যাশ, জীবনেব প্রিমিযাম দুশো হাজাব ডলাব। কেউ মনে বাখুক না বাখুক, প্রলয ঘোষেব জীবনে ওইটুকুই অনেকখানি পাওযা। হঠাৎ মাথাটা ঘুবে উঠল প্রলয ঘোষেব। চোখেব সামনে বাডিটা দুলে উঠল, মাটিটা কেঁপে গেল। পা দুটো হাল্কা। সামনেব বুশেব পাতাগুলো এবড়ো খেবড়ো নেচে উঠল চোখেব সামনে। সেকেণ্ডে আঠাবো মাইল বেগে ঘোবা সেই বলটায পা বেখে নিজেকে সোজা বাখতে চেষ্টা কবলেন উনি। হাত বাডিযে ধবতে চেষ্টা কবলেন কিছু। দু গজ এগোলেই বাডিব সামনেব ঐ সাদা বেলিং। যেমন কবেই হোক ওখানে পৌঁছতেই হবে। কোনবকমে টলতে টলতে এগিযে বেলিংটাকে শক্ত কবে চেপে ধবলেন প্রলয ঘোষ। একটা অদ্ভুত অনুভূতি শবীবে যেন কোন ভাব নেই। দৃষ্টিতে স্থিবতা নেই। এবোপ্লেন থেকে টুক কবে কাউকে ফেলে দিলে যে বকম হয। বেলিংটাকে কোনমতে আঁকডে ধবে মাটিতে বসে পডলেন প্রলয ঘোষ। বেলিংএ মাথা দিযে চোখটা বুজে ফেললেন। আলো নেই, শব্দ নেই, কোন ছবি নেই। একটা ভযাবহ শূন্যতা। একটা অদ্ভুত অন্ধকাব। বঙ বেবঙেব অজস্র তাবা সেই অন্ধকাবে ভেসে যাচ্ছে। কোন বঙটাই স্পষ্ট নয। এই বিবাট জীবনেব কাবখানায একটা ছোট্ট বেলিং আঁকডে শিশুব মতো বসে বইলেন প্রলয ঘোষ। মনে পডে না। বিবাট শূন্য সমযেব মাপ বদলে যায।

'চা হযে গেছে।' দূব থেকে কে যেন কথা বলল। দবজা খোলা, বন্ধ হবাব স্পষ্ট আওযাজ কানে এল। চোখ খুললেন প্রলয ঘোষ। 'ওখানে বসে আছ কেন? বাজ্যেব নোংবা ওখানে।' বত্নাব কণ্ঠস্বব স্পষ্ট চিনতে পাবলেন উনি।

'একটু বেস্ট নিচ্ছি।' আস্তে আস্তে বললেন প্রলয ঘোষ। সমস্ত জামাটা ভিজে গেছে ঘামে। বুকে হাত বাখলেন উনি। হৃৎপিণ্ড মনেব আনন্দে লাফাচ্ছে। ধক ধক ধক। ফুটপাতেব ওপবে বিবাট গাছটা এখন স্থিব। ঘাসেব ওপব হলুদ বোদ্দুবেব টুকবোগুলো উধাও। কালো ছোপ লেগেছে সবুজ

পাতাগুলোর গায়ে।

'ভেতরে এসে একটু আরাম করে বস-না।' রত্না দূর থেকে বললেন : 'একটু শুয়ে নাও। সারাদিন যা ধকল গেছে আজ।'

'যাচ্ছি।' একটু থেমে প্রলয় ঘোষ বললেন : 'তুমি যাও আমি আসছি। বাইরের হাওয়াটা ভাল লাগছে।' সত্যিই ভাল লাগছে। ঘর্মাক্ত শরীরে বাতাস লাগলে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায়। মাথা ঘোরাটা এখন আর নেই। অথচ সমস্ত শরীরটা যেন অসম্ভব দুর্বল। দু' চোখের পাতা কাঁপছে। একটা বিষণ্ণ অবসাদ ঘিরে রয়েছে এখনো। শরীরের আনাচে কানাচে একটা হাড় মুড়মুড়ি ব্যথা। ব্যথাটা যেন ঘাড় থেকে হাতে, কোমর থেকে পায়ে পেঁচিয়ে শুয়ে রয়েছে। চোখের পাতাদুটোয় অসহ্য ভার। প্রলয় ঘোষের মনে হলো আরেকটু বসে থাকলেই উনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়বেন। চা'টা খেয়েই আরাম করে স্নান করতে হবে গরম জলে। আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে গড়াতে হবে একটু। শরীর আর মহাশয় নয় আজকাল, সব ধকল সয় না। আর, বাড়ি মুভ করা কি চাট্টিখানি কথা। এই দেশটার সব কিছু ভাল। শুধু চাকর-বাকরের বড্ড অভাব। দু' একজন ডাক্তার, বদ্যি কি ব্যবসাদার যে চাকর-ঝি রাখছে না তা নয়। তবে অধিকাংশ মধ্যবিত্তই চাকর রাখার কথা ভাবতে পারেন না। মাইনে করা লোক রাখতে মাসে প্রায় চারশ-পাঁচশ ডলার। খাবে, দাবে, থাকবে। শনি, রবিবার ছুটি। নিউ-ইয়ার, ক্রীসমাস তো আছেই। তা ছাড়া দু' উইক ভেকেশন। অনেকে অবশ্য দেশ থেকে লোক আনিয়ে মাসে একশ ডলার করে দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন মাঝে মধ্যে। সেখানেও হাঙ্গামা। সুরেশ বিশ্বাসকে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছে লক্ষ্মণ। উকিলকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে, গ্রীণকার্ড করিয়ে, টিকিট কেটে, লক্ষ্মণ বলে অনেকদিনের বিশ্বাসী লোককে দেশ থেকে আনালেন সুরেশ বিশ্বাস। নাইট স্কুলে পাঠিয়ে ইংরিজী শেখালেন। সুন্দর জামাকাপড় পড়ে ভদ্রলোকের মত লক্ষ্মণ বাড়িতে ঘুরে বেড়াত—রান্না-বান্না, ঘর-দোর পরিষ্কার, বাসন ঘষা সব কিছু করত। এমন কি সুরেশ বিশ্বাস না থাকলে ফোন তুলে পরিষ্কার ইংরিজীতে বলত—'মিস্টার বিশ্বাসে'র রেসিডেন্স। হু ইজ কলিং, প্লীজ ?' সবই কপাল—মনে মনে ভাবলেন প্রলয় ঘোষ—না হলে এতদিনের বিশ্বাসী লোকটা পথে বসিয়ে যাবে কেন ? দু' বছর পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কেস করল। পঞ্চাশ হাজার ডলার। অভিযোগ—খেতে দেয়নি, পরতে দেয়নি, মাইনে দেয়নি, দিনে প্রায় ষোলো ঘণ্টা কাজ। এই সব যোগ করে দু' বছরে পঞ্চাশ হাজার ডলার। চোখেমুখে অন্ধকার দেখেছেন সুরেশ বিশ্বাস।

আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট হয়েছে শেষ পর্যন্ত। দশ বিশ হাজার নিশ্চয়ই গেছে। লোক জানাজানি, পার্টিতে পার্টিতে কানাকানি, হাজার রকমের গল্প। মনের দুঃখে আমেরিকা ছেড়ে সৌদি আরবিয়ায় চলে গেছেন সুরেশ বিশ্বাস। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ওকে দেশছাড়া করে ছেড়েছে। এ এক অদ্ভুত গণতন্ত্রের দেশ—মনে মনে ভাবলেন প্রলয় ঘোষ—আমেরিকায় ভদ্রলোকেরা চাকর আর চাকররা ভদ্রলোক বনে যায়। সুরেশ বিশ্বাস সৌদি আরবিয়ায় গেলেন আর শোনা যায় লক্ষ্মণ নাকি নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর কিছুদিন পর, লক্ষ্মণ বলে ডাকলে সাড়াও দেবে না হয়ত। নাম বদলে ল্যারি হয়ে যাবে ততদিনে। তারই মধ্যে পার্টিতে ঐ ছোঁড়াটা—শৈবাল না কি যেন নাম—দুম করে বলে উঠল : 'অন্তত এই পৃথিবীতে একটা গরীব তার পাওনা বুঝে নিয়েছে। সুরেশবাবুর কয়েক হাজার গেছে, সৌদি আরবিয়ায় আবার সেটা তেলের সঙ্গে চলে আসবে হাতে। আর. লক্ষ্মণের কথা একবার ভাবুন তো। এই কয়েক হাজার ডলার তার কাছে একটা গোটা পৃথিবী। ওর সঙ্গে হয়ত একটা পুরো পরিবারের ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি। কোনটা বড় ! সুরেশবাবুর দুঃখ না লক্ষ্মণের ভালোভাবে বেঁচে থাকাব টিকিট। এই সব কথাবার্তা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে প্রলয় ঘোষের। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, খুব বিরক্ত হয়ে প্রলয় ঘোষ বলে উঠেছিলেন—'তোমার যখন গরীবদের জন্য এত দুঃখ, এত ভালবাসা, তাহলে আমেরিকা এলে কেন ? দেশে থেকে গরীবদের কথা ভাবলেই তো পারতে !' ছোকরার এত বড় স্পর্ধা, মুচকি হেসে মুখের ওপর বলে উঠল : 'বেশ করেছি এসেছি। প্রেসিডেন্ট রেগান বা আপনি আমার মরাল গার্জেন নন। আমেরিকায় এসেছি বলেই যে আমাকে আমেরিকার দালালদের মতো কথাবার্তা বলতে হবে এরকম কোন দাসখত লিখে দিয়েছি কি ?' থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। ছেলেটার বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করে। ভাবসাব দেখলে মনে হবে ওই বোধহয় একমাত্র পণ্ডিত। কার্ল মার্কস কিংবা সরস্বতী যেন ওর দেহেই ভর করেছেন। এতদিন পর সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে বসে পুরোনো এই কথাটা ভেবে প্রলয় ঘোষ মনে মনে হেসে উঠলেন। মনে মনে বললেন—'জীবনের কতটুকু তোমরা দেখেছ শৈবাল ? আমি অনেকখানি দেখেছি। মাটিতে মুখ রগড়ে দেশের মাটিতে পড়ে থেকেছি চল্লিশ বছর। কেটেকুটে সাড়ে পাঁচশ টাকায় দুটো মেয়ে, বউ, মা নিয়ে সংসার চালিয়েছি ষোল বছর। যে আমায় দিয়েছে, আমি তার। যে দেশ আমায় দেয়নি, সে কেন দিতে পারে না, সেসব ভাবনা করার সময় পাইনি জীবনে। বল, স্বার্থপর

বল, যা খুশি তোমাদের বল। আমি শুধু আমার নিজের জীবনের দালাল। সুরেশ বিশ্বাসের জন্য কষ্ট বা লক্ষ্মণের বেঁচে থাকার টিকিট কোনটাই আমার কাছে বড় নয়। ওগুলো শুধু বলার জন্য বলা। একটু আলোচনা, একটু খোশগল্প, সারা সপ্তাহ খেটে শনিবার সন্ধ্যের সময় কাটানো। তার বাইরে শুধু এইটুকু চাই একটা সুস্থ বাঙালী সমাজ গড়ে উঠুক বিদেশে। তোমাদের আপত্তি আছে কারো?' শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রলয় ঘোষ। কোনো উত্তর নেই। উত্তর দেবার কেউ নেই।

ঘরের ভেতর থেকে রত্নার গলা পাওয়া গেল আবার : 'হ্যাঁগো, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল চা-টা। আসবে না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রলয় ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন। চুলগুলো সপসপে ভিজে। তবুও আঙ্গুল চালিয়ে কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরালেন। তারপর ক্লান্ত পায়ে হেঁটে বাড়ির ভেতরে যখন ঢুকলেন, বাইরে তখন অন্ধকার হতে বেশি দেরী নেই।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই রত্না বললেন—'আজ মহালযা, জানো?'

'মহালয়া?' অবাক হলেন প্রলয় ঘোষ · 'তাই নাকি? কি করে বুঝলে?'

'কাপ বের করতে গিয়ে, দুমড়োনো বাংলা ক্যালেণ্ডারটা বেরোল।'

'শুভ দিন বল। নতুন বাড়িতে ঠিক দিনেই এসেছি তাহলে?'

'শুভ দিন আমি জানতাম। হিন্দু টেম্পেলে ফোন করেছিলাম সপ্তাহ দুয়েক আগে। ওরা বলেছিল শুভ দিন। মহালয়া বলেনি।'

'মহালয়া বললে কি করতে?' হেসে ফেললেন প্রলয় ঘোষ।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রত্না : 'তা ঠিক। কিই বা করতাম। তবু, মনটা খারাপ লাগে। নিউইয়র্কের প্যাণ্ডেলে টেপ রেকর্ডারে ঢাকের বাজনা শুনতে শুনতে আসল ঢাকের আওয়াজ বোধহয় ভুলেই গেছি এতদিনে। এখানে আসার পব একবারও দেশে যাইনি পুজোর সময়।'

'কেন, এখানে তো অনেকগুলো পুজো হয় এখন।'

'তা হয়', অন্যমনস্ক সুরে রত্না বললেন—'কিন্তু দেশে অন্যরকম। তোমার মনে হয় না?'

একটু চুপ করে থেকে প্রলয় ঘোষ বললেন—'আগে হতো। এখন মেনে নিয়েছি। একটা পেতে গেলে আরেকটা ছাড়তে হয়। তবু যে দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই বিদেশ বিভূঁয়ে বসে বাঙালীরা দুর্গাপুজো করে এটা কি কম কথা। শুনেছি আমেরিকা ক্যানাডা মিলিয়ে আজকাল প্রায় গোটা চল্লিশেক

পুজো হচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা খোদ আমেরিকাতে থেকেও দেশের পুজো পার্বণ সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে এটা কেন ভাবছ না?'

'ওদের কথা আলাদা। যারা দুধের স্বাদ পায়নি, তাদের ঘোলে আপত্তি থাকে না। ওরা আর আমবা শুধু নামে এক। আসলে আমবা দুটো আলাদা জাত।'

'কেন?' চমকে উঠলেন প্রলয় ঘোষ।

পুরোনো চা ফেলে দিয়ে নতুন করে দু'কাপ চা তৈবি করে এনে টেবিলের ওপব রাখলেন বত্না। বিস্কুটের টিনটা খুলতে খুলতে বললেন—'তোমার মনে হয় না, আমরা আর আমাদের ছেলেমেয়েরা দুটো আলাদা জাত? আমরা বললে ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ওরা কথা বললে আমবা ভুরু কোঁচকাই। ওবা বাংলা বোঝে, আমরা ইংরিজী বুঝি। কিন্তু আমাদের মনের ভাষা এক নয়।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চেয়ারের ওপর আরাম করে পা তুলে বসে একটা সিগারেট ধরালেন প্রলয় ঘোষ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—'কে দায়ী এর জন্য? আমরা চেষ্টা তো করেছি। পরিবেশ তৈবি করার চেষ্টা করেছি। ক্লাব করেছি। বাংলা স্কুল খুলেছি। নাচ-গান-পূজা-পার্বণ কিছুই তো বাদ রাখিনি আমরা। এর থেকে বেশি আমরা আর কি করতে পারতাম?'

'কাউকে দায়ী কবছি না আমি। আমরা চেষ্টা করেছি ওদেরকে কাছে আনার, ওরা চেষ্টা করেছে কাছে আসার। কাউকে দোষ দেবার নেই। আমেরিকার মতো বিরাট দেশে থাকতে গেলে এটুকু বোধহয় ছাডতেই হবে।'

সিগারেটটা নিভিয়ে দিলেন প্রলয় ঘোষ। তেতো লাগছে কিরকম। মুখটা বিস্বাদ হয়ে আছে। চা'ও ভাল লাগছে না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে এখনো। চেয়ারে মাথাটা হেলিয়ে বললেন: 'হ্যাঁ তা হবে। কত মানুষকে কত কিছু ছাড়তে হয়। এত বড় ব্রীজ। ওপারে যেতে টোল লাগবে না?'

'জানি।' একটু চুপ করে থেকে রত্না বললেন: 'তবু কষ্ট হয়। আর, এই কষ্ট কাউকে বোঝানো যায় না।'

'কোন কষ্টই বোধহয় কাউকে বোঝানো যায় না। সব কষ্টই সম্পূর্ণভাবে নিজের। তাছাড়া...' কথাটা শেষ করতে পারলেন না প্রলয় ঘোষ। পেটটা গুলিয়ে উঠল। বমি পাচ্ছে। মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে চোখ বুজলেন উনি।

'কি হলো?' রত্না অবাক হলেন একটু।

হাতের ইসারায় রত্নাকে কথা বলতে নিষেধ করলেন প্রলয় ঘোষ। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে ফিস ফিস করে বললেন: 'গাটা গুলোচ্ছে।'

রত্না চুপ করে বসে রইলেন চেয়ারে। একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন:

'শরীরের আর কি দোষ। সারাদিন খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। সোফায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাক কিছুক্ষণ।'

প্রলয় ঘোষ কোন উত্তর দিলেন না। দর দর করে ঘামছিলেন উনি। পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়িগুলো যেন পাক খাচ্ছে কি রকম। কিছুক্ষণ চেপে থাকার চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালেন উনি। কোনরকমে হাত দিয়ে মুখটা চেপে বাথরুমের দিকে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রত্না। বাথরুমের বেসিনে দু'হাত রেখে প্রলয় ঘোষ অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিলেন। মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে নীচের দিকে। পেটে যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে গেল। কলটা খুলে দিলেন রত্না। মুঠো করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে প্রলয় ঘোষের ঘাড়ে, মাথায়, কপালে ছড়িয়ে দিলেন উনি। অনেকটা সময় একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রলয় ঘোষ। তারপর মুখ তুলে আয়নার দিকে তাকালেন। রত্না প্রশ্ন করলেন—'কি রকম লাগছে, এখন ?'

'একদম ফিট।' মুখে চোখে জল দিলেন প্রলয় ঘোষ।

'তবু একটু শুয়ে থাক কিছুক্ষণ। সোফাতে একটা বালিশ পেতে দিই।'

'নির্ঘাৎ চাইনিজ।'

'মানে ?' একটু অবাক হলেন রত্না।

'চিকেন চাউমেন খেলাম কাল রাত্তিরে। আজকাল ওরা নাকি শুয়োরের চর্বি টর্বি মেশায়। কিরকম গ্যাদগেদে আঠা আঠা ভাব।'

'অ্যাঁ, শুয়োর কি গো। চিকেনে শুয়োর দেবে কেন ?' আঁতকে উঠলেন রত্না।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে প্রলয় ঘোষ বললেন—'স্বাদ ভাল করার জন্য দেয়।'

'বলনি তো কোনদিন ?'

'আরে, আমিই কি ছাই জানতাম। গত সপ্তাহে অফিসের একজন বলল।' বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোফাতে আরাম করে বসলেন প্রলয় ঘোষ।

'এটা কিন্তু অসভ্যতা। ওদের বলে দেওয়া উচিত।'

'ওরা সব পারে। মুখ দেখে ওদের ভেতরটা বোঝার উপায় নেই। নির্বিকার, শান্ত, গৌতম বুদ্ধের মতো চেহারা। হাসি, কান্না, দুঃখ বিরক্তি সব একরকম। যাই বলবে ঘটঘট করে যন্ত্রের মতো মাথা নাড়বে। কিন্তু যা করবার ভেতরে ভেতরে ঠিক করে যাবে।'

রত্না হেসে ফেললেন—'যাঃ। খামাখা চাইনিজ খাবারের দোষ দিয়ে লাভ কি। আমিও তো খেয়েছি—কই, আমার তো কিছু হয়নি।'

'হয়নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ।' ঘড়িতে সময় দেখে চমকে উঠলেন প্রলয় ঘোষ. 'মাই গড। সাতটা বাজতে চলল। অরবিন্দ পোদ্দারের বাড়িতে যেতে হবে যে গো।'

'আজকে বাদ দাও না। এত খাটাখাটুনি গেছে। একটু আরাম কব।'

'তাই কখনো হয়। পুজোর ফাইন্যাল মিটিং। না গেলে খাবাপ দেখায।'

'পুজো না হাতি। পুজোব চেয়ে মিটিংটাই বেশি। খালি তক্কাতক্কি, গালাগালি, আর এর-ওর পেছনে লাগা। কে প্রেসিডেন্ট, কে ভাইস প্রেসিডেন্ট এইটাই যেন আসল ব্যাপার। পুজো না ন্যাশনাল ইলেকশন বোঝা মুশকিল।'

গজ গজ করে উঠলেন রত্না।

'ওটাও দরকার। আইডেন্টিফিকেশন। তাব জন্য একটু খাবলাখাবলি তো হবেই। এটাও একবকমের এন্টারটেনমেন্ট। পুজো থাকবে, দলাদলি থাকবে, রবীন্দ্রসংগীত-টংগীত থাকবে, থিয়েটার হবে—তবেই না বাঙালী। নাহলে চুপচাপ, শান্তিপূর্ণ পুজো কিবকম মরা-মরা লাগবে ভেবে দেখ।'

'আজকাল আব ভাল লাগে না।'

'কেন ? আমার তো ভালই লাগে। এক ফ্যামিলিতে দু'জন অফিসার। আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট, তুমি ভোগ ম্যানেজার।'

'বিচ্ছিরি। ভোগ ম্যানেজার—আমার দরকার নেই ম্যানেজারির। শবীরে, মনে কুলোয় না আর। গাদা গাদা রান্না কর, সন্দেশের জন্য বাড়ি বাড়ি ফোন কর। প্রথম প্রথম করেছি—আর ভাল লাগে না। দেশের লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে না। যদি গিয়ে বলি সাড়ে তিনশ সন্দেশ করি পুজোতে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়বে।'

'দেশের লোকের কথা বাদ দাও। আমেরিকার আরামটাই ওরা জানে, ব্যারামটা নয়। কিন্তু এই ক্লাবটারও দরকার ছিল তাই না ? যতই ঝগড়া হোক—তবু এটাই আমাদের হাতে গড়া ছোট্ট দেশ। এটাই আমাদের রাজত্ব। আমাদের বিশ্রাম। আমাদের স্বপ্ন, সব কিছু। তার চেয়েও বড় কথা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এ ক্লাবের প্রয়োজন আছে। এই সব না থাকলে ওরা জানতেই পারবে না ওদের বাপ-ঠাকুর্দার দেশ, সেই দেশের সংস্কৃতি।'

'এতদিন তাই ভেবেছি। আর ভাল লাগে না। ছোট্ট খেলনার মতো একটা দেশে মুখ গুঁজে দম বন্ধ হয়ে আসে। উইকএণ্ড হলেই গর্তে গিয়ে দেশ খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে গেছি। সেই একমুখ, এক পরিবেশ, একই ধরনের আলোচনা। আগে যেটাকে ভাবতাম দেশ এখন মনে হয় দেশের পোশাকে

সাজানো একটা বিদেশী পুতুল। গোটা দেশটা ফিরে পেতে চাই।'

'আর হয় না রত্না।' ম্লান হাসলেন প্রলয় ঘোষ : 'ইটস টু লেট। ফেরবার রাস্তা বন্ধ। তাছাড়া দেশে ফেরার কোন মানেই হয় না আর। দেশে গিয়ে থাকতে পারব বলে মনে হয় না।'

'চেষ্টা করব। আমাদের আর কি ! ছুটকি বড় হয়ে গেল। আর কিছুদিন পর, আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'চেষ্টা করার বয়স নেই আর। এখন নিশ্চয়তা চাই। মনে রেখো, চল্লিশ বছর চেষ্টা করেছি। আবার নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট করতে আমি রাজী নই।'

রত্না চুপ করে গেলেন। এই তর্কের কোন শেষ নেই। কথায় কথা বাড়বে শুধু। টেবিল থেকে কাপ দুটো তুলে রান্নাঘরে চলে গেলেন রত্না। প্রলয় ঘোষ উঠে পড়লেন সোফা থেকে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন : 'আমি স্নানটা সেরে নিই, কি বল ?'

'নাও', রত্না কাপ দুটো ধুচ্ছিলেন।

'তুমি রেডী হবে না ?'

'তুমি বেরোলে আমিও স্নান করব। এই ঘেমো শরীরে কোথাও যেতে ভাল লাগে না। বাড়িটার যা ছিরি হয়ে রইল। এটাকে ভদ্রস্থ করতেই মাসখানেক লেগে যাবে এখন।'

'বাড়ি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে করলেই হবে।' প্রলয় বাথরুমে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলেন রত্না। প্রায় একই সঙ্গে কলিং বেল বাজল। তোয়ালেতে হাত মুছে রত্না এসে দরজা খুললেন। পিংকি ঘরের ভেতরে ঢুকল। মেয়েকে দেখে চমকে উঠলেন রত্না। কালিবর্ণ চেহারা হয়েছে মেয়েটার। এই ক'মাসেই বড্ড রোগা হয়েছে। গজ গজ করতে করতে রান্নাঘরে ঢুকলেন রত্না : 'নিজের চেহারাটা আয়নাতে দ্যাখ একবার। গাল ভেঙে গেছে, কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। নিজে ইচ্ছে করে চেহারাটা নষ্ট করছিস।'

পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকে মাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল পিংকি।

'আঃ কি হচ্ছে কি !'

'সত্যি, মা, খারাপ লাগছে আমাকে দেখতে ?'

'খারাপ না তো কি। হাড় জিরজিরে চেহারা। দেখে মনে হচ্ছে খেতে পায় না মেয়েটা।'

'খেতে পায় না নয়, খেতে চায় না মেয়েটা। ওঃ মা। নেকবোলতা স্টাইল।'

'বিচ্ছিরি স্টাইল। এই সব হাড় বের করা স্টাইল আমার ভাল লাগে না।'

'তুমি কি চাও আমি হাতি হয়ে যাই।'

'হাড় না বেরোলেই কি সবাই হাতি হয়ে যায় ? তোর বয়স তো আমাদেরও ছিল একদিন। আমরা কি হাতি ?'

'না।' মুখ টিপে হাসল পিংকি।

'তবে আমরা কি ?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি মা। আমার মা। ডিয়ার ওল্ড মাদার।' পিংকি আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মাকে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল—'আর সকলে হাতি।'

'ছাড়বি না কি। কি খাবি বল।'

'ক্লোজ ইয়োর আইজ।'

'কেন ?'

'নো কোশ্চেনস, মা।'

'আচ্ছা বুঝেছি।'

'এবার আমার দিকে ফের।'

'কি ব্যাপার বল তো।'

'বলেছি না, নো কোশ্চেনস।'

রত্না ঘুরে দাঁড়ালেন মেয়ের দিকে।

'দেখছ না তো ?'

'না।' মুখ টিপে হাসলেন রত্না।

রত্নার ডানহাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার ওপর ছোট্ট একটা প্যাকেট রাখল পিংকি।

'কি এটা ?'

'এবারে চোখ খোল।'

রত্না চোখ খুললেন। হাতের ওপর ছোট্ট প্যাকেট দেখে বললেন—'এটা কি রে ?'

'সারপ্রাইজ।' পিংকি গম্ভীর মুখে বলল।

প্যাকেটটা খুলে ফেললেন রত্না। খুব সুন্দর একটা মেয়েদের ঘড়ি। প্যাকেটটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন রত্না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—'কোথায় পেলি ?'

'আগে বল কি রকম ?'

'খুব সুন্দর।'

'তোমার জন্যে কিনেছি মা। তোমরাই তো দিয়েছ আমাকে চিরকাল।' ঘড়িটা প্যাকেট থেকে বের করে রত্নার বাঁ হাতে পরিয়ে দিতে দিতে পিংকি বলল : 'আমি কিছু দিতে পারিনি কোনদিন। অনেকদিন থেকে ভেবে রেখেছিলাম—আমি যখন চাকরি করব—নিজের টাকায় তোমাদের জন্যে আই উইল বাই সামথিং।'

মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকাতে পারছিলেন না রত্না। বুকেব মধ্যে এক দঙ্গল গর্ভবতী মেঘ বাসা বাঁধল। চোখে আষাঢ়ের ঢল। মেয়ের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল কবতে রত্না পেছন ফিরলেন।

পিংকি বলল : 'ডিডন্ট য়্যু লাইক ইট মা?'

রত্না কোনো উত্তব দিতে পাবলেন না। সেই ছুটকি। এই তো সেদিন মাড়ি বার করে হাসত। 'ছুটকি রানী নাচে' বললে কোমর দুলিয়ে নাচত। কোলে তুলে নিয়ে রত্না যেই বলতেন 'একটু হামি মেরে দাও তো'—অমনি মাড়ি দিয়ে গালটাকে কামড়ে থুতু লাগিয়ে দিত একগাদা। সেই স্মৃতি, সেই একরাশ ছবি ঘুরে ফিরে চোখেব সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। নিঃশব্দে কাঁদছিলেন রত্না।

'মা।' পিঠে আবার হাত রাখল পিংকি।

'কি।' কোনরকমে নিজেকে সামলে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলেন রত্না। তাও গলাটা ভেঙে গেল একটু।

'লুক অ্যাট মি, মা।'

রত্না মেয়ের দিকে তাকালেন। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রত্না এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পিংকি অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়েছিল। কপালে রেখা পড়ে গেছে। অনেক চুল পেকে গেছে। তবুও চুল, কপাল, চোখ সব মিলিয়ে মা'র মধ্যে কোথাও যেন একটা দিদিভাই লুকিয়ে আছে। কোথায় ঠিক ধরতে পারছে না পিংকি। মনে মনে মা'র কপালের রেখাগুলো মুছে সেখানে একটা বড লিপস্টিকের টিপ। দিদিভাই-এর জ্বালায় পিংকি কাঁদতে পারত না। কাঁদলেই দিদিভাই খেপাত। হঠাৎ এখন মাকে খেপাতে খুব ইচ্ছে করল পিংকিব। মাটি যেরকম করে পিংকির ডানা দুটো ধরত পিংকি মাকে ঠেক সেইরকম করে ধরল। তারপর একটু নীচু হয়ে সোজাসুজি রত্নার চেখের দিকে তাকিয়ে সুর করে বলল : 'ছিচকাঁদুনি, নাকে ঘা।'

কাঁদতে কাঁদতে রত্না হেসে ফেললেন। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে বললেন—'সব টাকা খরচ করে এলি তো?'

'বলব না।'

'কেন ?'

'আগে বল তুমি কাঁদলে কেন ?'

'এমনি।'

'বলবে না ?'

'কি আবার বলব। বললাম তো।'

'না, ওরকম নয়। সত্যি করে বল। আমার বুকে হাত দিয়ে বল। পিংকি রত্নার ডান হাতটা নিজের বুকে চেপে ধরল। রত্না ছোটবেলায় মেয়েকে ঠিক এইরকম করতেন। বলতেন—'আমার বুকে হাত দিয়ে বল। আমার বুকে ভগবান আছে।'

'পিংকির গম্ভীর মুখ দেখে হেসে ফেললেন রত্না : 'কেন, তোর বুকে ভগবান আছেন ?'

'হ্যাঁ আছেন।'

'তবে যে তুই বলিস, হি নেভার লিসেনস।'

'আগে তুমি বল।'

কয়েক মুহূর্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন রত্না। এই মেয়েটা কে ? ছুটকি না মণিকা ? নাকি দুজনেই ? এরই মধ্যে দুটো মানুষ। একজন সেই মাড়ি বের করা, গোলগাল, উলঙ্গ সরল শিশু। আরেকজন স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী, বয়স্কা নারী। কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে পাওয়া যায় না। দুজনেই সত্যি। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে রত্না বললেন—'তুই কখনো কাঁদিস ?'

'আগে কাঁদতাম। এখন আর কাঁদি না। কান্না পায় না।'

'কেন কাঁদতিস।'

'কষ্ট হতো তাই।'

'আজ আমার উল্টো। আজকে আনন্দ। মণিকা ঘোষের কাছ থেকে ঘড়ি পেয়ে—ছুটকির কথা মনে পড়ল। তাই কেঁদেছি। হয়েছে ?'

পিংকি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মা'র দিকে।

রত্না আবার বললেন—'হাঁ করে দেখছিস কি ? বিশ্বাস হয়নি ? একদিন হবে। এখন কি খাবি বল। ফ্রিজ অবশ্য ফাঁকা। বাজারই করা হয়নি। একটা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দেব ?'

'না, মা। এক গ্লাস দুধ।'

'ব্যস!' আশ্চর্য হলেন রত্না—'তুই কি আরম্ভ করেছিস বল তো ? না খেয়ে খেয়ে শক্ত অসুখ বাঁধিয়ে বসবি যে।'

'কম খেলে অসুখ করে না মা। যত অসুখ সব বেশি খেয়ে। স্যান্ডউইচ খাবো। একটু পরে।' ব্যাগ থেকে আরেকটা প্যাকেট বের করল পিংকি : 'আর এটা বাবার।' মার হাতে প্যাকেটটা গুঁজে পেছন ফিরল পিংকি।'

পিংকি ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগেই রত্না পেছন থেকে ডাকলেন : 'শোন।'

পিংকি ফিরে মার দিকে তাকাল। রত্না প্যাকেটটা ওর হাতে এগিয়ে দিলেন : 'ওটা হাতে করে বাবাকে দে। বাবা খুশি হবে।'

মুখ নামিয়ে ফেলল পিংকি। মৃদু স্বরে বলল : 'ভয় করে। বাবা যদি রেগে যায়।'

'দিয়ে দেখই না রেগে যায় কিনা। তুই এনেছিস, আমি দেব কেন ?'

'কি কাকে দেবে কেন ?' তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে প্রলয ঘোষ রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তারপরই পিংকিকে দেখে মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল ওঁর। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরলেন প্রলয় ঘোষ।

পেছন থেকে রত্না ডাকলেন—'শোন।'

প্রলয় ঘোষ পেছন ফিরে রত্নার দিকে তাকালেন। পিংকি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে। ওর কাঁচুমাচু মুখখানা দেখে রত্না হেসে ফেললেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন : 'মেয়ে ভয় পাচ্ছে, তুমি বকবে।'

'কেন ?' গম্ভীর গলায় বললেন প্রলয় ঘোষ।

রত্না মেয়েকে বললেন—'কি রে। বলবি না।'

পিংকির চোখটা মাটিতে সেঁটে রইল। অনেক চেষ্টা করেও মুখ তুলে বাবার দিকে তাকাতে পারল না ও।

রত্না মুচকি হেসে হাতের প্যাকেটটা প্রলয় ঘোষের হাতে দিলেন।

'কি ?' প্রলয় ঘোষ অবাক হয়ে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

'আগে খোল। তারপর বলছি।'

তোয়ালেটা মাথায় রেখেই প্রলয় ঘোষ প্যাকেটটা খুললেন। কাছে গিয়ে প্যাকেটটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। সুন্দর, অত্যন্ত দামী একটা পাইপ ছিল প্যাকেটে। প্রলয় ঘোষ কিছু বলার আগেই রত্না বলে উঠলেন : 'ছুটকি তোমার জন্যে এনেছে। আর এই দেখ আমার জন্যে…' বাঁ হাতটা স্বামীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন রত্না।

পিংকির পা দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। ও না তুলতে পারল

মুখ, না যেতে পাবল বেবিযে। পুতুলেব মতো দাঁড়িযে বইল এক কোণে। প্রলয ঘোষও কোন কথা বলতে পাবলেন না। বোবা দৃষ্টিতে পাইপটাব দিকে তাকিযে বইলেন। যে লোকটা এত কথা বলে দিনবাত্তিব—কে যেন মন্ত্রবলে সব কথা কেড়ে নিযেছে ওঁব। স্বামীব মুখেব দিকে তাকিযে মুচকি হাসলেন বত্না। তাবপব পিংকিব হাত ধবে বেবিযে এলেন বাইবে। মেযেকে বললেন 'জুতোটা খোল। চল তোব জামাকাপড় সব কোথায আছে দেখি।' পিংকি জুতো ছেড়ে মাব পেছন পেছন উঠে গেল ওপবে। স্তব্ধ হযে প্রলয ঘোষ দাঁড়িযে বইলেন বান্নাঘবেব দবজায।

সিঁড়ি দিযে ওপবে উঠতে উঠতে পিংকি ফিসফিস কবে বলল বাবা কি বেগে গেল, মা?

'বেগে গেল?' মেযেব কথায অবাক হলেন বত্না।

'চুপ কবে গেল যে! কোন কথা বলল না।'

'তোব মাথা।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবাব কি! বাবা ছেলে না? ছেলেবা কি কাঁদতে পাবে! আমবা ঘব থেকে বেবিযে না এলে ও মুখ তুলতো না কিছুতেই। সব কথা ওব গলায আটকে গেছে?'

'তুমি বুঝলে কি কবে?' পিংকি অবাক হলো।

'এত বছব ঘব কবছি, মানুষটাব সব কিছু আমাব মুখস্থ হযে গেছে। হাঁ কবলে হাওড়া বলে দিতে পাবি। পৃথিবীব সবাইকে ও ফাঁকি দিতে পাবে, আমাকে পাবে না।'

'হোযাই?' ইচ্ছে কবলেই তো একজন আবেকজনকে ফাঁকি দিতে পাবে।'

'যে পাবে পাবে ও পাববে না। আজকে তোকে সব কথা আমি বোঝাতে পাবব না। তাছাড়া, সব কিছু বলে বোঝানো যাযও না। তুইও একদিন বুঝবি। তুই যদি সত্যিই কাউকে ভালবাসিস একদিন, যদি তাকে প্রাণপণে বিশ্বাস কবিস আব সেও যদি তোকে সত্যি ভালবাসে—সেও কিছুতেই তোকে ফাঁকি দিতে পাববে না। তোব বাবা শুধু নয, তুইও পাববি না কোনদিন। আমাকে ফাঁকি দিলে তোব কষ্ট হবে।'

পিংকি চুপ কবে গেল। মা এমনভাবে কথাগুলো বলে যে বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে হয। অথচ, ওব মনেব ভেতবে অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহ উঁকি মাবে। এখানকাব বন্ধু-বান্ধবীকে এসব কথা বললে হেসে উঠবে। 'বিশ্বাস' একটা

পুবোনো অচল শব্দ আজকেব পৃথিবীতে। আব, 'ভালবাসা' বা 'লাভ'—পিংকি মনে মনে ভাবল—হ্যাজ বিকাম এ হ্যাকনেইড টার্ম ফব কটিন ডিসেপশন্‌স। আমেবিকায গ্রীন ডলাবটা শুধু বিশ্বাসেব। আমি আছি, আই এক্সিস্ট—এটুকুই শুধু ভালবাসাব। দিস ইজ দি মেসেজ ফ্রম্ দি ল্যাণ্ড অফ গোল্ড। অথচ, এই মা, ওব মা—কামিং ফ্রম প্রবেবলি দি ডার্টিযেস্ট অ্যান্ড দি মোস্ট ব্যাকওযার্ড কান্ট্রি ইন দি হোল ওযালর্ড—কি কবে জোব গলায ভালবাসা আব বিশ্বাসেব কথা বলে। মা কি কবে জানে? সত্যিই যে পিংকিব মাকে ফাঁকি দিতে কষ্ট হয মা কি কবে বুঝতে পাবে? কি কবে এত অনাযাসে ওব চাবপাশে গণ্ডী এঁকে দেয?

'ঘবটা পছন্দ হযেছে তোব?' বত্না কার্টনগুলো খুলছিলেন।

চমকে উঠল পিংকি। চাবিদিকে তাকিযে বলল 'খুব সুন্দব। বিশেষ কবে এই জানলাটা ফ্যাসিনেটিং। প্রথম যখন বাড়িটা দেখতে এসেছিলাম, তখনই ভাল লেগেছিল।'

'কেন, আগেব বাড়িতেও তো জানলা ছিল।'

'ছিল। কিন্তু জানলা দিযে পাশেব বাড়িব দেযাল ছাড়া কিছু দেখা যায না। আব, এই জানালা দিযে দেখো। সামনেব ঐ পার্ক, বিবাট বিবাট গাছ, তাব মধ্যে আকাশ।'

পিংকিব পাশে জানলাব সামনে এসে দাঁড়ালেন বত্না। কযেক মুহূর্ত বাইবেব দিকে তাকিযে থেকে বললেন—'আমি দুধটা ঢেলে বাখছি। জামাকাপড় ছেড়ে নীচে আসবি তো? আমি স্নানটা সেবে নিই ততক্ষণ?'

'তোমবা যাবে কোথাও?

'হ্যাঁ, অববিন্দ পোদ্দাবেব বাড়ি। যাবি? চল-না।'

'আজ না মা। জ্যানিস আসবে একটু পবে।'

'বাড়ি ঘবদোব যা নোংবা। এব মধ্যে কেন আসতে বললি?'

'শি ডাজন্ট কেযাব।'

'কি খাবি বাত্তিবে?'

'খিদে পেলে স্যান্ডউইচ কবে নেব।'

'এত বাত্তিবে আসবে, ওব বাবা মা চিন্তা কববে না?'

পিংকি হেসে ফেলল।

'হাসলি যে?' বত্না অবাক হলেন।

'দে আব ডিফাবেন্ট মা। টু এক্সট্রিমস। তোমবা বড্ড বেশি চিন্তা করো। ওর বাবা মা একদমই কবে না। একটু-আধটু কবলে বোধহয জ্যানিস খুশিই হতো।

আর, তাছাড়া অ্যানা ওর মা নয়।'

'মানে ?'

'ওর বাবা মা ডিভোর্সড।'

'ওর মা কোথায় থাকে ?'

'সামহোয়ার ইন টেক্সাস।'

'জ্যানিস মার কাছে থাকে না কেন ?'

'শি ক্যান্ট টেক কেয়াব অফ হার। ইন ফ্যাক্ট, শি ক্যান্ট ইভেন টেক কেয়ার অফ হারসেল্ফ।'

'কেন ?'

'শি ইজ অ্যালকহলিক।' একটু চুপ করে থেকে পিংকি আবার বলল : 'জ্যানিস তোমাকে খুব ভালবাসে, জানো মা।'

'তাই নাকি ? কেন ?' বত্না হেসে ফেললেন।

'কি জানি। অনেকবাব আমাকে বলেছে আই উইশ আই হ্যাভ এ মাদার লাইক হার।'

'তুই কি বলিস তখন ?'

পিংকি ঠোঁট উল্টে বলল · 'কি আবাব বলব। চুপ করে থাকি।'

'জ্যানিসের কথা বিশ্বাস হয় না, না ?'

মা'র দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল পিংকি। ঘাড় নেড়ে বলল : 'না। একদম নয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বলি আমার মা'র সঙ্গে থাকার অনেক বিপদ। আমার মাকে একদম ফাঁকি দেওয়া যায় না।'

'বললেই পারিস।'

'তাও পাবি না। তোমাব কথা বাইরের কাউকে বলতে পা'বি না।'

'বুঝেছি'—মুখ টিপে হাসলেন বত্না।

'হোয়াট ?' পিংকি অবাক হলো।

'তোর যত বীরত্ব সব বাড়িতেই।' একটু থেমে রত্না বললেন—'হ্যাঁরে···' কিন্তু কথাটা আরম্ভ করেই চুপ করে গেলেন।

'হোয়াট ইজ ইট, মা।'

'না থাক। আরেকদিন বলব।'

'বল-না।'

'তুই রাগ করবি না, আগে বল।'

পিংকি হেসে ফেলল : 'অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, তোমাব ওপর রাগ করা

যায় না।'

'ঠিক ?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

একটু চুপ করে থেকে রত্না বললেন—'জনকে কি তুই ভালবাসিস ?'

'জন কার্টার ?'

'হ্যাঁ, ঐ যে কালো মতো ছেলেটা।'

পিংকি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। তাবপর মা'ব দিকে পেছন ফিরে বলল : 'কেন, কালো বলে তোমার কি ওকে খারাপ লাগে ?'

'না খারাপ যে লাগে তা নয়।'

'তবে ?'

'অনেকদিন তোকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছি কিন্তু পারিনি। কিন্তু প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঘুবপাক খাচ্ছে অনেকদিন থেকেই। তুই তো কখনো কিছু বলিসনি।'

'য়্যু মে নট লাইক হোয়াট আই হ্যাভ টু সে।'

রত্না চমকে উঠলেন। মৃদু স্বরে বললেন—'তবু বল।'

পিংকি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল : 'আমি জানি না এটা ভালবাসা কিনা। আই আস্কড দ্যাট কোশ্চেন টু মাইসেল্ফ অ্যাটলিস্ট এ থাইস্যান্ড টাইমস। তবে, আই ফিল ক্লোজ টু হিম।'

'ভবিষ্যতের কথা কিছু ভেবেছিস ?'

'কার ভবিষ্যৎ ?'

'মানে', ইতস্তত করে রত্না বললেন : 'মানে ওকে নিয়ে—তোর ভবিষ্যৎ।'

'কেন বল তো ?'

'এমনি জিজ্ঞাসা করছি। তুই তো আমাদের একমাত্র সন্তান। কাজেই তোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরাও মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভাবি। সেখানে তোর ভাবনাটা না জানলে আমাদের ভাবনার কোন মানে হয় না। আসলে কি জানিস··' কথাটা শেষ না করে রত্না আবার থেমে গেলেন।

'আসলে কি, বল।' পিংকি প্রশ্ন করল।

'কথাটা শুনতে তোর খারাপ লাগবে হয়ত।'

'না শুনলে আরো খারাপ লাগবে।'

'আসলে ওদের সমাজ আর আমাদের সমাজটা এত আলদা। ভাল লাগুক না লাগুক এই সমাজেই তো থাকতে হবে আমাদের। কাজেই ভাবছিলাম তুই যদি এখন কিছু করিস, মানে, কি করে তোকে বোঝাই—অনেক জিনিস যা তোর

কাছে সহজ, আমেরিকায় অনেক মানুষের কাছে সহজ—আমাদের সমাজেব কাছে মোটেই তা সহজ নয়।' এইটুকু বলে রত্না থামলেন।

নীচ থেকে প্রলয় ঘোষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল : 'কি গো, রেডি হয়ে নেবে না? আটটা বাজতে চলল যে।'

'যাই'—রত্না সিঁড়ির দিকে এগোলেন।

পিংকি পেছন থেকে বলল · 'আমি ভবিষ্যতের কথা কিছু ভাবিনি মা। তাছাড়া, জন হ্যাজ লেফট নিউইয়র্ক।'

'কেন?'

'হি হ্যাজ জয়েন্ড দ্য মেরিনস। ট্রেনিং-এ আছে নর্থ ক্যারোলিনায়। এক বছর থাকবে।'

'তারপর।'

'তারপর ইজ টু ফার মা। লট অফ থিংস মাইট চেঞ্জ। আই হার্ড য়্যু, মা। বিফোর আই ডু সামথিং, আমি ভাবব।' ম্লান হাসলেন রত্না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন—'জামাকাপড় ছেড়ে নীচে আয়। দুধটা টেবিলের ওপর রাখছি।'

'তোমরা কখন ফিরবে?'

'দেরী হতে পারে, কেন?'

'জ্যানিসের সঙ্গে একটা সিনেমা যদি যাই, আমারও ফিরতে বারোটা-সাড়ে বারোটা হতে পারে। চিন্তা করো না।'

'কোথায় যাবি?'

'যাব কিনা ঠিক নেই। জ্যানিস এলে ঠিক করব। গেলে হয়ত ম্যানহাটানেই যাব। জ্যানিস গাড়ি নিয়ে আসবে।'

'আমরা বেরোবার আগে বাড়ির আরেকটা চাবি তাহলে তোর কাছে রাখিস।' সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন রত্না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পিংকি নীচে নামল। প্রলয় ঘোষ সোফাতে হেলান দিয়ে বসে আছেন, ওর দেওয়া পাইপটা মুখে লাগানো। টেবিলের ওপর দুধটা বসিয়ে রেখেছেন রত্না। এক চুমুকে ওটা শেষ করে গ্লাসটা রান্নাঘরে গিয়ে ধুয়ে ফেলল পিংকি। রত্না বেরিয়ে এলেন বেডরুম থেকে। মাকে দেখে অবাক হয়ে গেল পিংকি। সাদার ওপর লাল পাড় একটা শাড়ি পরেছে মা। রত্না লিভিং রুমে এসে দাঁড়াতেই প্রলয় ঘোষ বলে উঠলেন : 'এসব অন্য জিনিস বুঝেছ?'

'আমাদের দেশে এসব চিন্তাই করতে পারে না!'

'কি সব ? তুমি কার কথা বলছ ?' রত্না প্রশ্ন করলেন।

'সাধে কি আর আমাদের দেশের লোকেদের মেড ইন ফরেন বললে এখনো নাল-ঝোল গড়ায়। এই সব পাইপ চোখে দেখেনি কেউ দেশে। বানানো তো দূরের কথা।'

'আজ হয়ে গেল !' রত্নার কথা বলার ভঙ্গীতে পিংকি হেসে ফেলল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে রত্না বললেন : 'আজকে অরবিন্দবাবুর বাড়িতে সকলের কপালে দুঃখ আছে।'

'কেন ?' প্রলয় ঘোষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'কেন আবার। সকলের চোখের সামনে পাইপ নাচবে আর ইণ্ডিয়ার শ্রাদ্ধ হবে' পিংকির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন রত্না : 'কেন যে দিলি পাইপটা। এখন ঠেলা সামলাতে হবে সবাইকে।'

'আমি ভুল বলেছি।'

'কে বলেছে ভুল। একদম ঠিক। আমাদের দেশ কিছু পারে না, আমাদের দেশে কিছু নেই। যাদের কোন উপায় নেই তারা শুধু ওখানে পড়ে আছে। ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর লোকের কাছে ভিক্ষে করে বেড়ায়। মোরারজির মাথা খারাপ। কম্যুনিস্টরা কলকাতার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এই সব শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।'

'কথাগুলো কিন্তু হাড়ে হাড়ে সত্যি।'

'কে বলছে মিথ্যে। আমেরিকা আসার পর থেকে এত বছর ধরে দেশ সম্পর্কে এতগুলো সত্যি কথা শুনেছি যে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। নাও ওঠো।'

'ভাল লাগুক আর না লাগুক, ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট।' সোফা থেকে উঠে পড়লেন প্রলয় ঘোষ। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে এখনো, সারা অঙ্গে কিরকম একটা ব্যথা। ব্যথাটা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। একবার পিঠে। একবার বুকে। অসহ্য যে তা নয়। কিন্তু বিরক্তিকর।

বেরোবার আগে রত্না বললেন—'খাটে কিন্তু তোষক নেই।'

'কার্পেটে শুয়ে পড়ব মা। তুমি একদম চিন্তা করো না।'

বিড়বিড় করে উঠলেন রত্না : 'চিন্তা কি আর আমি করি, দয়াল করান।'

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে প্রলয় ঘোষ বললেন : 'বয়স হচ্ছে। আর পরিশ্রম সহ্য হয় না।'

'টায়ার্ড লাগছে ?' রত্না প্রশ্ন করলেন। তারপরেই বললেন : 'বললাম বেরিও

না আব। আমার কথা তো শুনবে না।'

'আহা, তা নয়। মিটিং আছে। বলেছি যাব। তাছাড়া, একটু রিলাক্সেশনও তো হবে। পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়। ভাল লাগে।'

'একদম তর্ক করবে না কাবো সঙ্গে।' বত্না স্বামীকে সাবধান করলেন।

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা নয়, আমি জানি তুমি ঠিক কববে।'

'আজকালকার ছোঁড়াগুলো যেন কিরকম হযে যাচ্ছে। ওদেরকে সহ্য করতে পারি না কিছুতেই। আগের মিটিং-এ ঐ যে প্রদীপ বলে ছোকরা ডঃ রুদ্রকে কিরকম অপমান করল দেখেছ।'

'ডঃ রুদ্ররই বা কি দরকার ছিল ওকে ওরকম উপদেশ দেবার।'

'ঠিকই তো বলেছেন। মান্যিগণ্যি লোক, বতদিন এখানে আছেন। এখানকার সবাই ওঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। তাছাড়া, কিই বা এমন উনি বলেছেন। বলেছেন যে, আমি তোমার থেকে বয়সে বড় এটা যদি মানো তাহলে আমাব কথা শোনো। অমনি ছোকরা বলে উঠল—বয়সে বড লোকেবা যখন বোকা বোকা কথা বলেন তখন বুঝতে হবে তাদের ভীমরতি হযেছে। বয়সে বড়-টড বুঝি না। যুক্তি দিয়ে কথা বলুন।' একটু দম নিয়ে প্রলয় ঘোষ আবার বললেন 'এইসব ছেলে-ছোকরাদের একদম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আমাদের কালে আমরা গুরুজনদের অনেক শ্রদ্ধাভক্তি করতাম। পছন্দ না হলে চুপ করে থাকতাম।'

বত্না চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বললেন 'আমাদের কাল আর নেই। ওরা যদি কিছু বলতে চায়, বলতে দাও। যদি কিছু করতে চায় করুক।'

'কিছু করবে না ওরা। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি।' প্রলয় ঘোষ গর্জন করে উঠলেন—'ওরা কিছু রাখবে না। সব কিছু ভেঙে ছারখার করে দেবে। ওদেব সবাইকে ধরে ন্যাংটো করে চাবকানো উচিত।'

'চাবুক আমাদের হাত থেকে যদি ওরা কেড়ে নেয়!'

'কেড়ে নিলেই হলো!' প্রলয় ঘোষ চীৎকার করে উঠলেন : অত সহজে ছেড়ে দেব না আমরা।'

'কতদিন আগলে রাখবে?'

'যতদিন পারি। বিদেশে এই নতুন সমাজটা ভালভাবে, ঠিকভাবে গড়ে উঠুক এটা সকলেই চাই। তুমি কি চাও না?' প্রলয় ঘোষ স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দিয়ে প্রলয় ঘোষের গাড়ি তীব্র গতিতে যাচ্ছিল পশ্চিম দিকে। রত্না বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। স্ত্রীকে চুপ করে যেতে দেখে প্রলয় ঘোষ আবার বললেন—'বল, তুমি কি চাও না?'

রত্না এবার স্বামীর দিকে ফিরলেন। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—'না।'

অবাক হলেন প্রলয় ঘোষ : 'তুমি চাও না এই নতুন সমাজটা ঠিক ভাবে গড়ে উঠুক?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রত্না বললেন—'ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক আমি বুঝি না। শুধু এটুকু মনে হয় সমাজ অনেক বড় ব্যাপার। কয়েকটা ফ্যামিলি গিয়ে একসঙ্গে গপ্পোগাছা আর ক্লাব করলেই যদি সমাজ হয়, তাহলে নিউইয়র্ক-নিউজার্সীতেই তো প্রায় এক কুড়ি সমাজ। এখানে প্রত্যেকের হাতেই পয়সা। কেউ কারো ওপর নির্ভর করে না। আমাদের ক্লাবের রীতিনীতি, নিয়মকানুন যাদের পছন্দ হলো না, এখানে যাদের মতামত খাটল না কিংবা এখানে যারা নিজেদের জাহির করতে পারল না—তারা বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের পছন্দমত নিয়মকানুন আর মানুষ যোগাড় করে আরেকটা সমাজ বানিয়ে ফেলল। বলতে শুরু করল-—ওরা বাজে লোক, ওদের নিয়মকানুন আমরা মানি না। কোনটা আসল সমাজ? আর সবগুলো মিলিয়েই যদি সমাজ তাহলে ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক বলে কিছু নেই। এখানকার ভাল, ওখানকার মন্দ। সবই নির্ভর করছে তুমি কোন ক্লাবে আছো। কে তোমার বন্ধু, কে তোমার শত্রু। কেউ বলছে আমেরিকায় পুজো, পার্বণ প্রতিষ্ঠা করে দাও। ধর্মই যুগ যুগ ধরে সমাজকে ধরে রেখেছে। ধর্ম না ছাই, আমেরিকায় দুর্গাপুজো হলো বাঙালীদের মোড়লি করার ছুতো—ছেলে-মেয়েদের কাছে সংস্কৃতির ধ্বজা তুলে ধরতে গিয়ে এটা বড়দেরই নিজেদের বিজ্ঞাপন। আর আমি? আগেও সমাজের কথা ভাবিনি, এখনো ভাবি না। আমার সমাজ বলতে তুমি, পিংকি, আর আমার দয়াল।'

নিভে যাওয়া পাইপটা ধরালেন প্রলয় ঘোষ। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'তাহলে তুমি কি চাও?'

'কিছু চাই না, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই।'

একটু চুপ করে প্রলয় ঘোষ বললেন : 'তোমাকে আমি বুঝতে পারি না। কিছুই কি তোমার ইচ্ছে করে না, কিছুই কি তুমি চাও না? দেশের লোক আমেরিকা আসার জন্য মরে যায়। অথচ, খোদ নিউইয়র্কে বসে তুমি বলছ

তোমার কিছু ইচ্ছে করে না, কিছু তুমি চাও না। আমেরিকান সমাজ তোমার ভাল লাগে না। ঠিক আছে বুঝলাম। নতুন দেশ, নতুন সভ্যতা কিংবা অসভ্যতা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। বাঙালী সমাজও তোমার ভাল লাগে না। একই মুখ, একই পরিবেশ দেখে তুমি ক্লান্ত।'

'জানলাটা একটু খুলে দাও, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার।' মৃদু স্বরে রত্না বললেন।

কাঁচটা একটু সরিয়ে দিলেন প্রলয় ঘোষ। বিড়বিড় করে বলে চললেন—'আই অ্যাম হ্যাপি। আমার এখনো সখ আছে, আমোদ-আহ্লাদ করার ইচ্ছে আছে। আই লাভ আমেরিকা। এই দেশ আমাকে ঐশ্বর্য দিয়েছে। আমাদের দেশ দেয়নি। পিরিয়ড। এই যে এখানে কুড়িটা ক্লাব—দেশে থাকলে ভাবতে পারত কেউ। সেখানে বড়লোকদের জন্য ক্লাব, বড়লোকদের জন্যে রক—আর মধ্যবিত্তদের জন্য অন্ধকার। না পারে ক্লাবে উঠতে, না পারে রকে নামতে। কুড়িটা ক্লাব কুড়ি রকম বলুক। তবু তারা নিজেদের ফিউচার, ছেলেমেয়েদের ফিউচার ইচ্ছে মতো প্ল্যান করতে পারছে। ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে মতো মানুষ করতে পারছে।'

'সত্যি কথা বল তো, তুমি ছুটকিকে তোমার ইচ্ছে মতো মানুষ করতে পেরেছো? আজ সকালেই তো এই প্রশ্নটা তুমি আমাকে করেছিলে।'

'তোমার কি মনে হয়?'

রত্নার প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে গেলেন প্রলয় ঘোষ। হঠাৎ একটা সামান্য প্রশ্ন ওঁকে বিচলিত করে তুলল। কি উত্তর দেবেন প্রলয় ঘোষ। কেন অঙ্ক মিলল না? দুই আর দুইয়ে পাঁচ হয়ে গেল কোথায়? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ওঁর। এয়ার কণ্ডিশনারটা বন্ধ করে জানালার কাঁচটা পুরোপুরি নামিয়ে দিলেন। হু হু করে একরাশ বাতাস ঢুকে পড়ল গাডিটার অন্ধকার, ছোট্ট পরিসরে। এক্সপ্রেসওয়ের মাঝখানের পাঁচিলের ওপাশে পূবমুখী গাড়িগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে কোথাও। অন্ধকারেব মধ্যে পূবমুখী গাড়িগুলোর সব হেডলাইটগুলো যেন এই মুহূর্তে প্রলয় ঘোষের দিকে তাকিয়ে। আকাশের অন্ধকার, দৈত্যের মতো সারি সারি বিল্ডিং, হাজার হাজার হেডলাইটের মধ্যে উনি বোধহয় উত্তর খুঁজছিলেন। এত বাতাস, তবু শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন? বাইরে এতগুলো হেডলাইট, অথচ মনের ভেতর কেন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। পেটটা পাক খাচ্ছে আবার। বিকেলের সেই পুরোনো ব্যথাটা যেন নড়েচড়ে উঠছে। বুকের বাঁ দিক থেকে ব্যথাটা ওপরের দিকে উঠে গালের তলা

দিয়ে বাঁ হাতে ছড়িয়ে পড়ছে। জামার ওপরের বোতামটা খুলে ফেললেন প্রলয় ঘোষ। কাঁধে, মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা। বাঁ হাতে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে ডান হাতে বুক চেপে ধরলেন উনি। নিজের অজান্তেই একটা ছোট্ট শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে এল ওঁর—'উঃ।' এক্সপ্রেসওয়ের হাজার গাড়ির গর্জনের মধ্যেও সেই ক্ষীণ শব্দটা শুনতে পেলেন রত্না। পাশের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন—'কি হলো ?'

প্রলয় ঘোষ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। বাঁ হাতটা কেঁপে গেল। এক্সপ্রেসওয়ের ওপর গাড়িটা টলে পাশের লেনে চলে গেল। যেন লক্ষ শাঁখে ফুঁ দিল কারা। শাঁখে নয়, পেছনের গাড়িগুলোর হর্ন। গালাগাল দিতে দিতে গাড়িগুলো ঝড়ের গতিতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রত্না স্বামীর গা ঘেঁষে বললেন—'কি হলো ?'

আবার টাল খেয়ে গাড়িটা ডানদিকের লেনে এল। ডান হাতে বুক চেপে প্রলয় ঘোষ প্রাণপণে যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কোনো প্রশ্ন ভাল লাগে না এখন, কোনো উত্তর নেই। হঠাৎ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রলয় ঘোষ একা দাঁড়িয়ে গেছেন। ছুরি, ছোরা, কামান, বন্দুক, অ্যাটম বোমা পৃথিবীর যেখানে যাদের ঘরে যত মারণাস্ত্র আছে সব এসে লেগেছে ওঁর বুকে। ছিন্নভিন্ন রক্ত, মাংস, নাক, মুখ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ধুলোর মত বাতাসে উড়ছে। শুধু একটা একক আত্মা সেই কুরুক্ষেত্রে পাগলের মতো টুকরোগুলোকে নিয়ে মালা গাঁথতে চাইছিল। একটা ছোট্ট শরীর, একটা ছোট্ট স্বপ্ন, একটা সামান্য পূর্ণতা ফিরে পেতে চাওয়া কি এমন বেশি ! ডানদিকের লেন থেকে টাল খেয়ে গাড়িটা সার্ভিস লেনে এসে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে ব্রেক কষেছিলেন প্রলয় ঘোষ। কোনরকমে গিয়ারটাকে পার্কিং-এ দিয়ে প্রলয় ঘোষ আর্তনাদ করে উঠলেন আবার : 'ও গড !'

রত্না চীৎকার করে উঠলেন—'কি হয়েছে তোমার ?'

পাগলের মতো মাথা নাড়ছিলেন প্রলয় ঘোষ। শুধু কোনমতে বললেন—'বুক।'

'বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে ?' রত্না স্বামীর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। একটানে জামাটা খুলে ফেললেন। সব বোতামগুলো ছিঁড়ে পড়ে গেল কোথাও। ডান হাত দিয়ে স্বামীর বুক হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন—'কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে ? এখানে ?'

কি উত্তর দেবেন প্রলয় ঘোষ ! ভীষ্মের শরশয্যায় কেউ যদি প্রশ্ন করত কোন তীরটা খুলে নিলে আপনার আরাম লাগবে, ভীষ্মদেব কি উত্তর দিতেন !

কতগুলো তীর খুলে নেবেন রত্না ! কি করে ! তবু রত্না পাগলের মতো স্বামীর বুকে হাত বুলোতে লাগলেন।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল প্রলয় ঘোষের। পাগলের মতো বাতাস খুঁজছিলেন উনি। রত্নার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলে টলতে টলতে গাড়ির বাইরে বেরোলেন প্রলয় ঘোষ।

'ওদিকে গাড়ি ! চাপা পড়ে যাবে।' চীৎকার করে উঠলেন রত্না।

ঝড়ের মতো একটা বিরাট গাড়ি প্রলয় ঘোষের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। একটা লোক মুখ বের করে মাঝের আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এইদিকে তাকিয়ে চীৎকাব করে উঠল · 'বাস্টার্ড'।

প্রলয় ঘোষ কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন না। শিশুর মতো গাডির গা ধরে ধরে হেঁটে গাডির সামনে এসে ধপ করে বসে পড়লেন মাটিতে। রত্না ছুটে বেরিয়ে এসে স্বামীর কাছে দাঁড়ালেন। পাগলের মতো চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন রত্না : 'আমি কি করব ?' দয়াল, আমি কি করব ?'

চোখ দুটোতে শিশুর বিস্ময় নিয়ে অবাক হয়ে প্রলয় ঘোষ সামনের মানুষটার দিকে তাকালেন। টপ টপ করে জল পডছিল চোখ দিয়ে। যন্ত্রণার মেঘ থেকে অঘোরে বৃষ্টি পডছিল নিউইয়র্কের ধুলো মাখা রাস্তায়। একটা হাত বাড়িয়ে সামনের মানুষটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন উনি। আকাশে ভাসতে পারল না হাত, ছিটকে পডল কোলে।

রত্না রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন—'হেল্প।'

হু হু করে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটের মতো। কেউ থামল না। দু-চারজন ফিরে তাকাল। কাঁচটা তুলে দিল জানালার। পাগলের মতো একটা চলন্ত গাড়ির কাঁচে চড় মারলেন রত্না। যাত্রীরা চমকে সরে বসল ভেতরে। শাড়ি আর চুল উড়তে লাগল বাতাসে। কেউ কারো জন্য থামে না। নিষ্ঠুর নিউইয়র্ক শহুরের উদ্ধত হাইওয়ের ধারে অন্ধকারে অচেনা পোশাকের এক নাগরিকের জন্য তো নয়ই। প্রলয় ঘোষ বসে আছেন এখনো। স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে আবার সামনের দিকে তাকালেন রত্না। দূরে রেডিও বাজছিল কোথাও। এক্সপ্রেসওয়ের ওপারে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনো। এ রাস্তাটা একটু ফাঁকা হতেই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে মাঝখানের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেলেন রত্না। একটা অল্পবয়সী ছেলে ড্রাইভারের আসনে বসে। পাশে একটি তরুণী মেয়ে। রত্নাকে এরকম বিপজ্জনকভাবে ছুটে আসতে দেখে ছেলেটি হকচকিয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওঁর মুখের দিকে। পাগলের মতো

পাঁচিলের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে ছেলেটির হাতে হাত রেখে হাউ করে উঠলেন : 'প্লীজ, হেল্প, মাই হাসব্যান্ড।' হি ইন ডাইং।' ছেলেটি চমকে উঠল। পাশ থেকে তরুণীটি ঝুঁকে পড়ে বলল : 'হোয়াট ডু য়্যু মিন, হোয়ার হিজ হি ?' কোনমতে হাত দিয়ে গাড়িটা দেখাতে পারলেন রত্না। ছেলেটি এমারজেন্সি আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ। সামনে-পেছনের দু'একটা গাড়ি থেকেও দু-চারটে কৌতূহলী চোখ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। ছেলেটি পাঁচিলের ওপর লাফিয়ে উঠে এপাশে ঝাঁপিযে পড়ল। আবার প্রশ্ন করল ছেলেটা : 'হোয়াট হ্যাপেন্‌ড ?'

'আই ডোন্ট নো। হি হ্যাড এ চেষ্ট পেন, অ্যান্ড...'

'লেট্‌স রান। কুইক', ছেলেটি ওপারে দৌড়ল। পেছন পেছন রত্নাও ছুটে রাস্তাটা পেরিয়ে গেলেন। প্রলয় ঘোষকে এক নজরে দেখেই ছেলেটি বলে উঠল—'মাই গড। ইট সিমস টু বি এ হার্ট অ্যাটাক।' পাঁচিলের ওপার থেকে সেই তরুণী মেয়েটি চীৎকার করে প্রশ্ন করল 'হোয়াট হ্যাপেনড ?' ছেলেটি কিছু বলার আগেই রত্না ছেলেটির হাত চেপে ধরলেন। অবাক হয়ে ফিরে তাকাল ছেলেটি। রত্না পাগলের মতো বললেন—'য়্যু আর মাই সন। প্লীজ ডোন্ট লেট হিম ডাই। ডোন্ট লীভ আস এলোন।' রত্নার হাতের ওপর হাত রেখে মৃদু হাসল ছেলেটি : 'আই অ্যাম নট গোইং এনি প্লেস। আই অ্যাম গোইং উইথ য়্যু।' তারপরেই চীৎকার করে মেয়েটিকে বলল : 'প্রীটি ব্যাড। আই অ্যাম গোইং টু দি হসপিটাল।' কথাটা শেষ করেই চারপাশে তাকালো ছেলেটি। বেশ খানিকটা দূরে ডানদিকে একটা মোবিল গ্যাস স্টেশন। আবার চীৎকার করে বলল : 'হোয়েন য়্যু মুভ, টেক এন এক্সিট অ্যান্ড কাম টু দ্যাট মোবিল গ্যাস স্টেশন। আই উইল লিভ এ মেসেজ।'

রত্নার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি বলল—'হেল্প মি কুইক। হোল্ড হিম ফ্রম দি ওয়েস্ট ডাউন। উই হ্যাভ টু ক্যারি হিম টু দি কার।'

কোলে করে এনে পেছনের সীটে প্রলয় ঘোষকে শোয়ানো হলো। রত্না মাথার কাছে বসলেন। লাফ দিয়ে উঠে গাড়ি স্টার্ট করল ছেলেটি। রাস্তার ওপর চোখ রেখে বলল : 'আই উইল ড্রাইভ অ্যাজ ফাস্ট আই ক্যান। অ্যাজ স্মুথ আই ক্যান। কিপ এ গুড হোল্ড অন হিম। ডোন্ট লেট হিম ফল।'

ঘামে ভিজে গেছে প্রলয় ঘোষের সমস্ত শরীর। প্রলয় ঘোষের বুকের ওপর হাত রেখে রত্না ফিসফিস করে বললেন : 'এক্ষুনি পৌঁছে যাব আমরা। তুমি শুনতে পাচ্ছ ? আমি রত্না। তুমি আমার কোলে শুয়ে। আমার এক সাহেব

ছেলে গাড়ি চালাচ্ছে। তুমি কোন কথা বলো না, তোমার কষ্ট হবে। আমি বলছি।' কপাল থেকে চুলগুলো নিয়ে সযত্নে পেছনে ঠেলে দিলেন রত্না। প্রলয় ঘোষের ডান হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে অন্যমনস্ক সুরে বললেন : 'ফাইট করতে হবে আরেকবার। ফাইট তোমার কাছে কিছু না। সারাটা জীবন আমরা অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেছি। শুধ আরেকবার। আমি কোনদিন কিছু চাইনি তোমার কাছে। বাড়ি, গাড়ি, আমেরিকা কিছু নয়। আমি জানি তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ। প্লীজ. আমাদেব সকলের জন্য তুমি আরেকবাব ফাইট কব।' মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রত্না হাউ হাউ কবে কেঁদে উঠলেন।

ছেলেটি গাড়ি চালাতে চালাতে একটু ঘাড ঘুরিযে বলল 'ডোন্ট ক্রাই। কিপ হোপ। হি ইজ স্টিল ব্রিদিং, ইজন্ট হি?'

নাকের কাছে হাত রাখতেই উষ্ণ নিঃশ্বাস বত্নার হাতেব ওপব পডল। বত্না ফিস ফিস করে বললেন—'ইয়েস।'

'ফিল হিজ হার্ট।'

বুকের বাঁদিকের পাঁজব ঘেঁষে হাত বাখলেন রত্না। এখনো লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। এত জোবে কেন? নাকি, প্রলয ঘোষেব বুকের হাত বেখে নিজেব হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পেলেন রত্না। প্রলয ঘোষ মুখ তুললেন একবার। যে হাতটা রত্নার মুঠোয় সেই হাতটা দিয়েই আরো শক্ত কবে আঁকড়ে ধরলেন স্ত্রীকে। মোবিল গ্যাস স্টেশনে গাড়িটা দাঁড কবিয়েই মুহূর্তেব মধ্যে লাফ দিয়ে বেরিয়ে সামনের দিকে ছুটে গেল ছেলেটা। সামনে তাকিয়ে রত্না দেখতে পেলেন দূরে একটা পুলিশ গাড়ি দাঁড়িয়ে। ছেলেটি ঐ দিকেই ছুটে গেল। কয়েক মুহূর্তেব মধ্যেই পুলিশের গাড়িটা পাশে এসে দাঁড়াল। একটা পুলিশ ট্রান্সমিটারে ফিসফিস করে কিসব বলছিল। আরেকটা পুশিস দরজাটা খুলে ফেলল এক টানে। মুখটা গাড়িব ভেতবে ঢুকিযে রত্নাকে প্রশ্ন করল—'ইজ হি আনকনশাস?'

'আই ডোন্ট নো।' রত্না মৃদু স্বরে বললেন।

'লেট আস হ্যাণ্ডল ইট, স্যাম। ম্যাড য়্যু স্টেপ আউট প্লীজ।'

স্বামীর মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে দাঁডালেন রত্না। নিমেষের মধ্যে পুলিশ দুটো প্রলয় ঘোষকে চিৎ করে শুইয়ে ফেলল রাস্তায়। একজন প্রলয় ঘোষের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি সব দেখতে লাগল। অন্য পুলিশটা রত্নাকে প্রশ্ন করল—'হোয়াট এক্সাকট্‌লি হ্যাপেন্‌ড।'

রত্না কিছু বলাব আগেই অন্য পুলিশটা বলল : 'হি স্টিল হ্যাজ সেন্সেস।'

দু'এক মিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ল। চকিতের মধ্যে খাটে শুইয়ে প্রলয় ঘোষকে ওর ভেতরে তুলে ফেলল ওরা। নাকের ওপর নল চাপা দিল। রত্না অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার আগে আরেকবার চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—'ছুটকি, তোকে আমি কি করে খবর দেব ?'

সেই সাহেব ছেলেটি এগিয়ে এল। রত্নার খুব কাছে এসে মৃদু স্বরে বলল : 'য়্যু হ্যাভ টু বি ব্রেভ।'

'ক্যান, য়্যু ডু মি এনাদার ফেবার ?'

'ইয়েস, অফ কোর্স। ইফ আই ক্যান।'

'মাই ডটার ইজ অ্যাট হোম। উই জাস্ট মুভ্‌ড ইনটু আওয়ার নিউ হাউস টু'ডে। নো ফোনস ইয়েট। উড য়্যু রিচ দি মেসেজ ?'

'ইয়োর অ্যাড্রেস ?'

বত্না ঠিকানাটা বলতে বলতে খস খস করে লিখে নিল ছেলেটি। রত্না প্রশ্ন কবলেন—'ডু য়্যু নো হাই টু গেট দেয়াব ?'

'ডোন্ট ওরি। আই উইল ফাইন্ড আউট। সো লং নাও। অল দি লাক।' অ্যাম্বুলেন্সের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

একজন লোক নানারকম পরীক্ষা-নিবীক্ষা করছিল প্রলয় ঘোষকে। অ্যাম্বুল্যান্স একটা ছোটখাট হাসপাতাল। ছোট্ট একটা টিভি-তে নানারকমের সবুজ সবুজ ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। প্রলয় ঘোষের হৃদয়ের ঢেউ। আরেকটা লোক ট্রান্সমিটাবে নানারকমের মেসেজ পাঠাচ্ছিল। অর্ধেক কথা বুঝতে পাবছিলেন না রত্না। অন্য আরেকটা লোক রত্নাকে প্রশ্ন করল : 'হোয়াট এক্সাকটলি হ্যাপেনড ?'

সেই পুরোনো প্রশ্ন—যেটা পুলিশটা করেছিল। রত্না বললেন—'হি হ্যাড এ চেস্ট পেন।'

'এনিথিং এলস—দ্যাট য়্যু ক্যান রিমেমবার ?'

হঠাৎ মনে পডল রত্নার। বমি হয়েছিল বিকেল বেলায়। সেটা বললেন লোকটাকে।

'হাউ ওল্ড ইজ হি ?'

'ফিফটি টু।'

'ডিড হি হ্যাভ এনি চেস্ট পেন বিফোর ?'

'হাউ অ্যাবাউট হিজ ফ্যামিলি ? ডিড এনিবডি ইন হিজ ফ্যামিলি হ্যাভ হার্ট ডিসিস ? অর ডায়াবিটিস ?'

‘হিজ ফাদাব ডায়েড অফ হার্ট অ্যাটাক।’
‘হাউ অ্যাবাউট হিজ মাদার ?’
‘শি ডায়েড অফ ওল্ড এজ।’
‘ডিড হি স্মোক ?’
‘ইয়েস।’
‘হাউ মেনি ?’
‘আই ডোন্ট নো’, অস্থির বোধ করতে লাগলেন রত্না।
‘ওয়ান প্যাক, টু প্যাকস্’···লোকটা যান্ত্রিক ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল।
‘মে বি ওযান প্যাক। মে বি মোব। আই ডোন্ট বিমেম্‌বাব।’ বত্না স্থির দৃষ্টিতে স্বামীব দিকে তাকিয়ে।
‘ডু য়্যু হ্যাভ ইনসিওবান্স ?’
‘ইয়েস।’
‘মে আই সি দি কার্ড প্লীজ ?’
‘হিজ অব মাইন ?’
‘হিজ।’
‘হি হ্যাজ দ্য ওয়ালেট ইন হিজ পকেট।’
খুব সন্তর্পণে প্রলয় ঘোষকে পাশ ফিরিয়ে পকেট থেকে ব্যাগ বের করে রত্নাকে এগিয়ে দিল লোকটা। পাগলের মতো কাগজপত্র বের করতে লাগলেন রত্না। হাত কাঁপছে। বুকের ভেতর ঝড়। চোখ ঝাপসা। ভাল করে কাগজগুলো পড়তে পারছিলেন না রত্না। একগাছা কার্ড লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন ‘আই ক্যান্ট ফাইন্ড ইট। প্লীজ ট্রাই।’
লোকটি অবাক হয়ে তাকাল। ইনসিওরেন্স কার্ডটা নিয়ে বাকি কাগজ রত্নাব হাতে দিয়ে খসখস করে ফর্ম ভর্তি করতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পর লোকটি প্রশ্ন করল : ‘হোয়াট ডিড হি ইট ডিউরিং লাস্ট এইট আওয়ারস ?’
চমকে লোকটার দিকে তাকালেন রত্না। নির্বিকার, নির্লিপ্ত মুখ লোকটার। হঠাৎ সারা শরীর কাঁপতে লাগল রত্নার। মাথার ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। চীৎকার করে রত্না বললেন : ‘হোয়াই আর য়্যু সো ক্রুয়েল ? ক্যান্ট য়্যু সি হি ইজ’ কথাগুলো শেষ করতে পারলেন না রত্না। একটু থেমে কোনরকমে আবার বললেন : ‘আই উইল টেল য়্যু অল আওয়ার স্টোরিজ। মাই স্টোরি, হিজ স্টোরি, মাই ফাদার, হিজ গ্র্যাণ্ডমাদার। এভরিথিং য়্যু ওয়ান্ট টু নো। প্লীজ হেল্প হিম নাও।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লোকটা। তারপর সংযত কণ্ঠে বলল : 'আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হাই য়্যু ফিল। উড য়্যু লাইক আস টু হেল্প হিম ?'

রত্না কোনো উত্তর দিলেন না। লোকটা আবার বলল : 'উই মে নট হ্যাভ দ্য টাইম টু কাম ব্যাক অ্যাণ্ড আস্ক দিজ কোশ্চেনস লেটার। এভরিথিং য়্যু টেল আস নাও ইজ ভেরি ইমপর্টান্ট। ইট উইল হেল্প। বিলিভ মি।'

'অলমোস্ট নাথিং একসেপ্ট ফর এ লাইট ব্রেকফাস্ট অ্যাট নাইন।'

কয়েকটা ফর্ম ভর্তি করে রত্নার দিকে এগিয়ে দিল লোকটা। রত্না সই করলেন কাগজে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাসপাতালের চত্বরে ঢুকে পড়ল গাড়িটা। গাড়িটা থামতেই দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল লোকটা। ছুটতে ছুটতে হাসপাতালের কিছু কর্মচারী বেরিয়ে এসে গাড়ির পেছনে দাঁড়াল। নিমেষের মধ্যে স্ট্রেচাব ও যন্ত্রপাতি শুদ্ধ পাঁচজন লোক ছুটল। যন্ত্রচালিতেব মতো বত্না পাশে আব স্ট্রেচারের ওপর শুয়ে প্রলয় ঘোষ দোল খাচ্ছিলেন। প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন বোধগুলোকে সজাগ রাখতে। আগ্নেয়গিরি ফেটে জ্বলন্ত লাভা ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। লাভার সাগর থেকে অজস্র ঢেউ বারে বাবে আঘাত করছে প্রতিটি রোমকূপে। যন্ত্রণা জমে জমে পাথর হয়ে আছে শরীর। শুধু দৃষ্টিতে কোন যন্ত্রণা নেই। অবাক হয়ে সামনের পৃথিবীটাকে দেখছিলেন প্রলয় ঘোষ। এটা কোন দেশ ? কোন শহর ? আজ কি বার ? উত্তর মনে পড়ে না আব— শুধু প্রশ্নগুলো ভেসে যায়। কথা না বললে কেউ উত্তব দেয় না। উত্তর দিতে পারে না। জিভটা আটকে গেছে তালুতে। ঠোঁট শুধু কাঁপে, খোলে না। একটার পর একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। ছোট দরজা বড় দরজা। এরকম কখনো হয় ? শুধু দরজা ? ঘর নেই ? একটা বিরাট সমুদ্র আবছা দেখতে পেলেন উনি। ধূ ধূ বালিরাশি পেরিয়ে নীল সমুদ্র। সাদা ফেনার মতো ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালিতে। অনেক দূরে ফ্যাকাশে আকাশ নীল জলে ডুব দিচ্ছে। দুধের মতো দেখতে ওগুলো কি ? বোধহয় পাল তোলা নৌকো। ওরা ভাসছে, দুলছে। আর, কেউ কোত্থাও নেই। আর, এই নির্জন প্রান্তরে বহুদূরে বালির ওপর একটা বিরাট গেট। ঘর নেই, বাড়ি নেই, মানুষজন নেই—শুধু একটা বিরাট দরজা। চোখের সামনে শুধু একটা মুখ দুলছে। সাদা শাড়ি, লাল পাড়, সাধারণ একটি মানুষের মুখ। কপালের মাঝখানে সূর্যের মতো টিপটা ধেবড়ে গেছে। গাল বেয়ে সমুদ্রের ঢেউ। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট অনেকগুলো মুখ দেখতে পেলেন প্রলয় ঘোষ। ঝাড়গ্রামের সেই মেয়েটা। বিয়ের পরের রাত্তিরে জামা খোলার আগে যে মেয়েটা বলেছিল—'আগে

লাইটটা নিভিয়ে দাও।' অন্ধকার ঘরে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়েছিল ' অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন প্রলয় ঘোষ। মেয়েটা লজ্জা পাচ্ছিল। বলল—'কি দেখছ ?' উলঙ্গ শরীরের দিকে তাকিয়ে প্রলয় ঘোষ চুপ করে থেকেছেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলেছেন—'নদী আর পাহাড়।' সেই মুহূর্ত কই ? মুহূর্তরা কেন হারিয়ে যায় ? পাশাপাশি শুধু আরো অনেকগুলো মুখ। শুধু একজনকে দেখতে পেলেন না প্রলয় ঘোষ। কাকে ? কার মুখ নেই ? কার মুখ ? শুধু প্রশ্নগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। কে জানবে ? কে উত্তর দেবে ? পাগলের মতো চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন প্রলয় ঘোষ।

'এই তো। এই তো আমি'। এগিযে এসে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়লেন রত্না।

প্রলয় ঘোষ মনে মনে বললেন : 'না, তুমি নও, আরেকজন।'

স্বামীর কথা শুনতে পেলেন না রত্না। আরো ঝুঁকে পড়ে বললেন : 'এই তো আমি। তুমি কাউকে খুঁজছ ?'

প্রলয় ঘোষ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিযে বইলেন।

'এক্সকিউজ মি', একটি শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে রত্নাব গায়ে হাত দিল। সবে দাঁড়ালেন রত্না। দ্রুত হাতে সব জামাকাপড় ওবা শবীব থেকে খুলে নিচ্ছিল। নিমেষের মধ্যে স্বামীর উলঙ্গ শরীর দেখতে পেলেন রত্না। আশেপাশের সবাইকে ভুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রত্না। শিশুর মতো অসহায় চিৎপাত এই মানুষটাকে প্রাণভরে দেখছিলেন। এই প্রথম ওঁর কোন লজ্জা হলো না। এগিয়ে গিয়ে স্বামীব বুকের ওপর আলতো করে হাত রাখলেন রত্না। শিশুর গায়ে মা যেরকম ভাবে হাত বোলায় সেইরকম ভাবে আদর করে রত্না বললেন : 'তুমি ভয় পেও না। আমরা কোন অন্যায় করিনি। দয়াল তোমাকে ঠিক ফিরিয়ে দেবেন।'

'উড য়্যু কিপ হিজ ক্লোদ্‌স ?' কে যেন জামাকাপড়গুলো হাতে দিল রত্নার।

প্রলয় ঘোষকে নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিল। রত্না পাশে পাশে যেতেই একটি নার্স বলল : 'আই অ্যাম সরি ম্যাম। য়্যু হ্যাভ টু ওয়েট হিয়ার।'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রত্না। লম্বা করিডোর দিয়ে প্রলয় ঘোষ দূরে চলে যাচ্ছিলেন ক্রমশ। হঠাৎ সবকিছু অগ্রাহ্য করে রত্না চীৎকার করে উঠলেন : 'ফাইট।'

আশেপাশেব সমস্ত মানুষ চমকে তাকাল। শব্দটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগল ঘরে। রত্না আবার বললেন · 'আমি কিছু শুনতে চাই না। আমি ভিক্ষে

চাই।' দুটো হাত জোর করে কপালে ঠুকতে লাগলেন রত্না : 'আমার কথা ও শুনতে পাচ্ছে না দয়াল। তুমি বল। ওকে শক্তি দাও। যুদ্ধ করতে বল। ওকে ফিরিয়ে দাও।'

ঘরভর্তি মানুষ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। সবাই যেন বাংলা বুঝতে পেরেছে। এই মুহূর্তে বাংলাভাষা নদী, সাগর, মরুভূমি পেরিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হৃদয়ের ভাষা হয়ে গেছে। নির্বাসনের ভাষা, যন্ত্রণার ভাষা, প্রার্থনার ভাষা মিলেমিশে একাকার। সেই নার্সটা এসে পাশে দাঁড়াল। রত্নার পিঠে হাত রাখল মেয়েটি। রত্না অবাক হয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'উড হি ফাইট ?'

এক মূহুর্ত চুপ করে থেকে মুখ নীচু করল মেয়েটি। তারপর ফিস ফিস করে বলল : 'আই থিংক হি উইল।' একটু চপ করে থেকে মেয়েটি আবার বলল : 'উই অল থিংক হি উইল।'

রত্না মেয়েটির দিকে তাকালেন। তারপর, শান্তভাবে ওয়েটিং লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে চললেন।

বাবা-মা বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে এল পিংকি। সমস্ত বাড়িটায় নতুন রঙের গন্ধ। বিক্রী করার আগেই বোধহয় রঙ করিয়েছে লোকটা। এর আগের বার এসে পুরোনো মালিককে দেখেছিল পিংকি। বউ চলে গেছে লোকটার। দুটো ছেলেমেয়ে মার সঙ্গেই থাকে। বড় বাড়ির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে শহরে। ঘরটায় চোখ বুলিয়ে পিংকি মনে মনে ভাবল—বউ নেই কিন্তু রুচি আছে লোকটার। দেয়ালের হাল্কা নীলের সঙ্গে ঘন নীল কার্পেট ঘরটার চেহারা পাল্টে দিয়েছে একদম। নীল পিংকির সবচেয়ে প্রিয় রঙ। ঘরটা খুব পছন্দ হয়েছে পিংকির। অথচ একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল ওর। এত সুন্দর মনের মতো রঙ করা ঘর, বিরাট বাড়ি, জানালার বাইরে দূরের ঐ সারি সারি গাছ, সবকিছুর জন্য মনটা খারাপ লাগছিল। প্রয়োজন ফুরোলে সবকিছু সুন্দর এত অর্থহীন হয়ে যায়। মাকে কথাটা কিছুতেই বলতে পারছে না। আজ না হোক কাল বলতেই হবে। ম্যানহাটানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে পিংকি। সামনের মাসের প্রথমেই সেখানে চলে যাবে এরকমই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে ও। আপাতত জ্যানিস আর ও শেয়ার করে থাকবে। বলি বলি করে আজকেও মাকে কথাটা বলতে পারল না পিংকি।

ব্যাগ থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালো পিংকি। লম্বা টানে

অনেকখানি ধোঁয়া বুকের ভেতরে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল অ্যাসট্রের খোঁজে। মাঝারি গোছের একটা গ্লাস ভর্তি করে অরেঞ্জ জুস নিয়ে ডিনার টেবিলে এসে বসল পিংকি। অভ্যাসবশে দেয়ালের দিকে হাত বাড়ালো। দেয়াল ফাঁকা। পিংকি ভুলে গেছে নতুন বাড়িতে টেলিফোন আসেনি এখনো। অস্বস্তি লাগে কি রকম। এদেশে বাড়িতে টেলিফোন না থাকলে অক্ষম বলে মনে হয়। অভ্যাস কি রকম নিশ্চিতভাবে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। সবকিছুই এত সহজ হয়ে গেছে যে একটু নড়চড় হলেই অসহায় বোধ করে মানুষ। এদেশের মানুষেরা কেন যে অন্যদেশে গিয়ে হিমসিম খায় পিংকি স্পষ্ট বুঝতে পারে। ওর মাঝে মাঝে মনে হয় এই দেশের অজস্র ছোট, বড়, মাঝারি হাইওয়ে, দু'মিনিট অন্তর বিরাট বিরাট সাইনবোর্ড—একদিন রাতারাতি যদি সব কটা সাইনবোর্ড খুলে নেয়া হয় রাস্তা থেকে! হাজার, হাজার, লাখ, লাখ মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে রাস্তায়। বাড়ি ফিরতে পারবে না কেউ। গোটা দেশটা অচল হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। কথাটা ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল পিংকি। দু-তিন বছর আগেও পিংকির জীবনে কোন সাইনবোর্ড ছিল না। অন্যের চোখ দিয়ে দেখা সাইনবোর্ড অনুযায়ী রাস্তা চলত ও। রত্না আর প্রলয় ঘোষের মেয়ে—এইটুকুই ওর পরিচয়। ওর নিজের যে একটা অস্তিত্ব আছে সেটা যেন অর্থহীন। বাবা-মা যে ওর ভালই চান সেটা বুঝতে ওর কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু ওঁদের চাওয়া ভাল আর ওর নিজের চাওয়া ভাল কোথাও কোথাও মেলে না। জীবনটাকে নিজের চোখে দেখবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা উঁকিঝুঁকি মেরেছে এতদিন। কাউকে ভয় না পেয়ে, কৈফিয়ৎ না দিয়ে, কি করলে আর সকলকে খুশী করা যাবে এসব না ভেবে, খানিকটা সময় অন্তত নিজের মতো করে বাঁচতে ইচ্ছে করে। আর সকলের জন্য আমির পাশাপাশি আমার জন্য আমিরও একটা নিশ্চিন্ত পরিসর চাই। পিংকি এটাও জানে এই সামান্য পরিসরটুকু কেউ ওকে এমনি দেবে না। মা-বাবা ভয় পাবে, রাগ করবে, বোঝাবে। তবু, মা-বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে বলতেই হবে—'আই লাভ য়্যু অল। বাট আই নিড সাম স্পেস।' এখন আর এসব নিয়ে ভাববার কোন মানে নেই। চাকরির টাকায় ও আর জ্যানিস মিলে আগাম ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। একবার সাহস করে মাকে বলে ফেলতে হবে। পিংকি মনে মনে ভাবল আজকেই রাত্তিরে মার কাছে কথাটা পাড়বে।

বাবা নিশ্চয়ই রেগে যাবে খুব। তবে বাবার যুক্তিগুলো ও মানতে পারে না। এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে বিরক্ত হবে। তবু চুপ করে থাকতে পারে না

পিংকি। অনেক তুচ্ছ কারণেই তাই খিটিমিটি বেধে যায়। ও যে আর বাচ্চা মেয়ে নেই সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় অনেক সময়। বাড়ি ফিরতে দেরী হয়েছে বলে কিছুদিন আগে রেগে গিয়ে হঠাৎ বলল : 'আমেরিকায আছ বলে ভেবেছ যা খুশি তাই করবে ? নাকি ভাবছ আমেরিকান হয়ে গেছ ? রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকতে বুক কাঁপল না একটু ?' পিংকি একবার ভাবল চুপ করে থাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবল চুপ করে থাকা মানেই মেনে নেখা। তাই ছটফটিয়ে উঠে বলল : 'আমি ইচ্ছে করে আসিনি। তোমরা নিয়ে এসেছ সঙ্গে করে। আর আমার কথা ভেবে যে এনেছ তাও নয়। তুমি আসতে চেয়েছ তাই এসেছ। তখন ভাবা উচিত ছিল। ইটস টু লেট নাও। তাছাড়া আমি একা ছিলাম না। আমার বন্ধুরাও ছিল সঙ্গে। উইক-এন্ডে রাত বারোটা এমন কিছু বেশি রাত নয়। তোমরাও তো পার্টিতে গেলে অনেক সময় রাত তিনটেয় বাড়ি ফের।'

'আমার আর তোমার বয়স এক নয়।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পিংকি বলল : 'দ্যাটস রিয়েলি ফানি। আমাকে একটু বলবে আমি কবে বড় হব ? আমার ধারণা, আমি বড় হয়ে গেছি।'

রুখে দাঁড়ালেই বাবা আজকাল চুপসে যায়—ইদানীং পিংকি এটা লক্ষ করেছে। ওর নিজেরও খারাপ লাগে বাবার সঙ্গে প্রত্যেক মুহূর্তে তর্ক করতে। অথচ মেনে নিতেও অসম্ভব কষ্ট হয়। দেশে গিয়ে দেখেছে ওর বয়সী মেয়েরা এই শাসন, এই নিয়ম কত সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু ও পারে না, পারবে না। তার জন্য ও দুঃখও পায়। মনে হয় কেন বাবা-মা ওকে এদেশে নিয়ে এল। খড়গপুরে থাকলে হয়ত ও সবকিছুই মেনে নিত একদিন। না মেনে কোন উপায় নেই ওদেশে। ও যে আজকে কলেজে না ভর্তি হয়ে চাকরি নিয়ে আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাবার কথা ভাবছে—দিদিভাই স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না কোনদিন। ওর কাছে যেটা সহজ, স্বাভাবিক, ওর বাবা-মার কাছে সবসময় তা নয়। আমেরিকায় থেকেও বাবা-মা বেমালুম পুরোনো নিয়মগুলোই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাতে পিংকির কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওকেও যে পুরোপুরি সেই নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে সেখানেই আপত্তি। খুব ছোটখাট প্রশ্ন নিয়েই তাই খটকা বাধে। বাবা রেগে যায়, চ্যালেঞ্জ করে তাই বাবাকে মুখের ওপর বলতে পারে পিংকি। কিন্তু মাকে নিয়েই যত মুশকিল। যতই রাগ থাকুক, মা সামনে এসে দাঁড়ালেই ওর সব রাগ জল হয়ে যায়। যুক্তিগুলো হারিয়ে যায়। কথা খুঁজে পায় না পিংকি। অনেক চেষ্টা করেও মাকে জোরে কথা বলতে পারে না।

তার কথায় কথায় মা আজকাল দয়ালকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় সামনে। সমস্ত অবিশ্বাস বুকের ভেতরে চেপে পিংকি ছটফট করে। বিশ্বাস আর ভালোবাসাকে আঘাত করতে ভয় লাগে। অথচ, এই মা অনেকখানি অচেনা। মানুষ হিসেবে নয় কিন্তু ধ্যানধারণার দিক থেকে। মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান। অথচ অতদূরে থেকেও মা যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সেই বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে কষ্ট হচ্ছে পিংকির। অথচ মা কত অনায়াসেই কথাগুলো বলে ফেলে। সেদিন যেমন বলল : 'হ্যাঁরে, তুই মদ খেয়েছিস?'

পিংকি মদ কথাটা শুনে হেসে ফেলল। ছোটবেলায় মদ কথাটার অন্যরকম মানে ছিল ওর কাছে। দেবজ্যেঠুর পেছনের বাড়ির অরূপকাকাদের বাড়িতে ওদের যাওয়া নিষেধ ছিল সন্ধ্যেবেলায়। মা বলেছিল অরূপকাকা নাকি রোজ সন্ধ্যেবেলায় মদ খায়। অরূপকাকার বউকে মানুমাসি বলত পিংকি। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যেবেলা গোলমাল বাঁধত ও বাড়িতে। মা বলত মদ খেয়ে নাকি অরূপকাকা বউকে পেটায়। পিংকি কোনদিন দেখেনি। দেবজ্যেঠুর ছোট মেয়ে ঝুমা বলল একদিন : 'অরূপকাকা খুব খারাপ লোক।'

'জানি।' খুব বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়েছিল পিংকি।

'কি জানিস?'

'জানি, মা বলেছে। মদ খেয়ে বউকে মারে।'

ঝুমা হেসে ফেলেছে—'ধ্যাৎ। আরো খারাপ। তুই বুঝবি না।'

'বুঝবি না' কথাটা শুনলেই রাগ হয়ে যেত পিংকির। হেরে যাবার পাত্রী ও নয়। রাগটা নিঃশব্দে হজম করে ঠোঁট উল্টে বলেছে : 'না বললি তো বয়ে গেল। আমিও তোকে কোনদিন বলব না কিছু।'

ঝুমা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেছে—'দিদিকে একদিন জড়িয়ে ধরেছিল অরূপকাকা।' কথাটা বলেই অদ্ভুতভাবে হেসেছিল ঝুমা।

পিংকি বুঝতে পারেনি। জড়িয়ে ধরলে কি হয়। দেবজ্যেঠুও তো কত সময় ওদের জড়িয়ে ধরে। পিংকি রেগে গিয়ে বলেছে—'বাজে কথা বলছিস। জড়িয়ে ধরেছে তো কি হয়েছে।'

'আরো আছে', মুচকি হেসেছে ঝুমা।

'কি?'

ফিসফিস করে ঝুমা বলেছে : 'জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খেয়েছে, বুকে হাত দিয়েছে।'

একটা অদ্ভুত লজ্জা ঘিরে ফেলেছিল ওকে। রক্ত জমেছিল মুখে। তবুও

গলায় অবিশ্বাস এনে বলেছে—'ধ্যাৎ। তুই কি করে জানলি ?'

'দিদি মাটিদিকে বলছিল, আমি শুনেছি।'

একটা অপরিচিত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল ওর সারা শরীরে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল হাতের মুঠোয়। সেই প্রথম লজ্জা পেয়েছিল পিংকি। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হওয়া সেই প্রথম। পরের দিন স্নান করতে গিয়ে নিজের শরীরের দিকে ভাল করে তাকিয়েছিল পিংকি। লালিদি আর দিদি ভাই-এর ওপর মনে মনে হিংসে হয়েছিল খুব। কবে ওদের মতো হবে এই ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল পিংকি। পরক্ষণেই একটা অপরাধবোধ ওকে গ্রাস করেছে। পিংকি মনে মনে ভেবেছিল অরূপকাকার দিকে ও কোনদিন তাকাতে পারবে না। অরূপকাকার দিকে তাকালেই ঝুমার গল্পটা মনে পড়বে ওর।

'উত্তর দিবি না ?' মা প্রশ্ন করল আবার।

চমকে উঠল পিংকি। সামনে মা দাঁড়িয়ে। মার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে পিংকি হেসে ফেলল।

'হাসলি যে ?'

'তুমি মদ বললে আর আমার অরূপকাকার কথা মনে পড়ে গেল। তাই।'

'আমি জানি, তুই খেয়েছিস। মাঝে মাঝেই খাস। আমি গন্ধ পাই।'

'হ্যাঁ, কখনো-সখনো।'

'আর সিগারেট ?'

'তুমি রাগ করেছ ?' মার কথার সোজা উত্তর না দিয়ে পিংকি পাল্টা প্রশ্ন করল।

'না।'

'তবে গম্ভীর কেন ?'

'আমার ভাল লাগে না আমার মেয়ে সিগারেট খায়, ড্রিংক করে।'

'ওরকমভাবে বল না, আই ফিল ব্যাড। ইট'স নট দ্য এণ্ড অফ দ্য ওয়র্লড।'

'না তা নয়।'

'তবে ?'

'তুই যত সহজে নিতে পারিস, আমি পারি না। আমার অস্বস্তি হয়।'

'জানি। তাই তোমার সামনে খাই না।'

'খেলেই পারিস।'

'তুমি যদি বন্ধু হও কোনদিন, তখন খাব।' মুচকি হাসল পিংকি।

'আমি কি শত্রু ?'

'শত্রুর চেয়েও বড়। তুমি মা। বাবা বকে। বাবা চীৎকার করে। বুঝতে পারি। কিন্তু তোমাকে আমি ভয় পাই বাবার থেকে অনেক বেশি। তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে আমার সব দেয়ালগুলো একের পর এক ভেঙে যায়। তুমি যখন তাকাও আমার বুক কাঁপে। তুমি তোমার স্নিগ্ধতা দিয়ে আমাকে কষ্ট দাও। কোন অভিযোগ না করে, তোমার বিষণ্ণ হাসি দিয়ে তুমি আমার সব অস্ত্র কেড়ে নাও। আই ফিল নেকেড। তোমার ভাল লাগা, না-লাগাগুলো আমার সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যায়। আমার বোধ, আমার বিশ্বাসগুলো সেই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মরে। তুমি কখনো বন্ধুর মতো বল না—ছুটকি এটা করিস না। তুমি দুঃখ পাও। আর সেই দুঃখটা তুমি আমার মধ্যে অনায়াসে ছড়িয়ে দাও। মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি অনেক বেশি নিষ্ঠুর।' পিংকির মুখে এখন আর হাসি নেই।

মেয়ের গম্ভীর মুখ দেখে রত্না মুচকি হেসে বললেন : 'তোর তো বন্ধু অনেক আছে। মা তো আমি একটাই। তাছাড়া, আমি অন্যরকম ভাবে মানুষ হয়েছি। বন্ধু হিসেবে তোর আমাকে ভাল লাগবে কেন ? পদে পদে খিটিমিটি বাধবে। তুই বলবি ড্রিংক করব, আমি বলব দুধ খা।'

'তুমি ওরকম বলবে কেন ? তুমি যখন দুধ খাবে, আমিও মোটেই তোমায় বলব না—মা, দুধ খাচ্ছ কেন, বিয়ার খাও। বিয়ার খাওয়া বা সিগারেট খাওয়ার জন্য নয়। আমার কাছে ওগুলো খুব সামান্য ব্যাপার। আরো অনেক কথা জমে আছে আমার। কাউকে বলতে ইচ্ছে করে।'

'কেন তোর তো অনেক বন্ধু। জ্যানিস, জন, সিণ্ডি। ওরা ?'

'ওরা বোঝে না। চেষ্টা করে। কিন্তু কোথাও একটা ব্যবধান আছে আমাদের। আমি জানি তুমি বুঝবে। অথচ তোমাকে আমি বলতে পারি না।'

'কেন ?'

'খালি ভয় লাগে, তুমি যদি দুঃখ পাও কখনো। সব তোমার ভাল নাও লাগতে পারে।'

'দুঃখ আমার কাছে নতুন নয়। আমি যা দুঃখ পেয়েছি আমার পরম শত্রুও যেন কোনদিন না পায়।' চোখটা অন্যদিকে ফেরালেন রত্না।

'একটা কথা বলব, তুমি রাগ করবে না বল।'

'আগে তুই বল, তারপর ভেবে দেখব।'

'মা আর মেয়ে এটা তো শুধুমাত্র বায়োলজিকাল ব্যাপার। তুমি হয়তো বলবে রক্তের সম্পর্ক, নাড়ির সম্পর্ক। ঠিক। এই সম্পর্কটা কিন্তু নড়বে চড়বে

না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা ইচ্ছে করলেও সেই সম্পর্কটা বদলাতে পারব না। কিন্তু আরেকটা সম্পর্ক থাকে যেটা প্রতিমুহূর্তে বদলায়। কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। সেটা মানুষের সঙ্গে মানুষের। আমার মতে সেটাই সত্যিকারের সম্পর্ক। তুমি হাত বাড়ালে দেখবে আমি আমার মনের বন্ধ দরজাগুলো খুলে কখন তোমার বুকের মধ্যে ঢুকে বসে আছি।'

রত্না চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বললেন : 'তোদের বয়সে তোরা যতখানি গুছিয়ে কথা বলতে পারিস, আমরা এখনো পারি না। তাই মাঝে মাঝে ভয় হয়।'

'কিসের ?'

'মনে হয় আমি পেছনে পড়ে রইব আর তুই আমাকে ফেলে অনেক দূরে চলে যাবি।'

পিংকি হাসল : 'মাকে ফেলে চলে যেতে পারি, বন্ধুকে ফেলে যেতে পারব না।'

'কেন ?' মা দোষ করল কোথায় ?'

'দোষগুণ নয়। স্থির সম্পর্ককে অবহেলা করা সহজ। তাই।'

সেদিনের মতো চুপ করে গেলেন রত্না। পিংকি জানে না মা ওর কথা বুঝল কিনা। হয়ত নয়। পিংকি মনে মনে ভাবল—একদিন না একদিন মাকে বুঝতেই হবে। জ্যানিস নয়, জন নয়, একমাত্র মা' ওকে পুরোপুরি বুঝতে পারবে। জ্যানিস বা জন যে চেষ্টা করে না তা নয়। পিংকিও চেষ্টা করেছে অনেক। মাঝে মাঝে মনে হয় জন ওকে সত্যিই ভালোবাসে। তাও একটা দূরত্ব অনুভব করে পিংকি। খড়্গপুরের স্মৃতিগুলো তো প্রায় অস্পষ্ট। তাছাড়া অত ছোটবেলার কোনো বোধ তো সজীব থাকার কথা নয় এতদিন। তবে বোধহয় বাবা-মা—মানুক না মানুক বাবা-মা'র বাঙালীয়ানার কিছু কিছু হয়ত অজান্তেই ওর মনের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। ইচ্ছে করলেও ও সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। তাই, জনের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও বুঝতে পারছে, ওর শিক্ষা বলছে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। আর, এই দোটানার মধ্যে পড়ে ও অস্থির হয়ে উঠেছে। ও বুঝতে পারছে না ও কোথায় যাবে। কোন পথে হাঁটবে। যে সময়টার জন্য ও এত বছর ধরে অপেক্ষা করেছে সেই সময়টা এসে গেছে। আঠারো বছর বয়সটা এসে গেছে। কারো কাছে জবাবদিহি করার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু ও থেমে পড়েছে হঠাৎ। আপাত-বিরোধী অনেকগুলো বোধ তালগোল পাকিয়ে গেছে মনের মধ্যে। সেই

জটগুলো না ছাড়াতে পারলে কোথাও এগোতে পারছে না ও। এই মুহূর্তে পড়াশুনো করতে ভাল লাগছে না অনেকটা এই কারণেই।

ইদানীং জন মাঝে মাঝে রেগে যেত। পিংকির একটা ঔদাসীন্য ওকে বিব্রত করে তুলেছিল খুব। নর্থ ক্যারোলিনায় চলে যাবার আগের দিন জনের সঙ্গে ম্যানহাটানে গিয়েছিল পিংকি। সারাক্ষণই চুপচাপ ছিল ও। অধৈর্য হয়ে জন একসময় বলল : 'তোমাকে বুঝতে পারি না।'

'ইটস নট ইয়োর ফল্ট। আমিও বুঝি না আমাকে।'

'না ঠাট্টা নয়। য়্যু আর নট দি সেম গার্ল এনিমোর।'

'আই অ্যাম নট। তুমি ঠিক ধরেছ।' পিংকি ঠাট্টা গলায় বলল।

'উডন্ট য়্যু লাইক টু টক ?' হয়ত কথা বললে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। পিংকির কাঁধে হাত রেখেছিল জন। হঠাৎই প্রশ্নটা করল পিংকি : 'আই উড লাইক টু আস্ক য়্যু সামথিং। তুমি সত্যি কথা বললে খুশি হবো।'

'তুমি কেন এরকম বলছ ? তোমার কি কখনো মনে হয় আমি সত্যি কথা বলি না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল পিংকি। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল : 'না তা নয়। তবে এটা এমন একটা প্রশ্ন যেটা তোমাকে বলেই জিজ্ঞেস করতে পারছি। ইটস নট দ্যাট মাই লাইফ ডিপেণ্ডস অন ইট। কিন্তু আরেকদিক থেকে দেখলে এটা নিছক কৌতূহলও নয়।'

'শুট।'

জনের চোখের দিকে তাকিয়ে পিংকি বলল : 'ডিড য়্যু এভার সেল ড্রাগস ?'

আর যাই হোক, চলে যাবার আগের দিন রাত্তিরে এ প্রশ্নটা বোধহয় আশা করেনি জন। মুহূর্তের মধ্যে ওর চোয়ালটা শক্ত হল। এদিক ওদিক তাকালো দু'একবার। তারপর ফিসফিস করে আপন মনে বলল : 'বাস্টার্ড।'

'কে ?'

'সিণ্ডি। গ্রেট হোয়াইট হোর।'

'কেন ? সিণ্ডি কি মিথ্যে কথা বলেছে ?'

একটু চুপ করে থেকে জন বলল : 'না। ও সত্যি কথাই বলেছে। তবে পুরোটা বলেনি। আমি এখন বুঝতে পারছি অনেক কিছু।'

'সিণ্ড কিন্তু আমায় বলেনি।'

'যেই বলে থাক তার সঙ্গে সিণ্ডির সম্পর্ক আছে। কারণ একমাত্র সিণ্ডি জানতো। তাছাড়া আমার আরেক কালো বন্ধু। আমি জানি ও বলতে পারে

না।'

'কেন ? বলতে পারে না কেন ? কালো বলে ?'

জনের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো নিমেষে। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল ও। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত স্বরে বলল : 'আর কোনদিন আমাকে এরকম কথা বল না।'

পিংকি মৃদুস্বরে বলল : 'আই অ্যাম সরি। আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি। জানতে চেয়েছি শুধু।'

জন কোন উত্তর দিল না পিংকিকে। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পিংকি বলল : 'আমি তোমার নিউইয়র্কের শেষ সন্ধ্যেটা নষ্ট করে দিলাম।'

'না, তা নয়' মৃদুস্বরে উত্তর দিল জন : 'এরকম প্রশ্নের উত্তর এদেশে আমাদের প্রায়ই দিতে হয। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা সব সময়ই দোষী যতক্ষণ না অন্যরকম প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু তোমাব কাছ থেকে প্রশ্নটা আশা করিনি, তাই মেজাজটা বিগড়ে গেল হঠাৎ।' একটু থেমে জন আবার বলল : 'এতদিন পরে জানতে চাইলে কেন ? এ তো অনেকদিন আগের ব্যাপার।'

'ওয়েট করেছিলাম।'

'কিসের জন্য ?' অবাক হল জন।

'ভেবেছিলাম তুমি আমাকে বলবে। কেন ভেবেছিলাম জানি না। আমি অনেক সময় বেশি ভাবি। কিংবা অন্যরকম ভাবে ভাবি।'

'আমি হলে কিন্তু পরের দিন জিজ্ঞাসা করতাম।'

'তুমি যেটুকু বলতে চেয়েছ তার থেকে বেশি জানতে চাইনি কোনদিন।'

'তবে আজ চাইলে কেন ?'

'আই ডোন্ট নো। আমার মনে হল তুমি অনেকদূরে চলে যাচ্ছ কাল। হঠাৎ প্রশ্নটা বেরিয়ে এল মুখ থেকে। এখন ফিরিয়ে নেবার কোন উপায় নেই।'

'ভালই কবেছ। অন্তত আমার বলার সুযোগ এল। হ্যাঁ, আমি ড্রাগ বিক্রী করেছিলাম কিছুদিন। টাকার দরকার হয়েছিল। এই বয়সে আমি জীবনের অনেকখানি দেখে ফেলেছি পিংকি। সামান্য কারণে মানুষকে খুন করতে দেখেছি, নিজের মাকে বেশ্যাবৃত্তি করতে দেখেছি। আমার ছোটবেলা আর তোমার ছোটবেলা এক নয় পিংকি। তুমি না চাইতেই অনেক কিছু পেয়ে গেছ জীবনে। ফর মি ইট ওয়াজ এ কনস্ট্যান্ট মিসারি। টুকটাক চুরিও করেছি অনেকবার। ভাগ্য ভাল ধরা পড়িনি। মেরিন্‌স-এই চাকরিটা পাবার আগে আমার জীবনে ভাল কিছু ঘটেনি কোনদিন একমাত্র তুমি ছাড়া।'

'হাউ ডু আই ফিট ইন ?'

'তুমি সরল, তুমি ভীতু, তুমি সুন্দর—তুমি আলাদা। আই ক্যান স্মেল ফ্রেশ স্প্রিং এয়ার ইন ইয়োর ব্রেথ।'

পিংকির গালে বিকেলের আকাশ। উত্তেজনা চেপে পিংকি বলল : 'আই ফিল ফ্ল্যাটারড্।'

'না। আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। য়্যু আর হোয়াইট, আই নেভার ওয়াজ। তাই, তুমি আমার কাছে এত দামী। আজকে তোমাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি আমি।'

চমকে উঠল পিংকি। ওর হঠাৎ মনে হল জন কি বলবে ও জানে। ও ফিসফিস করে বলে উঠল : 'নট টু'নাইট।'

'কেন ?' বিস্মিত হল জন।

'পিংকি দৃঢ় স্বরে বলল : 'না, আজ বল না।'

'কিন্তু কেন না ? এবপব হয়ত অনেকদিন আমাদের দেখা হবে না।' অধৈর্য হল জন।

'সেই জন্যই নয়। আমি আঘাত পেতে চাই না, তোমাকেও আঘাত দিতে চাই না আজ।'

'তবু যদি আমি বলতে চাই।' জন পিংকির কাঁধে হাত রাখল।

পিংকি জনের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল . 'য়্যু উডন্ট ডু এনিথিং এগেইনস্ট মাই উইশ, উড য়্যু ?'

'এরকম অদ্ভুত ইচ্ছে হয কেন তোমার ?'

'জানি না। আজকাল আমার মনটা ভেসে বেড়ায়। আমি কিছুই ঠিকমত ভাবতে পারছি না।'

'কি করে বোঝ কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল ?' জন মৃদু স্বরে বলল।

'বুঝি না। আই অ্যাম নট ইভেন সিওর হোয়াট টু একসপেক্ট।' জনের ডান হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে পিংকি আবার বলল : 'ভুল বুঝ না। বেয়ার উইথ মি। প্লীজ।'

'মে আই হেল্প ?' জন প্রশ্ন করল।

'না। শুধু একজনই হেল্প করতে পারে। সে হলো আমি নিজে। বাট শি রিফিউজেস টু লিসন।' জনের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে পিংকি বলল : 'তোমার কখনো হয়নি ?'

'কি ?'

'এ ফিলিং দ্যাট সামথিং ইজ বদারিং য়্যু। বাট য়্যু ডোণ্ট নো হোয়াট ইট ইজ। এ একটা অদ্ভুত অনুভূতি। আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব । আগে ভাবতাম বোধহয় আমাব বাবা-মা—আমার মনে হত ওরা বোধহয় আমাকে বন্দী করে রেখেছে। আমি ভাবতাম কবে আমার আঠারো বছর বয়স হবে। আমি মুক্তি পাব। কিন্তু, আঠারো বছর বয়সটা আমার চোখের সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, হোয়াট আই ওয়ন্ট টু ডু, হোয়্যার আই ওয়ন্ট টু গো, হোয়াট আই ওয়ন্ট টু বি। আই ফিল সো হেল্পলেস, জন। আমি কাউকে দোষ দিতে পারি না। আই উইশ সামওয়ান কুড ইন্ট্রোডিউস মি টু মাইসেল্ফ।' জোরে জোরে কথা বলে পিংকি হাঁপাচ্ছিল।

পিংকির গালে আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে টোকা মেরে জন বলল : 'আমার একটা আইডিয়া আছে।'

'বল।'

'চল আমরা একটা ছবি দেখি। আলোচনা করে আমরা কোথাও পৌঁছতে পারব না। লেট'স কিপ দ্য ডিসকাসান ফর সাম আদার টাইম, সাম আদার ডেজ।'

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল পিংকির। বিদায় নেবার আগে পিংকি বলেছিল : 'প্লীজ, ভুল বুঝ না। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন আমি তোমাকে আমার আজকের ব্যবহারটা বোঝাতে পারব।'

'আই হোপ ইট হ্যাপেন্‌স সুন।'

পিংকি জড়িয়ে ধরেছিল জনকে : 'আই নিড টাইম।'

বাড়ির কাছাকাছি পিংকিকে নামিয়ে দিয়ে জন চলে গেল। বাড়িতে ফিরতেই বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল ওকে। বাবা যখন বলেছিল—'আমেরিকায় আছ বলে ভেবেছ যা খুশি তাই করবে'—ও একবার ভেবেছিল বলবে—'প্লীজ, আমাকে একটু সময় দাও। আমাকে তোমরা কেউ কোন প্রশ্ন করো না। আমার কাছে কিছুরই কোন উত্তর নেই।' কিন্তু বলতে পারেনি পিংকি। তার বদলে রাগ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ।

বাইরে হর্ন শোনা গেল গাড়ির। টেবিল ছেড়ে উঠে দরজাটা খুলল পিংকি। গাড়ির ভেতর থেকে জ্যানিস চীৎকার করে বলল : 'কাম অন আউট। লেটস গো।'

'আই অ্যাম নট রেডি ইয়েট। গেট ইন ফর এ মিনিট।'

জ্যানিস গাড়ি পার্ক করে বাড়ির ভেতরে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল :

'হোয়্যার ইজ এভরিবডি ?'

'আই অ্যাম অ্যালোন ফর এ চেঞ্জ।'

কথাটা শুনেই বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল জ্যানিস। পিংকি প্রশ্ন করল—'কি হলো ?'

'আই উইল বি রাইট ব্যাক।' আধ মিনিটের মধ্যেই হাতে একটা ব্রাউন প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল জ্যানিস। একটা বিয়ারেব বোতল পিংকির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল : 'ওয়ন্ট সাম ?'

'গ্লাস দেব ?' পিংকি জানতে চাইল।

'আর য়্যু কিডিং ? ইট কিলস দ্য মুড।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে জ্যানিস প্রশ্ন করল · 'তুমি বাবা-মাকে বলেছ ?'

'না', খানিকটা বিযার গলায় ঢালল পিংকি।

চিৎপাত হয়ে সোফার ওপর শুয়ে পডল জ্যানিস। একটু চুপ করে থেকে বলল . 'কবে বলবে ?'

'মে বি টু' নাইট। তুমি বলেছ ?'

'গতকাল বলেছি।'

'হাউ ডিড হি বিয়্যাক্ট ?'

'নর্মালি। ইট ওয়াজ জাস্ট এনাদার পিস অফ ইনফরমেশন। আমার তো মনে হয় ভালই হলো। শি উইল গেট লেইড ইন পিস।' বাবার গার্লফ্রেণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য কবল জ্যানিস।

'মাকে বলনি ?'

'হোয়াট'স দ্য ইউস ? শি ক্যান্ট হেল্প। শুধু শুধু কান্নাকাটি করবে ফোনে। আরো মদ খাবে। উল্টোপাল্টা বকবে। আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে নানারকম। না পারলে ফোন করে বাবাকে বিরক্ত করবে। গালাগাল দেবে।'

'মার জন্য তোমাব কষ্ট হয় না ?'

'আগে হতো। এখন আর হয় না। আর না দেখা হলেই ভাল। দেখা হলেই বরঞ্চ কষ্ট হয়।'

'কেন ?'

'আই ক্যান্ট হেল্প হার। তাই।' আলোচনার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে জ্যানিস বলল : 'কাম অন। গেট রেডি।'

'আমি একটু স্নান করে নিই। ইট উইল বি এ কাপল অফ মিনিটস।' নতুন জাপাকাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল পিংকি।

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে জ্যানিস বলল : 'য়্যু আর এ বেঙ্গলি রাইট ?'

'ইয়েস।'

'আই থট সো। আই টোল্ড সিণ্ডি।'

'কেন বল ত ?' পিংকি অবাক হলো।

'সিণ্ডি ইজ গোইং আউট উইথ অ্যান ইণ্ডিয়ান গাই দিস ডেজ। হি ইজ অলসো এ বেঙ্গলি। ডাজ দ্য নেম 'নীল' সাউণ্ড ফ্যামিলিয়ার টু য়্যু ?'

পিংকি হেসে ফেলল। তারপর মাথা নেড়ে জানাল—'না।' চেনাশুনোর মধ্যে ঐ নামে কাউকে চেনে না পিংকি।

'হোয়াই ডিড য়্যু লাফ ?'

'তুমি এত সুন্দর উচ্চারণ করলে নামটা, আমার হাসি পেল।'

'হোয়াট ডাজ দ্য নেম মিন ?'

'ব্লু। মাই ফেবারিট কালার।'

'আমার ভায়োলেট।'

'সিণ্ডির সঙ্গে আলাপ হলো কোথায় ?'

'ডিসকোতে। তোমার সঙ্গেও আলাপ হবে আজকে। সিণ্ডি ওকে নিয়ে আসবে বলেছে।' কথাটা বলেই থতমত খেয়ে গেল জ্যানিস। তাড়াতাড়ি আবার বলল : 'প্লীজ ডোন্ট টেল সিণ্ডি দ্যাট আই টোল্ড য়্যু।'

'কেন ?' মুচকি হাসল পিংকি।

'ইট ওয়াজ মেন্ট টু বি এ সারপ্রাইজ।'

'ইট উইল বি এ সারপ্রাইজ, এনিওয়ে। আই হ্যাভন্ট সিন হিম বিফোর।'

'জনের কোন খবর পেয়েছ ?'

'পৌঁছে একটা কার্ড পাঠিয়েছিল। ব্যস।' চুপ করে গেল পিংকি। জনকে কার্ডটার কোন উত্তর দেয়নি ও। পিংকি মনে মনে ভাবল নতুন অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ঠিকানা জানিয়ে জনকে একটা বড় করে চিঠি লিখবে ও।

ম্যানহাটানের দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীনউইচ ভিলেজ। এমনিতেই সন্ধ্যেবেলা এই অঞ্চল জমজমাট থাকে। আজ গিজ গিজ করছে ভীড়। বোধহয় শনিবার বলেই। জ্যানিস আর পিংকি যে ডিসকো বারটাতে ঢুকল সেটাব নাম চার্লিস। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম ডিসকো বার প্রচুর। প্রতিটির চরিত্র আলাদা। এই বারটিতে অল্পবয়সী তরুণ-তরুণীদের ভিড় বেশি। শুধু নেশা বা নিছক আনন্দ নয়, পিংকির মাঝে মাঝে মনে হয় ইটস এ ফর্ম অফ সেল্ফ এক্সপ্রেশন।

ওর ভেতরকার অভিমান, আনন্দ, জ্বালা, যন্ত্রণার গতিময় অভিব্যক্তি। বাড়িতে কেউ না থাকলে অনেক সময় স্টিরিও চালিয়ে দিয়ে আপনমনে নাচতে থাকে পিংকি। দেহ, মন, সঙ্গীত কখন সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। শরীরের প্রতিটি খাঁজ, মুখের প্রতিটি মাস্‌ল যেন যাদুস্পর্শে জেগে ওঠে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, ভেতরকার কান্নাগুলো ঘাম হয়ে ঝরে, রক্তে জোয়ার আসে, পিংকির ক্রোধ অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে লড়াই করে। নিজের শরীর যেন আর শরীর নয়। কোন এক অচেনা প্রেমিক ওর বুক জুড়ে বসে থাকে। পিংকির মনে হয় ইটস দ্য ট্রু ইনটারকোর্স উইথ ইয়োর লাভার। তার মধ্যেই কথা বলে পিংকি। শব্দগুলোকে ও চিনতে পারে না। শব্দরা অস্পষ্ট হয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যায়। পিংকি নিজেকে দেখতে পায়।

চার্লিস-এ ঢুকতেই ব্যাণ্ডের আওয়াজ সমুদ্রের হাজার ঢেউ-এর মতো কানের পর্দায় এসে আঘাত করল। ডান্সফ্লোর ঘিবে অনেকগুলো চৌকোনো টেবিল। মাঝাখানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আরো খানিকটা জায়গা দিয়ে লোকজনের বসবার জায়গা। ইতিমধ্যেই বেশ ভীড়। ডান্সফ্লোর ঘিরে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। নাচ চলছে পুরোদমে। কারা নাচছে দেখতে পেল না ওবা। ওপরে এসে দাঁড়াতেই কেউ একটা দূর থেকে জ্যানিসের নাম ধরে ডাকল। টমকে চিনতে পারল পিংকি। জ্যানিসের বয়ফ্রেণ্ড। খুব ভালো নাচতে পারে টমাস। সুন্দর ছিপছিপে লম্বা চেহারা। কিন্তু টমকে পছন্দ করে না পিংকি। বড্ড বেশি হ্যা হ্যা করে হাসে, স্থূল রসিকতা করে। তাছাড়া পিজ্জা-শপে কাজ করে বলেও পিংকির মনে মনে একটা অশ্রদ্ধা আছে ওর ওপর। জ্যানিস যে কি করে এই ছেলেটিকে পছন্দ করে পিংকি ভেবে পায় না। টমকে দেখলেই পিংকির চোখের সামনে সাদা টুপি, চীস্‌ আর টমেটো সসের কথা মনে পড়ে। অথচ টম মেয়েমহলে কিলার। শুধু জ্যানিস নয়, আরো অনেক মেয়েই টমের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অস্থির।

ওরা কাছে আসতেই হৈ হৈ করে উঠল টমাস : 'হাই গার্লস।'

প্রায় টমের কোলে বসে মুখে মুখ ঘষল জ্যানিস। টমাসের পাশে যে ছেলেটি বসেছিল তাকে আগে কোনদিন এখানে দেখেনি পিংকি।

টমাস আলাপ করিয়ে দিল। ক্লিফর্ড। টমাসের বন্ধু। ক্লিফর্ড হাত বাড়িয়ে দিল পিংকির দিকে।

'ইজন্ট শি কিউট।' পিংকিকে দেখিয়ে টমাস ক্লিফর্ডকে বলল।

ক্লিফর্ড পিংকির দিকে তাকিয়ে বলল : 'হোয়াট ডু য়্যু মিন কিউট ? শি ইজ এ টোটাল রিভল্যুশন।'

ক্লিফের কথা বলার ধরনে পিংকি হেসে ফেলল।

'হোয়াই ডোণ্ট উই অর্ডার সাম বিয়ারস।' জ্যানিস পিংকিকে বলল।

'হোয়াই নট ?' টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল পিংকি।

ক্লিফও উঠে এল পিংকির সঙ্গে। কাউণ্টারে বেশ ভীড়। আগের নাচটা থেমেছে। ওপর থেকে ডান্সফ্লোরটা স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরটাতে ভীড় ক্রমশ বাড়ছে। হুড়হুড় করে ছেলেমেয়েরা ঢুকছে। এই ডিসকোতে আইন-কানুনগুলো কড়া নয় অত। পার্টনার থাকতেই হবে অথবা নাচতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এমন অনেকদিন হয়েছে যে পিংকি আর জন এখানে এসে শুধু বিয়ার খেয়ে ফিরে গেছে।

'দিস ইজ এ নাইস জয়েন্ট। আই লাইক ইউ।' ক্লিফ বলল।

'ও, ইয়া।' ভীড় ঠেলে কাউণ্টারের সামনে পৌঁছতে চেষ্টা করছিল পিংকি।

'লেট মি ট্রাই। হোয়াট উড য়্যু লাইক ?'

পিংকি পিছিয়ে এসে বলল . 'টু ব্ল্যাক বিয়ারস।'

দু হাতে মানুষ সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিফর্ড।

'য়্যু আর নট ফ্রম নিউইয়র্ক। আর য়্যু ?'

'কেন বল ত ? এরকম মনে হল কেন তোমার ?' ক্লিফর্ড অবাক হল।

'তুমি আগে বল। তারপর বলছি।'

দুটো ব্ল্যাক বিয়ার নিতে নিতে ক্লিফ বলল : 'না, আমি কেণ্টাকিতে থাকি। যদিও আমার বাবা-মা বড় হয়েছে ব্রুকলিনে, আমি জন্মেছি কেণ্টাকিতে। ওখানেই বড হয়েছি। তবে নিউইয়র্কে এটা আমার প্রথমবার নয়।'

'টমকে চিনলে কি করে ?'

'ও আমার কাসিন। ওরা কেণ্টাকিতে এসেছে অনেকবার। কিন্তু, তুমি বল, বুঝলে কি করে ?'

'খুব সহজ। তুমি নিউইয়র্কের বাসিন্দা হলে তোমার সঙ্গে আগে দেখা হত আমার। কারণ, এখানে আমরা অনেকবার এসেছি। টমের সঙ্গেও দেখা হয়েছে অনেকবার। আর, তাছাড়া...'

'গো অন।'

একটু ইতস্তত করে পিংকি বলল · 'আমি শুধু নিউইয়র্কেই থেকেছি। এখানকার মানুষদের হাবভাব দেখলেই বুঝতে পারি।'

'হাউ ডু য়্যু ফাইণ্ড মি ? গুড অর ব্যাড।' ক্লিফ অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করল।

পিংকি হেসে ফেলে বলল : 'ভাল-মন্দ বুঝতে আমার সময় লাগে। কিন্তু

বুঝতে পারি আলাদা।'

টেবিলে ফিরে আসতেই জ্যানিসের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এল পিংকির : 'আই ডোন্ট কেয়ার হোয়াট য়্যু থিংক, বাট আই অ্যাম নট গোইং টু চেঞ্জ মাই ডিসিশন। অ্যাট লিস্ট নট ফর নাও।'

টমের চোয়াল দুটো শক্ত হল। ও অস্ফুট স্বরে বলল—'শিট্।'

'হোয়াটস আপ?' ক্লিফ প্রশ্ন করল।

'আই নিড অ্যানাদার ড্রিংক' চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল টমাস। সবাইকে অগ্রাহ্য করে সোজা এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে।

ক্লিফর্ড মুচকি হেসে জ্যানিসের দিকে তাকিয়ে বলল : 'হোয়াট ডিড য়্যু ডু?'

মুখ না তুলেই জ্যানিস বলল : 'নাথিং। দ্যাটস হোয়াট ইজ বদারিং হিম।'

না বসে ক্লিফ টমাসের পেছনে দৌড়ল। পিংকির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল জ্যানিস। ফিসফিস করে বলল : 'হি ডাজন্ট লাইক ইট।'

'হোয়াট?'

'আমি যে তোমার সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট নিচ্ছি এটা ওর পছন্দ নয়।'

'কেন?'

'ও চায় আমি ওর সঙ্গে গিয়ে উঠি। ওর অ্যাপার্টমেন্টে।' একটু থেমে জ্যানিস আবার বলল : 'আমি চাই না। তাই ও রেগে গেছে। হু কেয়ারস?' ঠোঁট উল্টোলো জ্যানিস।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে পিংকি বলল : 'আই উডন্ট মাইণ্ড।'

'আমি জানি। এ প্রশ্নটা আমার মাথাতে আগেই এসেছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে আমি থাকতে চাই না।'

'তুমি ভালবাস না টমকে?'

'আই লাইক টু থিংক আই ডু। বাট আই উড লিভ মাই ওন লাইফ।'

'একদিন না একদিন তো একসঙ্গে থাকতেই হবে। হোয়াই নট নাও।' পিংকি মুচকি হাসল।

'একসঙ্গে থাকতেই হবে এমন কোন মানে নেই।'

'তুমি বিয়ের কথা ভেবেছ কখনো?'

'বিয়ে?' হো হো করে হেসে উঠল জ্যানিস—'ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে? 'বিয়ে? ওর সঙ্গে? তোমার কি মাথা খারাপ?'

'এখন নয়। ভবিষ্যতে কোনদিন।'

'নেভার, কোনদিন নয়। হি ইজ গুড ইন বেড অ্যাণ্ড অন ডান্স ফ্লোর। বাট

আই অ্যার্ম নট গোইং টু ম্যারি হিম।'

'ও কি জানে তুমি এইরকম ভাবছ!'

'যদি কোনদিন প্রস্তাব দেয় জানবে, অবশ্য ততদিন আমাদের সম্পর্ক টিকে থাকবে কিনা জানি না।'

'কেন?'

'আই অ্যাম গেটিং টায়ার্ড অফ হিম।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল পিংকি। টম আর ক্লিফ টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্লিফ পিংকিকে বলল: 'নাচবে?'

'আপত্তি নেই।' পিংকি মৃদুস্বরে বলল।

টমাস কিছু বলার আগেই জ্যানিস বলল: 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ দ্য টেব্‌ল।'

কথাটা অবশ্য ঠিক। সবাই মিলে উঠে গেলে জায়গাটা হাতছাড়া হয়ে যাবে এই মুহূর্তে। পিংকি উঠে দাঁড়াতেই টমাস বসে পড়ল এখানে। গ্লাসটাকে সাবধানে টেবিলের ওপর রেখে—দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল জ্যানিসকে। ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেয়ে বলল: 'আই লাভ য়্যু, বেব।'

জ্যানিসও ফিসফিস করে বলল: 'আমিও।'

এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল পিংকি। আস্তে বললেও কথাটা কানে গেছে ওর। কি করে সম্ভব। কয়েক মুহূর্ত আগেই জ্যানিস অন্য কথা বলেছে ওকে। কোনটা ঠিক। একটু আগের জ্যানিস না এখনকার। অথচ ওর মুখের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন লক্ষ করল না পিংকি। কি অনায়াসে মেয়েটা অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে।

'হোয়াট আর য়্যু থিংকিং?' ক্লিফ পিংকির কাঁধে হাত রাখল।

'হোয়াট?' চমকে উঠল পিংকি।

'কি ভাবছ?'

পিংকি লজ্জা পেল। এগিয়ে যেতে যেতে অস্ফুট স্বরে বলল—'কিছু না।'

নাচতে নাচতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল পিংকি। চিন্তা ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। আর দুদিন পরে যে মেয়েটার সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকবে ও তাকে কি বিশ্বাস করতে পারবে? সত্যিই কি বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন আছে? মনে আছে, জ্যানিসই একবার বলেছিল—দুর্বলতার আরেক নাম বিশ্বাস। আমরা যখন কারো ওপর নির্ভর করতে চাই তখন বিশ্বাসের প্রশ্ন তুলি।'

পিংকি খুব জোর গলায় প্রতিবাদ করেছে : 'না, তা কেন ? আই লাভ টু ট্রাস্ট পিপ্‌ল ?'

'আই ডোন্ট, এক্‌সেপ্ট মাইসেল্ফ।'

'হোয়াই ডু য়্যু সে দ্যাট ?'

'আমি তাই দেখেছি।'

'এমনও তো হতে পাবে তুমি যা দেখেছ সেটাই সব নয়।'

'পসিব্‌ল। কিন্তু সেটুকুই আমার একমাত্র সত্যি। আই উইল নট টেক এনিওয়ান'স ওয়ার্ড ফর ইট। সত্যি কি তুমি কাউকে বিশ্বাস কর ? একটু ভেবে বল ত ?'

একটু চুপ করে থেকে পিংকি বলল : 'করি।'

'কাকে ?'

'ফর এক্‌সাম্‌পল, আমার বাবা-মাকে। আমি যে ওদের সব কিছু পছন্দ করি তা নয় কিন্তু আমি মনে করি ওদের প্রতি আমার একটা বিশ্বাস আছে। তুমি তোমার বাবা-মাকে বিশ্বাস কর না ?'

বাবা-মার কথায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল জ্যানিস। তারপর মৃদু স্বরে বলল : 'আই উইস্‌ আই কুড। দে আর বেটার দ্যান আদারস। বাট ডিপ ডাউন, আই ডোন্ট রিয়েলি থিংক আই ডু। আমি মনে করি বিশ্বাস, অবিশ্বাস এগুলো অর্থহীন মূল্যবোধ। সারাটা জীবন ধরে একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে যায়। হোয়েন আই ওয়াজ এ লিটল গার্ল, আই ট্রাস্টেড মাই পেরেন্টস। কিন্তু তার পেছনে আমার স্বার্থ ছিল যেটা তখন বুঝতাম না।'

'কি স্বার্থ ?' অবাক হলো পিংকি।

'আই নিডেড দ্য সাপোর্ট, আই নিডেড দ্য মানি।'

'আর, ওদের কি স্বার্থ ছিল তোমাকে সাপোর্ট করার পেছনে!'

'অ্যান অবলিগেশন, আই গেস। ক্যান্ট য়্যু সি ? ইট ওয়াজ দেয়ার চয়েস। দে ওয়ান্টেড টু প্লে দ্য রোলস অফ পেরেন্টস। আরো কিছুদিন পর আমারও হয়ত ইচ্ছে হবে মা হবার। আই উইল অর্ডার মাইসেল্ফ এ চাইল্ড। ইট'স ভেরী সিম্পল। ডোন্ট টেক দ্য পিল্‌স। গেট লেইড। হ্যাভ এ চাইল্ড।'

'ইজ দ্যাট অল ?'

'ইয়েস', খুব জোর গলায় জ্যানিস বলল : 'এভরিথিং এলস ইজ ফিকশন।'

'আমি মানি না।' খুব জোরে মাথা নাড়ল পিংকি। জ্যানিসের কথাগুলো

ওকে আঘাত করছিল। কিন্তু প্রতিরোধ করার কোন অস্ত্র খুঁজে পাচ্ছিল না ও।

'বাট হোয়াই?' জ্যানিস মুচকি হাসল।

'লাইফ শুড বি মোর দ্যান দ্যাট। য়্যু ক্যান্ট জাস্ট ফাক এনিওয়ান টু অর্ডার ইয়োরসেল্ফ এ চাইল্ড। দেয়ার মাস্ট বি অ্যান ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট বিটুইন দ্য টু অফ য়্যু।'

'হাউ ডাজ দ্য চাইল্ড নো দ্য ডিফারেন্স?'

'বাট য়্যু ডু। ইজন্ট দ্যাট ইমপর্টান্ট?' পিংকি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল মনের মধ্যে কথাগুলো পাক খাচ্ছিল অনবরত। কোন খেয়াল নেই। গান শেষ হলেও একা একা নেচে যাচ্ছিল পিংকি। ডান্সফ্লোর ঘিরে অনেকেই এখন ওর দিকে তাকিয়ে।

'লেটস গো'—কাঁধে হাত রাখল ক্লিফ

হুশ ফিরতেই লজ্জা পেল পিংকি। সবাই হাঁ করে ওর দিকেই তাকিয়ে লজ্জায় হেসে ফেলল পিংকি। ক্লিফের হাতটা ধরে বলল—'হোয়াই ডিডন্ট য়্যু স্টপ মি?'

'ইচ্ছে করেনি।'

'কেন?'

'ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল সাইট। সবাই থেমে গেছে তুমি একা নেচে যাচ্ছ দেখতে খুব ভাল লাগছিল আমার। আমি কোনদিন দেখিনি এরকম।'

'তোমার কি মনে হয়েছে আমি ক্লাউন?' পিংকি হেসে ফেলল।

'নট অ্যাট অল।' তাড়াতাড়ি ক্লিফ বলল 'আমার মনে হচ্ছে তুমি অন্য মানুষ।'

'কিরকম?'

'মনে হচ্ছিল তোমার সঙ্গীত প্রয়োজন নেই, পার্টনার প্রয়োজন নেই মানুষজন কাউকে প্রয়োজন নেই।'

'দ্যাটস নট ট্রু।' মুচকি হাসল পিংকি। তারপরই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল 'চল টেবিলে ফিরে যাওয়া যাক। জ্যানিস আর টম যাক আমরা টেবিলে আগলাই।'

দূর থেকেই পিংকি দেখতে পেল টেবিলটা খালি নেই আর আরো একজন বসে আছে সেখানে। কাছে আসতেই হৈ হৈ করে উঠল জ্যানিস 'উই ওয়্যার ওয়েটিং ফর য়্যু।'

ওর চেয়ারে সিণ্ডি বসে আছে এখন। সিণ্ডির পাশেই একটি ছেলে ওরে

ভালমত দেখতে পেল না পিংকি। মুখ ঘুরিয়ে জ্যানিসকে বলল : 'খুব দেরী হয়েছে, না!'

সিণ্ডি পেছন ফিরে বলল—'দেয়ার ইজ এ সারপ্রাইজ ফর য়্যু।'

'রিয়েলি ?' অবাক হবার ভান করল পিংকি।

'লেট মি ইন্ট্রোডিউস।' জ্যানিস বাধা দিয়ে বলল : 'পিংকি, দিস ইজ নীল। আই কান্ট প্রোনাউন্স হিজ ফুল নেম। খুব শক্ত নাম। নীল, তোমার আসল নামটা বল। আই উড লাইক টু নো হাউ ইট সাউণ্ডস্।'

ছেলেটি মৃদু হেসে বলল : 'ইন্দ্রনীল সান্যাল।' পাশ ফিরে পিংকির দিকে হাত বাড়ল।

'হোয়াট ?' প্রশ্নটা ছিটকে গেল পিংকির মুখ থেকে। ইন্দ্রনীলের মুঠোয় ধরা পিংকির হাতটা একতাল মাংসপিণ্ড হয়ে গেল। এখন অবশ্য যত্ন করে ছাঁটা একগাল দাড়ি, চেহারাটা যেন আগের থেকেও সুন্দর। বড বড চোখ। কিন্তু ইন্দ্রনীল সান্যালকে চিনতে একটুও ভুল হল না ওর। ইন্দ্রনীলও খুব খুঁটিয়ে দেখছিল পিংকিকে। একদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল : 'আই হ্যাভ সিন য়্যু বিফোব।'

হাতটা সরিয়ে নিল পিংকি : 'হ্যাভ য়্যু ?'

হো হো কবে হেসে উঠল জ্যানিস . 'ওয়াচ আউট সিণ্ডি। নীল হ্যাজ সিন পিংকি বিফোর। ডোন্ট স্টিক ইয়োর বাট ইন অ্যান ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার।'

জ্যানিসের কথায় হো হো করে হেসে উঠল সবাই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টমাস—'লেটস গো ফর এ ডান্স।'

জ্যানিস বলল · 'আই ডোন্ট মাইণ্ড। হু ইজ গোইং টু কিপ দ্য টেবল ?'

কেউ কিছু বলার আগেই সিণ্ডি বলল : 'আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। নীল আর পিংকি থাক। লেট দেম টক ইণ্ডিয়ান ফর এ চেঞ্জ।'

পিংকি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সিণ্ডি বলল : 'য়্যু আর নট গোইং টু স্টিল হিম, উড য়্যু ?'

পিংকি হাসল। কিন্তু বুকের ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল ওর। এই মানুষটা ওকে আরেকটা মানুষের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমশ নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিল পিংকি। হৈ হৈ করে ইন্দ্রনীলকে ফেলে বাকি চারজন উঠে গেল। বিয়ারের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে পিংকি অন্যদিকে তাকাল।

'ছুটকি !'

সেই ডাক। কণ্ঠস্বর আগের থেকে গম্ভীর হয়েছে অনেক। নিজেকে সংযত

রাখার চেষ্টা করল পিংকি। যান্ত্রিক ভঙ্গীতে বলল—'বেগ ইয়োর পার্ডন ?'

ইন্দ্রনীলের মুখে কোন পরিবর্তন হল কিনা বুঝতে পারল না পিংকি। এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে মানুষটা আবার বলল : 'আমি জানি তুমি ছুটকি। এও জানি তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ।'

ব্যাগের ভেতর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল পিংকি। সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া উড়িয়ে বলল : 'ডাজ ইট ম্যাটার ?'

'ইয়েস ইট ডাজ। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা তোমার কাছে হয়ত দুর্ঘটনা ? কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।'

একটু অবাক হল পিংকি। কিন্তু ভাবনা গোপন করে বলল : 'সো কাইণ্ড অফ য়্যু।' বিদ্রূপটা গোপন থাকল না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল ইন্দ্রনীল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল : 'আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হাউ য়্যু ফিল। তবু আমি একবার তোমার সামনে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম।'

'আই ফিল অনারড। বলুন আমি কি করব ? উঠে দাঁড়িয়ে সেলুট করব ?' খুব ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বলল পিংকি।

'আমি কিন্তু কোন অজুহাত দিতে আসিনি। আমি জানি ইটস টু লেট ফর এভরিথিং।'

'তাহলে কেন এসেছেন ?' ধারালো গলায় প্রশ্ন করলো পিংকি—'নাকি দেখতে এসেছেন হোয়েদার আই অ্যাম রেডি ফর ইয়োর প্লেজার ?'

'না। আমি নিজেকে দেখতে এসেছি। তোমাকে নয়।'

'মানে ?'

'পালিয়েই বেড়িয়েছি এতদিন। সিণ্ডি যখন তোমার কথা বলল, আর যখন বুঝলাম তুমিই ছুটকি, আমার মনে হল তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার, অনেকবার ভেবেছি। জানি, তুমি আমাকে অপমান করতে পার, অথবা এমন কিছু করতে পার যাতে আমি লজ্জা পাব।'

'জেনে রাখলাম।' নিস্পৃহ গলায় পিংকি বলল।

'কি ?'

'আপনার লজ্জা আছে। ভয় আছে।'

'ছিল। এখন নেই। এই মুহূর্তে তুমি আমাকে অপমান কর, যা খুশি কর, বিশ্বাস কর তার জন্য আমার কিছু যায় আসে না।'

'হোয়াই শুড আই ডু দ্যাট ? হু আর য়্যু ?'

'সেখানেই আমার আপত্তি। আমাকে দেখে তোমার ঘেন্না হতে পারে, রাগ হতে পারে কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যেতে পার না। আমি যেমন আমার অন্যায়টা ভুলতে পারিনি, তুমিও আমার অন্যায়টা ভোলনি।'

'হোয়াট ইজ দ্য নেকস্‌ট স্টেজ ? কনফেশন ? আপনার কাছে সেটা সহজ।'

'কেন ?'

'য়্যু কনফেস। অ্যাণ্ড য়্যু লিভ হ্যাপিলি এভার আফটাব।'

'খানিকটা ঠিক। একটা অন্যায়ের জন্য সারা জীবন হা হুতাশ হয়ত করব না। তবে এটাও ঠিক অন্যায়েব সঠিক দায়িত্বটুকু জানার অধিকার আছে আমার।'

'যে আপনাকে সেই দাযিত্বের কথা বলতে পারত সে এখন নেই।'

'তুমি তো আছ।'

'কি করবেন শুনে ? ইট ডাজন্ট ম্যাটার এনিমোর। তাছাড়া, আমি বলতে চাই না।'

'কেন ?'

'আমি যেটা বলব সেটা আমার ফিলিং, ওর নয়।'

'যদি বলি তোমার কথাই আমি শুনতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল পিংকি। তাবপব মৃদু স্বরে বলল : 'আমার কথা আমি সবাইকে বলি না।'

'আমি সবাই নই।'

'আপনি কি মনে করেন আপনি স্পেশ্যাল ?'

'শুধু মনে করি না। বিশ্বাস কবি।'

'হোয়াই ডু য়্যু ফিল সো গ্রেট ?'

'গ্রেট নয়। স্পেশ্যাল। মাটি তোমার কাছে স্পেশ্যাল। অন্যায়টা সবায়ের নয়। তার দায়িত্ব অনেকখানি আমার। সেই অর্থে আমিও স্পেশ্যাল। আর...'

'আই হ্যাভ এ রিকোয়েস্ট টু মেক।' পিংকি বাধা দিয়ে বলল।

'বল।'

'প্লীজ, স্টপ দিস ডিসকাশন। যেদিন আপনার সাহসের পরিচয দেবার সুযোগ ছিল সেদিন এসে দাঁড়ালে আপনাকে স্পেশ্যাল ভাবতে পারতাম। আজকে এসবেব কোন মানে হয় না। য়্যু আর ওয়েস্টিং ইয়োর টাইম অ্যাণ্ড মাইন।'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না, এই তো ?'

'আই ডোন্ট হ্যাভ এ চয়েস, ডু আই ?'

ইন্দ্রনীল চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আপন মনে বলল : আমি জানি, তুমি বলতে চাও না। কিন্তু আমি শুনতে চেয়েছিলাম। শুধু আরেকটা প্রশ্ন। ইচ্ছে না হলে উত্তর দিও না।'

পিংকি ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল। কোন উত্তর দিল না।

ইন্দ্রনীল আবার বলল : 'আবার যদি কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে ?'

মানুষটার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেল পিংকি। এই মুহূর্তে ওর প্রচণ্ড রেগে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোন রাগ হলো না ওর। কি চায় ইন্দ্রনীল ? পিংকি কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে বলল : 'ডু য়্যু হ্যাভ এনি গুড রিজন ?'

'না। ভাল কোন কারণ আমার নেই। আই নিড য়্যু, য়্যু ডোন্ট !'

অনেক চেষ্টা করেও পিংকি রাগ করতে পারল না। মনে মনে অবাক হলো ও। হঠাৎ মনে হলো ওই মানুষটা যেন ভিক্ষে চাইছে ওর কাছে। কোন বিদ্রূপ, কোন অপমান ওকে স্পর্শ করছে না। পিংকি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল। দেখে মনে হয় না মানুষটা মিথ্যে কথা বলছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পিংকি হঠাৎ বলল : 'দিদিভাইকে মনে আছে আপনার, এখনো ?'

ঢোঁক গিলল ইন্দ্রনীল : 'আমার ধারণা ছিল আমি ভুলে গেছি। কিন্তু আজকে আমার সামনে তাকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম।'

চমকে উঠল পিংকি। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : 'আমি আর দিদিভাই এক নই।'

'না, তা নও। তবে আজ এতদিন পরে আমি যদি ওর সামনে এসে দাঁড়াতাম ও বোধহয় তোমার মতো করেই কথা বলতো।'

'আজ কি বলত, আপনি কি করে জানলেন ?'

'আমি পালিয়ে যাবার আগের দিন কি বলেছিল সেইটুকু জানি। ও বোধহয় জানত কিংবা বুঝতে পেরেছিল আমি পালিয়ে যাব। কিন্তু কোন অভিযোগ করেনি। ও অভিযোগ করলে আমি একটা অজুহাত দিতে পারতাম, কৈফিয়ৎ সাজাতে পারতাম,. কিন্তু ও কোন সুযোগ দেয়নি। আমি নিজের ভয়ে নিজেই পালিয়েছিলাম। আজ আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। তোমার অভিযোগ শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি সেই এক অহংকার থেকে আশ্চর্যভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে।' ইন্দ্রনীল চুপ করে গেল একসময়।

'ডিড য়্যু এভার লাভ হার ?' আজকে জেনে কোন লাভ নেই, তবু প্রশ্নটা মুখ

ফসকে বেরিয়ে এল পিংকির।

ইন্দ্রনীল সিগারেট ধরাল একটা। তারপর মৃদু স্বরে বলল : 'যাই বলি সেটা কৈফিয়তের মতো শোনাবে।'

পিংকি উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইন্দ্রনীল অস্ফুট স্বরে বলল : 'ভাবতাম ভালবাসি।'

'কেন ?' অদ্ভুত প্রশ্ন করল পিংকি। কেন একজন মানুষ আরেকজনকে ভালবাসে ?' ইন্দ্রনীল নয়, প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল পিংকি।

'জানি না।' অন্যদিকে মুখ ফেরাল ইন্দ্রনীল।

'যতই আমরা অন্যরকম বলি, প্রত্যেক ভালবাসার পেছনে একটা স্বার্থ থাকে। ডু য়্যু বিলিভ দ্যাট ?'

'খানিকটা।'

'দিদিভাই-এর কাছে কি পেতে চেয়েছিলেন আপনি ? এ পিস অফ ফ্লেশ ?' এক দৃষ্টিতে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে রইল পিংকি।

হাত নেড়ে ওয়েট্রেসকে ডাকল ইন্দ্রনীল। নিজের জন্য একটা ড্রিংক অর্ডার দিয়ে পিংকির দিকে তাকাল : 'তুমি নেবে আরেকটা ?'

'আই ডোন্ট মাইণ্ড'—পিংকি বলল।

ওয়েট্রেস চলে যেতে ইন্দ্রনীল সিগারেট ধরাল। ঘরটাতে তিল ধারণের স্থান নেই আর। স্বল্প আলোতে মানুষগুলোকে প্রায় ছায়ার মতো মনে হয়। চারিদিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজছিল ইন্দ্রনীল। পিংকি হেসে ফেলল।

চমকে পিংকির দিকে তাকাল ইন্দ্রনীল : 'হাসছ কেন ?'

'অবাক লাগছে'—মৃদু স্বরে পিংকি বলল : 'ভাবছি, এত মানুষ পৃথিবীতে। আমাদের সকলেরই হারিয়ে যাবার কথা। অথচ আপনার সঙ্গেই আবার দেখো হলো কি করে ?'

'খারাপ লাগছে ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল পিংকি। জামার ওপরের বোতামটা খুলতে খুলতে বলল : 'আপনার গরম লাগছে না ?'

ইন্দ্রনীল কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। ওয়েট্রেস গ্লাসদুটো রাখল টেবিলের ওপর। ইন্দ্রনীল দামটা দিয়ে দিল। ওয়েট্রেস চলে যেতেই পিংকি ব্যাগ থেকে দুটো ডলার বের করে এগিয়ে দিল ইন্দ্রনীলকে।

'আমি দিলে কোন ক্ষতি হবে ?' প্রশ্ন করল ইন্দ্রনীল।

'হ্যাঁ।' স্পষ্ট উত্তর দিল পিংকি।

'কি?'

'আপনি দেবেন কেন ?'

'এমনি', সহজ গলায় ইন্দ্রনীল বলল।

'আমি নিতে চাই না।' একটু চুপ করে থেকে সহজ গলায় পিংকি আবার বলল : 'আপনাকে কিন্তু আমি অপমান করতে চাইনি। আমি এই রকমই। নিতে পারি সহজে।'

'আই আন্ডারস্ট্যান্ড। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনো।' ইন্দ্রনীল স্পষ্ট গলায় বলল।

'কি ?'

'তুমি আবার দেখা করবে কিনা।'

মনে মনে আবার অবাক হল পিংকি। দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিলেও নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে মানুষটা। কেন দেখা করতে চায় ইন্দ্রনীল ? মনের ভাব গোপন করে পিংকি দৃঢ়স্বরে বলল . 'আপনার সাহস দেখে অবাক লাগছে আমার। হঠাৎ এতদিন পরে আপনার সব প্রশ্নের উত্তব দশ মিনিটেব মধ্যে পেয়ে যাবেন জানলেন কি করে ? আমারও তো অনেক প্রশ্ন আছে, আমিও সেগুলো জানতে চাই। তাছাড়া একটু আগেই তো বললাম আমি আর দিদিভাই এক নই। আপনি যে ছুটকিকে চিনতেন, আমি সে নয়। প্লীজ, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। আজকের মতো এইটেই আমাব উত্তর।'

'ঠিক আছে। পরে কোনদিন ?'

'পরে কি হবে জানি না। আই ডোন্ট বিলিভ ইন ফিউচার।' বিয়ারে আবার চুমুক দিল পিংকি।

ইন্দ্রনীল কিছু একটা বলতে যেতেই পিংকি জানিয়ে দিল : 'আপনার গার্লফ্রেন্ড আসছে।'

সত্যিই ক্যাথি আর জ্যানিস সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। পেছন পেছন টম এবং ক্লিফ। ওদিকে একবার তাকিয়ে ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি বলল : 'একটা ভুল দিয়ে মানুষের সবকিছু বিচার করো না।'

'আমি বিচার করার কে ?' পিংকি হাসল।

'তবু তোমাকেই আমি সেই ভার দিলাম।'

'কি চান আমার কাছে—সান্ত্বনা ? সহানুভূতি ?'

'না।'

'তবে ?'

'বন্ধুত্ব।'

চমকে উঠল পিংকি। চোখে মুখে রক্ত জমলো। হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না ও। হৈ হৈ করে ক্যাথিরা এসে পড়ল টেবিলের সামনে। জ্যানিস এসেই চোখ পাকিয়ে পিংকির দিকে তাকিয়ে বলল : 'ডিড য়্যু গাইজ্ বিহেভ ইয়োরসেল্ভ্স ?'

পিংকি হাসল। কোন উত্তর দিল না। ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে জ্যানিস প্রশ্ন করল : 'ডিড য়্যু ল'ইক মাই ফ্রেণ্ড !'

ইন্দ্রনীল অল্প হাসল। পিংকির দিকে আড চোখে তাকিয়ে বলল : 'ও ইয়েস। টাফ বাট ফ্যাসিনেটিং।'

'ওয়াচ আউট ক্যাথি।' জ্যানিসেব কথায় হো হো করে হেসে উঠল সবাই। ইন্দ্রনীল ক্যাথিকে বলল : 'উড য়্যু কেয়ার ফর এনাদার ডান্স ?'

'হোয়াই নট ?'

'লেটস গো।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পডল ইন্দ্রনীল। ক্যাথির হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ও।

'আই অ্যাম গোইং ফর এনাদার ড্রিংক। জ্যান, উড য়্যু লাইক ওয়ান মোর ? পিংকি ?' টমাস জানতে চাইল।

'পিংকি মাথা নাড়ল অর্থাৎ না। জ্যানিস বলল : 'আই ডোন্ট মাইণ্ড ওয়ান মোর।'

টমাস আর ক্লিফ চলে যেতে জ্যানিস বলল : 'নীল ইজ হ্যান্ডসাম। ইজন্ট হি ?'

'ইয়েস।' অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল পিংকি।

'ডিড য়্যু লাইক হিম ?'

'নো।'

'হোয়াই ?' অবাক হয় জ্যানিস।

একটু অপ্রস্তুত বোধ করল পিংকি। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : 'ইটস নট হিজ ফল্ট। দোষটা আমারই। আই জাস্ট ডোন্ট লাইক অল দ্য হ্যান্ডসাম গাইজ দ্যাট কাম মাই ওয়ে।'

চুপ করে রইল জ্যানিস। বিয়ারে চুমুক দিয়ে পিংকি আবার বলল : 'তুমি আমাকে একটা কথা বলবে ?'

'নিশ্চয়ই।' জ্যানিস পিংকির দিকেই তাকিয়েছিল।

'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ?'

'কেন বলছ এ কথা ?' জ্যানিসের মুখে হাসি।

'না, ইয়ার্কি নয়, উত্তর দাও।'

'আই ডোন্ট থিংক সো।'

'তাহলে কেন এমন হয় !'

'কি হয় ?'

'কিছু ভাল লাগে না। সব কিছুতেই একটা সন্দেহ। খালি মনে হয় আমার কিছু করার নেই। যাদেরকে ভালবাসতে চাই, পারি না। পরম শত্রুকে ঘৃণা করতে পারি না। আই ডোন্ট হ্যাভ এ উইশ। কে যেন আমার সমস্ত ইচ্ছেগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে। দু'তিন বছর আগেও ভাবতাম আমার বাবা-মাই বোধহয় আমার একমাত্র শত্রু। বাট, দে ডোন্ট ম্যাটার নাও। আমি আজকে স্বাধীন। ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই আমি করতে পারি। বাট, আই ডোন্ট হ্যাভ এ উইশ।'

'আমি একটা ওষুধ বাতলাতে পারি, জানি না তোমার পছন্দ হবে কিনা।' মুচকি হাসল জ্যানিস।

'কি ?'

এদিক ওদিক তাকিয়ে জ্যানিস মুখটা কাছে সরিয়ে এনে বলল : 'গেট লেইড মোর অফেন।'

মুখচোখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল পিংকির। জ্যানিসের মুখে কিছু আটকায় না। এই ব্যাপারগুলোতে খুব অস্বস্তিবোধ করে পিংকি। সব কথা হারিয়ে যায়। ক্যানসার আর হৃদয়ের রোগ বাদ দিলে আমেরিকায় সবচেয়ে বড় অসুখ মাথাধরার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন বা টাইলেনল, পিংকির বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য সেইরকম একটা অব্যর্থ ওষুধ বাতলে দিল জ্যানিস। পিংকি হেসে ফেলে কোনরকমে বলল—'শাট আপ।'

'ডিড য়্যু এভার ডু ইট ?' জ্যানিস খুব গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

পিংকি হেসে ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ না।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল জ্যানিসের . 'তুমি কুমারী এটা কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?'

'বিশ্বাস করা না করা তোমার ওপর।'

'অদ্ভুত।'

'কেন ?'

'আমি ভাবতেই পারি না। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম সব।' বিজ্ঞের মতো

ঘাড় নাড়ল জ্যানিস।

'কি বুঝলে ?'

'দ্য কি টু অল ইযোর প্রবলেমস্। আই নো হাউ টু সল্‌ভ ইট।'

'কি করে ?' জ্যানিসের কথা বলার ভঙ্গীতে হাসি পেল পিংকির।

'আই হ্যাভ টু গেট য়্যু এ হ্যান্ডসাম স্টাড।'

'লাভ নেই।'

'কেন ?'

'আই উইল নট লেট এনিবডি টেম মি উইদাউট টাচিং মাই সোল।' পিংকি দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলল।

'যদি অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয় ?'

'আই ডোন্ট কেয়ার। আই হ্যাভ এ লং ডিসট্যান্ট রাণার।' পিংকির মুখে হাসি। একটু থেমে বলল : 'জনও কোনদিন আমাকে সম্পূর্ণভাবে পায়নি। আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। কখনো-সখনো চুমু খেয়েছি। হি ওয়াজ ক্লোজ। বাট নট এনাফ।'

'শরীর আর মন দুটোকে গুলিয়ে ফেলছ না তো ? আমার তো মনে হয় দুটো আলাদা ব্যাপার। শরীরের একটা আলাদা চাহিদা আছে।'

'আমি দুটোকে আলাদা করতে পারি না। মে বি আই সাউন্ড স্ট্রেঞ্জ। বাট দ্যাটস দ্য ওয়ে আই অ্যাম।'

জ্যানিস কিছু বলার আগেই টমাস আর ক্লিফ এসে পৌঁছল টেবিলে। ক্যাথি আর ইন্দ্রনীল এখনো নাচছে।

ক্লিফর্ড বলল : 'গরম লাগছে না তোমাদের ?'

'খুব গরম' পিংকি উত্তর দিল।

'অ্যাণ্ড স্টাফি।' সায় দিল জ্যানিস।

'কি মতলব তোমাদের ? কি এমন গরম ? ইটস ওয়ার্স ইন ইন্ডিয়া। রাইট, পিংকি ?' টমাস অনেকখানি স্কচ ঢালল গলায়।

'গরম বেশি সেটা ঠিক। ভাল না খারাপ জানি না।'

'ওয়ান আপ' হাততালি দিল জ্যানিস।

'লেট মি আস্ক য়্যু সামথিং।' পিংকির দিকে তাকিয়ে কথা বলল টমাস। টমাসের গলা এখন একটু ভাঙা ভাঙা লাগছে। একটু বেশি জোরে বলছে টমাস। বোধহয় স্কচের মহিমা।

পিংকিরও ঘোর লাগছে একটু একটু। ভালই লাগছে। পিংকি হেসে বলল .

'আমি অপেক্ষা কবছি।'

'তুমি আব জ্যান অ্যাপার্টমেন্ট নিচ্ছ শুনলাম।' টমাস খুব শান্ত ভঙ্গীতে বলল।

জ্যানিসেব দিকে তাকালো পিংকি। জ্যানিস চোখ টিপল। পিংকি মৃদু হেসে বলল 'সেইবকমই এখনো পর্যন্ত ঠিক।'

'আব য়্যু লেসবিযানস?'

পিংকি চমকে উঠল। জ্যানিস চীৎকাব কবে উঠল শাট আপ। হোযাট দ্য হেল হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু য়্যু।'

টমাস অবাক হবাব ভান কবল। খুব শান্তভাবে জ্যানিসকে বলল 'আই ডিডন্ট ডু নাথিং। আই জাস্ট আস্কড এ সিম্পল কোযেশ্চন। সি ইজ নট এ কিড। সি ক্যান্ অ্যানসাব মি'।

'য়্যু বাস্টার্ড।' চেযাব ছেড়ে দাঁড়িযে উঠল জ্যানিস। ক্লিফ জ্যানিসকে পেছন থেকে জড়িযে ধবল। না হলে হাতেব গ্লাসটা ছুঁড়ে টমকে মেবে দিত জ্যানিস। ক্লিফর্ড ধমকে উঠল টমাসকে 'কাট ইট আউট, উইল য়্যু?'

আত্মসমর্পণেব ভঙ্গীতে দুটো হাত আকাশে তুলল টমাস। ঘবেব চাবিদিকে তাকাল পিংকি। বেশ কযেক জোড়া চোখ এখন এই টেবিলেব দিকে তাকিযে। এই মুহূর্তে লজ্জা লাগল ওব। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ কবে উঠে দাঁড়াল জ্যানিস। পিংকিব দিকে তাকিযে বলল 'আব য়্যু বেডি?'

'হ্যাঁ', পিংকি মাথা নাড়ল।

'লেটস গো। আই অ্যাম নট গোইং টু স্পেণ্ড এনাদাব মিনিট ইন দিস প্লেস।' পিংকিও উঠে দাঁড়াল। বেশ অস্বস্তি লাগছিল ওব। এই মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে বেবিয়ে যেতে খাবাপ লাগছিল। তবুও জ্যানিসেব পেছন পেছন বাস্তায বেবিযে এল পিংকি। বাইবে এসেই জ্যানিস দুহাত তুলে 'আঃ' বলে চীৎকাব কবে উঠল হঠাৎ। তাবপবই বাস্তাব ওপব বনবন কবে লাট্টুব মতো ঘুবতে শুরু কবল।

'কি হল?' জানতে চাইল পিংকি।

জ্যানিস হঠাৎ থেমে গিযে বলল 'তোমাব মনে হচ্ছে না?'

'কি?'

'ইটস সো কোযাযেট। ইটস সো প্লেজান্ট।'

হেসে ফেলল পিংকি।

'হাসলে যে।'

একটু চুপ কবে থেকে পিংকি বলল 'তুমি যখন ঘুরছিলে—এক মুহূর্তেব

জন্য আমার হঠাৎ মনে হল তুমি একটা শিশু।'

জ্যানিস গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। মাথা ঝাঁকিয়ে এলোমেলো চুলগুলোকে নিয়ে এল পুরনো জায়গায়।

'কিছু মনে করলে ?' পিংকি জানতে চাইল।

জ্যানিস মাথা নাড়ল। পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল বলে ওর মুখটা দেখতে পেল না পিংকি।

'হোয়াট ইজ ইট ?

জ্যানিস ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল। স্বল্প আলোতেও জ্যানিসের চোখের জল স্পষ্ট দেখতে পেল পিংকি। জ্যানিস কাঁদছিল। অবাক হল পিংকি। কার জন্য কাঁদছিল জ্যানিস ? টমাসেব জন্য ?

'কি হয়েছে তোমার ?' জ্যানিসের হাত ধরল পিংকি।

ম্লান হাসতে চেষ্টা করল জ্যানিস। কথা বলতে গিয়ে শব্দগুলো আটকে গেল গলায়। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে।

'ইজ ইট টমাস ?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'না।'

'ইজ ইট মি ?'

'না।'

'তবে কে ?'

'জানি না কে। ছেলে না মেয়ে তাও জানি না।'

'মানে ?'

পিংকির দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল জ্যানিস : 'আই অ্যাম প্রেগন্যান্ট।'

পিংকি চমকে উঠল। ওর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে জ্যানিস বলল : 'লেটস গো।'

গাড়িতে উঠে বেশ খানিকক্ষণ পর পিংকি বলল : 'টমাসকে বলেছ ?'

'না।'

'বলবে না ?'

'হু কেয়ারস ফর দ্যাট বাস্টার্ড ?' রেগে উঠল জ্যানিস। একটু চুপ করে থেকে বলল : 'দোষটা তো আমারই। পিল খেতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া, ইট মে নট বি টমাস।'

পিংকি শিউরে উঠল। কিছু বলার আগেই জ্যানিস আবার বলল : 'কি এসে যায় এট করে ? যারই হোক, যন্ত্রণাটা আমারই।'

'কি করবে এখন ?'

'কি আবার। আই উইল গেট রিড অফ ইট।' একটু থেমে জ্যানিস আবার বলল : 'একবার ভেবেছিলাম বাচ্চাটা হোক। ওকে মানুষ করি। তারপর ভেবে দেখেছি তা হয় না। আই অ্যাম নট রেডি ইয়েট। ইট ওনলি টেক্স নাইনটি নাইন বাক্স টু কিল। বাট, ইট টেকস থাউস্যান্ডস অফ বাকস টু রেইজ এ চাইল্ড। আই ক্যান্ট অ্যাফর্ড ইট।'

আর কোন প্রশ্ন নেই পিংকির। সব উত্তর দিয়ে দিয়েছে জ্যানিস। ওর কথা শুনে মনে হয় সব কিছু কত সহজ। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সারাটা সন্ধ্যে এক সঙ্গে কাটিয়ে জ্যানিসকে দেখে মনে হয়নি ওর কোন দুশ্চিন্তা আছে। দিদিভাই-এর কথা বাদ দিলেও নিজের কথা ভেবে শিউরে উঠল পিংকি। এই অবস্থায় জ্যানিসের মতো স্বাভাবিক ও কিছুতেই থাকতে পারত না। ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত এতক্ষণে।

'কি ভাবছ ?' মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল জ্যানিস।

দু' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পিংকি বলল : 'ভাবছিলাম আমি হলে কি করতাম।'

'কি করতে ?'

'জানি না।' চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরাল পিংকি—'খুব বিচ্ছিরি কিছু একটা করতাম।'

'কি রকম ?'

পিংকি মুখ ফিরিয়ে হাসল। জ্যানিসের কাঁধে হাত রেখে বলল : 'ওসব কথা এখন থাক।'

বাড়ির সামনে ওকে নামিয়ে দিয়ে জ্যানিস চলে গেল। ঘড়ি দেখল পিংকি। রাত একটা। ড্রাইভওয়েতে গোটা তিনেক গাড়ি দেখে পিংকি একটু অবাক হলো। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ব্যাগ হাতড়ে চাবিটা খুঁজল পিংকি। একটু অস্বস্তি হচ্ছে ওর। বাবা, মা কি এখনো জেগে ? এতগুলো গাড়ি কার ? চাবি লাগাতে হলো না। দরজাটা খোলাই ছিল। অল্প ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল পিংকি। বাড়ি ভর্তি লোক। পিংকি কিছু বলার আগেই অরবিন্দ পোদ্দার এগিয়ে এলেন : 'হ্যালো পিংকি। ভালো। জুতোটা খুল না।'

পিংকি অবাক হয়ে তাকাল। অরবিন্দ পোদ্দার কাছে এসে নীচু স্বরে বললেন : 'ঘরে অনেক লোক। চল একটু বাইরে যাই। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

পিংকি বোকার মতো তাকিয়ে থাকল। এত রাত্তিরে এরা এখানে কি করছে। অরবিন্দ কাকা ওকে বাইরে যেতে বলছে কেন? মৃদু স্বরে পিংকি বলল : 'চলুন।'

বাড়ির বাইরে এসে চারদিকে তাকাল পিংকি। একটাও মানুষ নেই রাস্তায়। বাড়িগুলো ছবির মতো পর পর সাজানো। মাঝে মাঝে উঁচু ল্যাম্পপোস্ট থেকে ফ্যাকাশে হলদে আলো ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির আওয়াজ। পিংকি কিছু ভাবতে পারছিল না।

'বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলে!' অরবিন্দ কাকার গলা।

'হ্যাঁ।'

'কে?'

প্রশ্নটা অবান্তর মনে হলো পিংকিব। মৃদু স্ববে তবুও বলল : 'জ্যানিস।'

দু' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অরবিন্দ বললেন : 'আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে যার ওপর আমাদের কোন হাত নেই।'

'মানে?' অরবিন্দ কাকার কথাগুলো হেঁয়ালীর মতো লাগছিল পিংকির।

'তোমার বাবা...' কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন অরবিন্দ।

'বাবা?' চমকে উঠল পিংকি—'বাবার কি হয়েছে?'

'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল গাড়িতে।' মুখ নীচু করলেন অরবিন্দ।

সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল পিংকির। ও চীৎকার কবে উঠল : 'হোয়াট?'

অরবিন্দ পিংকির কাঁধে হাত রাখলেন : 'হাসপাতালে ওরা অনেক চেষ্টা করেছে। কিছু করতে পারল না।'

পিংকি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবাব। মুখ থেকে কোন আওয়াজ বেরোল না ওর। কেউ যেন ওর সব কথা কেড়ে নিয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ড অসম্ভব জোরে লাফাচ্ছে। চোখে দৃষ্টি নেই। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে চিনতে পার। না পিংকি। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। নিজের গলাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে পিংকি অস্ফুট স্বরে বলল : 'আঃ।'

'তোমাকে যে কি বলে সান্ত্বনা দেব আমি জানি না। আমরা যতই টেকনোলজি, বিজ্ঞান বলে চেঁচাই, মানুষ এখনো আগের মতোই অসহায়। আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না কাউকে। যত বড় দুর্ঘটনাই হোক. মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই আমাদের। তোমায় কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। তুমিই তো একমাত্র সন্তান।' অরবিন্দ পোদ্দার চুপ

করলেন।

কয়েক মুহূর্ত পর পিংকি শান্তস্বরে প্রশ্ন করল : 'মা কোথায় ?'

একটু ইতস্তত করে অরবিন্দ বললেন : 'রত্না একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফিট হয়ে যাচ্ছিল বারবার। ডক্টর মুখার্জি ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন শকে ওরকম হয়। ঠিক হয়ে যাবে কাল। এখন ঘুমোচ্ছে। গীতা বসে আছে ওর পাশে।'

পিংকি মাতালের মতো হেঁটে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। দরজা খুলে জুতোজোড়া ছেড়ে রাখল ঘবের কোণায়। ঘরশুদ্ধ লোক বোবা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে। পিংকি ওদিকে তাকাল একবার। তারপর মুখ নীচু করে দৃঢ় পায়ে হেঁটে শোবার ঘরে ঢুকল।

বিছানা জুড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন রত্না। চুলের রাশি এলোমেলো ছড়িয়ে আছে বালিশে। চোখদুটো প্রায় বোজা। মুখটা একটু ফোলা। পিংকি মার পাশে গিযে বসল খাটের ওপর। গীতা ফিসফিস করে বললেন : 'এখন একটু ঘুম ঘুম। আমরা তো ভয়ই পেয়েছিলাম প্রথমে। প্রলয়দাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার পর আমাদেরকে ফোন করল ও। আমরা পৌঁছবার মিনিট পনেরর মধ্যেই সব শেষ। খববটা শুনে পাথরের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরছে কিন্তু দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে আবার। কোন কথা বলছে না, শুধু সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। অরবিন্দ বেরিয়ে গিয়ে ফোন করল ডক্টর মুখার্জীকে। ওষুধ খাওয়ানোর পর একটু ভাল এখন।'

পিংকি মার দিকেই তাকিয়েছিল। চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে এখনো। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে মাঝেমধ্যে। মার শাড়ির আঁচল দিয়েই চোখটা মুছে দিল পিংকি। মার কপালে হাত রাখল। একবার চোখ খুললেন রত্না। পিংকি ঝুঁকে পড়ে বলল : 'আমি মা। এই তো আমি।'

কোন উত্তব দিলেন না রত্না। শুধু সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল আরেকবার। টিপটা ধেবড়ে গিয়ে সারা কপালটা লাল। আমেরিকাতেও সিঁদুরের টিপ পরেন বত্না। বাবা কতবার ধমকেছে। কিন্তু কোন কথা শোনেননি রত্না। খালি বলতেন—'আমাব ইচ্ছা, আমি পরব।'

'তোকে চিনতে পেরেছে মনে হল।' গীতা ফিসফিস করে বললেন।

পিংকি কোন উত্তর দিল না। নিজের আঙুল দিয়ে মার আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

টক টক আওয়াজ হল দরজায়। গীতা উঠে দরজা খুললেন। অরবিন্দ আর সুনীলকাকা বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। গীতা পিংকির কাছে এসে বলল : 'ওরা একবার তোকে ডাকছে। এক মিনিট।'

মার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পিংকি। দরজাটা ভেজিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। পিংকির খুব অবাক লাগছিল। কি অদ্ভুত পরিবেশে নতুন বাড়িতে আজ এত লোক এল। সুনীল ব্যানার্জী বললেন : 'চল একটু পাশের ঘরে যাই পিংকি।'

পিংকি ধীর পায়ে পাশের ঘরে এল। দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে দিয়ে অরবিন্দ বললেন : 'এইসব কথা বলার সময় নয় এখন। তবু না বললেও হবে না।'

'বলুন।' পিংকি সোজা তাকাল।

'আমরা ফিউনারাল ডিরেক্টরকে ফোন করেছি। দেখাও করে এসেছে সুনীল। ওরা বডি রিমুভ করবে কাল সকালে। তোমাকেও একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

'যাব।' যান্ত্রিক গলায় উত্তর দিল পিংকি।

'আর'...কথা বলতে গিয়ে একটু উসখুস করলেন সুনীল ব্যানার্জি। তারপর একটু থেমে বললেন : 'বেশ টাকা পয়সা লাগবে। বড়দিকে তো জিজ্ঞাসা করা যাবে না। কোন ব্যাঙ্কে ওঁদের অ্যাকাউন্ট আছে জানো?'

'অ্যাকাউন্ট!' চমকে উঠলো পিংকি।

'এখনকার মতো অবশ্য আমরা দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু হালটা তোমাকেই ধরতে হবে শীগগিরী। এটা এমন একটা দেশ যেখানে হাজার দুঃখ, শোক সত্ত্বেও মানুষকে প্র্যাক্‌টিকাল হতে হয়। অনেক কাজ আছে সামনে। দেরী করলে চলবে না।'

মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা করে বলল : 'আমার জমানো ন'শ ডলার মতো আছে। বাবা-মার অ্যাকাউন্ট আছে বোধহয় সিটি ব্যাঙ্কে। পাসবই কোথায় আছে জানি না। কত লাগবে?'

'আরো বেশি লাগবে। কাল সকালে খুঁজে দেখো একবার। অবশ্য ফিউনারাল হোমের জন্য ভাবনা নেই। আপাতত আমরা দিয়ে দেব।'

'না।' দৃঢ় কণ্ঠে পিংকি বলল : 'আরো আছে এদিক ওদিক। প্রয়োজন হলে আমার মাইনেটা আমি অ্যাডভান্স চাইতে পারি কোম্পানী থেকে।'

'না, তা নয়। আরো অনেক ভাবনা করার আছে।' অরবিন্দ বললেন।

পিংকি তাকালো। কিছু ভাবতে পাবছিল না ও। অস্পষ্ট স্ববে বলল 'কি ?'

'প্রলযদা কোন উইল কবেছিলেন কিনা জানো ?' সুনীল মুখার্জী প্রশ্ন কবলেন।

'জানি না।'

'যত শীগগিবী হয জানতে হবে। কোনো ইনসিওবান্স আছে কিনা। কোম্পানীতে ফোন কবতে হবে। উকিলেব সঙ্গে কথা বলা। ইনসিওবান্স কোম্পানীকে জানানো। আমবা হেল্প কবতে পাবি। কিন্তু খোঁজগুলো নিতে হবে তোমাকেই। যত দুঃখই হোক, কাজগুলো ফেলে বাখলে চলবে না।' অববিন্দ চুপ কবলেন একসময।

পিংকি স্তব্ধ হযে দাঁডিযে বইল। যে মানুষটা চলে গেছে মাত্র একটুখানি আগে, এখনি তাব হিসেব-নিকেশ শুরু হযে গেল। কত বযস হযেছিল বাবাব ? পঞ্চাশ বছবেব কিছু বেশি। এতগুলো বছবেব কনট্রিবিউশন শুধু উইল, ইনসিওবান্স আব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। পঞ্চাশটা বছব ঘেঁটে আব কিছুই কি ওঁব খুঁজে দেখাব নেই। পিংকিব মাথায আগুন জ্বলছিল। তবু, নিজেকে অসম্ভব সংযত কবে বলল 'কাল সকাল থেকে খুঁজব। এখন একটু মাব কাছে যাই ?'

'আবেকটা কথা।' সুনীল ব্যানার্জী বললেন।

'বলুন।'

'তোমাব কাছে ক্যাশ টাকা আছে ?'

'আছে কিছু।'

'আবো কিছু বেখে দাও। পেছনেব পকেট থেকে ব্যাগ বেব কবলেন অববিন্দ।

'আমাব কাছে আছে। প্রয়োজন হলে চাইব।' পিংকি দৃঢ অথচ নম্র স্ববে বলল। তাবপব ম্লান হেসে অববিন্দ কাকাব দিকে তাকিযে বলল 'বাবা এই বাডিটা খুব পছন্দ কবে কিনেছিলেন। হি ডিডন্ট হ্যাভ দ্য টাইম টু এনজয ইট।' সত্যি কথা বলতে কি, প্রসঙ্গ পাল্টানোব চেষ্টা কবছিল পিংকি।

'সবই ভাগ্য। এত সুন্দব বাডি। সব কিছু ফেলে চলে গেল প্রলয়। কিই বা এমন বযস। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুনীল ব্যানার্জী। পিংকি চুপ কবে দাঁডিযে বইল। কিছুক্ষণ পব মুখ তুলে বলল 'আমি একটু মাব কাছে যাচ্ছি।'

ভোব চাবটে নাগাদ ফাঁকা হযে গেল বাডি। গীতা থেকে যেতে চেযেছিলেন। পিংকি বলল 'থেকে কি হবে ?'

'আপনারা তো সারারাত্তির জাগলেন। বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। আমি তো আছি। বরঞ্চ অরবিন্দ কাকার সঙ্গে দুপুরে আসবেন। আমি তখন ফিউনারাল হোমে যাবো।'

'একটু একটু করে অরেঞ্জ জুস দিও রত্নাকে।'

'খাবে কি?'

'চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। দাঁতে দাঁত লেগে আছে এখনো। কিছুই যাচ্ছে না ভেতরে। তবু চেষ্টা কোরো। একটু লিকুইড খাওয়ানো দরকার।'

সবাই বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে মা'র কাছে ফিরে এল পিংকি। পা থেকে শাড়ি উঠে গেছে অনেকটা। শাড়িটা নামিযে সাবধানে মা'র পা দুটো ঢেকে দিল পিংকি। পাতলা একটা চাদব চাপা দিল গায়ে। পাশে বসে অস্ফুট স্বরে ডাকল: 'মা।'

রত্না শুনতে পেলেন না। মা'র কপালে হাত বুলিয়ে দিল পিংকি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পিংকি আবার ডাকল্: 'এই মা।' রত্নার ঠোঁট দুটো কাঁপল একবার। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এল পিংকি। ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে এলো ওর নিজের ঘরে। জামাকাপড় বদলালো। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালাব সামনে এসে দাঁড়াল। অস্পষ্ট আলো ফুটছে বাইরে। পাতলা সরেব মতো মেঘের চাদরে অনেকখানি ঢাকা। মাঝে মাঝে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে নীলের টুকরো দেখা যায়। ঝিঁঝি পোকার ডাকের সঙ্গে পাখীদেব কোরাস শুনতে পেল পিংকি। দূরের পার্কটা এখন ফাঁকা। দোলনাগুলো স্থির হয়ে ঝুলছে। কেউ দোলবার নেই। গাছগুলো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। পাতাদের রঙ এখন কালো। ল্যাম্পপোস্টেব আলোগুলো এখনো জ্বলছে। রাত্তিরবেলায় যে আলোগুলো ফ্যাকাশে হলদে দেখেছিল পিংকি—এখন সেগুলোতে লালচে ছোপ লেগেছে। দূরে আকাশের গায়ে একটা প্লেন একটানা গর্জন করে উড়ে যাচ্ছে। নিজের মনে বিড় বিড় করে পিংকি বলল: 'তুমি কখন উঠবে মা? আই নিড য়্যু নাও।'

ফিউনারাল হোমে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুটো বেজে গেল। চেকবইটা সঙ্গে নিয়ে নিল পিংকি। এর মধ্যে বিছানা ছেড়ে একবারও ওঠেননি রত্না। সব শুনে অরবিন্দ পোদ্দার বললেন: 'এরকম করলে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। যেমন করে হোক ওঠাতেই হবে রত্নাকে।'

'তোমরা ঘুরে এস, আমি ততক্ষণে একটু চেষ্টা করে দেখি।' গীতা ঝুঁকে পড়ে

ডাকলেন—'রত্না, এই রত্না! একবারটি ওঠ। পিংকির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার।' কোন উত্তর দিলেন না রত্না। পিংকি আর অরবিন্দ বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অরবিন্দ বললেন : 'দুর্বল হয়ে যাবে এরকম করলে। ফেরার পথে ডক্টর মুখার্জীকে ফোন করব আরেকবার।'

বাইরের দিকে তাকিয়েছিল পিংকি। ও কোন উত্তর দিল না।

ফিউনারাল হোমের ডিরেক্টর বেশ বয়স্ক লোক। অরবিন্দকে দেখেই অফিসে নিয়ে এসে বললেন : 'হাসপাতালের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু বডি রিলিজ করার আগে কিছু ফর্ম সই করতে হবে। কে করবে? তুমি?'

'আমি।' অরবিন্দ কিছু বলার আগেই পিংকি বলে উঠল।

'তুমি কে হও?'

'মেয়ে।'

'দ্যাটস ফাইন। হাউ ওল্ড আর য়্যু?'

'আঠারো।'

গোটা তিনেক ফর্মে সই করলো পিংকি। কাগজগুলো সরিয়ে রেখে তারপর ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—'কিরকম লোক এক্সপেক্ট করছ তোমরা?'

'মানে?' অবাক হয়ে গেল পিংকি।

'তিন রকমের ঘর আছে। তিন রকমের ভাড়া। ছোট ঘর একরকম, বড় আরেকরকম। কোনরকমে কাঠের বাক্সে রাখবে তারও দাম একেকরকম। ফুলের সাজ আমাদেরকে অর্ডার দিতে পার কিংবা তুমি আলাদাও কোন ফ্লোরিস্টকে যোগাযোগ করতে পার। বাবা তো খুব প্রিয়জন। তাই অনেকে শেষ সম্মানটা খুব ধুমধাম করে করতে চায়। অবশ্য, সবই নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

রক্ত উঠে এলো পিংকির মাথায়। টাকা বেশি খরচা করলে যে বেশি সম্মান দেখানো হয় এ ব্যাপারটা হজম করতে সময় লাগল খানিকটা। একটু চুপ করে থেকে বলল : 'যেটুকু আমাকে দিতেই হবে সেটুকুই দেব। ছোট ঘর, সাধারণ কাঠের বাক্স এতেই আমার চলবে।'

'আর য়্যু সিওর?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন—'তোমার বাবা তো! সব থেকে প্রিয়জনদের মধ্যে একজন। ইট ওনলি হ্যাপেনস্ ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম।'

'প্লীজ! লেটস ন টক অ্যাবাউট ইট। আই নো, হি ডাজন্ট কেয়ার এনিমোর, ডাজ হি?' পিংকি সোজাসুজি তাকাল।

একটু বিচলিত না হয়ে ভদ্রলোক বললেন : 'অ্যাজ য়্যু উইশ।' ড্রয়ার থেকে একটা চার্ট মেলে ধরলেন পিংকির সামনে। তাতে অনেকরকমের রেট। সুন্দর ঝকঝকে চার্ট। দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল পিংকি। চার্টটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—'আমি চার্ট চাই না। কত লাগবে বল ?'

একটা ছোট ক্যালকুলেটার বের করে নানারকম অঙ্ক কষলেন ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে থেমে প্রশ্ন করলেন অনেক। কোন রঙের কাঠের বাক্স। কি ধরনের ফুল। মালা না তোড়া। তারপর, অনেক ভেবেচিন্তে একটা দাম বললেন। চমকে উঠল পিংকি। এত টাকা এক্ষুনি কোথায় পাবে পিংকি। অরবিন্দ পিংকির দিকে তাকিয়ে বললেন : 'টাকার কথা পরে ভেব। এখন হ্যাঁ করে দাও।'

ওরা বেরিয়ে আসার আগে ভদ্রলোক আবার বললেন : 'যে পোশাকটা পরবেন, সেটা নিয়ে এস। অবশ্য, আমরাও দিতে পারি পোশাক। তার জন্য আলাদা পয়সা লাগবে।' ড্রয়ার থেকে আরেকটা রেট কার্ড নিয়ে পিংকির দিকে এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

রেট কার্ডটা নিল না পিংকি। মৃদু স্বরে বলল : 'য়্যু ডোন্ট হ্যাভ দ্য কাইন্ড অফ ড্রেস আই ওয়ান্ট।'

মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক : 'দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোমস ইন টাউন। নো বডি হ্যাজ টোল্ড মি দিস।'

'আই নো।' পিংকি ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তারপর মৃদু স্বরে বলল : 'আই ওয়ান্ট অ্যান ইন্ডিয়ান ড্রেস। ধুতি অ্যান্ড পাঞ্জাবী।'

'হোয়াট কাইন্ড অফ এ ড্রেস ইজ দ্যাট ?'

'দ্য কাইণ্ড হি ইউজ্‌ড টু উয়্যার ইন ইন্ডিয়া।'

'বাট হু ইজ গোইং টু ড্রেস হিম লাইক দ্যাট ?'

'আই উইল।'

'আই ক্যান্ট অ্যালাউ য়ু টু ডু দ্যাট।'

অরবিন্দ পিংকির কাঁধে হাত রেখে নীচু স্বরে বললেন : 'মর্গ থেকে কাটা-ছেঁড়া সেলাই করা শরীর। তুমি সহ্য করতে পারবে না পিংকি।'

একটু চুপ করে থেকে পিংকি বলল : 'বাবার চলে যাওয়া যদি সহ্য করতে পারি, এটুকুও পারব অরবিন্দ কাকা।' তারপর মুখ ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে বলল : 'আই অ্যাম রেডি টু পে য়্যু এক্সট্রা মানি ফর দ্যাট। বাট আই ওয়ান্ট হিম টু গো দিস ওয়ে।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। এরকম কথা কোনদিন শুনেছেন বলে মনে

হল না। খানিকক্ষণ গজ গজ করে তারপর রাজী হলেন। গম্ভীর মুখে বললেন : 'আওয়ার ম্যান উড বি দেয়ার। শো হিম হাউ টু ডু ইট।'

'আই উইল শো হিম।' অরবিন্দ তাড়াতাড়ি বললেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে পিংকি বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়ি স্টার্ট করে অরবিন্দ প্রশ্ন করলেন : 'আমি টাকা তুলে আনব কালকে।'

'আমি আজকে খুঁজে দেখি একবার। না পেলে আপনাকে জানাবো রাত্তিরে।'

'সঙ্কোচ করো না কিন্তু।' পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লেন অরবিন্দ। একটু পরে আবার প্রশ্ন করলেন : 'তুমি গাড়ি চালাতে জান?'

'হ্যাঁ?'

'লাইসেন্স আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বাবার গাড়ি চালাইনি কোনদিন। বাবা ভয় পেত। বন্ধুদের গাড়ি চালিয়েছি অনেক।'

বাড়ি ফিরতেই গীতা বললেন : 'খাওয়াতে পারছি না কিছুতেই। মাঝখানে একবার উঠে বাথরুমে গেল। কত করে বললাম একটু দুধ খাও। অথবা একটু অরেঞ্জ জুস। কোন উত্তরই দিল না। সোজা গিয়ে শুয়ে পডল বিছানায়।'

অরবিন্দ চিন্তিত হলেন : 'তাহলে তো মুশকিল। ডক্টর মুখার্জীকে একবার ফোন করে আসি তাহলে? এরকম করলে তো নিজেই অসুখ বাধিয়ে ফেলবে।'

'আজকের দিনটা একবার চেষ্টা করি। না পারলে কাল সকালে ফোন করব।'

'তুমিও তো খাওনি কিছু কাল থেকে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে একদম। কিছু একটু মুখে দিয়ে নাও।'

'আমি ঠিক খাব গীতা কাকিমা।'

'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কত খাবে। রান্নাবান্না করতে যেও না। অরবিন্দকে দিয়ে রাত্তিরের খাবার পাঠিয়ে দেব সন্ধ্যেবেলায়।'

'কাল সকালে উঠেই ফোনগুলো করো কিন্তু।' মনে করিয়ে দিলেন অরবিন্দ।

পিংকি ঘাড় নাড়ল অর্থাৎ মনে আছে ওর।

'আমরা চলি এখন।' গীতা বললেন—'তুমি একটু মার কাছে গিয়ে বসো। মাকে বোঝাও।'

'কি বোঝাই কাকিমা?' হঠাৎ মুখ তুলে বলল পিংকি।

একটু সময় চুপ করে রইলেন গীতা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : 'তা

ঠিক। কিই বা বোঝাবে। কোন ক্ষতিপূরণ হয় না। আর, তাছাড়া বিদেশ বিভুঁয়ে মনটা যেন আরো হাঁকুপাঁকু করে এসময়। নিঃসঙ্গ লাগে।'

'আমাদের তো আপনারা আছেন।' ম্লান হাসল পিংকি : 'আপনারা না থাকলে কি যে করতাম একা একা।'

'এখানে সময় কোথায় মানুষের। সংসার সামলে, বাজার দোকান অফিস কাছারি সেরে, রান্নাবান্না করে, বাসন মেজে অন্যের দিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসৎ কই? আমরা যেন ঠিক দম দেওয়া ঝি-চাকর। দুটো বশি পয়সার জন্য সব কিছু খুইয়ে বসে আছি।' গজ গজ করে উঠলেন গীতা : 'দেশে হলে কি তোমাদেরকে এরকম একা ফেলে যেতে পারতাম।'

অরবিন্দকাকারা চলে যাবার পর সোজা বাথরুমে ঢুকল পিংকি। স্নান সেরে শোবার ঘরে এল। রত্না এখনো চোখ বুজে শুয়ে। পাশে শুয়ে মার গায়ে হাত রাখল পিংকি 'মা।'

কোন উত্তর নেই। রত্না শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। মার দিকে ভাল করে তাকাল পিংকি। একদিনেই যেন অনেক বুড়ী হয়ে গেছে মা। চুলগুলো যেন অনেক বেশি পেকে গেছে। ভাঙাচোরা গাল। পিংকির বুকের ভেতর অচেনা কিছু অনুভূতি দলা পাকিয়ে যাচ্ছিল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। অরবিন্দকাকা বলে গেলেন সামনে অনেক ভাবনা। এত কাজ, এত দায়িত্ব। খুব অসহায় বোধ করল পিংকি।

সন্ধ্যেবেলা অরবিন্দকাকা খাবার দিয়ে গেলেন। আরো অনেকে এলেন দেখা করতে। শান্তভাবে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাল পিংকি। যাবার আগে অরবিন্দ বললেন : 'কাল সকালে গীতাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। ও সারাদিন থাকবে। আজ রাত্তিরে না খেলে কাল সকালেই ডক্টর মুখার্জীকে ফোন করতে হবে। কাজগুলো ফেলে রেখ না। কোনরকম অসুবিধে হলে ফোন করবে আমাকে।'

'কিছুই খুঁজতে পারিনি এখনো। মা কথা বলেনি একটাও।' পিংকি ফিসফিস করে বলল।

পিংকির চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। কিন্তু মা'কে ফেলে খেতে পারল না পিংকি। খাবারগুলো টেবিলেই পড়ে রইল। বাইরেব ঘরে সোফায় গা এলিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল পিংকি। একটা বিরাট বোঝা যেন ওর মাথায় জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে কেউ। নিজের মনের মধ্যে শক্তি খুঁজল পিংকি। তারপর, একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

অদ্ভুত একটা গোঙানীর শব্দে পিংকির ঘুম ভাঙল অনেক রাত্তিরে। সোফা

থেকে ধড়মড় কবে উঠে বসল পিংকি। ছুটে শোবাব ঘবে এল ও। বত্না একই ভঙ্গীতে শুযে। চোখ দুটো শুধু খোলা। পিংকি ফিসফিস কবে ডাকল 'মা।'

কোন সাড়া দিলেন না বত্না।

'একা ভয লাগে মা।' অসহায বোধ কবল পিংকি।

চোখ দুটো বুজে গেল আবাব। শুধু একটা ভাবী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশল।

'মা, ক্ষিধে পেয়েছে।'

পাথবেব মতো নিশ্চল শবীব এলিয়ে বযেছে বিছানায। পিংকি ভয পেল। খাটে মাব পাশে গিযে বসল। অজানা আশঙ্কায থব থব কবে কেঁপে উঠল পিংকি। মাথাব মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। শবীবে কাঁটা দিল ওব। পাগলেব মতো মা'ব শবীবটা ধবে ঝাঁকাতে লাগল পিংকি। কযেক মুহূর্ত পব সমস্ত শক্তি দিযে গর্জন কবে উঠল পিংকি য়্যু হ্যাভ নো বাইট টু কিল মাই মাদাব।'

গভীব বাত্তিবে নিঃঝুম বাড়িতে বীভৎস শোনাল চীৎকাব। আব, তখনই রত্না চোখ খুললেন আবার।

মাব মুখটা দুহাতেব মধ্যে চেপে ধবল পিংকি। মুখেব ওপব ঝুঁকে পড়ে বলল 'তোমাব কোনো বাইট নেই, মা।'

বত্নাব চোখদুটো ঘুবল পিংকিব দিকে। ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'তোমাব একবাবও কি মনে হচ্ছে না আমি একা?'

রত্নাব গাল বেয়ে জল গড়ালো। পিংকি আবাব স্থিব কণ্ঠে বলল 'চলে যেতে চাও? বল। উত্তব দাও?'

ঠোঁটটা নড়ে উঠল আবাব। অদ্ভুত ভাঙা গলায বত্না মৃদু স্ববে বললেন 'পাবছি কই?' তাবপব, একটু দম নিয়ে আবাব ফিসফিস করে বললেন 'আমাকে দিয়ে নবক না ভোগ করালে শান্তি নেই দয়ালেব।'

'আব আমি?' পিংকি স্থিব কণ্ঠে বলল।

বত্না মেযেব দিকে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত পর স্থিব কণ্ঠে বললেন 'তুই থেকে গেলি কেন? তুইও যা।'

যন্ত্রণায মুখ বেঁকে গেল পিংকিব। ফ্যাল ফ্যাল করে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বত্নাব হাত দুটা নড়ল। শাখা-চুড়ি ঝনঝন বাজল। সেই দুটো হাত জড়িয়ে ধরল পিংকিব পিঠ। বত্নাব শবীবটা বেঁকে গেল ধনুকের মতো। দুটো আহত মানুষ পরস্পরকে আঁকড়ে ধবে রইল।...

পিংকি যখন তাকাল বাইবে তখন ফুটফুটে রোদ্দুর। পাশ ফিরে দেখল মা

নেই। পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে এল পিংকি। রত্না ওখানেও নেই। বুকটা ধড়াস করে উঠল ওর। সিঁড়ি দিয়ে অ্যাটিকের ঘরটাতে চলে এল পিংকি। ঘরময় ছড়ানো, ছেটানো প্যাকিং বাক্স। পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন রত্না। চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল। পিংকি সহজ হতে চেষ্টা করল: 'তুমি এখানে? আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

পরশু দিনও ওখানে বসে কত কথা বলছিল লোকটা। কখনো বুঝিনি যে এত তাড়াতাড়ি...'

রত্নাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পিংকি বলল: 'চা খাবে মা?'

রত্না বোধহয় মেয়ের কথা শুনতে পাননি। চুপ করে রইলেন। পিংকি লক্ষ করল মাথায় সিঁদুর নেই মা'র। এই সিঁদুর নিয়ে পিংকি কম খ্যাপায়নি রত্নাকে। ও মাঝে মাঝেই বলত: 'অত সিঁদুর মেখো না, মা, সব চুল উঠে যাবে।'

রত্না ধমকে উঠতেন: 'যাক। আমার চুল আমি বুঝব।'

আর, আজ সিঁদুর ছাড়া মা'র মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না পিংকি। ও নীচে নামতে নামতে বলল: 'আমি চা করে ডাকছি।' আসলে মা'র সামনে থেকে পালাতে চাইছিল পিংকি। অনেক কষ্টে কান্নাটাকে সামলে নিল ও।

কিছুক্ষণ পর রত্না নীচে নামলেন। টেবিলের ওপর টোস্ট আর একগ্লাস দুধটা দেখিয়ে পিংকি বলল: 'এগুলো একটু খেয়ে নাও তারপর চা।'

'সাতসকালে গিলতে ভাল লাগছে না আমার।'

'খালি পেটে চা খেলে অসুস্থ হয়ে যাবে।'

রত্না নিঃশব্দে টোস্ট দুধ সরিয়ে রাখলেন। রান্নাঘর থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে এসে বিড়বিড় করে উঠলেন: 'আমার ক্ষিধে নেই।'

'বেশ তো। আমিও খাবো না তাহলে।'

'কেন এরকম করছিস।' গজগজ করে উঠলেন রত্না: 'বলছি তো ক্ষিধে পেলে খাবো।'

পিংকি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে এসে মা'র গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল: 'অনেক কাজ আছে সামনে। তুমি ভাল না থাকলে সব কাজ আমি কি করে করব?'

'আমার কোন কাজ নেই।' আপন মনে রত্না বললেন: 'জামা-প্যান্ট ইস্ত্রীর বালাই নেই, সকালবেলা ধাক্কা দিয়ে কাউকে ওঠাতে হবে না। আমার এখন দিব্যি ছুটি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পিংকি বলল: 'অনেক টাকা লাগবে মা।

আমার কাছে নেই অত।'

এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেলেন রত্না। তারপর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে শোবার ঘর থেকে ছোট্ট একটা বাক্স নিয়ে এলেন। টেবিলের ওপর রেখে বললেন : 'সব রয়েছে এখানে। যা লাগবে নিস। আমার আর কি হবে ?'

'তুমি না খেলে আমি খাবোও না, বেরোবও না। আগে খাও। আর কিছু না হোক, দুধটা খাও।' পিংকি জেদ করল।

পিংকির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন রত্না। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন : 'আমি ঠিক খাব। না খেয়ে যাবো কোথায় ? মরবার সাহস পর্যন্ত নেই এতো অমানুষ আমি।'

সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল পিংকির। প্রথমেই অরবিন্দ কাকার বাড়িতে গিয়ে ফোন করল সব জায়গায়। তারপর ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, ফিউনারাল হোম সব কাজ সেরে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বিকেল হল পিংকির। অরবিন্দকাকা ওর আগেই এসে বসেছিলেন। পিংকি ঢুকতেই বললেন : 'কবে ঠিক করলে ফিউনারাল ?'

'কাল।' যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল পিংকির।

'আমি তাহলে ছুটি নিয়ে নি কাল। তুমি কি একা সব সামলাতে পারবে ?'

'কি আর কাজ। ওরাই তো করবে সব। আমার তো শুধু দাঁড়িয়ে থাকা কাজ। আপনি বিকেলে এলেই চলবে।'

রাত্তিরে ঘুম এল না পিংকির। ওর ঘরে ও আর শোবার ঘরে রত্না দু'জনেই জেগে শুয়ে রইল সারারাত।

পরের দিন স্নান সেরে একটা শাড়ি পরল পিংকি। ফিউনারাল হোমে পৌঁছতে পৌঁছতে এগারটা বেজে গেল। রত্না এলেন না। বললেন : 'জানব ও দূরে চলে গেছে কোথাও। আমি যাব না।' জেদ করে কোনো লাভ নেই পিংকি জানে। তাই কোনো কথা বাড়ায়নি ও। গীতা কাকীমা থেকে গেলেন রত্নার কাছে।

পিংকি বাবার দিকে তাকিয়েছিল এক দৃষ্টিতে। একটু আগেই সাজিয়ে গুছিয়ে ওরা মঞ্চের ওপর সুন্দর কাঠের বাক্সে শুইয়ে দিয়ে গেছে বাবাকে। অসম্ভব সুন্দর দেখতে লাগছে বাবাকে। কোন কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই। সুন্দর ফিটফাট, কামানো দাড়ি, পিংকির মনে হল ডাকলেই বুঝি এক্ষুনি চোখ খুলবে বাবা। পাছে আঘাত লাগে, তাই বাবার বুকে আলতো করে হাত রাখল পিংকি। একদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল . 'তুমি সুট পরতে ভালবাসতে। তবু আমি তোমাকে ধুতি

পাঞ্জাবী পরিয়ে দিলাম। তোমাকে এই পোশাকে দেখতে আমার খুব সুন্দর লাগে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পিংকি আবার বলল : 'কি করবে এখন ? আমি যদি তোমার কথা না শুনি ? তুমি আমার কথা শুনতে চাওনি কোনদিন। বলতে পার, আমার রাগ, আমার অভিমান জমেছিল অনেক। অনেক কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করত। মাঝে মাঝে ভাবতাম বলি। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভয়ে পেয়েছি তোমাকে।

'তুমি কি চেয়েছিলে ? এক এক সময় মনে হত আমাকে অকারণ অনেক শাস্তি দিয়েছ তুমি। আর, যত শাস্তি দিয়েছ তত তোমার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছি আমি। চেষ্টা করেছি তোমাকে উপেক্ষা করতে, অবহেলা করতে। নিজের মতো করে আমিও চেষ্টা করেছি তোমাকে কষ্ট দিতে। মনে আছে, বছরখানেক আগে তুমি আমার ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলে ? কপালে হাত দিতে গিয়েও সরিয়ে নিয়েছিলে হাত ? আমি কিন্তু সেদিন জেগে ছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে ছুঁলে না। তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছি। কিন্তু সাড়া দিইনি। মনে হয়েছিল আমি সাড়া দিলে লজ্জা পাবে তুমি। অথচ, আমি কিন্তু তোমার খুব কাছাকাছি ছিলাম। তুমি যা চেয়েছিলে আমি হয়ত তা হতে পারিনি। কিন্তু আমি কি হতে চাই সেটা তো জানতে চাওনি কোনদিন।' এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছিল পিংকি। কিন্তু ওর কোন খেয়াল নেই। একটু দম নিয়ে ও আবার বলল : 'আজকে এত কথা বলছি কেন জানো ? তুমি কিছু বলতে পারবে না বলে। কলেজে ভর্তি হইনি ইচ্ছে করে। হয়ত তুমি খুব বেশি চাইতে তাই। আমি ভাবতাম একদিন এই দেয়ালটা ভেঙে যাবে। আমি অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য। আর, তুমি বোধহয় ভাবতে আমি' ...।'

একটু থেমে পিংকি আবার বলল : 'আমি বাড়ি থেকে চলে যাব ভেবেছিলাম। এবারেও আটকে দিলে তুমি। কেন এত রাগ তোমার ? এত বড় শাস্তিটা না দিলেই চলছিল না ? বিশ্বাস করো, আমার বুক কাঁপছে। হোয়্যার ডু আই গো ফ্রম হিয়ার ?' কথাগুলো বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল পিংকি। তার মধ্যেই ফিসফিস করে বলল : 'যেখানেই থাক, ভাল থেকো।'

কাঁধে হাত রাখল কেউ। চমকে পেছন ফিরে তাকল পিংকি : 'টিয়া কাকিমা।'

'একটা কথা কখনো ভেবে দেখেছিস ?' টিয়া মৃদুস্বরে বলল।

পিংকি অবাক হয়ে তাকাল টিয়ার দিকে। একটু চুপ করে থেকে টিয়া বলল : 'তুই শুধু চলে যাওয়াটুকু দেখছিস। কিন্তু উপহারটা ভুলে গেলে চলবে কেন ?'

'কি উপহার ?' চমকে উঠল পিংকি।

'তোর স্বাধীনতা ?'

'আই ডিডন্ট ওয়ান্ট ইট দিস ওয়ে।' আর্তনাদ করে উঠল পিংকি।

'জানি। কিন্তু তোকে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন প্রলয়দা। তুই কি করবি ? পালিয়ে যাবি ?'

'আই অ্যাম স্কেয়ার্ড !' পিংকি শান্তস্বরে বলল।

'স্বাভাবিক। কিন্তু একবার ভয়টা কাটিয়ে উঠলে দেখবি তুই অন্য কোথাও পৌঁছে গেছিস। তোর বয়সী অনেক মেয়েই জীবনটাকে দেখতে পায় না। শুধু খাঁচা থেকে খাঁচায় ছটফট করে। জীবনকে দেখার সুযোগ ক'জনে পায় ? তুই এগিয়ে যাবি, না কাঁদবি সেটা তোর ব্যাপার।' টিয়া চুপ করল।

'রাস্তায় যা জ্যাম। বাপরে।' অরবিন্দকাকার গলার আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল পিংকি। তারপর অরবিন্দর পাশে এসে দাঁড়াল। কাছের, দূরের অনেক মানুষ এসেছিল শেষ সম্মান দিতে। ক'জনে সত্যিকারের বাবাকে শ্রদ্ধা করত বা ভালবাসত পিংকি জানে না। জন্ম আর মৃত্যু সামাজিক ব্যাপার। ভালবাসুক না বাসুক লোকে এসে পাশে দাঁড়ায়। পিংকি সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে শান্তভাবে।

হল ফাঁকা হয়ে গেল রাত ন'টা নাগাদ। পিংকি পেছন ফিরে যাকে দেখল তাকে একটুও আশা করেনি ও।

পেছনের বেঞ্চিতে চুপ করে বসে ইন্দ্রনীল পিংকির দিকেই তাকিয়েছিল। এবারে উঠে সামনের দিকে এল। পিংকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল : 'কালকেই খবর পেয়েছিলাম।'

মুখ নীচু করল পিংকি।

'জানি, তুমি বারণ করেছিলে। তাও এলাম।'

পিংকি তাকাল। কোন উত্তর দিল না। অরবিন্দ পাশে এসে দাঁড়ালেন। ইন্দ্রনীল চলে যাচ্ছিল। পিংকি হঠাৎ ডাকল : 'ইন্দ্রনীল !'

ইন্দ্রনীল ফিরে তাকাল।

পিংকি অস্ফুটস্বরে বলল : 'আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন।'

ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। মাথা নাড়ল একবার। তারপর পেছন ফিরল।...

শোবার ঘরের বিরাট বিছানার সার, পাশাপাশি শুয়েছিল। দুজনেব চোখেই ঘুম নেই। মা'র গলাটা জড়িয়ে ধরল পিংকি : 'মা।'

'উঁ' রত্না অস্ফুটস্বরে বললেন।

'আমরাও চেষ্টা করলে পারব।'

'কি ?'

'এই সব কিছু যেমন আছে তেমনি করে রাখার। আমরা ঠিক পারব। বাবা এতটা পথ পৌঁছে দিয়ে গেল আমাদের—দেখো আস্তে আস্তে ঠিক এগিয়ে যাবো আমরা।'

রত্না কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু মেয়ের আঙুলগুলো নিজের আঙুল দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন।

পরেরদিন সকালে ইচ্ছে করেই টিয়া একটু দেরী করে উঠল। ফিউনারাল হোম থেকে বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল অনেক। পিংকির মুখটা এখনো ভাসছে চোখের সামনে। একটা অদ্ভুত জেদ আছে মেয়েটার। আর, ঐ জেদটার জন্যেই ওকে ভাল লাগে। যে সব ছেলেমেয়েরা এদেশে মানুষ হয় তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছে টিয়া। এদের হাবভাব, আচার-আচরণ সব কিছুতেই স্বচ্ছ ব্যাপার আছে একটা। ওরা মেপে কথা বলতে জানে, দেশের লোকেরা যেখানে দশটা কথা বলবে ওরা হয়ত বলবে অনেক কম। লুকোচুরি নেই, যা বলতে চায় স্পষ্ট বলে ফেলবে। নিজের ছোটবেলার দিকে তাকালে হাসি পায় টিয়ার। পিংকির বয়সে ওর নিজের কোনো মতামতই ছিল না। কলেজ আর কফিহাউস—এই ছিল ওর স্বাধীনতার দৌড়।

আরো কিছুক্ষণ কুঁড়েমি করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল টিয়া। খাটের তলা থেকে সাইকেলটা বের করল টেনে। সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে হাই তুলতে তুলতে চেপে বসল। ঘুম কাটানোর অব্যর্থ ওষুধ। শুধু ঘুম কাটানো বলে নয়, আজকাল শরীরের অনেক জোর পায় খানিকটা এই জন্যেই। ঘরে বসেই আধঘণ্টা প্যাডেল করে যখন স্নান শেষ করে বেরোয় সব ক্লান্তি উধাও হয় কোথায়। অভ্যেস করতে কষ্ট হয়েছিল—এখন নেশার মতো হয়ে গেছে অনেকটা। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করতে ক্লান্ত লাগে না অতটা। মনটাও আজকাল তাজা থাকে অনেক। শরীরের সঙ্গে মনের বোধহয় কোন আত্মীয়তা আছে।

সপ্তাহখানেক ধরে মনের সঙ্গে বিরাট একটা যুদ্ধ চলছে ওর। পিংকির মতো ও নিজেও এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট চৌমাথার মোড়ে। কোনদিকে বাঁক নেবে এ নিয়ে চিন্তা করেছে অনেক। জীবনের ধাঁধাগুলো বড্ড জটিল লাগে মাঝেমাঝে। প্রত্যেকটি বিকল্পের মধ্যেই কিছু না কিছু ছেড়ে আসার ব্যাপার লুকিয়ে আছে। প্রত্যেকটা ছেড়ে আসাই বেশি-কম বেদনার। যত ভেবেছে তত জট পাকিয়ে গেছে সব। ওর জীবনে এটাই হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে অনেক। একটা রাস্তা বেছে নিতেই হবে ওকে! মনে মনে তৈরিও করেছে নিজেকে। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সব রাস্তা যেমন ছুঁয়ে থাকা যায় সেই স্বস্তিটা হারাতে বসেছে টিয়া। পিংকিকে যে কথাগুলো বলেছিল কাল রাত্তিরে সেগুলো খানিকটা ওর নিজেকেই বলা। গড়িমসি করে করে সেই সকালটা এসে গেছে আজ। আর কিছুক্ষণ পরেই ডগলাস কুপারের অফিসে মুখোমুখি বসতে হবে টিয়াকে। মিঃ কুপার খুব মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করবে—'হোয়াট ইজ ইয়োর ডিসিশন ?' আর, তখনই বাঁক নিতে হবে টিয়াকে। ভুলে যেতে হবে আর সব। এক মুহূর্তেই জীবনটা নতুন পথে চলতে শুরু করবে। তারপর, পেছিয়ে যাবার কোনা প্রশ্ন ওঠে না। হেরে যেতে লজ্জা লাগে ওর। তবু, গড়িমসি করেছে টিয়া। এখনো দুর্বলতা আছে মনে। তাই, মনের মধ্যে অনেক ভীড় নিয়ে টিয়া যাচ্ছে। খানিকটা আন্দাজ করেছে ও নিজে কি চায়! কিন্তু, পাশাপাশি আরো অনেক কিছু ওকে অস্থির করে তুলেছে ক্রমশ।

বাথরুমে ঢোকার আগে অফিসে ফোন করল টিয়া। শরীরের অজুহাত দেখিয়ে বলল ও যেতে পারবে না আজ—ভাল থাকলে কাল চেষ্টা করবে। এমনিতে কখনো কামাই করে না টিয়া। কাজেই, অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছিল ও। মিথ্যে কথা বলতে গেলেই যত রাজ্যের ভয় ওকে পেয়ে বসে। কোনোরকমে ফোনটা ছেড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল টিয়া।

বাথরুমে ঢুকেই বেসিনের ওপর নীল এয়ারলেটারটা দেখতে পেল টিয়া। শৈবালের—কলকাতা থেকে লেখা। রাত্তিরে ফিরে বাথটাবে শুয়ে অনেকবার পড়েছে চিঠিটা। কলকাতায় দু' দুটো চাকরি পেয়েছে শৈবাল। নেবে কিনা ঠিক করতে পারেনি। লিখেছে—মন ঠিক করবে এসে। এয়ার লেটারটা খুলে নীচের লাইনগুলো আরেকবার চোখ বোলালো টিয়াঃ 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা জমে আছে আমার। মাঝে মাঝেই তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার একটা ছবি থাকলে ভাল হতো। তুমি যে কতখানি অধিকার করে বসে আছ, কলকাতায়

এসে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এখানে সবাই এতো ভালবাসছে, আদর করছে যে তুমি না থাকলে নিউইয়র্কের কথা আমি দিব্যি ভুলে যেতে পারতাম।...' চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল টিয়ার। তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে চিঠিটা শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল।

টিয়া কলেজে পৌঁছল সাড়ে দশটার একটু আগেই। খুব সুন্দর দিন। শীতের আমেজ জড়ানো রোদ্দুর। গাছের পাতারা রং বদলাচ্ছে ধীরে ধীরে। হলদেটে ছোপ লেগেছে গায়ে। টিয়া মনে মনে ভাবল—সারাটা বছর এরকম থাকলে বেশ হতো। বাবা-মা এবার অনেক করে লিখেছে পুজোর সময় আসতে। এবারও যাওয়া হলো না ওর। খানিকটা ভয় লাগে দেশে যেতে। মা হয়ত বলে বসবে—এখানেই থেকে যাও। কি হবে ফিরে গিয়ে। আমাদের যা আছে, তাতে দিব্যি চলে যাবে তোমার। টিয়া ওরকমভাবে যেতে চায় না। মাকে কষ্ট দিতেও খারাপ লাগে। তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় বারবার।

প্রফেসর কুপার নিজের অফিসে ঢুকলেন ঠিক সাড়ে দশটায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়ল টিয়ার। মনের ভেতর ঝড়টা থামছে না কিছুতেই। ফোন করেছিলেন মিঃ কুপার। টেলিফোনটাকে বাঁহাত দিয়ে চেপে ডান হাতের ইঙ্গিতে টিয়াকে বসতে বললেন। ডগলাসের চেহারায় একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্য আছে। লালচে রঙ, চোখে সরু গোল্ড ফ্রেমের চশমা, মেদহীন শরীর সব মিলিয়ে একটা পরিচ্ছন্নতা প্রথমেই চোখে পড়ে। মাথা ভর্তি কাঁচা পাকা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কিছু কিছু মানুষকে দেখলে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে আবার—প্রফেসর কুপারকে দেখে প্রথমেই এই কথাটা মনে হয়েছিল টিয়ার। তাছাড়া, মানুষটার হাঁটা চলা, কথা বলা, ব্যবহার সব কিছুর মধ্যেই একটা ভিন্ন স্বাদ। এশিয়ান স্টাডিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। অথচ, ওঁর সঙ্গে কথা বলে ঔদ্ধত্যের কোন প্রকাশ কোনদিন দেখতে পায়নি টিয়া। অধিকাংশ আমেরিকান ছেলেদেরকে দেখলেই টিয়ার কিরকম বাঁদর বাঁদর মনে হয়। অকারণে বেশি কথা বলে, আচার-আচরণে এমন একটা ভাব যেন ওরাই একমাত্র জাত পৃথিবীতে। সব সময় খই ফুটছে মুখে। বড় বড় কথা শুনলে মনে হবে পৃথিবীর সব সাবজেক্টে অথরিটি। ওরা যেটুকু জানে সেটুকুই যেন পৃথিবী। বাকি সব এলেবেলে।

'হোয়াট আর য়্যু থিংকিং?'

টিয়া চমকে উঠল। ডগলাস ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিটিমিটি।

'নাথিং মাচ।' টিয়া হাসল। ভাগ্যি মনটা দেখতে পায় না কেউ।

'তুমি ভেবে এসেছ কি করবে ?' ডগলাস ওর দিকেই তাকিয়ে।

'খানিকটা।' টিয়া মৃদুস্বরে বলল : 'যত ভেবেছি ততই ভাবনাগুলো বেড়েছে। তাই, হ্যাঁ কিংবা না বলার আগে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

'আমি যেটুকু জানি তোমাকে বলতে পারি। না জানা থাকলে জেনে এসে বলব।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টিয়া বলল: 'এই সুযোগটা আমার জীবনে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না কোনদিন, সেই অর্থে বলতে পারো এই মুহূর্তে আমি সবচেয়ে সুখী মানুষ। অ্যাপ্লাই করেছিলাম এমনিই, হাজার হাজার মানুষের কত আবেদনপত্রই তো জমা পড়ছে কত জায়গায়। দু' সপ্তাহ আগে তুমি যখন বললে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার।...'

টিয়া আরো কিছু বলার আগেই ডগলাস বললেন : 'একটু বাধা দিচ্ছি তোমায়।'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি কিন্তু এখনো কোন প্রশ্ন করোনি। জানি না ঠিক কিনা, তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি ঘুরপাক খাচ্ছ চারদিকে।'

লজ্জা পেল টিয়া। ডগলাস অনুমান করেছেন ঠিক। প্রসঙ্গের কাছাকাছি আসতে ভয় পাচ্ছিল ও। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : 'সব থেকে সহজ প্রশ্নটা আগে। চাকরিটা নিলে পড়াশুনো শেষ হবে কি ? আমি পি-এইচ ডি কমপ্লিট করতে চাই।'

'তোমার তো কোর্সওয়ার্ক প্রায় শেষ'—জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ডগলাস।

'গোটা তিনেক কোর্স বাকি আছে এখনো।'

'সেটা কোন সমস্যাই নয়। ফিল্ডওয়ার্কের ওপর তুমি যাতে ক্রেডিট পাও, সেটার ব্যবস্থা আমি করব। তারপর মাঝখানে একবার এসে কোয়ালিফাইন পরীক্ষাটা দিয়ে যাবে। আর আমার কাছে থিসিস করতে যদি আপত্তি না থাকে...' মুচকি হাসলেন ডগলাস।

'না, না আপত্তি বিন্দুমাত্র নেই।'

'অনেকদিন পরে ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টের জন্য গ্র্যান্ট পেয়েছি। শেষ এইরকম একটা গ্র্যান্ট পেয়েছিলাম বছর আষ্টেক আগে।'

'এই সুযোগটা আমাকে দিলেন কেন ?' ডগলাসের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল টিয়া।

'হোয়াট ডু য়্যু মিন ?'

'বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম যে আমিই একমাত্র যোগ্য ক্যান্ডিডেট। কিন্তু আমি জানি, তা নয়। তারা কি দোষ করল ?' জানতে চাইল টিয়া।

হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক করে ডগলাস মুচকি হাসলেন—'ডাজ দ্যাট বদার য়্যু ?'

'না, তা নয়। আমি জানি না, আমার কাছে কি এক্সপেক্ট করবে তোমরা। হয়ত তোমরা যা ভাবছ তার চেয়ে আমি অনেক বেশি সাধারণ।'

'আর য়্যু নার্ভাস ?'

'খানিকটা।' ম্লান হাসল টিয়া।

'হোয়াই ? য়্যু সাউন্ডেড ভেরি কনফিডেন্ট ডিউরিং দ্য ইন্টারভিউ।'

'তোমার কি মনে হয় আমি পারব ?'

'গিভ ইট এ ট্রাই।' মৃদুস্বরে ডগলাস বললেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল টিয়া। তারপর অনুচ্চ স্বরে বলল : 'এরকম সুযোগ আমার জীবনে আর কোনদিন আসবে কিনা জানি না।' একটু থেমে আবার বলল : 'আই উইল টেক ইট।'

'কনগ্রাচুলেশনস।' হাত বাড়িয়ে দিলেন ডগলাস। টিয়ার হাতে হাত রেখে বললেন : 'আই থিংক য়্যু হ্যাভ মেড এ গুড ডিসিশন।'

'কবে যেতে হবে আমাকে ?'

'সময় খুব বেশি নেই। আগামী রবিবারের পরের রবিবার।'

'এত তাড়াতাড়ি !' চমকে উঠল টিয়া। চোখের সামনে আরেকটা মুখ ভেসে উঠল।

'অসুবিধে কিসের তোমার ?'

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল টিয়া : 'অনেক কাজ যে বাকি রয়েছে এখনো। চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে। এই অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া, জিনিসপত্র গোছানো। কাজের দিন মাত্র ন'টা। কাজ কি শেষ হবে ?'

'শেষ করব মনে করলেই হবে। কিছু সমস্যা হলে ফোন করবে আমার অফিসে। তোমার পাসপোর্ট ঠিক আছে তো ?' শুনেছি ইন্দোনেশিয়া ইজ এ ফ্যাসিনেটিং কান্ট্রি। তোমার কি মনে হয় ?'

'জানি না।' টিয়া মৃদুস্বরে বলল : 'কোনদিন যাইনি। চেনা তো দূরের কথা।' টিয়া মনে মনে ভাবল—কোন দেশই তো চিনি না।

'কাল সন্ধ্যেবেলা কি করছ ?'

ডগলাসের প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল টিয়া। আজকে কি করবে তাই জানে না। কাল অনেক দূর। মনের ভাবটা গোপন করে টিয়া বলল : 'কেন বল তো ?'

'একসঙ্গে কাল ডিনার করলে কেমন হয় ?' একটু থেমে ডগলাস আবার বললেন : 'অবশ্য তোমার যদি অন্য কোন কাজ না থাকে।'

একটু চুপ করে থেকে টিয়া হেসে বলল : 'গেটিং রেডি ইন টেন ডেজ ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক। তবে, একটা ডিনারের সময় করে নিতে পারব।'

'আমি তোমাদের দেশের খাবার খাইনি কখনো। ভাবছি, চেষ্টা করলে কেমন হয়।'

'ম্যানহাটানে যেতে হবে তাহলে। আমার কোনো অসুবিধেই নেই। আমি যেখানে কাজ করি তার কয়েক ব্লকের মধ্যেই মাঝারি গোছের রেস্টুরেন্ট আছে একটা। তুমি কখন আসতে পারবে বল।'

টেবিলের ওপবে রাখা ডায়েরিটা চোখ বুলিয়ে ডগলাস বললেন : 'ধর সাড়ে ছটা। ইজ দ্যাট টু লেট ?'

'না। ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করব।' একটা ছোট কাগজে রেস্টুরেন্টের নাম আর ঠিকানাটা লিখে দিল টিয়া।

কলেজের মেন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল ভাবছিল টিয়া। ভালমন্দ এখন আর ভেবে কোনো লাভ নেই। মিনিট দশেক আগেই ভাবনাচিন্তা সব চুকিয়ে নিয়ে এসেছে ও। দ্বন্দ্বটা থেকেই গেল। যে ভার সেই ভার। শুধু বুকের ভেতরের পাথরটা গড়িয়ে এপাশ-ওপাশ। সাত বছর আগেও টিয়ার জীবনে কোনো স্বপ্ন ছিল না। একটা পছন্দসই বর, খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য—এর চেয়ে বেশি ও কিছু চায়নি তখন। আর, আজ ! টিয়া মনে মনে হাসল। শুধু মনের মধ্যে একটা মানুষের মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে। অনেক চেষ্টা করেও ছায়াটাকে সরাতে পারছে না টিয়া। খালি মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে কুপারকে বলে আসে—'ডগলাস, আমি দুঃখিত। আমি এখানেই থাকতে চাই। ও চাকরি আমার চাই না।' টিয়া মনে মনে ভাবল—অসম্ভব ! হাজার কষ্ট হলেও এই সুযোগটা হারাতে চায় না ও। থেমে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব থেমে গেলেই এই দ্বীপ ওকে পেয়ে বসবে। অনুপের ফ্ল্যাট ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিল থেমে যাওয়ার জন্য নয়। টিয়া নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল : টাকা নয়, টাকা ছাড়তে রাজী আছি আমি, ক্ষমতা নয়। অর্থের সঙ্গে যদি ক্ষমতার আত্মিক যোগ না থাকত তাহলে এই সুযোগটা অনায়াসে ফেলে আসত ও। তবুও অনেক প্রশ্ন

বিব্রত করতে লাগল ওকে। অস্বস্তির ছায়া দীর্ঘতর হল।

বাড়িতে এসে প্রথমেই সুপারের অফিসে উঁকি মারল টিয়া। সারা অঙ্গে কালি, টেবিলের ওপর পা তুলে বিয়ার খাচ্ছিল পিট। টিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখে থতমত খেয়ে ভদ্রস্থ হয়ে বসল একটু—একগাল হেসে বলল : 'হোয়াত ক্যান আই দু ফর ইয়ং লেদি ?' জাতে গ্রীক। বছর দুয়েক হল এসেছে এ দেশে। তাই ইংরাজীতে 'ত' আর 'দ'-এর প্রাধান্য।

'দেখা যাক, কতটুকু তুমি করতে পার আমার জন্য', পরিষ্কার ইংরিজীতে কথাগুলো বলে টিয়া হাসল।

'তোমার নাম বলতে পারি।' লোকটা হাসল। নীচের পাটির দুটো দাঁত সোনার জল-বাঁধানো।

'চেষ্টা কর।'

'তায়া। ইটস সিম্পল।'

'নো। টিয়া। ইটস সিম্পলার।'

'আই ওয়াজ ক্লোজ। রাইট ?' লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসল। তারপর বলল : 'বল, কি করতে পারি তোমার জন্য ?'

'খুব সামান্য কিছু করতে পার। আমার অ্যাপার্টমেন্টটা আমি ছেড়ে দিতে চাই। কি করতে হবে বল ?'

'হোয়াই ?' উত্তেজিত হয়ে পড়ল লোকটা : 'তোমার কি অ্যাপার্টমেন্টটা পছন্দ নয় ? আরেকটা খুব সুন্দর ঘর খালি হয়েছে আট তলায়। য়্যু ক্যান সি দি এন্তায়ার সিতি ! বিউতিফুল '

'না, তা নয় ?'

'তবে ? সার্ভিস খারাপ ? কিছু খারাপ হয়ে থাকলে এক্ষুনি সারিয়ে দিচ্ছি। সুন্দরী মেয়েরা চলে যাবে এ হতেই পারে না।'

লোকটার হাত পা ছুঁড়ে কথা বলার ধরনে টিয়া হেসে ফেলে বলল : 'আমাকে এই দেশের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে।'

'কোথায় ?'

'ইন্দোনেশিয়া।'

ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে টিয়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পিট বলল : 'হোয়্যার ইজ দ্যাত ?' ইন ইন্দিয়া ?'

'না। ওটা আরেকটা দেশ।' টিয়া মুচকি হাসল : 'এখন বল আমাকে কি করতে হবে। ভাড়ার টাকা তো আগাম দেওয়া আছে—তার জন্য চিন্তা নেই

আমার। জিনিসপত্র যেগুলো আছে সেগুলো বিক্রী করে দিয়ে যেতে চাই। কি করে কবা যায়?'

'কবে যাচ্ছ?'

'দশদিনেব মধ্যে দেশ ছাড়ব।'

'মাই গদ!' আঁতকে উঠল পিট 'একেবাবেই যে সময় নেই আব।' তাবপর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা কবে বলল 'কি কি জিনিসপত্র বিক্রী কবতে চাও তার একটা লিস্ট করেছ?'

'না। একটু আগে জানতে পাবলাম যেতে হবে। সোজা তোমাব কাছে এসেছি।'

একটু চুপ কবে থেকে পিট বলল 'তুমি কি ঘবে থাকবে এখন?'

'হ্যাঁ। আছি ঘণ্টা দুযেক।'

'ঠিক আছে। আমি আধঘণ্টা পবে আসছি। একটা লিস্ট বানাতে হবে।'

'থ্যাঙ্ক য়্যু সো মাচ।'

সোনা বাঁধানো দাঁত দুটো ঝকঝক করে উঠল আবার 'বললাম না, সুন্দরী মেয়েদের ওপর আমাব একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে।'

ঘবে ঢুকেই সোজা শোবার ঘরে চলে এল টিয়া। বাবা মাকে ফোন করতে হবে একটা। হিসেব করে দেখল কলকাতায় এখন প্রায় রাত এগারটা। টিয়া ডায়াল ঘুরিয়ে অপারেটারকে নম্বর দিল। কালকে গুছিয়ে চিঠি লিখবে একটা। তবে সে চিঠি পৌঁছনোর আগেই হয়ত টিয়া রওনা হয়ে যাবে। শৈবালের সঙ্গেও যাওয়ার আগে দেখা হবে না হয়ত। সব মিলিয়ে টিয়ার কেমন ভ্যাবাচ্যাকা লাগছে।

প্রথম চেষ্টাতেই ফোনটা রিং করল কলকাতায়। স্পষ্ট বেচুর গলা শুনতে পেল টিয়া। ওপার থেকে বেচু চীৎকার করে বলল 'হ্যালো।'

অপারেটর 'প্রোটিমা'কে চাইল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বেচু বলল 'রং নাম্বার।'

টিয়া কিছু বলার আগেই কটাং করে ফোনটা কেটে দিল বেচুদা। হাসি পেল ওর। বেচুদা সেই আগের মতোই আছে। কেউ ইংরেজিতে কথা বললেই বেচুদা সটান বলে দেবে রং নাম্বার।

টিয়া অপারেটরকে আরেকবার চেষ্টা করতে বলল। ফোনটা বেজে উঠল আবার। এবার টিয়া কথা বলল. 'কে? বেচুদা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি টিয়া কথা বলছি।'

'দিদিমণি!' অবাক হয়ে গেল বেচু : 'কোথা থেকে?'

'আমেরিকা। মা কোথায়?'

'মা এই সবে শুয়েছেন। ধর, আমি ডাকছি।'

'ডিড য়্যু গেট দ্য পার্টি?' জানতে চাইল অপারেটর।

'শি উইল বি কামিং ইন এ সেকেণ্ড', মা'র গলা শোনার জন্য ছটফট করছিল টিয়া।

'হ্যালো।' প্রতিমা চীৎকার করলেন।

'মা। আমি টিয়া।'

'ইজ দিস দ্য পার্টি।' অপারেটরের গলা।

'ইয়েস।' উত্তর দিল টিয়া।

'কি বলছিস বুঝতে পারছি না। জোরে বল।' প্রতিমা চীৎকার করলেন আবার।

'তোমরা কেমন আছ?'

'তুই কেমন আছিস আগে বল।'

'আমি ভাল। তোমাদের শরীর কেমন আছে?'

'তোর বাবা একটাও কথা শোনে না আমার। ডাক্তার বারণ করেছে তবু গাদা গাদা সিগারেট খায় আর সারা রাত্তির কানের কাছে ঘং ঘং কবে কাশে। ওখানে ক'টা বাজে এখন?'

'দুপুর দেড়টা। শোনো মা, আমি আমেরিকা থেকে চলে যাচ্ছি বছর দেড়েকের জন্য।'

'চলে আসছিস?' প্রতিমা খুব খুশি হলেন : 'খুব ভাল হয়েছে। হ্যাঁগো, খুকু চলে আসছে।' ফোনের মধ্যেই স্বামীকে চীৎকার করে ডাকলেন প্রতিমা।

টিয়া অস্বস্তিবোধ করল। কি করে কথাটা বলবে বুঝতে পারল না ও।

'হ্যালো।' বাবার গলা ভেসে এল।

'বাবা, তুমি এত সিগারেট খাচ্ছ কেন?'

'তোর মা একটু বাড়িয়ে বলে সব সময়। তুই কবে আসছিস?'

দু' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টিয়া বলল : 'আমি একটা প্রজেক্ট টিমের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছি বছর দেড়েকের জন্য।'

'ও।'

'অনেক মাইনে। থাকা-টাকার খরচা সব ওরাই দেবে। এত ভালো সুযোগ

আব হযত পাবো না।'
একটু চুপ করে থেকে সমবেন্দ্র বললেন 'তুই খুশি তো?'
কি উত্তর দেবে বুঝতে পারল না টিয়া। এই সহজ প্রশ্নের কোন উত্তব ওব জানা নেই। ও চুপ করে থাকল।
'কবে যাচ্ছিস?' সমবেন্দ্র আবার বললেন।
'আগামী ববিবাবেব পবেব ববিবাব। আমি ওখানে পৌঁছে ঠিকানা দিযে দেব তোমাদেব।'
'মাব সঙ্গে কথা বল।' সমরেন্দ্রর গলাটা ভারী শোনাল একটু।
'মা।' টিযা ডাকলো। কোন সাড়া নেই। টিযা আবার ডাকল 'মা।'
একটা কথা বল তো? তুই কি দেশে আসবি না কোনদিন?' প্রতিমাব গলায বিষণ্ণতাব আভাস পেল টিযা।
আসব মা। বডদিনেব সময তোমাদের কাছে যাব। সপ্তাহ তিনেকের ছুটি আছে তখন।'
একটু চুপ কবে থেকে প্রতিমা বললেন 'কি হবে চাকরি কবে?'
'আমি নিজেব পায়ে দাঁড়াতে চাই মা।'
'বাড়িতে থেকে কি নিজের পাযে দাঁড়ানো যায না? তোর দাদা কি নিজের পাযে দাঁড়াযনি?'
'দাদা আব আমি এক নই। তুমি বেগে যেও না মা। আশীর্বাদ কব।'
কোন উত্তব নেই ওপাবে। একটু পবে সমবেন্দ্রর গলা পাওয়া গেল 'ওখানে গিযে চিঠি লিখিস তাড়াতাড়ি।'
'মা কোথায গেল?' জানতে চাইল টিয়া।
কোথায আবার! এখানেই দাঁড়িযে ভেউ ভেউ কবে কাঁদতে লেগেছে। কি আব কবাব আছে ওব।'
'আমি বডদিনেব সময় যাবো বাবা।' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল টিয়াব। তবু কোনমতে বলল 'এবাবে আমাব কাছে এসে থাকো কিছুদিন।'
'থাকবো। আগে তুই আয়।' সমরেন্দ্র আস্তে আস্তে বললেন।
আমি ছেড়ে দিচ্ছি এখন। পৌঁছেই চিঠি দেব।'
'আচ্ছা।' অনেক দূব থেকে সমরেন্দ্রব গলা ভেসে এল। তাড়াতাড়ি ফোনটা নামিয়ে বিছানাব ওপব পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল টিয়া।
পিট এল আবো কিছুক্ষণ পর। দুজনে মিলে লিস্ট বানালো একটা। জামা-কাপড, কিছু কাগজপত্র আর নিজের টুকিটাকি দু'একটা জিনিস ছাড়া কিছুই

সঙ্গে নেবে না টিয়া।

'যারা কিনবে তারা তো জিনিসগুলো দেখতে চাইবে। তুমি কখন বাড়িতে থাকবে ?'

দু' এক মুহূর্ত ভেবে টিয়া বলল : 'তোমার কাছে চাবি রাখ একটা। কেউ দেখতে চাইলে ঘর খুলে দেখিও।' অবাক হয়ে টিয়ার দিকে তাকিয়ে পিট। বিড়বিড় করে বলল : 'দ্যাটস স্ট্রেঞ্জ।'

'কেন ?'

'তুমি কি বিশ্বাস করো আমায় ? এখানে তো কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।' পিট দাঁত বের করে হাসল।

'লেটস ব্রেক দ্য রুল।' মুচকি হাসল টিয়া : 'বিক্রী করে যা পাবো তার থেকে তোমার কমিশন রেখে আমি নেব বাকিটা। ইজ দ্যাট ফেয়ার এনাফ ?'

'কমিশন ?' পিট টিয়ার দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীরভাবে বলল : 'আই ডোন্ট টেক কমিশন ফ্রম নাইস গার্লস।'

নির্লজ্জ বেহায়াপনা সত্ত্বেও লোকটাকে খুব সাধাসিধে মনে হল টিয়ার। ও গম্ভীর হয়ে বলল : 'তুমি কিছু না নিলে আমার অস্বস্তি হবে।'

পিট একটু ভাবল। তারপর একটু মাথা নেড়ে বলল : 'ওকে। বাই মি এ বটল অফ স্কচ। আই লাভ টু ড্রিংক।'

'ঠিক আছে।' ব্যাগ থেকে ঘরের চাবির একটা ডুপ্লিকেট পিটকে দিল টিয়া। বেরিয়ে যাবার আগে পিট ঘুরে দাঁড়াল। টিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল : 'ইট'স নাইস দ্যাত য়্যু আর লিভিং।'

'কেন ?' মৃদু হাসল টিয়া।

'আমি বলছি তোমায়। ইন অ্যানাদার ফিফতি ইয়ারস, দিস কান্ট্রি উইল বি এ দেজার্ট।'

পিটকে উত্তেজিত হতে দেখে বিস্মিত হল টিয়া : 'কেন ? সোনার দেশ মরুভূমি হয়ে যাবে কেন ?'

'আমাদের মতো গরীব লোকেদের জন্য কিছু নেই এদেশে।'

টিয়া চুপ করে গেল। কোন কথা না বলে ও পিটের দিকে তাকিয়ে রইল। চাবির গোছা নাচাতে নাচাতে পিট আবার বলল : 'য়্যু ডোন্ত এগ্রি উইথ মি. দু য়্যু ?'

টিয়া হাসল। দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল : 'শুধু আমেরিকা নয়, কোন দেশেই কিছু নেই তাদের জন্য।'

'তা ঠিক।' পিট ঘাড় নাড়ল : 'কিন্তু গ্রীসে থাকতে এরকম মনে হত না।'

সেটা হয়ত তোমার নিজের দেশ, তাই। চেনা পরিবেশে অনেক যন্ত্রণা সহ্য হয়ে যায়।'

পিট ঘাড় নাড়ল। কি বুঝল কে জানে। চাবির গোছা নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার আগে বলল : 'কাল সন্ধ্যেবেলা আমি তোমাকে জানাব—কিরকম কি চলছে।'

পরের আট ন'দিন চোখেমুখে অন্ধকার দেখল টিয়া। সারাদিন চাকরি, সন্ধ্যেবেলা টুকিটাকি জিনিসপত্তর কেনা, গোছানো, ইমিগ্রেশন অফিস, নতুন দেশের ভিসা, পাসপোর্ট রিনিউ করা। নীলাদ্রিদা আর পিট না থাকলে ও একা এত কাজ পেরে উঠত কিনা সন্দেহ। অফিসের পর নীলাদ্রিদা প্রায় দিন তিনেক এসেছেন। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে বাজার দোকানে গেছেন। খাট, তোষক, অন্যান্য সব ফার্নিচার বিক্রী করা, সরানো পিট প্রায় একাই সামলেছে। শনিবার বিকেলে নীলাদ্রি এলেন বনানীকে নিয়ে। ওঁরা ঘরে ঢুকতেই টিয়া বলল : 'কি বিচ্ছিরি বনানীদি! একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই যে বসতে দি।'

'তোর দাদা ঠিকই বলেছিলেন'—বনানী গম্ভীর মুখে বললেন।

'কি?' অবাক হল টিয়া।

'এরকম হাড় বের করা চেহারা। ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা বিশ্বাসই করবে না এই মেয়ে আমেরিকা থেকে এল!' ধপ করে মাটিতে বসে পড়লেন বনানী।

'খুব রোগা হয়ে গেছি?' টিয়া হাসল।

'রোগা মানে? আর কয়েকদিন এরকম চালালে নিজেই উড়ে যেতে পারবি, এরোপ্লেন লাগবে না।'

'আঃ, সেকেলে বুড়িদের মতো কথা বলো না তো। সবাইকেই যে তোমার মতো গাবদাগোবদা হতে হবে তার কি মানে আছে। একেই বলে নতুন জেনারেশনের ফিগার, বুঝেছ?' নীলাদ্রিদা ধমকে উঠলেন।

'ওর কথা বাদ দে।' বনানীদি চোখ পাকালেন : 'নতুন দেশে গিয়ে শরীরের একটু যত্ন নিবি। না নিলে ঠিক তোর বাবা মাকে লিখে দেব।'

'চিরটা কাল নালিশ করা অভ্যেস।' বিড়বিড় করে উঠলেন নীলাদ্রি।

এদের দুজনের ঝগড়া দেখে টিয়ার হাসি পেল। কারো কারো জীবনে সুখ কত সহজেই বাসা বাঁধে। কোনো দেশ, কোনো পরিবেশ বনানীদিকে বিব্রত করে না। শান্ত, পরিপূর্ণ মন। একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধতা। বনানীদির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টিয়া বলল : 'তোমার রেসিপিটা দেবে আমায়?'

'কিসের রেসিপি ?' চোখ বড় বড় করলেন বনানী।

'তোমার মতো সুখী মানুষ আমি কম দেখেছি জীবনে। কি তোমার চাবিকাঠি, বল তো ?'

'সুখ ? সুখ কোথায় দেখলি ?' চোখ কপালে তুললেন বনানী : 'তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতেই জীবনটা কাটিয়ে দিলাম।'

'এই ছোট ছোট ঝগড়াগুলোই তো সুখ।' মুচকি হাসল টিয়া—'ঝগড়া করার জন্য মনের মতো লোক ক'জনে পায় ?'

'ওয়ান ফর মি।' হাততালি দিয়ে উঠলেন নীলাদ্রি।

বনানী কিছু বলার আগেই টিয়া বলল :'একটু চা খাও আগে। তারপর তর্ক। বাসন-কোসনগুলো কি করি বল তো ?'

'ওমা। বাসন-কোসন নিয়ে যাচ্ছিস না ?'

'না। কে বইবে এত সব। তেল-কালি মাখা বাসন। ওখানে গিয়ে টুকটাক কিনে নেব দু' একটা।'

'বোকা মেয়ে !' বনানীদি ধমকে উঠলেন—'পুরোনো বাসনে রান্নার স্বাদ ভাল হয়।'

টিয়া চমকে তাকাল। কার জন্যে রান্না করবে ও। বুকের মধ্যে যে মুখটা লুকিয়ে বসে আছে সে যেন উঁকিঝুঁকি মারল আবার। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : 'দুটো পেটে পড়া নিয়ে কথা। নিজের জন্য রান্নার আবার স্বাদ।'

'কেন, আমরা কি দোষ করলাম ?' নীলাদ্রি মুচকি হাসলেন—'আজকের দিনটা তো আছে।'

লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল টিয়া : 'আমি কি স্বার্থপর দেখুন। শুধু নিজের কথা ভাবছি।'

'আচ্ছা, তোমার কি আক্কেল বিবেচনা সব লোপ পেয়েছে!' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বনানী : 'কাল মেয়েটা চলে যাচ্ছে আর আজ জুলুম শুরু করেছ।'

'কে বললে ওর ওপর জুলুম। আমি রাঁধব আজকে।'

'তাহলেই হয়েছে !' ঠোঁট উল্টোলেন বনানী : 'আজকেও তাহলে উপোস!'

'বেশ তো তুমি রাঁধ তাহলে।'

'না, আমরা কেউ রাঁধব না। তুমিও না। রেস্টুরেন্টে নিয়ে চল আমাদের। তুমি এত কিপ্টে হলে কবে থেকে ?'

'হাতী পোষার খরচ নেই!' নীলাদ্রি গম্ভীর হবার চেষ্টা করে হেসে ফেললেন।

বনানীদি চোখদুটো গোল গোল করে টিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'দেখলি কি অসভ্য। আমাকে সোজা হাতী বলে দিল।' তারপরই চোখ পাকিয়ে বললেন : 'এই হাতীর জন্যই তরে গেলে এ যাত্রা মনে থাকে যেন।'

টিয়া দেখল নীলাদ্রি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করছেন। টিয়া তাড়াতাড়ি বলল : 'রেস্টুরেন্টে গেলে আড্ডা সেরকম জমে না। তার চেয়ে কিছু চীনে খাবার আনিয়ে নিলে কেমন হয় ?'

'এতক্ষণে একটা ভালো আইডিয়া এসেছে—' নীলাদ্রি বললেন—'চা খেয়ে তোমরা বরঞ্চ জিনিসপত্তর গোছাও টুকটাক। আমি খাবার নিয়ে আসি।'

চা খেয়ে নীলাদ্রি বেরিয়ে গেলেন। সুটকেস প্রায় সবই গোছানো হয়ে গেছে। শুধু হ্যাণ্ড ব্যাগটায় নিজের জিনিসপত্রগুলো পুরে নিলেই ব্যস। পেপার পাল্পের দুর্গার মুখটা দেয়ালে ঝুলছে এখনো। ওটা নামিয়ে বনানীদির হাতে দিল টিয়া : 'এটা তুমি রাখবে বনানীদি ?'

'এত সুন্দর মূর্তি। তুই নিয়ে যা।'

'তুমি রাখ। আমি নিতে গেলে ভেঙে যাবে।'

বনানী কপালে ঠেকালেন মূর্তিটা। তারপর ফিসফিস করে বললেন : 'কি জ্বলজ্বলে মুখ। মনে হয় এক্ষুনি কথা বলবেন।' মুখ ঘুরিয়ে টিয়াকে বললেন : 'আমি রেখে দিচ্ছি। তুই ফিরে এসে নিস।'

টিয়া অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে রাখছিল একপাশে। বনানীদি এসে কখন পেছনে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি ও।

'শৈবাল কবে ফিরবে ?' শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন বনানী।

টিয়া চমকে উঠল। নিজেকে প্রাণপণে সংযত রাখার চেষ্টা করে বলল : 'আগামী সপ্তাহের শেষে।'

একটু চুপ করে থেকে বনানী আবার বললেন : 'তুই কি পালিয়ে যাচ্ছিস ?'

ঘরের মধ্যে একরাশ অন্ধকার ছড়িয়ে দিল কেউ। অনেক চেষ্টা করেও বনানীদির মুখের দিকে তাকাতে পারল না টিয়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফিসফিস করে বলল : 'দুটো অস্থির মানুষ এক জায়গায় স্থির হতে পারে না কিছুতেই।'

বনানী কোন উত্তর দিলেন না। টিয়া কয়েক মুহূর্ত পর আবার বলল : 'তোমার কি মনে হয় আমি খুব স্বার্থপর ?'

'না, তা নয়।' বনানী হাসলেন : 'কথাটা হঠাৎ মনে হলো। তুই শৈবালের কথা এত বলিস। আমি আর নীলাদ্রি ভাবতাম...' কথা শেষ না করেই চুপ করে

গেলেন বনানী।

'ঠিকই ভাবতে', টিয়া বলল কিছুক্ষণ পর : 'কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমিও ভেবেছি। বিশ্বাস করো আমার যতটুকু জোর তার অনেকখানি ওর জন্যেই।'

'তবে যে ফেলে চলে যাচ্ছিস!'

'ওর হাত ধরে নতুন করে নিরাপদ গর্তে ঢুকতে আমার ভয় লাগে।'

'মানে ?' বনানী অবাক হলেন।

'স্বার্থ দিয়ে সম্পর্কটাকে বাঁধতে আমি রাজী নই। তুমি যদি বল এটা পালানো, তবে তাই।' বনানীদির দিকে তাকিয়ে টিয়া হঠাৎ হেসে ফেলে বলল : 'বুঝলে কিছু মশাই ?'

'না।' বনানীদি হেসে ফেললেন।

'তুমি বুঝবে না। যাদের ঘরে মিলিযন ডলার, শাড়ির আঁচলে একটা তামার পয়সা বেঁধে রাখার মর্ম তারা বোঝে না। তুমি তো রানী গো বনানীদি। সব কিছু তুমি এমনিই পেয়েছ। আর আমাব ভালবাসা বলতে একটা তামার পয়সা। এটুকু শাড়ির আঁচলে বেঁধে নিয়ে আমি চললাম।'

বনানী টিয়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার হেসে ফেললেন : 'তুই বাংলা ভাষায় ইংরিজী ছবির মতো কথাবার্তা বলছিস। খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি, সবটা নয। যাই হোক, কবে ফিরবি ?'

'বছর দেড়েক পর। অবশ্য সব কিছু যদি ঠিকঠাক চলে। ভাল না লাগলে আগেও চলে আসতে পাবি। আর ভাল লেগে গেলে কি করব জানি না। অনেক ভেবেছি এতদিন—আর ভাবতে ভাল লাগে না। সময়ের ঢেউয়ে ভাসতে চাই কিছুদিন।' টিয়া হ্যাণ্ডব্যাগে জিনিস পুরছিল।

'তোর ভয় কবে না ?'

'কাকে ?' টিয়া অবাক হয়ে তাকাল।

'এই যে একা একা—।'

'আগে করত। অনুপের বাড়ি থেকে যেদিন সুটকেস নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিন করেছিল। খালি মনে হচ্ছিল অনুপ যদি নেমে এসে একবার ডাকে তাহলে ফিরে যাব। ভাগ্যিস ও ডাকেনি।'

'ডাকলে কি হতো ?'

'কি আর ?' মুচকি হাসল টিয়া : 'পোষা বেড়াল হয়ে যেতাম আবার। ভালবাসা মরে পড়ে থাকত গর্তের মধ্যে। আর আমরা দুজনে সারাটা জীবন স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে যেতাম। ব্যাগটা একটু ঠেসে ধর তো,

চেনটা লাগাতে হবে।' টিয়া মধ্যিখানে রাখল ব্যাগটা।

বনানী ব্যাগটা চেপে ধরে বললেন : 'তোর কথা শুনলে কিরকম বুক ঢিপ ঢিপ করে।'

শক্ত করে ধরে চেনটা টানল টিয়া : 'কিছু তো পেলাম। যেখানে যার কাছে পেয়েছি, তোমরা বল, শৈবাল বল, নির্লজ্জের মতো শুধু নিয়েই গেলাম। কিছু দেয়া হলো না। অবশ্য কিই বা দিতাম।'

'সব কিছু চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাস?'

'না গো।' বনানীর মুখের দিকে তাকিয়ে টিয়া হেসে ফেলল : 'তা নয়। ঋণ কখনো শোধ হয় না।'

'ওসব কথা বাদ দে তো এখন। আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছিস সেই থেকে।' ঘরের চারিদিকে চোখ বোলালেন বনানী : 'আরো তো জিনিস পড়ে রইল। ওগুলো কি হবে?'

'ওগুলো ফুটপাতে নামিয়ে দেবে পিট।'

'পিট কে?'

'এ বাড়ির সুপার। ঐ তো বিক্রী করল সব জিনিসপত্তর।'

নীলাদ্রি ভেতরে ঢুকলেন। ব্রাউন ঠোঙাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন : 'বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। গা শিরশির করে।'

'শীত ভাল লাগে না আমার। সারা বছর সামার থাকলে বেশ হয়।' বনানী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তাহলে সামারের কোন আলাদা চার্ম থাকত না।' টিয়া হাসল।

'তাহলে চার্মের জন্য বছরে দু'মাস ঠক ঠক করে কাঁপতে আমার ভাল লাগে না। বাইরে বেরোবার কথা ভাবলেই জ্বর আসে গায়ে।'

'ইন্দোনেশিয়া থেকে তোমাদের জন্য খামে পুরে আমি রোদ্দুর পাঠাব।'

'কাল তোমার ফ্লাইট কখন?'

'সন্ধ্যেবেলা।'

'আমরা বিকেল নাগাদ এসে পড়ব।' নীলাদ্রি বললেন।

'না', টিয়া মৃদুস্বরে বলল।

'কেন?' বনানী অবাক হলেন।

'আমি একটা ট্যাক্সী নিয়ে চলে যাব। তোমরা এস না। মন খারাপ লাগবে আমার! গিয়ে চিঠি দেব তোমাদের।'

'অদ্ভুত মেয়ে বাবা। সোজা বলে দিল—এস না।'

'বেশি লোককে সোজা কথা বলতে পারি না।' টিয়া হাসল।

বনানীদিরা চলে যাবার পরও অনেক রাত্তির পর্যন্ত জেগে রইল টিয়া। যে খামটায় শৈবালের নাম লিখে কুড়ি সেন্টের স্ট্যাম্প লাগিয়েছে একটু আগে, সেটা নেড়েচেড়ে দেখছিল বারবার। সব কথা বলা হল না শৈবালকে! একা একা অন্ধকার ঘরে টিয়া বুকের ভেতরের মুখটাকে আদর করল। ফিস ফিস করে বলল : 'জানি না বললে অন্যায় হবে। আমি জানি কেন যাচ্ছি। শুধু চাকরির জন্য—একথাটা যতখানি ভুল, তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি—এ ভাবনাটা তার চেয়েও বড় ভুল। অনেকেই এসব ভাববে, তুমি প্লিজ এসব ভেব না। বলতে পারো খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার নেশা।' নিজের বুকের ওপর হাত রাখল টিয়া। একটু দম নিয়ে আবার মনে মনে বলল : 'যে আহত পাখিটা খাঁচার মধ্যে ডানা ঝটপট করছিল একদিন, তুমি তাকে আকাশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলে। ইচ্ছে করলেই আকাশের লোভ দেখিয়ে তুমি তাকে আরেকটা খাঁচায় বন্দী করতে পারতে। আমার সমস্ত সত্তা, সমস্ত চেতনা দিয়ে সেই আশ্চর্য উদার মানুষটাকে আমি ভালবেসেছি। তোমাকে। প্রাত্যহিক নিয়মের চাপে তাকে খুন করতে আমি রাজী নই। নিজের নরম বুক ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে শৈবালের মুখটাকে স্পর্শ করতে চাইছিল টিয়া। একটা অদ্ভুত কষ্ট বুক ঠেলে ওপরে উঠতে চাইছিল। শরীরের প্রতিটি রোমকূপ টিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আজ। অনেকদিন আগে পাশাপাশি শুয়ে টিয়া শৈবালকে বলেছিল : 'তোমার মায়া-মমতা কম।'

'কেন?' পাশের বস্ত্রহীন আদিম মানুষ ঝুঁকে তাকিয়েছিল টিয়ার মুখের দিকে।

'আমার বুকে তোমার দাঁতের দাগ লেগে আছে এখনো।'

'কোন বুক?'

'জেনে কি করবে?'

'দেখি কোন বুক?' নির্লজ্জের মতো মানুষটা শক্ত করে চেপে ধরেছিল টিয়াকে। দাঁত বসানো বুকটা হাতের মুঠোয় নরম করে আগলে অন্য বুকটা কামড়ে ধরেছিল।

টিয়া শৈবালেব চুলগুলো মুঠো করে ধরে ওর মুখটাকে মুখের কাছে এনে বলেছিল : 'এত ছটফট করছ কেন বল তো?'

ঘামে ভেজা শৈবালের মুখটা মুহূর্তের মধ্যে রঙ পাল্টালো। পাশে শুয়ে পড়ে বলল : 'এইটুকু বুকে আমার হবে না। তোমার হৃৎপিণ্ড চাই।'

আজকে সেই হৃৎপিণ্ড শৈবালকে খুঁজছিল। অদ্ভুত একটা অনুভূতির জোয়ারে শরীরের সমস্ত ভাঁজ, সমস্ত খাঁজ ভেসে যাচ্ছিল। খালি অন্ধকার ঘরে, অদ্ভুত শহরে, একা টিয়া বুকের মধ্যে মুখটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে শিশুর মতো কুঁকড়ে শুয়ে রইল। সাত রাজার ধন এক মানিক। ছোট্ট একটা তামার পয়সা। ওর ভালবাসা।

রাত দশটায় দমদম থেকে ফ্লাইট। চন্দ্রনাথ বিকেল তিনটে থেকেই চেঁচামেচি শুরু করলেন বাড়িতে : 'কি দরকার ছিল পূরবীর শবুকে নিয়ে বেরোনোর। এতদিন গেল, প্লেনে ওঠার আগে বাজার না করলেই নয়। আজ নির্ঘাৎ প্লেন মিস করবে, বলে রাখলাম আমি।'

এমনিতেই মনমেজাজ খারাপ সর্বাণীর। তার ওপর স্বামীর অকারণ ব্যস্ততায় আরো রেগে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন : 'একটু চুপ করে থাক তো। আর, এতই যদি ভাবনা হয়, একটা ট্যাক্সী ডেকে মালপত্র নিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাক। যখন সময় হবে, আমরা ঠিক গিয়ে পৌঁছব।'

'এসব কি আর হাওড়া রুটের বাস যে প্যাসেঞ্জার না এলে ছাড়বে না। এক মিনিট এদিক ওদিক হবে না। ঠিক সময়ে আসবে, আর ঠিক সময়ে হুস করে উড়ে যাবে। একবার জ্যামে পড়লে তো হয়ে গেল এই শহরে। কুলি মাথায় মাল চাপিয়ে হেঁটে শিয়ালদা স্টেশন যাওয়া চলে, দমদম কি সোজা রাস্তা!' বিড়বিড় করে উঠলেন চন্দ্রনাথ।

সর্বাণী কোন উত্তর দিলেন না এ কথার। আপন মনে বলে উঠলেন : 'আবার চলল ছেলে। কতকাল যে আর এরকম ছন্নছাড়ার মতো একা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।'

'চাকরি নেবে কিনা বলেছে কিছু তোমাকে?' চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন।

'ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেই পার। আমার কাছে ঘুরঘুর করছ কেন?' গজগজ করে উঠলেন সর্বাণী : 'এত করে বললাম একটা বিয়ে কর। কিছুতেই কথা শুনল না। খালি এক কথা, আর কয়েকটা মাস সময় দাও মা।'

'ভালবাসা-টালবাসা হয়েছে বোধহয় কারো সঙ্গে।' চন্দ্রনাথ উদাসীন ভঙ্গীতে বললেন।

'কিছুই বলে না। খালি হাসে। অনেকদিন তো হল। এবার দেশে ফিরে এলেই পারে।' দুজোড়া চটি খবরের কাগজে মুড়ে সুটকেসের কোণায় যত্ন করে রাখলেন সর্বাণী।

'দেশে ফিরেই বা কি করবে ?'

'কেন, আর সবাই যা করছে, তাই করবে। বিয়ে থা করবে, সংসার করবে, ভাল চাকরি করবে। তুমি একটু বুঝিয়ে বল না। আমার কাছে ঘুরঘুর না করে ছেলের সঙ্গে বসে দুটো কথা বল।'

'না।' শান্তস্বরে চন্দ্রনাথ বললেন : 'ও যেখানে আনন্দে থাকবে সেখানেই থাক। মাঝে মাঝে দেখা হলেই আমি খুব খুশি। আমাদের আর কটা দিনই বা বাকি ?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

গড়িয়াহাট থেকে শৈবালকে দুটো পাঞ্জাবী কিনে দিল পূরবী। কেনাকাটা শেষ করে পল্টু, শৈবাল আর পূরবী একটা ছোটখাটো রেস্টুরেন্টে ঢুকল। একটা মিশ্র অনুভূতি শৈবালকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একদিকে যেমন পুরোনো কলকাতায় পাঁচটা সপ্তাহ স্বপ্নের মতো লেগেছে, অন্যদিকে নিউইয়র্কে ফেরার জন্যও ভেতরে ভেতরে একটা টান অনুভব করেছে ও।

'কি ভাবছিস ?' পূরবী জানতে চাইল।

'ভাবছি তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে।' ম্লান হাসল শৈবাল।

'চাকরি দুটোর কি করবে ? কিছু ঠিক করলে ?' পল্টু শৈবালের দিকে তাকিয়ে।

অন্যমনস্ক হয়ে গেল শৈবাল। একটু চুপ করে থেকে বলল : 'কি করি বল তো পূরবীদি ?'

'নিস না।'

'কেন ?' অবাক হল শৈবাল।

'তোর এখন যে ডিমাণ্ড সেটা আমেরিকার ছাপ লাগানো বলে। এখানে ফিরে এলে সে ডিমাণ্ড উড়ে যাবে। পকেটে ডলারের বদলে টাকায় তোর পেট হয়ত ভরবে, মন ভরবে না।'

'কেন আমি কি অন্যরকম হয়ে গেছি ?' শৈবাল আহত বোধ করল।

'না, তা নয়', শৈবালের হাতের ওপর হাত রাখল পূরবী : 'কলকাতায় এলে আমাদের মতো তোর মনটাও পেটের মধ্যে ঢুকে যাবে। যদি ব্যবসা-ট্যাবসা করতে পারিস সে কথা আলাদা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শৈবাল বলল : 'একবার বড়মার সঙ্গে দেখা করব।'

'মরা মানুষটাকে দেখে কি করবি ?'

'তবু দেখব।'

'ঠিক আছে।' পৃববী বলল 'তাব আগে আবেকজনেব কাছে তোকে নিযে যাব। কাছেই।'

'কে ?'

'সত্যেনকে মনে আছে তোব ? সম্ভুব বন্ধু।'

অনেক চেষ্টা কবেও নামটা মনে কবতে পাবল না শৈবাল 'কে বল তো ? নিশ্চযই দেখেছি। নামটা মনে কবতে পাবছি না।'

'ও বলল চেনে তোকে। কাল অনেক কবে বলল নিযে আসতে। যাবি ?'

'চল।'

লেকমার্কেটেব কাছে ট্যাক্সীটা ছেড়ে দিল পৃববী। ফুটপাতেব ওপব ছোট্ট ফোটোব দোকান। এক চিলতে কাউন্টাব। কোন লোক নেই ওখানে। ভেতবে বোধহয আবেকটা ঘব। কাউন্টাবেব পাশেই কালো পর্দা ঝুলছে দবজায। পৃববী জোব গলায ডাকল 'সত্যেন।'

কযেক মুহূর্ত পবে যে ছেলেটি কালো পর্দা ঠেলে বেবিযে এল তাকে দেখে চমকে উঠল শৈবাল।

'চিনতে পাবছেন ?'

'পাঁচু ?'

'তোব নাম আবাব পাঁচু হল কবে ?' পৃববী অবাক হল।

ম্লান হাসল সত্যেন 'ছিল একদিন। এখন নেই।' শৈবালেব দিকে তাকিযে সত্যেন বলল 'আপনাব চেহারা কিন্তু আগেব মতোই আছে।'

'তাই ?' মুচকি হাসল শৈবাল।

'অধিকাংশ লোককেই তো দেখি মোষেব মতো চেহাবা নিযে ফেবে।'

'তুমি কেমন আছ ?'

'কিরকম দেখছেন ?'

'এত অল্প দেখায বোঝা যায় না। আমাব বাড়িতে যেদিন এসেছিলে সেদিনও অল্প দেখেছিলাম, আজও এইটুকু দেখছি। একটু মোটা হযেছ।'

'হ্যাঁ। অল্পস্বল্প ঘি দুধ পড়ছে পেটে। খাচ্ছি, দাচ্ছি দোকান কবছি, ভালই আছি।'

'আব ?' শৈবাল একদৃষ্টিতে সত্যেনেব দিকে তাকিয়ে রইল।

শৈবালের চোখ এড়িয়ে সত্যেন পৃববীর দিকে তাকিয়ে বলল 'আমবা এখন মানুষ হযেছি, কি বল পৃববীদি ?'

'পুরো নয়।'

'কেন ?'

'এখনও তোরা ছটফট করিস।'

ম্লান হাসল সত্যেন : 'আর কয়েকটা বছর যেতে দাও। দেখবে কলকাতার সব মানুষ কিরকম ভেড়া বনে গেছে।' তারপর শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল : 'আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে না আপনার ?'

'না।' শৈবাল শান্তস্বরে বলল : 'হেরে যাওয়ার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। বিশ্বাসের আগুন না নিভলেই হল।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শৈবাল আবার বলল : 'পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?'

'পার্টি আমাদের বিশ্বাস করে না আর। তবে আগের থেকে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে শুনেছি। বিশেষত কলকাতার বাইরে।' একটু চুপ করে থেকে সত্যেন বলল : 'একটু চা খাবেন ?'

'একটু আগেই খেলাম। এবার যেতে হবে আমাদের।' পূরবী তাড়া দিল।

'পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে যান। ভাঁড়ে করে এক কাপ চা খেয়ে যান। আমেরিকায় আর যাই হোক, ভাঁড়ে চা মেলে না নিশ্চয়ই।'

'না।' শৈবাল হেসে ফেলল : 'হোক এক কাপ।'

সত্যেনের দোকানের কাছ থেকে আবার ট্যাকসি নিল ওরা। পূরবীদির বাড়িতে শুধু বড়মা। কমলাকে বড়মার কাছে রেখে বড়দা জ্যাঠা শৈবালের বাড়ির দিকেই গেছেন একটু আগে। শোবার ঘরের জানলার সামনে একটা চেয়ারে বড়মা চুপ করে বসেছিলেন। শৈবাল সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ডাকল : 'বড়মা।'

কোনো উত্তর দিলেন না বড়মা। একদৃষ্টিতে সামনের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। পূরবীদি বড়মার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল : 'মা, শবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ও ফিরে যাচ্ছে।'

শৈবাল প্রণাম করল বড়মাকে। বড়মার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ফিসফিস করে বলল : 'আমার সঙ্গে আমেরিকা চল-না বড়মা!'

বড়মা একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ শৈবালের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললেন। কালো অন্ধকার ঘরে আলো ফুটল। শৈবাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বড়মার মুখের দিকে।

'এরপর দেরী হয়ে যাবে।' পূরবীদি মৃদু স্বরে বলল : 'চল।'

বাড়িতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে পল্টুকে তেড়ে উঠলেন চন্দ্রনাথ : 'তোদের

কোন আক্কেল বিবেচনা নেই। এতটা দূরের পথ যেতে হবে। টং টং করে সারাটা দিন ঘোরালি ওকে।'

বাবার ব্যবস্থা দেখে শৈবালের হাসি পেল : 'এখনো তো চারঘণ্টা বাকি বাবা!'

চন্দ্রনাথ বললেন : 'আমার আর কি! তোর মা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

মুখ টিপে হাসল পূরবীদি। শৈবাল শোবার ঘরে এসে দেখল মা চুপ করে বসে আছে খাটের ওপর। মার পাশে বসে শৈবাল বলল : 'তুমি রাগ করেছ?'

'না।' সর্বাণী আস্তে আস্তে বললেন।

শৈবাল লক্ষ করল সর্বাণীর চোখ দুটো ভেজা। শৈবাল মার গায়ে হাত রেখে বলল : 'তুমি আবার কেঁদেছ! বললাম যে নো কান্না।'

সর্বাণী কোন উত্তর দিলেন না। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন : 'একটা সত্যি কথা বল তো?'

'কি?'

'তুই কি ফিরবি কোনদিন?'

শৈবাল হেসে ফেলল। 'এই জন্যে কাঁদছিলে?'

'না, সত্যি করে বল।'

'আমি দিনরাত ভাবছি মা।' শৈবাল মনে মনে উত্তর খুঁজছিল। কোনটা সত্যি ও নিজেও জানে না। কলকাতা ফেলে যেতে ওর কষ্ট হচ্ছে ঠিকই কিন্তু একটা অদৃশ্য সুতো যেন বাঁধা আছে ওপারে। শৈবাল কি করবে? কি করে সত্যি কথা বলবে মাকে। কি করে বোঝাবে কয়েকটা বছরে অদ্ভুত আরেকটা শেকড় নিজের অজান্তেই বাসা বেঁধেছে ওর মনে। টিয়া? না, শুধু টিয়া নয়। ঐ দেশটাও ওকে টানছে। যেখানে প্রত্যেকটি মুহূর্ত ওর কাছে মনে হতো নির্বাসিন, এখন কেন আবার সেখানে ফিরে যেতে লোভ হয়। কি করে মাকে বোঝায় শৈবাল। নির্বাসিন ওর মনে—কোন দেশ এর জন্য দায়ী নয়।

'জয়ন্ত এসেছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে। কিছুক্ষণ বসে গল্পটল্প করে চলে গেল।'

'তোমার কি মনে হয় আমি বদলে গেছি?'

'কে বলল?' সর্বাণী অবাক হলেন।

'কেউ যে বলেছে তা নয়।' শৈবাল অন্যমনস্ক সুরে বলল : 'তোমার মনে আছে, এমন একটা সময় ছিল আমি দিনরাত জয়ন্তর বাড়িতে পড়ে থাকতাম? তুমি মাঝে মাঝে বলতে ওদের বাড়িতে থাকলেই পারিস। বাড়ি ফেরার আর কি

দরকার।'

'হ্যাঁ'—সর্বাণী হেসে ফেললেন।

'এই কয়েক বছরে আমিই বোধহয় পাল্টে গেছি। তা না হলে ওদেরকে আজ দূরের মানুষ মনে হয় কেন ? ওদের বাড়িতে গিয়ে বাববার মনে হচ্ছিল আমি অনেক দূরের অতিথি। অনেক যত্ন করছিল জয়ন্ত আর প্রমীলা। আর, আমি সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। কেন এরকম হয় জানি না।'

'ওদেরকে দোষ দিলে চলবে কেন ? তুইই বা কতটুকু সম্পর্ক রেখেছিস ওদের সঙ্গে ?' সর্বাণী হেসে বললেন।

'সেখানেই আমার আপত্তি মা। আমি ভাবতাম বন্ধুরা বন্ধুই। যোগাযোগ থাক আর নাই থাক। ওদেশে গিয়ে এক মুহূর্তেব জন্যও আমি ওদের ভুলিনি। অথচ, আমরা সবাই এখন আলাদা আলাদা দ্বীপ।'

চন্দ্রনাথ আবার তাড়া দিলেন : 'এখুনি না বেরোলে প্লেন মিস করবে কিন্তু।'

'কি খাবি ?' সর্বাণী প্রশ্ন করলেন।

'তুমি যা রান্না করেছ সব।'

সর্বাণী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। বারান্দায় মা'র গলা পেল শৈবাল : 'পুষ্প, একটা আসন পেতে দে। দাদাবাবু খাবে।'

শৈবাল একা বসে রইল ঘরে। চলে যাবাব ব্যাপারটা খুব বিশ্রী। মাথাব ভেতব একগাদা ভাবনা শৈবালকে অস্থির করে তুলছিল।

বেরোনোর ঠিক আগে আগেই আলো নিভল। চন্দ্রনাথ চীৎকার করে উঠলেন—'যাঃ। ওবে লণ্ঠন জ্বালা শিগগীর।'

অন্ধকারে কাউকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না শৈবাল। দুটো ট্যাক্সি করে ওরা রওনা হল এয়ারপোর্টের দিকে। অন্ধকারে নিজের বাড়িটাকেও ভাল করে চিনতে পারল না শৈবাল। ট্যাক্সি ছাড়ার আগে সর্বাণী বিড়বিড় করে বললেন . 'দুর্গা, দুর্গা।'

ডিপার্চার গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে চন্দ্রনাথ বললেন : 'পৌঁছে টেলিগ্রাম করো।'

'ফোন করব।'

সর্বাণী কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু বোবার মত তাকিয়ে রইলেন শৈবালের দিকে। ভেতরে চলে যেতে যেতে অনেকবার ঘুরে তাকাল শৈবাল। কয়েকটা মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইরে। শৈবাল ঢুকে গেল ভেতরে।

জন এফ কেনেডীতে প্লেন নামল বিকেল চারটেয়। বেরোতে বেরোতে প্রায় পৌনে পাঁচটা। সঞ্জয় আর ইন্দ্রনীল এসেছিল এয়ারপোর্টে।

'কি ব্যাপার, তোমরা?' অবাক হলো শৈবাল।

'পুরোনো গাড়ি কিনেছি একটা, ভাবলাম সারপ্রাইজ দেয়া যাক।' সঞ্জয় হাসল।

শৈবাল মুখ ফিরিয়ে লাউঞ্জের চারিদিক খুঁজছিল।

'কাউকে খুঁজছো?'

'না।' দীর্ঘশ্বাস চেপে শৈবাল বলল: 'কে আর আসবে? তোমরা আসবে তাও ভাবিনি।'

'জ্যাকেট কোথায়?' ইন্দ্রনীল প্রশ্ন করল।

'সুটকেসে। কেন?'

'বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে কিন্তু।'

'এইটুকু তো রাস্তা। বুক চেপে পেরিয়ে যাব। চল।' শৈবাল এগোল।

এয়ারপোর্ট ছেড়ে ভ্যান ওয়াইক এক্সপ্রেস ধরে গাড়ি চলছিল। বাইরের দিকে তাকিয়েছিল শৈবাল। শহরটাকে খুব চেনা চেনা লাগছিল। একটা সিগারেট ধরাল শৈবাল।

'কেমন লাগল কলকাতা?'

'দারুণ।'

'মানুষজন?'

একটু চুপ করে থেকে শৈবাল বলল: 'সব কিছু সেইরকমই। যেরকম দেখে এসেছিলাম ঠিক সেইরকম। তবে...'

একটু ইতস্তত করে শৈবাল বলল: 'আমি বোধহয় বদলে গেছি।'

'মানে?' সঞ্জয় অবাক হল।

মৃদু হেসে শৈবাল বলল: 'মানেটা আমিও খুঁজছি সঞ্জয়।'

'জিনিসপত্রের দাম?' ইন্দ্রনীল পেছন থেকে বলল।

'আমাদের গায়ে লাগবে না। পকেটে ডলার থাকলে চেটেপুটে খাওয়া যায়।'

'ইন্টারভিউ দিয়েছো?' সঞ্জয় প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। চাকরিও পেয়েছি দুটো।'

'চলে যাচ্ছো তাহলে?'

'তুমি হলে কি করতে?' পাল্টা প্রশ্ন করল শৈবাল।

'আগে একলাখ ডলার জমুক, তারপর ভাবব। তখনও যদি ফিরে যাবার টান

থাকে, যাব। ডলারের সুদে দেশে বসে চেটেপুটে খাব বুড়ো বয়সে। এখন সবে সেভিংস অ্যাকাউন্টে ন'শ পঞ্চাশ।'

'যৌবনটাকে বাজী রাখতে ভয় লাগে না?'

'কিসের ভয় শৈবালদা? দেশে থেকে প্রথম যৌবনে কিছুই পাইনি যে হারাবার ভয় থাকে। সম্পদ বলতে ছিল না-থাকার অহংকার। সেই অহংকারের প্রতিধ্বনি বেশি, শব্দ কম।'

'বাঃ। সুন্দর বলেছ কথাটা।' শৈবাল হাসল: 'শুনতে ভাল না লাগলেও কথাটার মধ্যে কোথাও এক টুকরো সত্যি লুকিয়ে আছে। দেশের জন্য মন কেমন করাটা বোধহয় আসলে সেই শূন্য অহংকারের প্রতিধ্বনি। সব কিছু ফেলে দিয়ে শূন্য থেকে শুরু করার মধ্যে একধরনের মনগড়া গৌরব আছে—যুক্তি হয়ত নেই।'

'তুমি কি করবে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শৈবাল বলল: নিজেকে প্রশ্ন করতে ভয় লাগছে এখন। নিজের উত্তরটা হয়ত আমার অহংকারকে আঘাত করবে। মন কেমন করাটুকু থাক। ধীরেসুস্থে ভাবব।'

'বাইরে কিছু খেয়ে নেবেন নাকি?' ইন্দ্রনীল প্রশ্ন করল।

'আইডিয়াটা মন্দ নয়। ক্ষিধে অবশ্য খুব একটা নেই—তবু ছোটখাট কিছু চলতে পারে।'

বাড়ির কাছেই একটা ম্যাকডোনাল্ডের সামনে গাড়ি দাঁড় করালো সঞ্জয়।

'অনেকদিন পর দেখলাম।' শৈবাল অন্যমনস্ক সুরে বলল।

'কি?'

'ম্যাকডোনাল্ড।'

'কিরকম লাগছে?'

'ভালই। ঝকঝকে।'

'কথাগুলো প্রাণহীন শোনাচ্ছে কিন্তু।' ইন্দ্রনীল হাসল।

শৈবালও ম্লান হাসল: 'অন্ধকার থেকে এলে আলো সহ্য হতে সময় লাগে।' কলকাতার অন্ধকার বাড়িটার কথা মনে পড়ল ওর।

ম্যাকডোনাল্ড থেকে বেরিয়ে শীত শীত লাগল শৈবালের। জড়োসড়ো হয়ে সঞ্জয়ের পাশের সীটে বসল ও।

'আজ কিছু জিনিসপত্তর কিনে নেবেন তো?' সঞ্জয় প্রশ্ন করল।

'কি বল তো?' শৈবাল অবাক হল।

'চা, চিনি, দুধ—কিছু আছে ঘরে ?'

'না।' লজ্জা পেল শৈবাল। তাড়াতাড়ি বলল : 'একটা ছোট দুধ নিই। আপাতত চা হলেই চলবে। পরে দেখা যাবে।' কলকাতার ঘোর কাটেনি এখনো। শৈবাল মনে মনে হাসল।

চিঠির বাক্সে একরাশ কাগজপত্রর গাদাগাদি। দু'তিনটি চিঠিও রয়েছে মনে হল। সবাই মিলে শৈবালের ঘরে এল ওরা। ঘর খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ পেল শৈবাল। অন্ধকার ঘরে দেয়াল হাতড়ে লাইট জ্বালাল ও। মালপত্তরগুলো কার্পেটের ওপর রেখেই সঞ্জয় বলল : 'জানালাগুলো খুলে দি শৈবালদা। মরা বাতাসগুলো বেরিয়ে যাক।'

শৈবাল চমকে উঠল—মরা বাতাস ! থেকে থেকে অদ্ভুত সব কথা বলে ছেলেটা। শৈবাল হেসে বলল : 'চা হবে নাকি একটু ?'

ইন্দ্রনীল রান্নাঘরের দিকে এগোল : 'আমি জলটা বসাই।'

'বসাও।' শৈবাল হেসে উঠল : 'কলকাতার আরামটা চলুক আরো কয়েক মিনিট।' শৈবাল শোবার ঘরে এসে টেলিফোনটা তুলে টিয়ার নম্বরটা ঘোরাল। মুহূর্তের মধ্যেই যান্ত্রিক গলা ভেসে এল—দিস নাম্বার ইজ নো লংগ্যার ইন সার্ভিস। একটু অবাক হল শৈবাল।

চা খেয়ে সঞ্জয় আর ইন্দ্রনীল উঠে পড়ল।

'চললে ?'

'হ্যাঁ চলি। কাল থেকে আবার ন'শ পঞ্চাশ এক, ন'শ পঞ্চাশ দুই।' সঞ্জয় সিগারেট ধরালো একটা।

'মানে ?'

'বললাম না সেভিংস অ্যাকাউন্টে এখন মাত্র ন'শ পঞ্চাশ।'

শৈবাল আর ইন্দ্রনীল হেসে উঠল।

'তাপস কেমন আছে ?'

এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সঞ্জয় বলল : 'ভালই। তোমাকে হয়ত আজই ফোন করবে।'

ডাকে আসা কাগজপত্তরগুলো জড়ো করে খাটের ওপর বসে আরাম করে সিগারেট ধরালো শৈবাল। একটা একটা করে সরাতে গিয়ে টিয়ার লেখা ছোট্ট খামটা নজরে এল ওর। আবার অবাক হল শৈবাল। জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে রেখে সযত্নে খামটা খুলল শৈবাল। বাইরের ঘরের যেটুকু আলো শোবার ঘরে এসেছে তাতে ভাল পড়া যায় না। সাইড টেবিলের আলোটা জ্বেলে

দিল শৈবাল। অক্ষরগুলো উজ্জ্বল হল।

'একটা ভালো চাকরি নিয়ে ইন্দোনেশিয়া চলে যাচ্ছি আমি। আপাতত বছর দেড়েকের প্রজেক্ট। চাকরিটা তোমার কাছে এমন কিছু নয় কিন্তু আমার কাছে অনেকখানি!

'কলকাতা থেকে লেখা তোমার চিঠিটা পেয়েছিলাম। ওটাও আমার সঙ্গে চলল। শুধু একটা কথায় খুব রাগ হয়েছে। আমার ছবি চেয়েছ কেন? আমার সবচেয়ে উজ্জ্বল ছবিটা ত তোমার কাছেই। লেক জর্জে, তোমার ঘরে, আমার ফেলে আসা অ্যাপার্টমেন্টে।

'রাগ করো, ঘেন্না করো, আমাকে ভুলতে তোমার কষ্ট হবে এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে আমি যাচ্ছি। নতুন ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেব। একটু আগে যে ছবিটার কথা বললাম সেই ছবিটাকে ফ্রেমে বাঁধতে ভয় লাগছে আবার। ভুল বুঝ না। ভাল থেক।

—আমি টিয়া।'

'নো!' একা ঘরে আর্তনাদ করে উঠল শৈবাল। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা ফিরে এল আবার। চিঠিটাকে মুঠো পাকিয়ে টলতে টলতে দাঁড়াল ও। বেসামাল পায়ে শোবার ঘর পেরিয়ে বাইরের ঘরে এল। বাইরের ঘরের দরজা পেরিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল শৈবাল। ওর চুলগুলো উড়ছিল হাওয়ায়। বোবা দৃষ্টি নিয়ে শৈবাল তাকালো সামনের দিকে। অনেক দূরে ছবির মতো নিউইয়র্কের স্কাইলাইন ঝিকিমিকি জ্বলছে। গোঁ গোঁ শব্দ করে একটা প্লেন বাড়ি কাঁপিয়ে উড়ে গেল। চারপাশের অন্ধকারে, দূরের আলোয় শৈবাল একদৃষ্টিতে সেই বিন্দুটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নিজেকে। কলকাতার বাড়িতে এখন সকাল। মার পুষ্পকে বকাবকি, বাজারের থলি নিয়ে বাবা, পূরবীদি, পল্টু সব মিলিয়ে একটা ভরাট সংসার। ও সেখানে নেই। কটা বাজে ইন্দোনেশিয়ায়? এতক্ষণে নিশ্চয়ই সূর্য উঠেছে টিয়ার নতুন ঠিকানায়। সবাই যে যার বিন্দুতে ফিরে গেছে। মুঠো শিথিল হয়ে দুমড়োনো চিঠিটা ভেসে গেল হাওয়ায়। রেলিংটাকে শক্ত করে চেপ ধরল শৈবাল। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নীচে নামল চিঠিটা, তারপর হারিয়ে গেল একসময়। দূরে, অন্ধকারে—যেখানে বিন্দুদের কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই।

সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙ্গল ওর। বাইরের ঘরের সোফাতেই শুয়ে পড়েছিল কখন খেয়াল নেই ওর। একরাশ তাজা রোদ্দুর মুখে নিয়ে তড়াক করে

লাফ দিয়ে উঠল শৈবাল। চায়ের জল চাপিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকল। নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই অফিসে পৌঁছে গেল শৈবাল।

ওর ঘর ভর্তি রোদ্দুর। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শৈবাল। উইপিং উইলো গাছটার সেই ডালটা এখনো ঝুঁকে রয়েছে জানালার ওপর। দূরে রাস্তার ধার ঘেঁষে সারি সারি অনেকগুলো গাছ—সুন্দর সুন্দর রং লেগেছে পাতায়। সবুজ হাবিয়ে গিয়ে লাল আর হলুদে মাখামাখি রোদ্দুর। রং বদলাচ্ছে পাতারা।

'গুড মর্নিং।' বেথের গলা পেল শৈবাল।

'গুড মর্নিং।' শৈবাল হাসল।

'ছুটি কাটালে কিরকম ?'

'খুব ভাল কিন্তু খুব অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত কেন ?' একটা দামী সৌরভ ভেসে এল বাতাসে।

'আমি কখনো ভাবিনি এখানকার জন্য মন কেমন করবে আমার।'

'কি ঠিক করলে ? ফিরে যাবে দেশে ?'

একটু চুপ করে থেকে শৈবাল বলল : 'বোধহয় না। দেশকে হয়ত ভালবাসি, নিউইয়র্কে আছি বলেই। তোমবা কেমন আছ ?'

'একই রকম চলছে। কোন অভিযোগ নেই।' বেথ হাসল। হাতের নোটবইয়ে মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে বলল : 'তোমার একটা মিটিং আছে ন'টায়।'

শৈবাল ঘড়ি দেখল—পাঁচ মিনিট বাকি আছে আর।

'চা খাবার নেমন্তন্নটা ভ্যালিড আছে এখনো ?' শৈবাল জানতে চাইল।

মুহূর্তের জন্যে একটু অবাক হয়েই হেসে ফেলল বেথ : 'তোমার মনে আছে এখনো ? নিশ্চয়ই। যে-কোন দিন।'

'আমাব এখন অফুরন্ত সময়। দিন ঠিক করে আমাকে জানিও।' মুচকি হেসে বেথকে পাশ কাটিয়ে শৈবাল বেরোল ঘরে থেকে।

বিরাট পার্কিং গেট পেরিয়ে মেন বেল্ডিং-এর দিকে হেঁটে যাচ্ছিল শৈবাল। এক গাদা নীলে ডোবা আকাশ তাকিয়েছিল মাটির দিকে। হলুদ লাল পাতারা ঝিলমিল উড়ছিল বাতাসে। সারা গায়ে রোদ্দুর মেখে শৈবাল দৃঢ় পায়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল পথ। এটা এখন একমাত্র দ্বীপ। দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল হতে আর রাজী নয় ও। দূরে মেন বিল্ডিং-এর ঝকঝকে গেটটা দেখতে পেল শৈবাল। আর সময় নেই। এখন দাঁড়াতে গেলে দেরী হয়ে যাবে আরো।

—